ISSN : 2519-5816

Jagannath University

Journal of Arts

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস

Faculty of Arts | কলা অনুষদ

Volume 12, Number 2

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 12, No 02, July–December 2022

ISSN 2519-5816

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 12, No 02, July–December 2022

Published in : 31 December, 2022

All views and ideas expressed in articles published in the journal are solely belong to the author(s). The Editor, the Editorial Board and the Publisher have no responsibility or liability in such cases.

Published by: Dean, Faculty of Arts
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh

Printed at : DS Printing and Packaging
234/D New Elephant Road, Dhaka-1205
Cell : 01817078796

Subscription : BDT 300/- (Three Hundred Taka) per issue

ISSN : 2519-5816

Chief Editor
Professor Dr. Md. Rais Uddin

Faculty of Arts
Jagannath University, Dhaka-1100
www.jnu.ac.bd

Advisory Board

1. **Professor Dr. A.K.M Yakub Ali**
   Professor Emeritus
   Department of Islamic History and Culture
   Rajshahi University, Rajshahi
2. **Professor Dr. Fakrul Alam**
   UGC Professor & Director
   Bangabandhu Sheikh Mujib Research Institute
   University of Dhaka, Dhaka-1000
3. **Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed**
   Department of History
   University of Dhaka, Dhaka-1000
4. **Professor Dr. Syed Azizul Haque**
   Department of Bangla
   University of Dhaka, Dhaka-1000
5. **Professor Dr. Rashidunnabi**
   Department of Music
   Jatia Kobi Kazi Nazrul Islam University
   Trishal, Mymensingh.
6. **Professor Nisar Hossain**
   Dean, Faculty of Fine Arts
   University of Dhaka, Dhaka-1000
7. **Professor Dr. Lutfor Rahman**
   Department of Drama & Dramatics
   Jahangirnagar University, Savar, Dhaka
8. **Professor Dr. M. Matiur Rahman**
   Department of Philosophy
   University of Dhaka, Dhaka-1000
9. **Professor Dr. Anirudha Kahaly**
   Department of Bangla
   Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

10 **Professor Dr. Muhammad Shafiq Ahmad**
   Department of Islamic Studies
   University of Dhaka, Dhaka-1000

Editorial Board

Chief Editor : **Professor Dr. Md. Rais Uddin**
Dean
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

Associate Editor : **Fazle Elahi Chawdhury**
Associate Professor, Dept. of Bangla
Jagannath University, Dhaka

Dr. Musarrat Shameem
Associate Professor, Dept. of English
Jagannath University, Dhaka

Members : **Professor Dr. Milton Biswas**
Chairman
Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Md. Momin Uddin
Chairman
Department of English, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Shamsun Nahar
Chairman
Department of Hisroty, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Md. Atiar Rahman
Chairman
Department of Islamic History and Culture
Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Muhammad Abdul Wadud
Chairman
Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Mohammad Hafizul Islam
Chairman
Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka

Dr. Jhumur Ahmed
Chairman
Department of Music, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Bazlur Rashid Khan
Chairman
Department of Fine Arts, Jagannath University, Dhaka

Shams Shahriar Kabi
Chairman
Department of Theatre, Jagannath University, Dhaka

Editorial Assistant : **S.M.Enamul Haque**
Assistant Registrar
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

সম্পাদকীয়

দারুণসব গবেষণাফল সংবলিত ২৯টি প্রবন্ধ নিয়ে ‘Jagannath Universtiy Journal of Arts’ (Volume 12, No 02) সংখ্যাটি যথাসময়ে প্রকাশ করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কেবল সম্পাদকীয় কঠোরতা কিংবা সচেতনতা দিয়ে এই সংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা যেত না, যদি গবেষক এবং মূল্যায়নকারীর সার্থক সমবায় না থাকত। ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মতত্ত্ব, আইন, তথ্যপ্রযুক্তি-ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থায়ন-ব্যবস্থাপনা, অভিবাসী জীবন, নিম্নবর্গের মানুষের জীবন, প্রকৃতি-ব্যবস্থাপনা, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বরতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ পদ্ধতিগতভাবে উঠে এসেছে গবেষকগণের রচনায়। বাংলা ভাষায় লিখিত অধিকাংশ প্রবন্ধে ধর্মের সঙ্গে জীবনকে সম্পৃক্ত করে দেখবার বাসনা লক্ষ করা যায়। ইংরেজি ভাষায় লিখিত রচনাসমূহে অপেক্ষকৃত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কোনো গবেষণা-সংকলনে বৈচিত্র্য থাকা বা না-থাকার ব্যাপারটি পরনির্ভর– যা কেবল অংশগ্রহণকারী গবেষকদের চিন্তার ঐক্য কিংবা বৈসাদৃশ্যের ওপরই নির্ভরশীল।

নির্ধারিত সময়ে জার্নালটি প্রকাশের সহযোগী হিসেবে এই সংখ্যার সকল প্রাবন্ধিক, মূল্যায়নকারী, সম্পাদনা-পর্ষদ এবং মুদ্রণ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদদীন)
প্রধান সম্পাদক
Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July–December 2022
Jagannath Universtiy
Dhaka-1100

সূচি

১.	বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে আধুনিকতার প্রভাব ও ইসলামের নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা আতিয়ার রহমান	১১
২.	শিক্ষা-সাহিত্য ও মানবসেবায় নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী আনোয়ারা আক্তার	২৫
৩.	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও): ইসলামি নির্দেশনার আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা এ জি এম সাদিদ জাহান, মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক	৩৯
৪.	রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তায় 'সুর': রবীন্দ্রসংগীত নির্মাণে এর প্রতিফলন ঝুমুর আহমেদ	৫৪
৫.	ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতবৈচিত্র্য : কারণ, ধরন ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ	৭০
৬.	ক্যাথে কোলয়িজের চিত্রকর্মে সহমর্মিতা ও স্মৃতির দৃশ্যায়ন মোহাম্মদ জাহিদুল হক	৯২
৭.	মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন	১১০
৮.	ইসলামের আলোকে বাজারজাতকরণ নীতিমালা মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল, মোহাম্মদ ওমর ফারুক	১২৬
৯.	"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন	১৪৬
১০.	ব্রিটিশ ভারতে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা: একটি পর্যালোচনা মোঃ কামাল হোসেন	১৬৩
১১.	প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, সেবা ও পরিচর্যা: ইসলামি নির্দেশনা মোঃ নজরুল ইসলাম, ফারজানা আক্তার ডালিয়া	১৭৭
১২.	খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা মোঃ নুরুল আমিন	১৯৬
১৩.	কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে অলঙ্করণ শৈলীর বিশ্লেষণ মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস	২১৪
১৪.	মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে রাজনৈতিক অভিক্ষেপ : প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন শামসুজ্জামান মিলকী	২৪৪
১৫.	চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুসলিম স্বর্ণযুগ (৬১০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) সুফিয়া খাতুন	২৫৮
১৬.	রাজধানী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শহর: ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণে রমনা এলাকার ঐতিহাসিক বিবর্তন সুরাইয়া আক্তার	২৭৪

১৭. **Dalit Children in Primary Education: An Overview of Their Status in Munshigonj District** ২৯১
Ayesha Siddequa Daize, Md. Ershadul Islam
১৮. **Why do Women Migrants Return? Evidence from Bangladeshi Migrants** ৩০৬
Azmira Bilkis
১৯. **A Study on the Genocidal Torture of Bangladesh Genocide 1971** ৩২৬
Chowdhury Shahid Kader
২০. **Tolerance and Pluralism in Islam: A Contemporary Thought** ৩৪২
Gazi Omar Faruque, Maksuda Akhter
২১. **The Effects of Perceived Discrimination on the Level of Confidence among Immigrants in Canada** ৩৫৪
Md. Aminul Islam
২২. **Policies and Challenges to Prevent Deforestation in Bangladesh** ৩৬৮
Md. Azam Khan
২৩. **The Role of MPs in Strengthening Local Government in Bangladesh: The Case of Two Upazila** ৩৭৭
Md. Naim Akter Siddique
২৪. **Determinants of Profitability of Insurance Business in Bangladesh: A Study on Bangladesh General Insurance Company (BGIC) Ltd.** ৩৯৩
Md. Omar Faruque
২৫. **The Conceptualization of Policy Implementation Theory** ৪১৩
Md Saidur Rashid Sumon
২৬. **China’s Role in the Infrastructure Development of a Muslim Country Bangladesh** ৪২৩
Mobarak Hossain
২৭. **Smartphone usage and its impact on interpersonal relationships of the school going adolescents of Dhaka city** ৪৩৭
Sabina Sharmin, Bushra Islam
২৮. **Impediments of Women Empowerment in Rural Bangladesh: An Empirical Study** ৪৫৪
Shahnaz Sarker
২৯. **Why Islamic Finance is Panacea for Addressing Crisis in Financial Markets** ৪৭০
Tareq Muhammad Shamsul Arefin, Mohammad Nurullah, Salieu Senghore

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে আধুনিকতার প্রভাব ও ইসলামের নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা

আতিয়ার রহমান*

Abstract

Marriage is the proper and only means of uninterrupted human existence. It carries tremendous importance and profound significance in human life. Its implications are far-reaching. In fact, marriage is a social institution, of which almost all people are direct or indirect members. It is a unique worship and legal and social contract. Marriage is the name of the contract by which two people from two completely different families become 'one joint human being' and are identified as half and half in family life. The motto of keeping human society pure is the selection of bride and groom before 'marriage'. With the touch of modernity which has been separated from the originality of Islam. The beautiful and egalitarian rules that Islam has formulated in the Muslim society in the selection of spouses are absolutely essential. This article is devoted to the detailed description of that beautiful and just law.

চাবিশব্দ: সমাজ, বিবাহ, স্বামী ও স্ত্রী, ইসলাম, আইন, মুসলিম, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের সূচনা ঘটে যা মানবসমাজের উৎস। এ থেকেই পরিবার, সমাজ ও বৃহত্তর রাষ্ট্র কাঠামোর সৃষ্টি। পরিবার হচ্ছে একটি সার্বজনীন, স্থায়ী ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যাকে সামাজিক জীবনের চিরন্তন বিদ্যালয় হিসেবে সনাক্ত করা হয়। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন মানব–প্রকৃতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিকে ইসলাম কোনোভাবেই অস্বীকার করে না। বরং এ ব্যাপারে যথাযথ উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান করে। ইসলাম এ ব্যাপারে আরও যে ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে, বিবাহের মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্ক ও গঠিত পরিবার যাতে সুরক্ষিত থাকে এর চিরকার্যকর বিধি-ব্যবস্থা নির্দেশ করে। ইসলাম নির্দেশিত এ বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি অর্জিত ও নিশ্চিত হতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে আধুনিকতার যে প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালাও সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নে গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে আধুনিকতার স্বরূপ

বিবাহ[১] বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাম্পত্য[২] জীবনের পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি এর কলেবরও বিস্তৃত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক, পারিবারিকভাবে কোনো ব্যবধান থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে বিবাহের

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

পূর্বেই ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা অপরিহার্য। আধুনিক সমাজ[৩] ব্যবস্থায় পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে নানা প্রকার রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

ক. উচ্চ শিক্ষিত (মাস্টার্স কিংবা পিএইচ.ডি থাকার শর্ত জুড়ে দেয়া) ও সাংসারিক কাজে দক্ষ হওয়া।[৪]
খ. ধার্মিক, রুচিশীল, সুন্দরী ও পাত্রীর চুল লম্বা হওয়া।
গ. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বৈঠকে বৈশ্বিক জীবন ধারণমূলক নানা প্রশ্ন করা। যেমন: গান গাইতে পারা, নাচতে পারা ইত্যাদি প্রসঙ্গ।
ঘ. নম্র স্বভাব ও সরলমনা হওয়া।
ঙ. অর্থবিত্তশালী অর্থাৎ নিজস্ব ফ্ল্যাট, কয়েকটি প্লট ও গাড়ি, শিল্পপতির মেয়ে, প্রবাসী, আবার অনেক ক্ষেত্রে আভিজাত্যের অভিভাবক পাত্রের ক্ষেত্রে ভালো ছেলে হিসেবে মান যাচাই না করে মেয়েকে লাখ বা কোটি টাকা যৌতুক দিয়ে পাত্রস্থ করে।
চ. সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততি হওয়া।
ছ. চাকুরিজীবী হওয়া। অর্থাৎ পাত্র শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকুরিজীবী হওয়া। তবে সরকারি চাকুরিকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।
জ. পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় বি-গায়রি মুহরিমদের সাথে নিয়ে আসা। অর্থাৎ বোন জামাই, বড় ভাই, বন্ধু প্রমুখ লোকজনকে সাথে নিয়ে আসা।
ঝ. পাত্রীর সৌন্দর্য বা ধার্মিকতার চেয়ে যৌতুককে প্রাধান্য দেয়া হয়।
ঞ. সক্ষমতা বহির্ভূত মহরানা নির্ধারণ।[৫]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে আধুনিকতার প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশে শুরু থেকেই সকল ধর্মের, শ্রেণিপেশার মানুষ সহাবস্থানে থেকে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পার্বণ পালন করে আসছে। এখানে সকল ধর্মের লোকই পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং পরিবারের মধ্য থেকেই দাম্পত্য জীবন গঠন করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ দেশের মানুষ বর্তমানে কতটুকু দাম্পত্য জীবন পরিচালনায় পারিবারিক নিয়ম কানুন এবং ধর্মীয় বিধান মেনে চলছে? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সূত্রে সমাজের চিত্রে দেখা বা শোনা, সংবাদ পত্র, রেডিও টিভির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বাস্তব চিত্র। আজ বাংলাদেশে ৮৮% এর উপরে মুসলমান, সেখানে পারিবারিক ও সামাজিক এবং দাম্পত্য জীবনে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে যা দেখা যায় তা আসলে খুবই বেদনাদায়ক। আজকের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই চোখে পড়ে যে, পারিবারিক কলহে বাবা ছেলেকে, ছেলে বাবা-মাকে, ভাই ভাইকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা বা খুন করছে, সামান্য কারণেই মুক্তিপণের আশায় নিষ্পাপ শিশুকে গুম করে হত্যা, ৩/৪ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ, শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রী ধর্ষণ, বখাটে কর্তৃক উঠতি বয়সী মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করা, অবৈধ মেলামেশায় অনৈতিক সম্পর্ক তৈরি এবং মোবাইলে পর্ণগ্রাফি ধারণ এবং তা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া, পরকীয়া প্রেম, স্বামী স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন অবশেষে হত্যা-খুন ইত্যাদি দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলছে যা জাহিলিয়াতের যুগকেও হার মানিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামি অনুশাসন অনুসরণ না করা। যার ফলশ্রুতিতে পরিবার থেকেই প্রথম অধঃপতন শুরু হয়

আর ক্রমে তা সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ কারণেই বর্তমানে বাংলাদেশে উল্লিখিত বিষয়ের দরুণ দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তথা কলহের চিত্র এতই নাজুক ও বর্বরতায় ভরপুর যা বর্ণনাতীত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো:

১. নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী মো. আব্দুল্লাহ চৌধুরী ওরফে রাসেল (৩২) তার স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস জ্যোতিকে (২৩) ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।[৬]
২. সাভারের আশুলিয়ায় দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী শাহরিয়ার সোহেল (৪৪) এর বিশেষ অঙ্গ কেটে দিয়েছে স্ত্রী। স্ত্রীর অভিযোগ কয়েকদিন ধরে সে অন্য মেয়েদের সাথে পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। এলাকার মরুব্বিদের মাধ্যমে শালিশেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্ত্রী তার বিশেষ অঙ্গ প্রায় ৫০ ভাগ কেটে দেয়।[৭]
৩. নরসিংদীতে পরকীয়ার সন্দেহের জেরে স্বামী প্রবাসী সুজন মিয়ার স্ত্রী লাভলী বেগমকে (৩০) হত্যা করে।[৮]
৪. গাজীপুরে দাম্পত্য কলহের জেরে গার্মেন্টস কর্মী সুমা আক্তার ওরফে সুমিকে (২৭) ১৫ টুকরো করে হত্যা করে স্বামী মামুন মিয়া (২৫)।[৯]
৫. রংপুরের পীরগঞ্জে দাম্পত্য কলহের জেরে নববধূ তার স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দিয়েছে।[১০]

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো বিভিন্ন দৈনিক খবরের কাগজ ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদগুলোর ন্যায় প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। এর অন্যতম কারণ হলো বিবাহপূর্ব পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ না মানা, অজ্ঞতা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের আইনগত দিক

বিবাহপূর্ব পাত্র-পাত্রী নির্বাচন মানবাধিকারের[১১] অন্যতম একটি অধিকার, যা জাতিসংঘ কনভেনশন ও বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা' নামে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত উক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "ভাবী দম্পতির অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে।"[১২]

বাংলাদেশ জাতিসংঘ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে, তবে পারিবারিক বিষয়টি বাদ রেখেছে।[১৩] বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার মূল ধর্মীয় বিধানের আলোকে পারিবারিক আইন প্রণয়ন করেছে। সরকার প্রণীত এ আইনেও বিবাহে বর কনের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে এভাবে, "সিদ্ধ বিবাহের জন্য পাত্র এবং পাত্রীর সম্মতির প্রয়োজন। বালেগ হওয়ার পর যদি পাত্র ও পাত্রীর পরিণত বুদ্ধি না হয় তবে তাহাদের সম্মতিতে বিবাহ অসিদ্ধ। আবার সম্মতি যদি স্বাধীন না হয় তবে সে সম্মতি মূল্যহীন। যিনি বিবাহের দাবি করেন তাহাকে প্রমাণ করিতে হয় যে, পাত্র ও পাত্রীর বিবাহে স্বাধীন সম্মতি ছিল।"[১৪] সরকারের এ আইনটি মূল শারঈ আইনের হুবহু প্রতিফলন। ইসলামি শরী'আর স্বতঃসিদ্ধ বিধান হচ্ছে,

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا
قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

> "বিনা অনুমতিতে বিধবাকে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং বিনা সম্মতিতে কুমারিকেও বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তার সম্মতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, তার চুপ থাকা।"[১৫]

ভাবী দম্পতির পারস্পরিক দেখাদেখি, উপযুক্ততা যাচাই এবং অবাধ ও পূর্ণসম্মতি ব্যতিরেকে যে বিবাহ সম্পাদিত হয় সে বিবাহ হচ্ছে জোর জবরদস্তির বিবাহ। ইসলামি শারীআহ, রাষ্ট্রীয় আইন কিংবা জাতিসংঘ কনভেনশন-এর কোনোটিতেই এ প্রকার বিবাহ স্বীকৃত নয়।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামি নির্দেশনা

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বা দেখার অর্থ এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই নয়।[১৬] এর বহুবিধ অর্থের মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে যাচাই-বাছাই, খোঁজ-খবর নেয়া ও খুঁজে বের করা এবং বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রভৃতি।[১৭] তাই দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ, সুমধুর ভালোবাসা ও বিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক জীবনে দৃঢ়তা ও সুখ-সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

> فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
>
> "সুতরাং তোমরা বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার জন।"[১৮]

আল্লামা সুয়ূতীর (রহ.) বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ আয়াতাংশের মধ্যে বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা হালাল হওয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কোন পাত্রী ভালো হবে তা চোখে দেখে জানা যায়।[১৯] জালালুদ্দীন আল কাসিমীর বিশ্লেষণে রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও কল্যাণ-ক্ষমতার দিক দিয়ে যে মেয়েরা নিজেদের জন্য ভালো বিবেচিত হবে তাদের বিবাহ করতে বলা হয়েছে।[২০] উপরিউক্ত আয়াতাংশের আরেকটি অর্থ হতে পারে "নারীদের মধ্যে তোমাদের জন্য যারা হালাল তাদেরকে (তোমরা বিয়ে কর)।"[২১] ইমাম আর-রাযী (র.) এ দুটি অর্থের প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভালো শব্দকে মনের ভালো লাগা ও অন্তরের আকৃষ্ট হওয়া অর্থে প্রয়োগ করলে তখন আয়াতটির অর্থ ব্যাপকভিত্তিক হবে এবং তাতে বিশেষ ভাবও প্রবিষ্ট থাকবে।[২২] আলিমগণের বিশ্লেষণ থেকে এ আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়, فانكحوا من النساء ما مالت له نفوسكم واستطابته "সুতরাং তোমরা বিবাহ কর সেই নারীদের যাদের প্রতি তোমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং যারা তোমাদের মনঃপুত হয়।[২৩] আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদিস উক্ত অর্থকে সাব্যস্ত করে,

> كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.
>
> "আমি নবি কারিম (স.)-এর নিকট ছিলাম, তাঁর কাছে একজন লোক এসে তাঁকে জানালেন যে, তিনি আনসারদের এক রমণী বিবাহ করেছেন। তখন তাঁকে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি কি তাকে দেখে নিয়েছো? তিনি রা. বললেন, না? তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি যাও তাকে দেখে নাও, কেননা আনসারগণের চোখে একটু সমস্যা আছে।"[২৪]

সুতরাং বলা যায় যে, উল্লিখিত আয়াতে দু'টি দিক আলোকপাত করা হয়েছে। ১. তোমরা যাদেরকে বিবাহ করবে তারা অবশ্যই তোমাদের জন্য হালাল হতে হবে। অর্থাৎ মুহরিম না হওয়া। ২. পাত্রীকে অবশ্যই সতীসাধ্বী হতে হবে এবং তাদের দেখেশুনে তোমাদের ভালো লাগতে হবে-মনঃপুত ও মনের মত হতে হবে। আর হাদিসে যে দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো, বিবাহে পাত্রী দেখার জন্য সরাসরি রাসুলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশ দান এবং এ নির্দেশ অবিলম্বে বাস্তবায়নের আদেশ প্রদান আর অন্যটি হচ্ছে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মুখে কোনো কোনো আনসার রমণীর চোখের একটি ত্রুটি উপস্থাপন। বস্তুত এ ত্রুটি উপস্থাপন করা হয়েছে النصيحة বা বিবাহের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের স্বার্থে।[২৫] যাতে বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য জীবনে অদেখা ত্রুটির কারণে কোনো সংকটের সৃষ্টি না হয়।

বিবাহের আগে পাত্র-পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে দেখলে বিবাহোত্তর প্রেম-ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে একাধিক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈকা নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এতে রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না, দেখিনি। তখন তিনি সা. বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এই দেখা তোমাদের মাঝে ভালোবাসা জন্ম দিবে।"[২৬]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا

"সাহল ইবন সা'দ (র.) হতে বর্ণিত, একজন নারী রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এসেছি এজন্য যে, আমি নিজেকে আপনার নিকট সোপর্দ করব। তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর প্রতি উদার দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তাঁকে সার্বিকভাবে দেখলেন। অনেক সময় ধরে তিনি নির্বাক হয়ে থাকলেন, কোনো জবাব দিলেন না। তখন নারী লোকটি বুঝতে পারলেন, রাসুলুল্লাহ সা. তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত নন তবুও তিনি বসে থাকলেন তখন তাঁর একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ নারী লোকটিতে আপনার যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিন।"[২৭]

হাদিস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, বিবাহের প্রস্তাবের পরে রাসুলুল্লাহ সা. পাত্রীকে দেখেছেন বরং খুব ভালোভাবেই দেখেছেন এবং দেখে তাঁকে তার পছন্দ হয়নি এবং তাঁকে তাঁর বিবাহও করতে হয়নি। আরও দেখা যায় যে, অন্য একজন পাত্র তাকে দেখেছেন এবং তাঁকে দেখে তাঁর পছন্দ হয়েছে এবং এ পছন্দের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বিবাহের উদ্দেশ্যে কনে দেখলে তাকে বিবাহ করা বা না করা উভয়ই তার জন্য বিধিসম্মত।

কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, বিয়ের পূর্বে কনে দেখা বৈধ এবং সুন্নাতও বটে। তবে কতটুকু দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে ইমাম গায্যালী পাত্র-পাত্রীর কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখে করেছেন;

যা সুন্নাত। তা হলো, ১. ধর্ম পরায়ণতা, ২. সৎ স্বভাব, ৩. সৌন্দর্য, ৪. মোহর কম হওয়া, ৫. ধার্মিকতা ও পরহেজগারীর পরিপ্রেক্ষিতে পাত্রী কুলীন হওয়া ৬. পাত্রী কুমারী হওয়া, ৭. পাত্রী নিকট সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া।[২৮] রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

> إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.
>
> "যখন তোমাদের কেউ নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন সে যেন উক্ত নারীকে এমনভাবে দেখে যা তাকে তার সাথে বিবাহে উৎসাহিত করে; সে যদি এটি করতে সমর্থ হয় তাহলে অবশ্যই যেন সে এটি কার্যকর করে। হযরত যাবির রা. বলেন, আমি যখন এক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম, তখন আমি চুপিসারে গোপনে তাকে এমনভাবে দেখলাম, যা আমাকে তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে তোলে এবং আমি তাকে বিবাহ করে ফেলি।"[২৯]

যাবির রা. তার ভাবী স্ত্রীকে বিবাহের পূর্বে দেখেছেন বাগানের খেজুর বৃক্ষে আরোহণ করে অতিশয় সংগোপনে।[৩০] এ দেখার বিষয়টি তখন ভাবী স্ত্রী জানতে পারেননি। অন্য একটি হাদিসেও কনেকে না জানিয়ে দেখার বৈধতা পাওয়া যায়। হাদিসটি আবূ হুমায়দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

> إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.
>
> "যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন তাকে (নারীর) দেখা ও যাচাই-বাছাই করা তার জন্য কোনো প্রকার দূষণীয় কাজ নয়। কেননা, সে তো কেবল তাকে দেখেছে ও যাচাই-বাছাই করছে তাকে বিবাহে প্রস্তাব দেয়ার প্রেক্ষিতেই; যদিও সে (নারী) কিছুই জানে না।"[৩১]

ইমাম আশ-শাওকানীর (রহ.) বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কনে দেখা সংক্রান্ত হাদিসগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অনুমতিক্রমে কিংবা অনুমতি ব্যতিরেকে কনে দেখা জায়েয।[৩২] তবে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো মেয়েকে দেখা শরীআত সম্মত নয়। যদি কারও নিত্য নতুন যুবতী মেয়ে দেখা শুধু দর্শনসুখ লাভের বদরুচি হয়ে থাকে তবে তার মেয়ে না দেখা বা তাকে মেয়ে না দেখানো আবশ্যক।[৩৩] এ বিষয়ে উলামা-ই-কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, لا ينظر اليها تلذذا و شهوة ولا لريبة "কোনো মেয়েলোকের প্রতি যৌনসুখ লাভ, যৌন উত্তেজনার দরুণ কিংবা কোনো সন্দেহ-সংশয় মনে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়।"[৩৪]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামি নির্দেশনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের জীবনে এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে ইসলামের কোনো নির্দেশনা নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে যে সকল নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. ভালোভাবে কনেকে দেখে নেওয়া: কোনো সময় কোনো নারীকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে দেখে নেওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সা.-এর হাদিসেও উৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

"জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন্ আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।"[৩৫]অন্য এক হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলল, আমি একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন,"মেয়েটিকে দেখে নাও। আনসারীদের চোখে আবার সমস্যা থাকে।"[৩৬]

খ. ধার্মিকতা: দ্বীনদার ও ধার্মিক পাত্র-পাত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামে অধিকতার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে প্রথমেই খোঁজ নিতে হবে পাত্র-পাত্রী দ্বীনদার কি-না? এ জন্য ইসলামের বিধানে বিয়ের ক্ষেত্রে ধার্মিকতাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: দুনিয়ার সমস্ত কিছুই (তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী) ধন-সম্পদ। (তন্মধ্যে) মুসলিম সতী-সাধ্বী রমণী সর্বশ্রেষ্ঠ ধন।[৩৭]

এ সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:

لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْباً شَاكِراً وَلِسَاناً ذَاكِراً وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ.

"তোমাদের প্রত্যেকের অন্তর হবে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ও জিহ্বা হবে যিকরে নিবেদিত। আর এমন মুমিন স্ত্রী গ্রহণ করা উচিৎ, যে তার আখেরাতের কাজে সহায়তা করবে।"[৩৮]

সুতরাং এমন পাত্রী পছন্দ করা উচিৎ, যে হবে পুণ্যময়ী, সুশীলা, সচ্চরিত্রা, দ্বীনদার, পর্দানশীন; যাকে দেখলে মন খুশিতে ভরে ওঠে, যাকে আদেশ করলে তৎক্ষণাৎ পালন করে, স্বামী বাইরে গেলে নিজের দেহ, সৌন্দর্য ও ইজ্জতের এবং স্বামীর ধন-সম্পদের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ.

"সুতরাং সাধবী নারী তো তারা, যারা (তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে ও লোক চক্ষুর অন্তরালে) অনুগতা এবং নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযতে (তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে।"[৩৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

"আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা, তাদের এ রূপ সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য তাদেরকে বিয়ে করো না; কারণ ধন সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো নারীর দ্বীনদারিত্ব দেখে। মনে রাখবে, কালো দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবুও সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।"[৪০]

রাসুলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কেবল ধন-সম্পত্তি, বংশ-মর্যাদা ও রূপ-সৌন্দর্যের কারণেই কাউকে বিয়ে করা উচিত নয়। আর এটি নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গ. সম্পদ ও বংশ মর্যাদা: বিয়ে করার জন্য পাত্র-পাত্রীর যে সকল গুণাবলি দেখতে হবে তন্মধ্যে সৌন্দর্য, সম্পদ ও বংশ মর্যাদা থাকলেও দীনদারিত্ব হচ্ছে সর্বোত্তম গুণ। এ সম্পর্কে হাদিসে এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবূ হুরায়রাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: (মূলত) চারটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়: নারীর ধন-সম্পদ, অথবা বংশ-মর্যাদা, অথবা রূপ-সৌন্দর্য, অথবা তার ধর্মভীরুতার কারণে। (রাসুলুল্লাহ সা. বললেন) সুতরাং ধর্মভীরুকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ করে সফল হও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমার দু' হাত ধূলায় ধূসরিত হোক (ধর্মভীরু মহিলাকে প্রাধান্য না দিলে ধ্বংস অবধারিত)।[৪১]

ঘ. চারিত্রিক মাধুর্য: চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। হাদিসের বর্ণনানুযায়ী কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির আমলনামা সবচেয়ে বেশি ভারী হবে যার চরিত্র সুন্দর। তাই তো রাসুলুল্লাহ সা. সচ্চরিত্রবান পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

"তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।"[৪২]

অতএব দ্বীন ও চরিত্রেই পাত্র-পাত্রীর সমতা জরুরি। কারণ, সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্য, বন্ধন ও উচ্চ-নীচতার প্রাচীর চুরমার করে দেয় দ্বীন ও তাকওয়া।

ঙ. সন্তানদের প্রতি স্নেহশীলতা: রাসুলুল্লাহ সা. উল্লিখিত গুণাবলির পাশাপাশি সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণা ও স্বামীর সম্পদের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণকারী নারীগণকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نسَاء ركبن الْإِبِل صَالح نسَاء قُرَيْش أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

"আবূ হুরায়রাহ্ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: উট আরোহণকারিণীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী কুরায়শ বংশের নারীগণ, তারা শৈশবকালে সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণা হয় এবং স্বামীর ধন-সম্পদের উত্তম রক্ষনাবেক্ষণকারিণী হয়।"[৪৩]

চ. অধিক সন্তান ধারণকারী নারী বিবাহ করা: রাসুলুল্লাহ সা. পাত্র-পাত্রীর যে গুণ দেখে বিবাহ করতে বলেছেন তন্মধ্যে অন্যতম দুটি গুণ হলো অধিক সন্তান ধারণকারী নারী ও প্রেমময়ী নারী। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.

"মা'কিল ইবনু ইয়াসার রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবি সা.-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদা সম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? তিনি বললেন: না। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন: এমন নারীকে বিয়ে কর যে, প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো।"[৪৪]

ছ. পাপাচারী পাত্র-পাত্রী বর্জন করা: ফাসিক বা পাপাচারী ব্যক্তিকে পাত্র বা পাত্রী হিসেবে মনোনীত করা ঠিক নয়। কারণ পাপাচারী ব্যক্তি সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় না এবং এ জাতীয় ব্যক্তির সাথে সুখময় দাম্পত্য জীবন যাপনের আশাও করা যায় না। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা.-এর এক হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عن الشعبي قال: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.

"শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি তার প্রাণের টুকরা কন্যাকে কোনো ফাসিকের কাছে বিয়ে দেয়, সে মূলত রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।"[৪৫]

এছাড়া দেখা উচিত, ভাবী-সঙ্গিনীর পরিবেশ। শান্ত প্রকৃতির মেজাজ, মানসিক সুস্থতা ইত্যাদি; যাতে সংসার হয় প্রশান্তিময়। সুতরাং দ্বীনদারী ও চরিত্র ব্যতীত আভিজাত্য, নাম করা বংশ, যশ, সম্পদ, পদ প্রভৃতি বিবেচনা করে বিবাহ দিলে বা করলে দাম্পত্য-সুখের সুনিশ্চিত আশা করা যায় না।

প্রচলিত আধুনিকতা ও ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনা

বর্তমানে বাংলাদেশে দাম্পত্য সমস্যা উত্তরাত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাম্পত্য কলহের অন্যতম কারণ হলো মানুষ কখনো কখনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করে বা বিয়ে করে। অথবা বিয়েতে এমন সব বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেয় যা পরিশেষে জীবনকে দুর্বিসহ ও বিষময় করে তোলে।[৪৬] পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে প্রচলিত আধুনিকতা ও ইসলামি আইনের নির্দেশনার একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বিয়েতে কোন্ ধরনের পাত্র-পাত্রী প্রাধান্য পাবে ইসলামে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

> "চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধারণত কোনো মেয়েকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ মর্যাদা এবং তার দ্বীনদারী। তবে তোমরা তার দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দাও।"[৪৭]

রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন,

> لا تزوجوا النساء لحسنهن . فعسى حسنهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن لأموالهن . فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل

> "তোমরা কেবল নারীর বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করবে না। কেননা তাদের এ রূপ-সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধনসম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে কর নারীর দ্বীনদারী গুণ দেখে। মনে রাখবে, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবুও সে অন্যান্যদের তুলনায় উত্তম।"[৪৮]

কিন্তু প্রচলিত আধুনিক সমাজব্যবস্থায় পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়, কে কত সুন্দর-সুদর্শন, উচ্চতর ডিগ্রিধারী, লোভনীয় চাকরি, কার কত টাকা-পয়সা আছে, সে চাকরি বা টাকা হোক অবৈধ বা ঘুষের-সুদের, তা বিবেচনা করা হয় না। অথবা যাকে বিয়ে করলে যৌতুক বেশি পাওয়া যাবে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এটিই বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ কারণেই দাম্পত্য জীবনে এত সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে সবার শেষে অথবা সেকেলে বলে চালিয়ে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করা হয়। অথচ মহানবি সা. দ্বীনদারীকে অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। কারণ একজন দ্বীনদার রমণীই সংসারের সুখী দম্পতির পরিচায়ক। এ জন্য বলা হয়, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তাই সংসার সুখের করার জন্য সতী নারীর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة

> "আল্লাহ ভীতির পর মুমিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় সতীসাধ্বী স্ত্রীর মাধ্যমে।"[৪৯]

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشرط الثاني

> "আল্লাহ যাকে সৎ স্ত্রী প্রদান করেন; তাকে দ্বীনের অর্ধেক দিয়ে সাহায্য করেন। অতএব সে যেন দ্বীনের অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।"[৫০]

প্রকৃতপক্ষে সুখ-শান্তির ভিত পবিত্র কুরআন ও হাদিসেই বিবৃত হয়েছে। মানুষ যেন বুঝেও না বুঝার ভান করে অথবা বুঝে শুনেই সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং বলা যায় যে, বাস্তবিকই ধর্মপরায়ণা স্ত্রীগণ ইসলামি নির্দেশনা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা দ্বারা স্বামী সোহাগিনী, বিনীতা, শিষ্টাচারিণী, ন্যায়পরায়ণতা ও সতী-সাধ্বী ইত্যাদি সৎগুণের অধিকারিণী হয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারে। কাজেই রাসুলের উপদেশ ও নির্দেশ মুতাবিক বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে অগ্রাধিকার বিষয়: কিছু প্রস্তাবনা

আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনান্তে কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. ইসলাম নির্দেশিত ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দেয়া।
২. শুধু উচ্চ শিক্ষাকে প্রাধান্য না দিয়ে স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে পাত্রস্থ করা।
৩. বিবাহপূর্ব পাত্রীকে ভালোভাবে দেখে নেয়া।
৪. লোভনীয় চাকুরির দিকে লক্ষ না করে পাত্র-পাত্রীর নৈতিকতার দিকে লক্ষ রাখা।
৫. আর্থিকভাবে বেশি উপকৃত হওয়া যাবে এমন মনস্থির না করে রাসুলুল্লাহ সা. নির্দেশিত পাত্রীর সম্পদ, তার সৌন্দর্য, তার বংশ মর্যাদা এবং তার দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেয়া।
৬. বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। যা একটি বংশ ধারাকে পবিত্র রাখে। তাই বিবাহপূর্ব গর্ভধারণ বা গর্ভপাত করানো থেকে বিরত থাকা।

সর্বোপরি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. নির্দেশিত পন্থায় পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা।

উপসংহার

বস্তুত দাম্পত্য জীবনের সুখ নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতা, জীবনযাত্রা, রুচি, অভ্যাস ও সামাজিক অবস্থানের সাজুয্যের উপর। রাসুলুল্লাহ সা. বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর যে চারটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রাখতে বলেছেন, এগুলো তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তিনি বিশেষভাবে দ্বীনদারিত্বকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন, যা পাত্র-পাত্রীর মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের অভিন্নতা নিশ্চিত করে। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী যদি এ বিষয়গুলোতে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিয়ে করে তাহলে তা সুখময় দাম্পত্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আর এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিয়ের আগেই ধারণা নেয়া দরকার, যা পাত্র-পাত্রীর পারস্পারিক মতবিনিময় ও দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ হতে আরো যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়, তা হলো, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে উভয়পক্ষকেই স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে এবং পাত্র-পাত্রীর পারস্পারিক সাক্ষাৎ ও খোঁজ-খবর নেয়াকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া গণ্য করে সমভাবে সহযোগী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই পাত্র-পাত্রী শরীআ নির্দেশিত প্রক্রিয়ায় বিবাহপূর্বকালে নিজেদের জন্য আদর্শ সঙ্গী নির্বাচন করতে সক্ষম হবে, যা চূড়ান্তভাবে প্রেমময় দাম্পত্যজীবনের পাশাপাশি সুখি-সমৃদ্ধিশালী সমাজ বিনির্মাণেও ভূমিকা রাখবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ **বিবাহ:** বিবাহের আরবি প্রতিশব্দ (النكاح)। আভিধানিক অর্থ: দলিত করা, সংযুক্ত করা। বিবাহের সংজ্ঞায় ইবনে আবেদীন হানাফী (র) বলেন- النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالانثى قصدا "এটি এমন চুক্তি যা স্ত্রীকে উপভোগ করার অধিকার দেয়।" দ্র. জাবেদ মুহাম্মদ, *আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম* (ঢাকা: আল-মারুফ পাবলিকেশন্স, ২০১১ খ্রি.), পৃ.৩৮; *আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ* (কুয়েত : ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শাউনিল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), ৪১ খণ্ড, পৃ.২০৫। উল্লিখিত সংজ্ঞার ওপর কেউ কেউ আপত্তি উপস্থাপন করে বলেন, দৈহিক চাহিদা মেটানোই শুধু বিবাহ নয়; বরং দাম্পত্য জীবনে দুজন সভ্য মানুষের পরস্পরের প্রতি দায়িত্বও রয়েছে। আল কুরআন প্রদত্ত ভাষ্যটি যথার্থ সংজ্ঞার পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন- {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই

স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।" দ্র. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১

২ **দাম্পত্য:** দাম্পত্য শব্দটি বিশেষণ; এর বিশেষ্যরূপ দম্পতি। দম্পতি শব্দটি জায়া ও পতি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যার অর্থ স্বামী-স্ত্রী। এর আরবি প্রতিশব্দ 'যাওজুন' (زوج)। দম্পতির আভিধানিক অর্থ: জোড়া, দম্পত্তি, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ইত্যাদি। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম পূন:মুদ্রণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ.২৩০; মহিউদ্দিন খান, *আল-কাউসার, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৭৬

৩ **সমাজ:** বুৎপত্তিগত ভাবে সমাজ শব্দটি সম+অচ্+ঘঞ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ একত্রে গমন, একসঙ্গে বসবাস। সমাজের আরবী প্রতি শব্দ হলো المجتمع (আল মুজতামা) এবং এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Society। মূলত Society শব্দটি ইংরেজী Sociology শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ল্যাটিন শব্দ socious এবং গ্রীক logos শব্দ বা logia এর সমন্বিত শব্দ। ল্যাটিন socious শব্দের অর্থ (companions) সঙ্গীসহযোগী সমাজ। আর সমাজ হচ্ছে সহযোগিতা। যেহেতু সংঘবদ্ধ বা সঙ্গী-সাথি একত্রে মিলে জীবন নির্ভর করে সমাজ গড়ে ওঠে, সেহেতু socious এর ভাবার্থ সমাজ করা হয়েছে। দ্র. ড. মায়দান, *উসূলুদ-দা'ওয়াহ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকরীল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৬; মুহাম্মদ হাসান ইমাম, *সমাজ বিজ্ঞানের শব্দ সংজ্ঞা* (ঢাকা: প্রাসুখ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫২; আলহাজ্ব মো: আসাদুজ্জামান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচয়* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩,১০; ড. নাজমুল করিম, *সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭ম সংস্ক., ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৫

৪ '৩৬ গুণের সমাহারের বেশি দেশপ্রেমী পাত্রী চাই', *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি.; 'পাত্রীর মন হতে হবে 'ফুলের মতো নরম', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.

৫ প্রথম আলোর নারীমঞ্চে ২০১৬ সালের ১৯ জানুয়ারি 'সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী, শিক্ষিত, সংসারী পাত্রী চাই!' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। যাতে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। *দৈনিক প্রথম আলো*, পাত্রীর মন হতে হবে 'ফুলের মতো নরম', ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮; কানিজ ডিলায়া, বিয়ে করতে যাচ্ছেন? দেখুন তো পাত্র/পাত্রীর মধ্যে এই ১০ টি গুণ রয়েছে কি-না, *https://m.priyo. com/*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.; শাহানা হুদা রঞ্জনা, *The Business Standard,* ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. আরো অন্যান্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী চাই কলাম দ্রষ্টব্য

৬ https://bonikbarta.net/home/news_description/319331, সংগ্রহের তারিখ: ০২/১২/২০২২ খ্রি.

৭ https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1015330.details, সংগ্রহের তারিখ: ২১/১২/২০২২ খ্রি.

৮ https://www.somoynews.tv/news/2022-11-08/নরসিংদীতে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামী গ্রেফতার, সংগ্রহের তারিখ: ১১/১২/২০২২ খ্রি.।

৯ https://www.dailynayadiganta.com/more-news/432421, সংগ্রহের তারিখ: ১২/১১/২০২২ খ্রি.

১০ https://mzamin.com/news.php?news=18022, সংগ্রহের তারিখ: ২১/১১/২০২২ খ্রি.

১১ মানবাধিকার শব্দটি অধুনাবিশ্ব প্রেক্ষাপটে বহুল আলোচিত বিষয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "Human Rights"। এটা যৌগিক শব্দ। যার একটি হলো 'মানব' অপরটি 'অধিকার'। 'অধিকার' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Right'. যার শাব্দিক অর্থ হলো- সত্য, ন্যায়গত, সঠিক বা সর্বসাধারণের অধিকার। দ্র. Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bengali Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 2011), p. 655; সুতরাং 'অধিকার' বলতে ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার স্বাধীনতাকেই বুঝতে হবে। 'অধিকার' শব্দটির পরিচয়ে 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এ বলা হয়েছে স্বত্ব, আধিপত্য, দাবি, দাবিদার। দ্র. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫), পৃ. ১৫। পরিভাষায় অধিকার হলো, সেই সকল বাহ্যিক অবস্থা, যা মানুষের মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে।" দ্র. T.H. Green, *Lectures of the Principles Obligation* (Canada: Batoche Books, 1999), p. 05

১২ জাতিসংঘ কনভেনশন-১৯৪৮, অনুচ্ছেদ-১৬, ধারা ০২

১৩ গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার* (ঢাকা : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৪২-১৪৩

১৪ গাজী শামছুর রহমান, *নারী প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য* (ঢাকা : এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট {আশা}, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ.১৯০; মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ.৫৫; অধ্যাপক এ. এ. খান, *মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন* (ঢাকা : জুয়েল ব্রাদার্স, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ.২,৩

১৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (বৈরূত: দারু ইবনে কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদিস নং-৪৮৪৩; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারুল আফাকিল জাদীদ, তা.বি.), হাদিস নং-৩৫৩৮

১৬ আহমদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৮৩

১৭ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান* (কলিকাতা : ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৮৯

১৮ আল-কুরআন, ৪ : ৩

১৯ আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), পৃ. ১৮৯-১৯০; আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছুর*, ১ম খণ্ড (সৌদি আরব: জাহরান, আল মাকতাবাহ আল জা'ফারী, তাবি,) পৃ.১১৯

২০ মাহাসিনুত তাবীল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১০৪; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৩৭

২১ আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪২১হি./ ২০০১খ্রি.), পৃ. ৪৯৮

২২ ইমাম আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), পৃ. ১৭৩; আল-কুরতুবী, *আহকামূল কুরআন* (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), পৃ. ১২; আস-সুয়ূতী ও আল মাহাল্লী, *তাফসীরুল জালালাইন* (ভারত : দেওবন্দ, তাবি) পৃ. ৬৯।

২৩ আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ১ম খণ্ড (মিসর : মাকতাবাতুল মুসতাফা আল বাবী আল হালবী, ১৯২৪), পৃ. ৪১৯।

২৪ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৩৫৫০

২৫ আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবন্ শারফুদ্দীন আন্ নাবাবী, *রিয়াদুস সালেহীন* (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩ খ্রি.), পৃ.৪৫৬।

২৬ ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূত: মুয়সসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি. / ২০০১ খ্রি.), হাদিস নং-১৮৬৪৪

২৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৪৭৪২, ৪৮৩৩।

২৮ ইমাম গায্যালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ,৩৪-৩৫।

২৯ আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতু মুসতাফা আল হালবী দারু ইহইয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, তা.বি.), হাদিস নং- ২০৮২; আল বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাত, তা.বি.), পৃ.১৪৮; আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদিস নং-১৭৯১, পৃ.২০০

৩০ সামীর ইবন আমীন আয-যুহায়রী, *আল-আহকামূল মাতলবাহ ফী রুইয়াতিন মাখতুবাহ* (মিসর: জামিহুরিয়্যাতু মিসর আল আরাবিয়্যাহ, মাকতাবাহতুত তাওহীদ, ১৪১১ হি.), পৃ.৩০

৩১ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, ৫ম খণ্ড (কায়রো: মুয়াসসাসাতু কুরতুবাহ ও দারু ম'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৪২৪; আল-হায়ছামী, *মাজমাউস যাওয়াইদ ওয়া মামবা'উল ফাওয়াইদ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল

কিতাববিল আরাবী, তাবি), পৃ. ২৭৬; আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার শারহ মুনতাকাল আখবার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (লেবানন বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলামিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১১০

৩২ আশ-শাওকানী, পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১১

৩৩ আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বদরুদ্দীন আইনী, '*উমদাতুল কারী*, ২০শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারু এহয়ায়িত তুরাসিল আরবী, তা.বি.), পৃ. ১০৯

৩৪ আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বদরুদ্দীন আইনী, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৯-১১০

৩৫ সুলাইমান ইবনু আশআস ইবনু আবু দাউদ, *আস-সুনান*, ১২তম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ-শামেলাহ, ৩.৮ সংস্করণ, http://www.al-islam.com), হাদিস নং-২০৮৪

৩৬ আবু আব্দির রহমান ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ১৯৯১ খ্রি.), হাদিস নং-৩২৫৯

৩৭ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৩৭১৬

৩৮ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *আস-সুনান* (হালব : দারু ইহইয়ায়িল কিতাব আল-আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), হাদিস নং-১৯২৯

৩৯ আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

৪০ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-১৯৩২

৪১ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৫০৯০

৪২ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-২০৪৩

৪৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৫৩৬৫

৪৪ আবু আব্দির রহমান ইবনে শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-২০৫২

৪৫ আহমদ ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী আবু বাকর আল-বায়হাকী, *শু'আবিল ঈমান* (রিয়াদঃ মাকতাবাতার রুশদ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪২৩হি./২০০৩খ্রি.), হাদিস নং-৮৭০৭

৪৬ ড.মোঃ শামসুল আলম, *দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়ঃ কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি* (ঢাকাঃ ইসলামী আইন ও বিচার, ২০১০ খ্রি.), ত্রৈমাসিক পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১০, বর্ষ সংখ্যা-২৪, পৃ.৪৬

৪৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৫০৯০

৪৮ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-১৮৫৯

৪৯ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযভীনী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-১৮৫৭

৫০ আল-হাকিম মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, *আল-মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন* (বৈরূতঃ দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./১৯৯০ খ্রি.), হাদিস নং-২৬৮১

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৯.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

শিক্ষা-সাহিত্য ও মানবসেবায় নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী

আনোয়ারা আক্তার*

Abstract

The19th-century Bengali Muslim woman Nawab Faizunnesa Chowdhuraniemerged as the liberator of the then contemporary Indian Muslim women's society. She was a Zamindar and was awarded the title ‘Nawab’. She has made a remarkable contribution to literary development and social welfare. She was very conscious of politics and had involvement with contemporary political organizations. She has also played a significant role in the expansion of education, particularly that of women. She established separate educational institutions for women. She built Madrasah, Maktab, and primary schools not only for girls but also for boys. She also has outstanding contributions to the welfare of human beings. Although she had extensive contributions in diverse fields, most of the academic discussions focus only on her educational contributions. She was a Zamindar, and accordingly, she had an important contribution to every social and political field. This politically conscious woman managed her Zamindari very well. The present paper attempts at highlighting the very special aspects of the great personality Nawab Faizunnesa Chowdhurani.

চাবিশব্দ: ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, শিক্ষা-সাহিত্য, রাজনীতি, মানবসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন

ভূমিকা

উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি মুসলিম নারী নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩) ভারতীয় তথা বাংলার মুসলিম সমাজের এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও স্বীয় ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড তাঁকে সমসাময়িক পাক-ভারতীয় মুসলিম সমাজে পশ্চাৎপদ নারীদের মুক্তিদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এ মুসলিম মহিয়সী নারী একজন জমিদার ও খেতাবপ্রাপ্ত নবাবই ছিলেন না বরং সমাজসেবা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলিম নারীদের মাঝে অনন্য নক্ষত্র হয়ে আছেন। একজন নারী হয়ে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় জমিদারি পরিচালনা করা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। অথচ এ কাজটিকে অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করায় তাঁকে সুলতান রাজিয়ার সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। বস্তুত তিনি এমন একটা সময়ে আবির্ভূত হন যখন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা ছিল চরম দুর্দশায় নিপতিত, শুধু বিত্ত নয় শিক্ষা দীক্ষায়ও তারা ছিলেন পশ্চাৎপদ। পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দুদের মধ্যে নবজাগরণ তৈরি হলেও অপেক্ষাকৃত মুসলমানরা ছিল সে তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দুদের সমপর্যায়ভূক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য পরবর্তীতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখের প্রচেষ্টায়

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

মুসলমানদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে থাকে। এদেরই সমপর্যায়ভূক্ত ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী। উল্লেখ্য স্কুল কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এ নারী উপলব্ধি করেন নারী পুরুষের জন্য সমভাবে শিক্ষা প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকে তিনি ১৮৭৩ সালে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শুধু মেয়েদের জন্য নয় তিনি ছেলেদের জন্যও গড়ে তোলেন মাদ্রাসা, মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া তিনি ছিলেন সমাজসেবী ও সাহিত্যকর্মী। যে সময়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পুরুষদের পদচারণা ছিল সীমিত সে সময়ে নবাব ফয়জুন্নেছা 'রূপ জালালের' মত গদ্যে পদ্যে রচিত মিশ্রভাষারীতির সাহিত্যকর্ম রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এছাড়া সমাজকল্যাণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ, জেনারেল হাসপাতাল, মাদ্রাসা, মক্তব, মুসাফিরখানা, দিঘি, পুষ্করণী আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সেবাব্রতী, প্রজারঞ্জক একজন জমিদার। অথচ ইতিহাস দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন নারী জাগরণের প্রতীক এ নারী সম্পর্কে চর্চা ও অধ্যয়ন সময়ের বিশেষ দাবি। নারীর ক্ষমতায়নের এ যুগে তাঁর মত মহিয়সী নারী সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান প্রজম্মকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করবে। এই বোধ ও উপলব্ধি থেকেই বর্তমান প্রবন্ধটির অবতারণা।

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রবন্ধের উপজীব্য

প্রবন্ধটি রচনায় মানবিক বিদ্যা গবেষণায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধটি প্রণয়নে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক উৎস এবং অধিকাংশ দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নবাব ফয়জুন্নেছার রচনা ও সাহিত্যকর্ম, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, সরকারি দলিল ও নথি প্রাথমিক তথ্য হিসেবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে এবং আধুনিক গবেষকদের গবেষণার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বস্তুত প্রবন্ধটি রচনায় প্রাথমিক তথ্যসমূহ, দ্বৈতীয়িক তথ্যসূত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয়কে নতুন যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উনিশ শতকে দুর্দশাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হওয়া মুসলিম একজন নারীজমিদার ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেছা। একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন খেতাবপ্রাপ্ত নবাব, সমাজসেবায় ও সাহিত্য সৃষ্টিতে এক অনন্য নক্ষত্র। তিনি শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাৎপদ চরম দূর্দশায় নিপতিত ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে মুসলিমদের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ সময়কালে নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ফয়জুন্নেসা নারী জাগরণের প্রতীক ছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নারী জাগরণের প্রতীক নবাব ফয়জুন্নেছার কর্মপরিধির ব্যাপকতা তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে। এ গবেষণা থেকে পাঠক ও গবেষক প্রগতিশীল ও নারীজারণের প্রতীক নবাব ফয়জুন্নেছার জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।

পরিচয়

উনিশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী নবাব ফয়জুন্নেছা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রেঁনেসা যুগের মহান ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) কর্তৃক নারীদের উন্নয়নে ও নারী শিক্ষা বিস্তারে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা মুসলিম নারীদের স্পর্শ করেনি। বাংলায় তথা সমগ্র ভারত উপমহাদেশে গোটা মুসলিম সমাজ যখন

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন তখন তারা নারীদের কথা কমই ভেবেছিলেন। এ ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে যারা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী। বহু বিবাহ ও পর্দাপ্রথা উনিশ শতকের বাঙালি মুসলিম নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথা পালন করা সাধারণ রীতি ছিল এবং তা পারিবারিক আভিজাত্যের প্রতীকও ছিল। নারীরা পর্দা শুধু পুরুষদের সাথে করত না তারা নারীদের সাথেও পর্দা করত। এ সময় পর্দা প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রথা সামাজিক রীতি ছিল। মেয়েদের পড়াশুনায় আগ্রহী না করে তাদের সেলাই ও রান্নার কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। অবশ্য সাধারণভাবে অভিজাত পরিবারে নারীদের উর্দু পড়ানো হত ও কোরআন শিখানো হত। সর্বোপরি এ সময় নারীরা বাড়ির চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকতেন। এ সময়কালে জন্মগ্রহণ করেন ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী। তিনি উনিশ শতকের অসাধারণ বাঙালি মুসলিম নারী যিনি তাঁর স্বীয় যোগ্যতায় বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফয়জুন্নেছা তৎকালীন ত্রিপুরা[১] জেলা বর্তমান কুমিল্লা[২] জেলায় ১৮৩৪ মতান্তরে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হোমনাবাদের জমিদার আহমদ আলীর কন্যা। তাঁর জন্ম কুমিল্লা জেলার অধীন হোমনাবাদ পরগণার লাকসাম জংসনের দুই মাইল দূরে ডাকাতিয়া নদীর পার্শ্বে পশ্চিমগাঁও নামক গ্রামে। তাঁর মাতার নাম আফরান্নেছা। তিনি ছিলেন পিতা মাতার তৃতীয় সন্তান। [৩]

বুদ্ধিমতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ছোটবেলা থেকে সমবয়সীদের সাথে ক্রীড়া, কৌতুক ও খেলাধুলায় মেতে থাকতেন। সে সময় পর্দার বেড়াজাল অতিক্রম করে নারীদের লেখাপড়ার সুযোগ না থাকলেও ফয়জুন্নেছাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল একটু ভিন্ন। আর তাই তিনি পুরুষ শিক্ষকের সান্নিধ্যে আরবি, ফারসি ও বাংলা চর্চা করেন। তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। পারিবারিক মুক্ত আবহাওয়ার কারণে এবং গৃহ শিক্ষকের সহায়তায় তিনি কুসংস্কারমুক্ত এবং পরিবর্তিত যুগ অনুযায়ী গড়ে ওঠার সুযোগ পান। আর তাইতো তিনি তাঁর 'রূপজালাল' গ্রন্থে তাঁর শিক্ষকের গুণকীর্তন করে বলেন,

> উস্তাদের পদবন্ধি শিরের উপর।
> অন্ধ চক্ষে জ্যোতি দিয়ে করিল পসর।।
> তাজউদ্দিন মিয়া তাঁর নাম।
> প্রভু আগে মাগি তাঁর সর্গে হৈতে স্থান।।[৪]

অপরূপ সুন্দরী ফয়জুন্নেছাকে বালিকা বয়সে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার প্রাচীন জমিদার গাজী সাহেদের বংশধর।[৫] ফয়জুন্নেছার বয়স কম হওয়ায় এ বিয়েতে রাজী হননি তাঁর পরিবার। পরবর্তী সময়ে তিনি বিয়ে করেন নাজমুন্নেছাকে। বিয়ে করার পরও মোহাম্মদ গাজী ফয়জুন্নেছাকে বিয়ে করার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। আর তাইতো নানান জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি ফয়জুন্নেছাকে ১৮৬০-৬১ সালে বিয়ে করেন। দশ বছর বয়সে পিতৃহারা হওয়ায় ফয়জুন্নেছার মা ও তাঁর দুই ভাই জমিদারির হাল ধরেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও ফয়জুন্নেছাকে বিয়ে দিতে না পারার পশ্চাতে নানা কারণ থাকলেও মোহাম্মদ গাজীর ষড়যন্ত্র ছিল অন্যতম। উল্লেখ্য অন্যত্র বিয়ে দেবার সামান্য সুযোগ থাকলেও অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আফরান্নেছা (ফয়জুন্নেছার মা) এ বিয়ে দিতেন না। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা কিছু শর্ত রাখেন তার মধ্যে একটা হলো ফয়জুন্নেছা

মোহাম্মদ গাজীর বাড়িতে থাকবেন না। বিয়ের পর ফয়জুন্নেছা পাঁচ বছর স্বামীর সংসার করেছেন।[৬] এ সময় তাঁর দুই কন্যার জন্ম হয়। পরবর্তী কালে কৌশল অবলম্বন করে মোহাম্মদ গাজী ফয়জুন্নেছাকে তাঁর বাড়িতে (ভাউকসার) নিয়ে গেলে তিনি সেখানে মাত্র সাত দিন অবস্থান করেন। ফয়জুন্নেছা স্বেচ্ছায় চলে আসার প্রস্তুতি নিলে তাঁর স্বামী তাঁকে বড় কন্যা আরশাদুন্নেছাকে তাঁর কাছে রেখে দেয়ার শর্তারোপ করেন। ফয়জুন্নেছা তাঁকে রেখে তাঁর ছোট কন্যা বদরুন্নেছাকে সাথে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন জীবনে কেউ কারো মুখ দর্শন করবেন না। যদিও ফয়জুন্নেছা তা রাখতে পারেননি। তিনি মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে দেখতে গিয়েছিলেন। পশ্চিমগাঁওয়ে ফিরে ফয়জুন্নেছা ত্রিপুরার কোর্টের গাজীর বিরুদ্ধে মোহরানা মামলা করেন। মামলায় তিনি জয়লাভ করেন এবং মোহরানার এক লক্ষ টাকা পশ্চিমগাঁওয়ে গাজীর সম্পত্তি সমর্পণের মাধ্যমে শোধ করা হয়েছিল। অবশ্য তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি।[৭]

ফয়জুন্নেছার সংসার দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে সেসময় একাধিক বিয়ে স্বাভাবিক ছিল যার কারণে নানা রকম ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়, তাদের সংসারও হয়ত এর ব্যতিক্রম ছিল না। গাজী সাহেবের ঘর জামাই থাকার অনীহা বা পূর্বে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়ও থাকতে পারে। তবে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে থাকলেও প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেননি। এতে মনে হয় তাঁর মধ্যে সামন্ত প্রভুর জমিদারী মানসিকতা কাজ করে। তবে ফয়জুন্নেছার এ শোক তাঁকে অনবদ্য, অসাধারণ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করে। ফয়জুন্নেছা আত্মপ্রকাশ করেন জমিদার হিসেবে, হয়ে উঠেন সাহিত্যপ্রেমী, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী।

সংসার নামক রঙ্গমঞ্চের কঠোরতা ফয়জুন্নেছাকে দুর্বল করতে পারেননি। প্রতিকূল ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে না গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, আঘাতকে রূপান্তরিত করেছিলেন শক্তিতে, হয়ে উঠেছিলেন জমিদার নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী। জমিদারির কর্মযজ্ঞে প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে ছিলেন রাজেশ্বরী, জনদরদি।

নবাব ফয়জুন্নেছা বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার বড় জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারিতে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অংশও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর এ জমিদারি উত্তরাধিকার সূত্রে বাবা মায়ের সম্পত্তি, তাঁর মোহরানার অংশ, বোনের নিকট (লতিফুন্নেছা) থেকে ক্রয়কৃত এবং স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তাঁর জমিদারি থেকে বাৎসরিক আয় হত প্রায় এক লাখ টাকা এবং তাঁর জমিদারিতে ১৪ টি মৌজা অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮]

অত্যন্ত মেধা ও কর্মদক্ষতার সাথে জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন নবাব ফয়জুন্নেছা। তাঁর জমিদারি কার্যভার গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে ১৮৭০ সাল[৯] এবং কেউ কেউ ১৮৮৫ সাল[১০]বলে উল্লেখ করেন। জমিদারি কার্যভার গ্রহণ করার পর যথেষ্ট যোগ্যতার সাথে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। সেখানে পর্দা প্রথা কোন বাধা হতে পারেননি। তিনি সমসাময়িক অনেক পুরুষ জমিদারের থেকে অত্যন্ত সফলতার সাথে জমিদারি পরিচালনা করেছেন। জমিদার হিসেবে তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনকল্যাণকামী। তাঁকে সহযোগিতা করেন প্রবীণ, সুযোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন দেওয়ান নকীর তুল্লাহ।[১১] এ নায়েব ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত। পর্দার আড়াল থেকেই ফয়জুন্নেছা তাঁর সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা করতেন। অধিকাংশ আমলা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও নবাব ফয়জুন্নেছার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জমিদারি পরিচালনায় কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি। তিনি প্রজা সাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে

পরিদর্শনের জন্য পালকিতে চড়ে বিভিন্ন মৌজা পরিদর্শনে বের হতেন এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ প্রজাদের সুখ দুঃখ পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি ছিলেন প্রজা কল্যাণকামী জমিদার। দরিদ্র জনগণের অবস্থা তিনি নিজ চোখে দেখে তাদের দুর্দশা লাঘবে কাজ করতেন। যেকোনো প্রয়োজনে কেউ তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফেরেননি।[১২]

দরিদ্র জনগণের সুবিধার্থে তাঁর জমিদারি এলাকায় তিনি বহু দিঘি, পুকুর এবং খাল খননসহ রাস্তাঘাট নির্মাণ, মক্তব, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা, মেহমানখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তাঁর সামগ্রিক নিয়ম ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও রুটিন মাফিক জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে নাস্তা শেষে তাঁর জমিদারের কার্যালয়ে বসে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন এবং পর্দার আড়াল থেকে তিনি তাঁর আমলা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। তাঁর কাজ সকালে শুরু হয়ে বেলা এগারোটায় শেষ হতো। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার তিনি জমিদারিতে আত্মনিয়োগ করতেন। তিনি সমসাময়িক জমিদারদের থেকে একটু ব্যতিক্রম ছিলেন, কারণ তিনি সাধারণ জনগণের অত্যন্ত কাছ থেকে জমিদারি পরিচালনা করতেন। এভাবে একজন ন্যায় পরায়ণ, প্রজাবৎসল ও জনদরদি জমিদার হিসেবে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী পরিচিতি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক তাঁকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৩]

শিক্ষাব্রতী নবাব ফয়জুন্নেছা

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইংরেজদের হাতে মুসলমানদের পতনের পর তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকেও বিরত থাকে। তাদের অনগ্রসতার সুযোগে এগিয়ে যায় হিন্দুরা। ধর্মীয় অনুশাসনের ফলেও মুসলিম নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিল। উনিশ শতকে বাংলায় নতুন পরিবেশ তৈরি হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের (সাধারণভাবে সিপাহি বিদ্রোহ নামে খ্যাত) পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দুরা এগিয়ে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় তারা নারী উন্নয়নে কাজ করে। অবশ্য ভারতবর্ষে নারীদের উন্নয়নে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁরা নারীদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে কাজ করেন। ১৮৫৫–১৮৫৮ সময়কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার প্রায় বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১৪] অন্যদিকে মুসলিম সমাজে তাঁদের মত কোনো মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যারা নারীদের শিক্ষা ও নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলবেন। এ সময়ে মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৪)। তিনি গঠন করেন মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩) নামক একটি সংগঠন। সংগঠনটি মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে ভূমিকা রাখলেও এর কর্মসূচিতে নারী শিক্ষা বা নারীর উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ ছিল না।[১৫] নবাব আব্দুল লতিফ নিজেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেন নি। ১৮৬৭ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ 'বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স এসোসিয়েশন'-এ মুসলমানদের শিক্ষার উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন যেখানে নারী শিক্ষার বিষয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না।[১৬]

অন্যদিকে সিপাহি বিদ্রোহের পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭–১৮৯৮), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯–১৯২৮) প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে যান। তবে সৈয়দ আমীর আলী ছাড়া অন্য মুসলিম নেতাদের কেউই নারী শিক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি।

আমীর আলী নিজে ইংল্যান্ড থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন এবং তিনি একজন বিদেশি সুশিক্ষিত নারীকে বিয়ে করেছিলেন।[১৭] সম্ভবত এ কারণে তিনি স্বদেশীয় নারীদের শিক্ষা নিয়ে ভেবেছিলেন। নারী শিক্ষা প্রসারে তাঁর কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। তবে এ বিষয়ে তাঁর কার্যাবলি শুধু সভা-সমিতিতে, আলোচনা ও প্রবন্ধ লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বস্তুত শিক্ষায় নারীর সম্পৃক্ততা, নারীর শৃঙ্খল মোচনের ও স্বাধিকার অর্জনের হাতিয়ার। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকারের সনদে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। উনিশ শতকে নারীশিক্ষা জনপ্রিয়তা না হওয়ার পেছনে তৎকালীন সময়ে কতগুলো কুসংস্কার ও অযৌক্তিক চিন্তা-চেতনা কাজ করেছিল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুসলিম নিষ্পেষণ এবং অর্থনৈতিক শোষণের মুসলিম সমাজ যখন দুর্দশায় নিপতিত তখন অন্য দুই নেতার মত নবাব ফয়জুন্নেছাও উপলদ্ধি করেন শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই শিক্ষার উন্নয়নে তিনি সুদূর প্রসারী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য স্থাপন করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তিনি আজও বাঙালি সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী কুমিল্লার পশ্চিমগাঁওয়ে তাঁর নিজ বাসস্থানের পাশে স্থাপন করেন দশ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ, যা আজও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পবিত্র কুরআন, ইসলাম বা দ্বীনিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে সেখানে শিক্ষা দেয়া হতো।[১৮] তাছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। যা গাজীমুড়া আলীয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত। এটি পরবর্তী সময়ে ১৯৪৩ সালে তাঁর বংশধররা নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিয়া কলেজে রূপান্তরিত করে।[১৯] নবাব ফয়জুন্নেছা তাঁর জমিদারি এলাকা ভাউকসার, ভাটরা, ছাতার পাইয়া, মানিকমুড়া এবং বাংগডডায় ছেলেদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২০]

এছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমগাঁওয়ে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ও বদরুন্নেছা হাই স্কুল নামে দু'টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব ফয়জুন্নেছা সমধিক পরিচিতি অর্জন করেছেন মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। এদেশে নেতৃবৃন্দ যখন পুরুষদের শিক্ষার অগ্রসরতার কথা ভাবছেন তখন নবাব ফয়জুন্নেছা শুধু নারী শিক্ষার কথা ভাবেননি, তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে একটি এবং নানুয়া দিঘিরপাড়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও নানুয়া দিঘির পাড়ের স্কুলটির অস্তিত্ব বর্তমানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের আবর্তে এর নামে পরিবর্তিত হয়ে শৈলরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।[২১]

অন্যদিকে কান্দিরপাড়ে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় ফয়জুন্নেছা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিক এটিকে ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় বলে উল্লেখ করলেও ওয়েবস্টারের ১৯০৮-০৯ সালে ত্রিপুরা জেলার নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলা হয়েছে- "There were 1908-09, one middle vernacular & upper Primary and 628 lower Primary girls Schools, beside 17 Schools teaching the Koran Only."[২২] তাঁর লেখায় তৎকালীন নারীদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায়নি, তবে তিনি 'One middle vernacular girls School' নামে নবাব ফয়জুন্নেছার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন।

পুরো উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত যেখানে নারীদের শিখানো হতো গৃহকর্মে নিপুণা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা বলতে ছিল ধর্মীয় শিক্ষা। ঠিক এ সময়ে নবাব ফয়জুন্নেছা নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু অনুভবই করেননি সে লক্ষ্যে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা ছিল যুগের তুলনায় প্রাগ্রসর। তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রপথিক।

সাহিত্যসেবী নবাব ফয়জুন্নেছা

ফয়জুন্নেছা ছিলেন স্বশিক্ষিত। পারিবারিকভাবেই তিনি বাংলা, ফারসি ও সংস্কৃতিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তাঁর পরিবার ছিলো উদার মনোভাব সম্পন্ন। তিনি তাঁর গৃহ শিক্ষক উস্তাদ তাজউদ্দিনের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছিলেন 'ফয়জুন্নেসা পুস্তকালয়'।[২৩] তিনি বাংলার প্রথম নারী সাহিত্যিক যিনি আংশিক গদ্যে, আংশিক পদ্যে কিছুটা উপন্যাসের ভঙ্গিতে কিছুটা রূপকথা, কিছুটা আত্মজীবনী উল্লেখপূর্বক মিশ্ররীতিতে রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'রূপজালাল'।[২৪] ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধের পরবর্তী কালে বাংলার মুসলিম সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সামাজিকভাবে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের পক্ষে চিন্তাশীল সাহিত্য রচনা করা দুরূহ ছিল। আর তাই উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানগণ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমান লেখকগণ সাহিত্য সৃষ্টিতে অনেকটা সচেতন হয়ে ওঠেন। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, কবি মোজাম্মেল হক, নওশের আলী খাঁ ইউসফজী, আবদুল করিম, কাদের আলী, আবদুল হামিদ খান ইউসফজী, আবদুল লতিফ, শেখ সুবহান, পণ্ডিত রেয়াজ-আল-দিন আহমদ মাশহাদী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, পুরো উনিশ শতক জুড়ে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস তাতে নারীর উপস্থিতি ছিল না। পর্দার বেড়াজালে আবদ্ধ, শিক্ষা-বঞ্চিত নারীদের সাহিত্য রচনা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ। তথাপি এ সময়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে যার নাম অনবদ্য তিনি হলেন নবাব ফয়জুন্নেছা। উনিশ শতকের বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী সাহিত্যিক। তাঁর রচিত সাহিত্য গ্রন্থ 'রূপজালাল' ১৮৭৬ খ্রি. ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা গিরিশ মুদ্রণ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়। 'রূপজালাল' ছাড়া 'সংগীত সার' ও 'সংগীত লহরী' নামে তাঁর রচিত আরো দু'টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তবে কেউ কেউ 'সংগীত লহরী' ও 'সংগীত সমীক্ষা' নাম উল্লেখ করেন।[২৫] ওয়াকিল আহমেদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন 'রপজালাল' নবাব ফয়জুন্নেছার রূপক জাতীয় রচনা এবং 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭) ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর 'সংগীত সার' ও 'সংগীত লহরী' সহ মোট চারটি গ্রন্থের কথা বলেন। যদিও শেষোক্ত গ্রন্থ দুটি দুষ্প্রাপ্য।[২৬] শ্রী কৈলাশ চন্দ্র সিংহ রচিত 'রাজমালায়' রূপজালাল গ্রন্থের উল্লেখ আছে।[২৭] মূলত রূপজালালই ছিল সাহিত্যিক ফয়জুন্নেছার পরিচয়জ্ঞাপক রচনা। রূপজালালের স্বরূপ অন্বেষণের মাধ্যমেই উদ্ঘাটিত হয়েছিল সাহিত্যিক ফয়জুন্নেছার পূর্ণ পরিচয়। ৪৭১ পৃষ্ঠার 'রূপজালাল' গ্রন্থে নবাব ফয়জুন্নেছা বিভিন্ন ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে অপরূপ সব কাহিনি পরিবেশন করেছেন। মূল একটি কেন্দ্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও প্রচুর শাখা উপ-শাখার কাহিনিকে অধিক প্রসারিত করায় এটি মূল কাহিনি বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। লেখিকা কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে কাহিনির অবতারণা করেছেন।

সাহিত্য সমালোচকগণ ফয়জুন্নেছার গ্রন্থে পুঁথি সাহিত্য বা মিশ্রভাষারীতির কাব্যের ধারা লক্ষ করেছেন। যদিও এটি পরিপূর্ণভাবে পুঁথিসাহিত্য বা মিশ্ররীতির কাব্য নয়। মিশ্রভাষারীতি বলতে ড. আনিসুজ্জামান বিভিন্ন ভাষার (বাংলা, হিন্দি, আরবি, ফার্সি এবং তুর্কি) মিশ্রণে যে ধারার কাব্য রচিত তাকে বুঝিয়েছেন।[২৮] মিশ্রভাষারীতির কাব্যসমূহ বিষয়বস্তুর দিক থেকে অলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃততে ভরপুর, অসাধারণ, অস্বাভাবিক অবাস্তব এবং ধর্মের বিকৃত কাল্পনিক কাহিনিতে ভরপুর। ফয়জুন্নেছার 'রূপজালাল' এর কাহিনীতে দেখা যায় কবি কল্পনার আতিশয্যে কাব্যে উদ্ভট, অতিপ্রাকৃত, অবাস্তব, পরী, দৈত্য, রাক্ষস, খোয়াজ খিজির, যাদু ইত্যাদির সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা মিশ্রভাষারীতির বৈশিষ্ট্য। গদ্যের পদ্যাংশে ফয়জুন্নেছা অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই অনুসরণ করেছেন। আর গদ্যে তৎসম শব্দের প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ করা যায়।[২৯]

উনিশ শতকে একমাত্র মুসলিম নারী লেখক নবাব ফয়জুন্নেছা কর্তৃক রচিত 'রূপজালাল' গ্রন্থটি ভাব, ভাষা, চরিত্রে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থ। এতে পুঁথি সাহিত্য বা মিশ্ররীতি রূপকথা, মধ্যযুগীয় ভাবধারার সাথে গদ্য ও পদ্যের সমষ্টিতে আধুনিক ভাবের সমন্বয় ঘটেছিল। গ্রন্থটি কখনো বাস্তবে, কখনো পরী রাজ্যে, আবার যাদু রাজ্যে, মানুষ, পরী, দৈত্য, রাক্ষস, যাদুকন্যা ইত্যাদির সমন্বয়ে পুঁথি সাহিত্য বা মিশ্রধারার কাব্য, রূপকথা, মধ্যযুগীয় বা আধুনিক ধারার মিশ্রণ ঘটেছে যা একটি নির্দিষ্ট ধারায় স্থির হয়নি। তাঁর দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুর্পদী কাব্যে, ছন্দের অপূর্ব মিল ও শব্দ চয়ণে উৎকৃষ্টতা এবং অত্যধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাঁর এ গ্রন্থ তাঁকে করে তুলেছিল অসাধারণ এক কবি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞান পিপাসু। তবে তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোর সন্ধান পেলে হয়তো তাঁর লেখার আলাদা ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো। ভাব, ভাষা, আঙ্গিকের বিচিত্রতা ৪৭১ পৃষ্ঠার 'রূপজালাল' গ্রন্থটিকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে।

ফয়জুন্নেছার মানব হিতৈষণামূলক কাজ

নবাব ফয়জুন্নেছা ছিলেন মানবতাবাদী এবং প্রজাদরদী, জনহিতৈষী ও জনকল্যাণকামী জমিদার। তিনি সর্বত্র আর্তমানবতার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল হাসপাতাল নির্মাণ। উনিশ শতকে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত। যা ছিল তাও ছিল আবার পুরুষতান্ত্রিক। পর্দাপ্রথা, দারিদ্র ও যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে নারী জাতি চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। উচ্চবিত্তের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। একজন অভিজাত ঘরের নারীকে আত্মীয়স্বজন মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ডাক্তারের হাতে নয়। এতে বোঝা যায় পর্দাপ্রথা কত ভয়াবহ ছিল। জনদরদি ফয়জুন্নেছা জাতির এ দুর্ভোগের বিষয়টি অনুধাবন করে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন লাকসামে (পশ্চিমগাঁও) দাতব্য চিকিৎসালয়।[৩০] অনেক পরে তাঁর নাতনি ফখরুন্নেছা (বদরুন্নেছার কন্যা) এ হাসপাতালে মেয়েদের জন্য আলাদা কক্ষ স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি লাকসাম সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় নামে পরিচিত। [৩১]

ফয়জুন্নেছা শুধু নারীদের জন্য ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে দক্ষিণ চর্থায় তৎকালীন একটি দুস্থ পল্লিতে 'জেনানা হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ হাসপাতালটিতে ছিল ইংরেজ ডাক্তার এবং দেশি খ্রিষ্টান নার্স। এ সম্পর্কে জাহানারা হায়দার তাঁর 'সেবাব্রতী ফয়জুন্নেছা'

প্রবন্ধে লিখেছেন "উঁচু কম্পাউন্ডে পাকা দেয়ালে ঢাকা সুশিক্ষিত, সুঅভিজ্ঞ মহিলা নার্স ও ডাক্তারদের পরিচালনায় সেখানে চিকিৎসা চলত দুস্থ পীড়িত নারীদের।[৩২] পরবর্তী কালে এ হাসপাতালটি কুমিল্লা সদর হাসপাতালের সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানে এটি ফয়জুন্নেসা মহিলা ওয়ার্ড নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন আর্তের সেবক। শুধু স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় নয় মানবসেবায়ও তাঁর অবদান ছিল আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি ১৮৯২ সালে তাঁর জমিদারির একটা অংশ অর্থ্যাৎ আয়কৃত বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকার জমিদারির মধ্যে একটি অংশ ৬০ হাজার টাকার জমিদারি মহান আল্লাহর নামে মানব সেবায় দান করে দিয়েছিলেন। ওয়াক্‌ফনামা দলিলের মাধ্যমে তিনি বিশাল সম্পত্তি সাধারণ মানুষ তথা সমাজের দরিদ্র শ্রেণির সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করে যান। এছাড়া তিনি স্বয়ং মুতাওয়াল্লি থাকা কালীন মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা মাদ্রাসা ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা, দরিদ্রদের শীত বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি মহৎ কাজগুলো করে গিয়েছেন। তিনি নিজ বাড়ি সংলগ্ন দশ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

এছাড়া জনসাধারণের কল্যাণার্থে নবাব ফয়জুন্নেছা প্রচুর দিঘি, পুকুর ইত্যাদি খনন করেন। তিনি পশ্চিমগাঁওয়ে বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডগলাসের রাস্তা ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজে অর্থ সাহায্য প্রদান করেন।[৩৩] তিনি পশ্চিমগাঁওয়ে ডাকাতিয়া নদীর উপর দিয়ে তাঁর মাতা আফরান্নেছার তৈরি পুলটি পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি কবরস্থান নির্মাণের জন্য দুইটি স্থান নির্ধারণ করে দেন। নবাব ফয়জুন্নেছার প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, এগুলো সংস্কার প্রয়োজন।

নবাব ফয়জুন্নেছা কোন রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে না তুললেও তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল নারী। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সে সময়কালীন নেতৃবৃন্দ যে সংস্থাগুলো গড়ে তুলেছেন তাও কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয় বরং শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। নবাব ফয়জুন্নেছা কোনো সংস্থার মাধ্যমে নয় সংস্থা ছাড়াই শিক্ষা উন্নয়নে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। নবাব ফয়জুন্নেছা নিজে কোন সমিতি গড়ে না তুললেও অন্যান্য সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এরূপ একটি সমিতি 'সখী সমিতি' যা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৬ সালে কলকাতায় নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমিতির সদস্য ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেছা।[৩৪] সাহিত্য সংসদ, সখী সমিতির তালিকা থেকে দেখা যায় এ সমিতির অধিকাংশ সদস্য ব্রাহ্ম সমাজের হিন্দু, খ্রিষ্টান হলেও মুসলিম সদস্যেরও সমাবেশ ছিল। তিনি একমাত্র পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম নারী যিনি এ সমিতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[৩৫] প্রগতিশীল এ নারী সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' কলকাতার সদস্য ছিলেন।[৩৬] এ ছাড়া তিনি 'ঢাকা প্রকাশ', 'সুধাকর' ও 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকাগুলোকে অর্থায়ন করতেন।[৩৭] এ ধরনের কর্মতৎপরতা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি রাজনৈতিক সচেতন প্রগতিশীল নারী ছিলেন।

ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে সরকারি কাজে অনুদান প্রদান করে নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। আর তাই তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে 'নবাব' উপাধি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, প্রথমে

তাঁকে বেগম উপাধি প্রদান করা হলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন, এ যুক্তিতে জমিদারের কন্যা, জমিদারের স্ত্রী এবং তিনি নিজে জমিদার ছিলেন বলে এমনিতে তিনি প্রজাদের কাছে 'বেগম' উপাধিপ্রাপ্ত। তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহারানীর প্রস্তাবে সর্বোচ্চ পদবি 'নবাব' উপাধি প্রদান করা হয়। W. H. Thompersons তাঁর *Final Report on the Servey and Settlement Operation in the District of Tippera* গ্রন্থে লিখেছেন, "She was offered by Government the title of 'Begum' but Faizun Nessa it would not accepted, as she wanted the masculine title of Nawab. This was ultimately given to her."[৩৮] তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাঙালি কিংবা ভারতীয়দের মধ্যে 'নবাব' 'খান বাহাদুর', 'রায় বাহাদুর', 'রাজা' ইত্যাদি উপাধি প্রদানের মাধ্যমে একটি পৃষ্ঠপোষক শ্রেণি তৈরি করতে চাইলেও ফয়জুন্নেছার 'নবাব' উপাধি তাঁর কর্মের স্বীকৃতি। সরকারকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে তিনি কিছু করেননি। ফলে তাঁর এ নবাব উপাধি প্রাপ্তি উপাধি প্রাপ্ত নবাবদের থেকে ব্যতিক্রম ছিল বলা যায়।

মানবতাবাদী এ নারী যেখানে গিয়েছেন সেখানেই বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে গিয়েছেন। মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়েও তিনি সেখানে মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ও নহরে যোবায়দা খাল পুনঃখনন করেন। ১৮৯৫ সালে নবাব ফয়জুন্নেছা হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যান। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারনে তিনি সে বছর হজ করতে না পেরে এক বছর সেখানে অবস্থান করে পরের বছর তথা ১৮৯৬ সালে হজ পালন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানা স্থাপন এবং নহরে জুবায়দা খাল পুনঃখননের কাজ করে গিয়েছিলেন।[৩৯]

উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানদের অনন্য ব্যক্তিত্ব এ নারী বেগম উপাধি বর্জন করে নবাব উপাধি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর দুর্দান্ত, সাহস ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ফয়জুন্নেছার জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পর্দার মধ্যে থেকেই তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। পর্দা প্রথা নিয়ে তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত পাওয়া যায়নি। তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন, হজ পালন করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মানবতার সেবক ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী মারা যান। পশ্চিমগাঁওয়ে তাঁর নিজস্ব স্থাপিত মসজিদের পার্শ্বে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্যপ্রেমী এ নারী সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় বলা হয়-

অদ্য আমরা আমাদিগের পূর্ব বাঙ্গালার একটি মুসলমান মহিলারত্নের পরিচয় দান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ... ইনি যেমন বিদ্যানুরাগী ও বিষয়কার্য্য পারদর্শিণী সেই রূপ সৎকার্য্যেও সমুৎসাহিনী। বাহিরে ইহার আত্মপর মাত্র নাই... শুনিলাম ইহার আবাস স্থানে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন, এখানেও (ঢাকা) সেইরূপ বিনড়ম্বরে নিরুপায় দরিদ্রগণকে দান করিয়াছেন।[৪০]

মূল্যায়ন ও উপসংহার

উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, উনিশ শতকের রাজনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত, আর্থ-সামাজিকভাবে শোষিত, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে জন্মগ্রহণকারী নবাব ফয়জুন্নেছা ছিলেন উনিশ শতকের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। উল্লেখ্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় হিন্দু সমাজের কিছু যুগ পরিবর্তনকারী মনীষীদের আবির্ভাবের কারণে হিন্দু মানসে প্রবল চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল এবং সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু নারী মানসে

জাগরণ অনুভূত হয়। কিন্তু মুসলিম মানসে এ চিন্তা আন্দোলিত করতে আরো সময় লেগে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তির আবির্ভাবে মুসলিম মননে জাগরণ সৃষ্টি হয়। যদিও তারা ইংরেজ সহযোগিতার নীতি অবলম্বনে মুসলিম মানসকে পরিবর্তনে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময়ে কিছু নারীদের অবস্থার পরিবর্তনে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আর্বিভাব ঘটলেও বাংলায় মুসলমান সমাজে তেমন নেতৃত্বের আবির্ভাব দেখা যায়নি। উনিশ শতকের শেষের দিকে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তারাও পুরুষ সমাজকে উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত নারী সমাজ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা সীমিত। এ সময়ে পূর্ববঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে এসেছিলেন নবাব ফয়জুন্নেছা। দৃঢ়চেতা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ নারী সেই পরিবারের মেয়ে, যার মা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। তিনি বহু বিবাহের বিপক্ষে থাকলেও বাধ্য হয়ে তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী হয়েও সেখানে পাঁচ বছরের বেশি তিনি সংসার করেননি। যে সময় এদেশের নারীরা পতি দেবতার ইচ্ছায় আত্মাহুতি দিচ্ছিল সে সময়েই ফয়জুন্নেছা তাদের মুক্তির জন্য কাজ করেন। এমনকি এখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে বিয়েতে মোহরানা ধার্য করা হলেও আদায় হয় না অথচ যুগবাস্তবতার বিপক্ষে গিয়ে তিনি মোহরানা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামী সংসার ত্যাগ তাঁকে দূর্বল না করে পরিণত করে একজন আদর্শ জমিদারে। এ শাশ্বত নারী তাঁর স্বামীকে অসম্ভব ভালোবাসতেন কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন অনঢ়। পর্দা প্রথা তাঁর জমিদারি পরিচালনায় বাধা হতে পারেনি। তিনি ছিলেন উদারমনা আদর্শিক জমিদার। আর্তমানবতার সেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ফয়জুন্নেছা প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও মুসাফিরখানা। মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় এবং জেনানা হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

‘রূপজালাল’ গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নারী সাহিত্যিক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং তৎকালীন পুরুষ সাহিত্যিকদের সমপর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নবাব উপাধি প্রাপ্ত এ নারী অনেকের কাছে ঈর্ষণীয় ছিলেন। সমাজকর্মী, সাহিত্যপ্রেমী, প্রগতিশীল এ নারী সমাজে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়িত হননি। তাঁর সমসাময়িক সমাজ সেবক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী সম্পর্কে ইতিহাস যেমন সোচ্চার ফয়জুন্নেছা সম্পর্কে তেমন নয়। যদিও এ মহান ব্যক্তিরা কাজ করেছেন উচ্চ শ্রেণির জন্য পক্ষান্তরে নবাব ফয়জুন্নেছার পদচারণা ছিল সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোকদের মাঝে। তাছাড়া অভিজাত শ্রেণির ঘরে জন্ম নেয়া ফয়জুন্নেছা, যাদের ভাষা ছিল ফারসি কিংবা উর্দু, সেখান থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি চর্চা করতেন বাংলা ভাষা। তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন বাংলায়। প্রজাদের ভাষায় তিনি সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন, এখানেই তৎকালীন অন্যান্য জমিদারদের সাথে ছিল তাঁর পার্থক্য। জণকল্যাণে নিবেদিত এ নারী তাঁর জমিদারির ৬০ ভাগ দরিদ্রদের কল্যাণার্থে ওয়াক্ফ করে যান। প্রগতিশীল এ নারী সংগঠন গড়ে না তুললেও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন এবং নিয়মিত অর্থায়নও করতেন। পরিশেষে ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে যে কয়জন নারী সমাজ সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে ‘নবাব ফয়জুন্নেছার’ নাম ন্যায়সংগতভাবেই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হওয়ার দাবিদার। মানবসেবী এ

নারী তাঁর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের বলে সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। একজন সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী উনিশ শতকের এক অসামান্য বাঙালি মুসলিম নারী ফয়জুন্নেছা তিনি বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছেন। পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহিত করার জন্য নবাব ফয়জুন্নেছা সম্পর্কে আরো অধিক অধ্যয়ন ও চর্চা সময়ের দাবি। যুগ বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠে একজন নারী যে সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে পারেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নবাব ফয়জুন্নেছা। নারীর ক্ষমতায়নের এ যুগে তিনি হতে পারেন বর্তমান প্রজন্মের নারীদের আরো উৎসাহ ও প্রেরণার দৃষ্টান্ত।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১ ভারত উপমহাদেশের এক অতি প্রাচীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা। এক সময়ে ভুলুয়া রাজ্য বর্তমান (নোয়াখালী) মেহেরকুল (আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত বিস্তৃত সমতল ভূমি) পাটিকারা , শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি সমতলক্ষেত্র ও খাসিয়া কুকি প্রদেশ এরুপ বহু পার্বত্য এলাকাও উক্ত রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। পরবর্তীতে এ রাজ্যটি ছোট হতে থাকে এবং ১৭৬৫ সালে এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন আসে। G.E Webstar, East Bengal District Gazetters (Tippera) (Alahabad: Pioneer Press, 1910), p.14

২. পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬০ সালের ১ অক্টোবর ত্রিপুরা জেলার নূতন নামকরণ করা হয় কুমিল্লা। *Bangladesh District Gazetters,* Comilla (Nurul Islam Khan edited) (Dacca: Bangladesh Govt. press, 1972), p.2

৩. তাঁর বড় দুই ভাই ইয়াকুব আলী ও ইউসুফ আলী এবং ফয়জুন্নেছা ছাড়া তাঁর আরো দুই বোন ছিলেন এরা হলো লতিফেন্নছা ও আমীরন্নেছা, রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃ. ৫

৪. শ্রীমতি ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, *রূপজালাল* (ঢাকা: গিরিশ চন্দ্র, ১৮৭৬), পৃ.৪; উদ্ধৃত রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭

৫. বিস্তারিত দেখুন, রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

৬. আবুল কাসিম মোঃ আদমুদ্দিন, *নবাব ফয়জুন্নেছা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃ.৬

৭. Fayeza S. Hasanat, *Recasting Muslim Women : A Translation of Nawab* Faizun *Nessa, Rupjalal, with Commentary,* An unpublished PHD thesis,(University of Florida, 2005), p. 6

৮. ফয়জুন্নেছার জমিদারির অন্তর্গত ছিল ১৪টি মৌজা। সেগুলো হলো :
ক) সদর তালুক (সদর পশ্চিমগাঁও, নিজবাড়ি)
খ) সদর খাস (পশ্চিমগাঁওয়ে)
গ) ভাটার (লাকসাম জংশন স্টেশনের পাঁচমাইল পূর্বে)
ঘ) মোহাম্মদগঞ্জ (লাকসাম থানার পূর্বে)
ঙ) ফোমগাঁও (লাকসাম থানার শেষ পশ্চিম প্রান্তে)
চ) কৃষ্ণপুর (লাকসাম থানার পূর্ব দক্ষিণে)
ছ) মানিকমুড়া(নাথের পেটুয়ার পূর্বে)
জ) কুমিল্লা ঊনিষা (দক্ষিণ চর্থায়)
ঝ) ভাউকসার (কুমিল্লায়, পূর্বে চান্দিনা বর্তমানবরুড়া থানায়)
ঞ) বাংগডডা(কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানায়)

ট) খাড় ঘর(চৌদ্দগ্রাম থানায়)
ঠ) সিজিয়ারা (চৌদ্দগ্রাম থানায়)
ড) বক্সগঞ্জ (চৌদ্দগ্রাম, বর্তমান লাঙলকোর্ট, কুমিল্লায়)
ঢ) ছাতার পাইয়া (নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানায়)। রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৩-২৪

৯. মজির উদ্দিন আহমদঃ *নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী*, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ২৫

১০. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস; *আলোর দিশারী*, (কুমিল্লাঃ শাহীন গ্রন্থাগার, ১৯৭৬), পৃ. ১০১

১১. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৪

১২. আবদুল কুদ্দুছ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

১৩. ড. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী* (কলকাতাঃ অর্পনা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, ২০০৫), পৃ. ৯৩

১৪. See Mrs H Gray, *'The Progress of Women in L.S.S'* Malley (ed.), *Modern India and the West* (Lonon: Oxford, 1968), p. 456

১৫. Enamul Haque, *Nawab Bahadur Abdul Latif, A 19th Century Social Reformer His writing and Releted Documents* (Dhaka: Nandonik, 2012), p. 97

১৬. প্রবন্ধটি বিস্তারিত দেখুন, *op.cit*, pp.97-122

১৭. K.K Aziz, Ameer Ali, *His life and work* (Lahore, United in English, 1968), p.103-105

১৮. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

১৯. এ এইচ এম মহিউদ্দিন, নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মোতাওয়াল্লী আলহাজ্ব সৈয়দ ছেরাজুল হক স্মরণ, 'নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ বার্ষিকী' (পশ্চিমগাঁও, কুমিল্লাঃ ১৯৭৮-৭৯), পৃ. ৫৩

২০. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭

২১. আবদুল কুদ্দুস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

২২. Webster J.E, East Bengal District Gazetteers, Tippera, p. 106

২৩. Fayeza S. Hasanat, *op.cit*, p. 16; শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী*, *রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা (*বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪), পৃ. ৬৪

২৪. পূরবী বসু, *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী* (ঢাকাঃ বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৭), পৃ. ১৭৮

২৫. আব্দুল আউয়াল ঃ *'প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা'*, ফয়জুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৭৩ (কুমিল্লাঃ ১৯৭৫), পৃ. ৪৯

২৬. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা (*ঢাকাঃ নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩), পৃ. ৮১

২৭. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০

২৮. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ১৯৯৯), পৃ. ১১৭

২৯. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৭

৩০. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮

৩১. *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৩৮

৩২. জাহানারা হায়দার; 'সেবাব্রতী ফয়জুন্নেছা', *রূপজালাল শতবার্ষিকী স্মরণীঃ* রূপজালাল শতবার্ষিকী সংগঠন কমিটি (পশ্চিমগাঁও, ১৯৭৭), পৃ. ৩৭

৩৩. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

৩৪. Ghulam Murshid, Reluctant Debutanate: Response of Bengali Women of Modernization, 1849-1905,*The journal of Asian Studies*,vol.43, issue-4, pp-785-786

৩৫. *ভারতী ও বালক*, *ডিসেম্বর*, ১৮৯১ জানুয়ারি, ১৮৯২, তিনি সখী সমিতিতে অর্থায়ন করতেন; 'রূপজালাল', ভূমিকা, পৃ. ১৬

৩৬. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

৩৭. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

৩৮. W. H thompson (Settlement Officer), *Final report on the Survey and settlement operations in the district of Tipperay 1915 to 1919,* Calcutta, 1920, p. 77

৩৯. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭

৪০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ মাঘ, ১২৮১

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৬.১২.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ও ইসলামি নির্দেশনা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

এ জি এম সাদিদ জাহান*
মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক**

Abstract

The United Nations (UN) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is a human rights charter approved by almost all UN member states that intends to eliminate unjust treatments aganist womens rights. Some governments claimed that certain CEDAW provisions cannot be executed in their countries due to it's infringements with Islam and Muslim laws. For instance, they may claim that CEDAW is incompatible with Shari'ah and those laws or practices cannot be changed because they are divine. But Islam cannot be used to justify discrimination against women. CEDAW marked a milestone in the path of women's rights. As much discrimination as exists between men and women in today's society, CEDAW has given guidelines for its elimination in almost all cases. This article is intended to submit that full implementation of CEDAW is possible in Muslim contexts, as core principles and values of Islam. Islam has introduced principles to establish women's rights in the Quran and Hadith. The current article has been completed following explanatory research method and a comparative analysis was also presented with a view to investigate similarities and dissimilarities between CEDAW and Islamic guidance on women rights at large.

চাবি শব্দ : সনদ, জাতিসংঘ, নারী অধিকার, বৈষম্য, সাম্য, ন্যায়

ভূমিকা

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ CEDAW (সিডও)-কে নারী অধিকার অর্জনের পথে একটি মাইলফলক বিবেচনা করা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী–পুরুষ ভিত্তিক বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদে পথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সিডও সনদে নারী ও পুরুষের বৈষম্য অবসানে সকল ক্ষেত্রে সমতার নীতি বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে সমতা নীতির পরিবর্তে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বৈষম্য দূরীকরণের পথ নির্দেশনা দিয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণে কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে সিডও সনদের সাথে ইসলামি নীতির পর্যালোচনার মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সিডও সনদের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সকল মূল্যায়নের আলোকে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলাম নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন মূলনীতি প্রবর্তন করেছে। এ সকল মূলনীতির আলোকে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হলেও 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর উপর বৈষম্য বিলোপে ইসলামি নির্দেশনা বিশ্লেষণ করা হয়নি। উক্ত গবেষণা শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এ গবেষণায় সিডও সনদে উল্লিখিত বিষয়াদি ইসলামি নির্দেশনার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনায় ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সিডও সনদের সাথে ইসলামি নির্দেশনার পর্যালোচনা করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী বৈষম্য দূরীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সিডও সনদ : দেশিয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

জাতিসংঘের The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) শীর্ষক অঙ্গসংগঠনের অধীন Comission On The Status Of Women-CSW ১৯৭৬ সালে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW (সিডও) সনদের খসড়া প্রস্তুত করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পেশ করে। পরবর্তীতে এ খসড়া সনদের পর্যালোচনা করে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহিত হয়।[১] ১৯৮০ সালের ১ মার্চ সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং এটি ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। ইতোমধ্যে ১৮৫টি দেশ এই কনভেনশন স্বাক্ষর করেছে এবং ১৫১টি দেশ এ কনভেনশন পরিপূর্ণভাবে অনুমোদন করে নিজ নিজ দেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার করে।[২] ওআইসিভুক্ত ৫৭ টি দেশের মধ্যে ২৯টি দেশ এ সনদ অনুমোদন করেছে। তবে বাংলাদেশসহ[৩] মুসলিম বিশ্ব এ সনদের কতিপয় ধারা ইসলামি বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিবেচনা করে আপত্তি জানিয়েছে এবং সাংঘষিক ধারাসমূহ সংরক্ষণ করে এ সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে।[৪] বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সনদটি অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে। অনুমোদনকালে বাংলাদেশ সরকার এই দলিলের ৪টি ধারা ২, ১৩(ক) এবং ১৬-১(গ) ও (চ) সংরক্ষণ করে একে আংশিক অনুমোদন দেয়। পরবর্তী কালে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ধারা ১৩(ক) ও ১৬-১(চ) এর উপর সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ধারা ২ এবং ১৬-১(গ) এর উপর সংরক্ষণ বহাল রেখেছে।[৫] এছাড়াও যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানিসহ অনেক অমুসলিম দেশও সিডও সনদের বিভিন্ন ধারা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে আপত্তি জানিয়েছে।[৬] এ সনদে ৬টি পরিচ্ছেদ সম্বলিত ৩০টি ধারা রয়েছে। এ ৩০টি ধারাকে বিধি-বিধানের দিক থেকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- ১-১৬ ধারা: নারী পুরুষের সমঅধিকার সংক্রান্ত, ১৭-২২ ধারা : সিডও গঠন ও কার্যপন্থা সংক্রান্ত, ২৭-৩০ ধারা : সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত।[৭]

নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ : সিডও সনদের বিভিন্ন ধারা-উপধারা ও ইসলাম

সিডও সনদের ১-১৬ ধারায় নারী পুরুষের সমঅধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত ধারাসমূহ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা বর্তমান নিবন্ধের পরিধিভূক্ত। সিডও সনদের উল্লিখিত ধারাসমূহ ক্রমানুযায়ী শিরোনাম যুক্ত করে উপস্থাপন করা হলো–

ধারা-১ (নারী বৈষম্যঃ প্রকৃতি ও পরিধি)[৮]: এই ধারায় নারী বৈষম্যের সংজ্ঞায়ন ও পরিধি বর্ণিত হয়েছে। 'নারীর প্রতি বৈষম্য' বলতে পুরুষ-নারী ভিত্তিতে যে কোন পার্থক্যকেই বুঝায়। নারীর মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের অসমতা নারীর প্রতি বৈষম্য বিবেচিত হবে। ইসলাম উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য পোষণ করে না; বরং নারীকে মৌলিকভাবে এ সকল অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামে নারী-পুরুষের পরস্পরের কাছে প্রাপ্য অধিকারের ভিত্তি সমতা নয়; বরং ন্যায়সঙ্গতা। ন্যায়সঙ্গত শব্দের অর্থ 'ভারসাম্যপূর্ণ', 'সম' বা 'সমান' নয়। একে 'সুষম' অধিকারও বলা যায়। ইসলাম ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকারও দিয়ে থাকে। ইসলামে বৈষম্য অবসান সমানাধিকারের ভিত্তিতে নয়; বরং সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলাম সমানাধিকারের স্থলে প্রাপ্য অধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী। এ জন্য ইসলাম প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন অনুসারে অধিকার নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ আআলা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

> "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের এক ধাপ বেশি মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৯]

এ আয়াতের বর্ণানানুসারে নারীর কাছে পুরুষের যেমন অধিকার প্রাপ্য আছে, তদ্রূপ নারীরও পুরুষের কাছে অধিকার প্রাপ্য আছে। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার সমান হলেও সংগত কারণেই কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর চেয়ে বেশি অধিকার এবং কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করে থাকে।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

> "পুরুষরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই কারণে যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে।"[১০]

এছাড়াও ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব যার যা দায়িত্ব নয়, তাকে সে দায়িত্ব দেয়াও উচিত নয়। সুতরাং ইসলামে অধিকারের ভিত্তি হচ্ছে সুষমা, ন্যায্যতা ও ন্যায়সংগতত্ব; সমান অধিকার নয়। ইসলামে নারীর মানবিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ন্যায্যতা ও ন্যায়সংগতত্ব।

ধারা-২ ও ৩ (নারীর প্রতি বৈষম্যের দূরীকরণ নীতি ও প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন) [১১]: উক্ত দু'টি ধারায় নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে বৈষম্য প্রতিরোধে যথাযথ আইন প্রনয়ন, সংশোধন ও বাতিল সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে। তবে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে সবাইকে বাধ্য করতে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা থাকায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ আইনের 'নারী-পুরুষের সমতার নীতি' বাক্যটি আপত্তি করে এ ধারা সংরক্ষণ করে

সিডও সনদ অনুমোদন করেছে। আপত্তিকারী রাষ্ট্র সমূহ সমতার স্থলে ন্যায়সঙ্গত শব্দের প্রতিস্থাপন প্রত্যাশা করে।

নারী-পুরুষের সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যথাযথ বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। এ ধারায় উল্লেখিত নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইসলাম সামাজিক অপরিহার্যতা এবং পরিস্থিতির আলোকে নতুন কোন আইন ও বিধির প্রয়োজন হলে তা প্রণয়নের সুযোগ দিয়েছে। ইসলাম প্রচলিত সমস্যার সমাধানে ইসলামি আইনের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ইজতিহাদের সুযোগ উন্মুক্ত রেখেছে। সুতরাং নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে রাষ্ট্র ইসলামের আলোকে যথাযথ আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হবে। কারণ ইসলাম নারীর পূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রত্যাশা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ: إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ "

"আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়িশার মর্যাদা সব নারীর উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের ঝোলে ভিজা রুটির) মর্যাদা সর্ব প্রকার খাদ্যের উপর।"[১২]

ধারা-৪.১ (স্থায়ী সমতার লক্ষ্যে অস্থায়ীভাবে নারীকে বেশি সুবিধা দেয়া)[১৩]: ৪.১ নং ধারায় নারী অধিকার রক্ষায় নারী-পুরুষে সমঅধিকার বাদ রেখে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা দেয়া হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এ আইনের বিভিন্ন ধারায় নারী-পুরুষে সমঅধিকারের বিষয়ে বলা হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকে বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সিডও সনদের লক্ষ্য সমঅধিকার নয়; বরং নারীর যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা। নারী পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম এ নীতির সাথে সম্পূর্ণ একমত। ইসলাম কখনো অন্ধভাবে সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে না। ইসলাম নারীর কর্মের অধিকারের ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় নারীর যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক নারীর কর্মের অধিকার দিয়েছে। এছাড়াও এ ধারায় সুযোগ ও আচরণের সমতার লক্ষ্য অর্জিত হবে এমন বিধানকে বৈষম্যমূলক বিধান হিসেবে বিবেচনা না করার নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামেও নারী পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় নারীকে বিশেষ মর্যাদায় পুরুষের তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়েছে। হাদিসে পিতা-মাতার অধিকারের ক্ষেত্রে একজন নারী 'মা'-এর অধিকার পুরুষ 'পিতা'-এর তুলনায় তিনগুণ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أُمُّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أُمُّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ "

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সাহচর্যের শ্রেষ্ঠ দাবীদার কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূল (সা.)

বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার পিতা।"[১৪]

ধারা-৪.২ (মাতৃত্ব রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থা)[১৫]: ৪.২ নং ধারায় মাতৃত্ব রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ বৈষম্যমূলক হিসেবে বিবেচনা না করার নির্দেশনা রয়েছে। এ ধারাটি নারীকে সমতা ভিত্তিতে নয়; বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিশেষ অধিকার প্রদান করেছে। নারীর অধিকারের ইসলাম নির্দেশিত যৌক্তিক ধারণার সাথে এখানেও সিডও সনদ একমত হয়েছে। ইসলাম মাতৃত্ব রক্ষার্থে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলাম একমাত্র পুরুষকেই একাধিক বিয়ের শর্তসাপেক্ষ অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।"[১৬]

এ আয়াতে একাধিক বিবাহের বিধান বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমান আচরণের শর্তারোপ করেছেন। ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতি কখনো বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং ইসলাম দু'টি কারণ ব্যতীত সর্বাবস্থায় বহুবিবাহ সমর্থন করেছে। ক. সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার অনিশ্চয়তা; খ. সুবিচার প্রতিষ্ঠার অনিশ্চয়তা। উক্ত দু'টি অনিশ্চয়তার আশঙ্কা না থাকলে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ বিশেষ অধিকার লাভ করতে কোনো বাধা নেই।[১৭]

ধারা-৫.ক (বৈষম্যমূলক কুসংস্কার দূর)[১৮]: এ উপধারায় নারীর প্রতি বৈষম্যস্বরূপ সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করার নির্দেশনা রয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার অনেক সময় নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এ ধারার ন্যায় ইসলামও যেকোনো প্রকার কুসংস্কার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামে বৈষম্যমূলক এসব অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কারকে 'ফাহশা' (অশ্লীলতা) ও 'মুনকার' (গর্হিত), 'যুলুমাত' (অন্ধকার) কর্ম বিবেচনা করা হয়েছে। নারীর প্রতি সামাজিক সকল অনাচার বন্ধ করে নারীকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে অশুভ-কুলক্ষণের কোনো চর্চা নেই; বরং আছে শুভের ধারণা।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ قَالُوْا : وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

"আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে 'ফাল' [শুভ লক্ষণ] আমাকে আনন্দিত করে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাল' কি? তিনি বললেন, 'উত্তম বাক্য।"[১৯]

উত্তম বাক্যের মাধ্যমে পরস্পরের কল্যাণ ও শুভকামনা ইসলামের সংস্কৃতি। সুন্দর শব্দ ও উত্তম বাক্য শুনে মনে মনে কল্যাণের আশা পোষণ করা শুভ লক্ষণ। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ কিংবা ঋতুস্রাব ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে নারীকে অকল্যাণের কারণ বিবেচনা করার মতো অপসংস্কৃতি ও বৈষম্যমূলক আচরণকে ইসলাম বৈষম্যমূলক কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তা সমূলে তিরোহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"মনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না।"[২০]

ধারা-৫.খ (মাতৃত্ব ও সন্তান পালনে দায়িত্ব বন্টন): উক্ত উপধারায় সন্তান লালন পালনে নারী ও পুরুষের অভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। সমাজে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে সন্তান লালন-পালনে কেবল নারী দায়িত্ব হিসেবে নারীকে সন্তান লালন-পালনে প্রচুর কষ্ট শিকার করতে হয়। এ ধারণায় পরিবর্তন এনে সন্তান লালন-পালনে নারী ও পুরুষের অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণেও সন্তান লালন-পালনে শুধু মা নয়; বরং মা ও বাবা দু'জনেরই দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব মা ও বাবার অভিন্ন হওয়া জরুরি নয়; বরং সুষম হওয়াই অত্যাবশ্যক। সুতরাং সন্তান লালন-পালনে মাতৃস্নেহে সন্তানকে দুধ পান ও তার সেবা-শুশ্রূষায় যেমন মা বেশি গুরুত্বারোপ করবে তেমনি বাবা সন্তান লালন-পালন ও সকল অর্থনৈতিক সহায়তায় মাকেও সাহায্য করবে। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম-ইসমাঈল[২১], যাকারিয়া-ইয়াহয়া[২২], লুকমান ও তাঁর পুত্র[২৩] ইত্যাদি পিতা-পুত্রের বিবৃতিমূলক বর্ণনায় সন্তানের প্রতি পিতার দায়-দায়িত্ব লক্ষণীয়।

ধারা-৬ (পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ)[২৪]: এ ধারায় পতিতাবৃত্তি বন্ধের নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণেও পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ। ইসলাম পতিতাবৃত্তি দমনে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

"আবু মাসউদ আল আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কুকুরের বিক্রয়মূল্য ও পতিতার উপার্জিত সম্পদ গ্রহণে নিষেধ করেছেন।"[২৫]

ধারা-৭ ও ৮ (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক অধিকার)[২৬] **:** উল্লেখিত দু'টি ধারায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর অধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম অনুযায়ী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর রাজনৈতিক পরামর্শের অধিকার রয়েছে, তবে আধুনিক ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য হওয়া বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামি শারিয়ার মৌলিক বিধান পর্দা রক্ষা ও পরিবার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার অপরিহার্য শর্ত রয়েছে।[২৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) সমবেত লোকদের 'ইয়া আইয়্যুহাস নাস' তথা 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করলে উম্মু সালামা (রা.) উক্ত সমাবেশের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। লোকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমিও মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত'।[২৮] মুসলিম নারীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি বায়আতবদ্ধ হতেন। উম্মু সালিত (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে

বায়আত গ্রহণকারিণী এমন একজন আনসার নারী যিনি উহুদ যুদ্ধে মশক (পানির পাত্র) বহন করে নিয়ে আসতেন।"[২৯] যয়নব বিনত মুহাজির (রা.) নিজে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.)-এর সাথে রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। এমনকি নারীরা পুরুষের ন্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ও ভোট দিতে পারে। ইসলাম নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। কেননা ভোটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করার সুযোগ নেই।[৩০]

ধারা-৯ (নারীর জাতীয়তার অধিকার)[৩১]**:** এ ধারায় নারীর জাতীয়তার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইসলাম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতিকেই এক বিশ্বজনীন জাতি হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে নারী-পুরুষে পার্থক্য না করার নির্দেশনা দেয়। ইসলামে প্রত্যেকটি মানুষকে এক আদমের বংশজাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কাউকে জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيْرٌ.

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। প্রকৃতার্থে তোমাদের মাঝে যে লোক সর্বাধিক আল্লাহ অনুগত, সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত।"[৩২]

বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহ সীমিতকরণের অপরিহার্য ইসলামি বিধান রয়েছে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রভাবে তাতে কোনো পরিবর্তন প্রযোজ্য হবে না। বিবাহের প্রতিক্রিয়ায় নারীর পরিচয়ের কোনো পরিবর্তন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলামে নারীর পারিবারিক ও বংশগত পরিচয় অক্ষুন্ন রাখা নারীর অধিকার।

ধারা-১০ (নারীর শিক্ষার অধিকার)[৩৩]**:** এ ধারায় নারীর শিক্ষার অধিকারের পাশাপাশি সহশিক্ষায় উৎসাহ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর প্রভেদ নয়; বরং সমতা ভিত্তিতে অধিকার প্রদান করা অপরিহার্য। ইসলামে নারী-পুরুষ সকলের শিক্ষার অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নারী-পুরুষ সকলের জন্য দ্বীন শিক্ষাকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।"[৩৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে মসজিদের মিম্বারে বসে বক্তৃতার মাধ্যমে পুরুষ-নারী সাহাবিগণকে শিক্ষা দান করতেন। সাহাবিগণ পুরুষের মাজলিস ও নারী মাজলিসে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি নারীদের দ্বীন শিক্ষার জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যাতে করে নারী সাহাবিগণ নির্বিঘ্নে পর্দার সাথে দ্বীন শিক্ষা করতে পারেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ"

"আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন, পুরুষেরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের

অঙ্গীকার করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নাসিহাত করলেন ও নির্দেশ দিলেন।"[৩৫]

ধারা-১১ (কর্মক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার)[৩৬]: এ ধারায় কর্মক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার ঘোষিত হয়েছে। ইসলামে নারীর ঘরের বাইরে কর্মের অধিকার অনুমোদিত। স্বাভাবিকভাবেই নারীদের ওপর বাইরের কোন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি। তবে তারা নিজেদের পারিবারিক স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি সামাজিক কাজ করতে সমর্থ হয়, তাতে কোন বাধা নেই। তবে এ বিষয়ে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের ঘরের চার প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে ইসলাম নির্দেশ দেয়নি। তাই ইচ্ছা করলে নারীরা কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। এটি মৌলিকভাবে বৈধ বিষয়। কেননা ইসলামে মৌলিকভাবে সকল কাজই বৈধ, যতক্ষণ না তা অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি।[৩৭] কর্মক্ষেত্রে নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া এবং চাকরিতে যোগদান নিষিদ্ধ নয়; বরং এজন্য অনুমতি রয়েছে। হাদিসের বর্ণনা থেকেও নারীর কর্ম মুবাহ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

"জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তাঁর বাগানে গিয়ে খেজুর কাটতে মনস্থ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে তিরস্কার করলো। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "হ্যাঁ তুমি গিয়ে নিজের বাগান থেকে খেজুর কাটবে। হয়ত তুমি তা দান-খয়রাত করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজে ব্যয় করবে।"[৩৮]

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতানুযায়ী নারী শ্রম-বিনিয়োগের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। এ অভিমত থেকে নারীর চাকরিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তবে নারীর কর্মের বৈধতা শারিয়া নীতিমালা, মাকাসিদুশ শারিয়া (Objectives of Shariah) এবং অকল্যাণ দূরীকরণ ও কল্যাণ অর্জনের শারিয়া মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করে বাস্তবায়ন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত কুরআন, সুন্নাহ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে আলিমগণ নারীর কর্মের অধিকারের ব্যাপারে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। নারীর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজ ঘরের স্বাভাবিক কাজ সম্পন্ন করা, পর্দা রক্ষা করা, শারিয়াসম্মত পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি শর্তপূরণ অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৯]

কোন নারী যদি নিজ পরিবারের স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ পালনের পর পর্দা রক্ষা করে ঘরের বাইরের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে, ইসলাম তাতে উৎসাহিত করে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত নৈতিকতার সাথে সংগতি রেখে নারীরা তাদের জন্য সহজসাধ্য যে কোন চাকরি বা পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। তবে শালীনতা, মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা নারীর দায়িত্ব।

ধারা-১২ (পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা)[৪০]**:** এ ধারায় পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবার অধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম পরিকল্পিত উপায়ে জীবন গড়ায় বিশ্বাসী। কেননা পরিকল্পনার মাধ্যমেই সুনির্ধারিত পরিমাণে আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ- অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।"[৪১] প্রচলিত সমাজ কাঠামোয় সাধারণত জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবারের জনসংখ্যা নির্ধারণ করাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে। ইসলামে অবাধ জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ নয়; কেবল সীমিত ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদ আল-শায়বানীর অভিমত হচ্ছে, স্ত্রীর সম্মতিসাপেক্ষে 'আযল' বৈধ। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসকে[৪২] আযলের বৈধতার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং আযলের উপর আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সমূহকে কিয়াস বা অনুমান করা হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিবেচনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও মাতৃত্বকালীন মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে স্বামীর উপর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কেননা পরকালে স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৪৩]

ধারা-১৩ (পারিবারিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার)[৪৪]**:** এ ধারায় নারীর পারিবারিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণের অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম পারিবারিক কল্যাণে পুরুষের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও দায়িত্ব বেশি প্রদান করেছে। পরিবারে সন্তান লালন-পালন, স্বামীগৃহের নিরাপত্তা, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামে পুরুষের তুলনায় একজন নারীকে বেশি দায়িত্ব প্রদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্ত্রী পারিবারিক কল্যাণে সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। তাই ইসলাম স্বামীকে তার স্ত্রী ও সন্তানের যাবতীয় ব্যয় বহনে কল্যাণকামী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ.

> "যে লোককে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে তার কর্তব্য সচ্ছলতা হিসেবেই তার স্ত্রী-পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয় স্বল্প তার সেভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে খরচ করা কর্তব্য।"[৪৫]

সুতরাং স্বামী পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীর জন্য কল্যাণকর যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। অর্থনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য হিসেবেও কল্যাণকামী আচরণ করবে। বিশেষত একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা বজায় না রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"

> “আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে অথচ সে এক জনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, তা হলে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে, তার এক পার্শ্ব নিম্নগামী থাকবে।”[৪৬]

সুতরাং প্রত্যেক স্ত্রীর মাঝে খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমতা বজায় রাখা ইসলামের নির্দেশনা। তবে মানসিক প্রশান্তি লাভে স্বামীর মনে সবার মধ্যে সমতা বজায় রাখা কখনোই সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

> “আর তোমরা যতই প্রত্যাশা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে না, যার ফলে অপরকে ঝুলন্ত রাখার মত হয়ে পড়ে।”[৪৭]

এ ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রীর কোন একজনের প্রতি ভালোবাসা এমনভাবে প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তা অন্য স্ত্রীর উপর যুলুম হয়। মানসিক ভালোবাসার পূর্ণ সমতা সম্ভব না হলেও রাতযাপন ও ব্যয় নির্বাহে সমতা অপরিহার্য। এটাই হলো একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষার শারঈ বিধান। এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে,

> عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ "

> “আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বন্টন করে বলতেন, হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে ইনসাফ, যেটুকু আমার সম্ভব হয়েছে। আর যা আপনার নিয়ন্ত্রণে এবং আমার সাধ্যের বাইরে, সেজন্য আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।”[৪৮]

পারিবারিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক গোপনীয় বিষয়াদি প্রকাশ না করার নির্দেশনা দিয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না। উভয়ে পরস্পরের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকে। তাই স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর একান্ত গোপনীয় বিষয়গুলো প্রকাশ না করা। এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে,

> عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا "

> “আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে, স্ত্রীও তার নিকট আসে। আর সে স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়।”[৪৯]

উক্ত ধারার খ উপধারায় নারীর ব্যবসা পরিচালনায় ঋণ গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের বিপদে সুদমুক্ত করজে হাসানা দেয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়। করজে হাসানা দেয়ার বিধানে ইসলাম নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য করেনি। একই ধারার গ উপধারায় নারীর সাংস্কৃতিক অধিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে। ইসলাম নারীকে সাংস্কৃতিক অধিকার দিয়েছে। একজন নারীও পর্দা লঙ্ঘন না করে নিজস্ব পরিমণ্ডলে খেলাধুলা, গল্প, লেখালিখি ইত্যাদি চর্চা করতে

পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের থেকেও এ বিষয়ের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন।[৫০]

ধারা-১৪ (পল্লী উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বৈষম্য দূর)[৫১]***:*** এ ধারায় পল্লী উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বলা হয়েছে। ইসলাম পল্লী উন্নয়ন তথা আবাসন, রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে পার্থক্য বিবেচনা করে না। একই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইসলাম নির্দেশিত, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি দানের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী-পুরুষে পার্থক্য করে না। ইসলাম এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বান্দা হিসেবে অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সমাজের অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনা দেয়, হোক সে ব্যক্তি পুরুষ অথবা নারী। যেমন- যাকাতের অর্থ পাওয়ার যোগ্য খাতগুলো বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

> "নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বন্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[৫২]

এখানে কোনো খাতের ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ আলাদা করা হয়নি; বরং অর্থনৈতিক অবস্থাই বিবেচনা করা হয়েছে।

ধারা-১৫ (বৈষম্যহীনভাবে বিচার লাভ)[৫৩]***:*** এ ধারায় আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষে সাম্য ও বৈষম্যহীন বিচার লাভের অধিকার সম্পর্কিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। নির্যাতন, সহিংসতা ও অধিকার হরণ ইত্যাদি থেকে রক্ষার্থে সংক্ষুব্ধ নারী আইনের মাধ্যমে বিচার লাভের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় সমানাধিকার লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বিচারকার্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর আদল প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

> "যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার কার্য সম্পাদন করবে তখন যেন তা ইনসাফের সাথে কর।"[৫৪]

ধারা-১৬ (বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ নিবন্ধন)[৫৫]***:*** ১৬ নং ধারার ১ নং উপধারায় বিবাহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও বাল্যবিবাহ নিরোধ সম্পর্কিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ ধারায় বাল্য বিবাহ নিরোধ করার বিষয়ে বলা হলেও বাল্যকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়নি। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭' অনুসারে, বাল্যবিবাহ তথা যে বিবাহের বর অথবা কনের যেকোনো একজন "অপ্রাপ্তবয়স্ক" এবং "অপ্রাপ্তবয়স্ক" বলতে বুঝাবে যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বৎসর ও নারী হলে ১৮ বৎসরের কম। কিন্তু ইসলামি নির্দেশনানুসারে "অপ্রাপ্তবয়স্ক" বলতে নির্দিষ্ট বয়স না বুঝিয়ে সাবালকত্ব

লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়। সুতরাং সাবালকত্ব লাভ যেহেতু প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং এর নির্দিষ্ট বয়সমীমা হতে পারে না। তাই প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বয়সের সীমায় "অপ্রাপ্তবয়স্ক" প্রত্যয়টিকে বেঁধে ফেলা ইসলামে গ্রহণযোগ্য।[৫৬] সাবালকত্ব লাভই "অপ্রাপ্তবয়স্ক" বলে বিবেচিত হওয়ার সর্বসম্মত শেষ বয়সসীমা। ইমাম মালিক, আহমদ, শাফিঈ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আবূ হানিফা (র.)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী ছেলে হোক মেয়ে হোক ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হিসেবে ধরা হবে।[৫৭]

ইসলামে বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। কারণ যে কোন বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইসলামি আইনে কোন অপরাধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিলো মাত্র ছয় বছর বয়সে।[৫৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে ও তাঁর উপস্থিতিতে তার বিবাহের ঘটনাবলীর ভিত্তিতে বাল্যবিবাহের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। এছাড়াও যদি বিয়ে বলতে শুধু আক্‌দ ও ইজাব-কবুল বুঝায় তাহলে তা যে কোন বয়সেই হতে পারে। এমনকি পিতার নেতৃত্বে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে। ড. মুস্তফা আস সিবায়ীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী চারটি মাযহাবের ইজতিহাদ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বালেগ [সাবালক] হয়নি, এমন ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে শুদ্ধ ও বৈধ।[৫৯] সুতরাং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ নয়; বরং বাল্যকালে তথা অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ। কেননা আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে ছয় বছর বয়সে হলেও প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরই তিনি রাসূল (সা.)-এর ঘরে এসেছিলেন।

উক্ত ধারার দ্বিতীয় উপধারায় বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি আইন অনুসারে বিবাহ হলো একটি চুক্তি।[৬০] এ ছাড়াও বিবাহকে দেওয়ানি তথা সামাজিক চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং ইসলামি চুক্তি আইনের ন্যায় এ চুক্তি মৌখিক বা লিখিত যে কোনো পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে। তবে শাফিঈ ফকিহগণ চুক্তির ক্ষেত্রে লেখাকে ফরজে কিফায়া বলেছেন। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রতিটি আর্থিক এবং অনার্থিক লেনদেন যেমন- তালাক, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দলিল এবং নথিপত্র লেখা ফরজে কিফায়া। কারণ বিবাদ ও তর্কের সময় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এটির প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঘটনা স্মরণ করার ক্ষেত্রে এটির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং এতে অধিকারকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়।[৬১] সর্বোপরি ইসলাম পারস্পরিক চুক্তির ক্ষেত্রে লিখে রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ .

> "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।"[৬২]

বিবাহের চুক্তির মাধ্যমে স্বামী যেমন স্ত্রীর উপর শারিয়া সম্মতভাবে ভোগাধিকার পায়, তেমনি স্ত্রীও এ চুক্তি বলে স্বামীর জীবদ্দশায় মোহরানা, খোরপোশ, বাসস্থান, ভালো ব্যবহার ইত্যাদি এবং স্বামীর ইন্তিকালের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ইসলাম নির্দেশিত অংশের অধিকার পায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের আলোকে প্রতিয়মান হয় যে, নারীর প্রতি বৈষম্য ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে বৈষম্য প্রমাণিত হতে হবে ন্যায্যতা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে। পুরুষ-নারীর

পারস্পরিক অধিকারের ভিত্তি অনেক ক্ষেত্রে যেমন সমতা, একইভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের উপর নারীর অগ্রাধিকার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর উপর পুরুষের অগ্রাধিকার। সিডও সনদেও তা স্বীকার করা হয়েছে। সিডও সনদের প্রায় সকল ধারার সাথে ইসলাম একমত পোষণ করে এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম নির্দেশিত বিষয়াদি বাস্তবায়নে সিডও সদন একটি দৃঢ় ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। নারী অধিকার সম্পর্কিত ইসলাম নির্দেশিত বিষয়াদির বাস্তবায়ন নারীকে সকল ধরনের নেতিবাচক বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দিতে পারে। ইসলাম নির্দেশিত ক্ষমতাবলে একজন পুরুষ পরিবারের কর্তা হিসেবে নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকা নৈতিক দায়িত্ব। একই সাথে একজন নারী ইসলাম নির্দেশিত বিধান অনুশীলন করে তার ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ভোগ করার মাধ্যমে নিজেকে যাবতীয় বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দেয়া অপরিহার্য। ইসলামে নারীর কাঙ্খিত পূর্ণতার দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনের সেই নারীগণ যারা পূর্ণতায় পৌঁছেছেন; রাসূলুল্লাহর (সা.) যুগের সেই নারীগণ যারা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। ইসলামের লক্ষ্য সে পূর্ণ নারী যারা আগামী দিনে কাঙ্খিত পূর্ণতা লাভের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে কুরআন ও নির্ভুল হাদিসের বিশুদ্ধ এবং অবিকৃত শিক্ষাগুলোকে কর্মে রূপদানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বিখ্যাত সাহাবি আদ্দি ইবন হাতিম (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা উক্তিতে ইসলামের প্রত্যাশিত পূর্ণ নারী দৃশ্যমান হয়, যেখানে তিনি একজন নারী কোনো সাহায্য ছাড়াই একাকী হিরা থেকে কাবায় আসবেন এবং তাওয়াফের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবেন বলে প্রত্যাশা করেছেন। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করে নারীর পূর্ণতা অর্জনের ইসলামি নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেবল ইসলামের প্রত্যাশিত 'পূর্ণ নারী' সমাজে দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১ *The United Nations Blue Books Series*, Volume-VI (New York : Department of Public Information, United Nations, 1996), p. 40-42

২ Sharifa Begum and others, *THE CEDAW IMPLEMENTATION IN BANGLADESH: LEGAL PERSPECTIVES AND CONSTRAINS* (Dhaka : Bangladesh Institute of Development Studies, 2008), p. 3

৩ বাংলাদেশ সরকার ধারা ২ এবং ১৬-১(গ) এখনও অনুস্বাক্ষর করেনি। [মালেকা বানু ও রেখা সাহা সম্পাদিত, *দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলন* ২০১৩ (জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই) (ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৩), পৃ. ৬৯]

৪ তুরস্ক (ধারা-১৫, ১৬), লিবিয়া-মালদ্বীপ-মালয়েশিয়া (শারিয়া আইনের বিরোধী যে কোন ধারা), মরক্কো (ধারা-২, ১৫, ৮, ১৬), মিশর (ধারা-৯, ১৬), ইরাক (ধারা-২.চ, ২.ছ, ৯, ১৬), জর্ডান (ধরা-৯, ১৫, ১৬), তিউনেসিয়া (৯, ১৬) ধারা সংরক্ষণ করে অনুমোদন করেছে। সূত্র: আলতাফ পারভেজ, *বাংলাদেশের নারী : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা : জন অধিকার, ২০০০), পৃ. ৬২

৫ মালেকা বানু ও রেখা সাহা সম্পাদিত, *দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলন* ২০১৩ (জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই) (ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৩), পৃ. ৬৯

৬ আলতাফ পারভেজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

৭ Shahiduzzaman and Mahfuzur Rahman (ed), *Gender Equality in Bangladesh : Still a long way to go* (Dhaka : News Network, 2003), p. 177

৮ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন* (ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ৫

৯ আল কুরআন, ২ : ২২৮

১০ আল কুরআন, ৪ : ৩৪

১১ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬

১২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং ৩৪১১, খ. ৪, পৃ. ১৫৮

১৩ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৪ আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং ৫৯৭১, খ. ৮, পৃ. ২

১৫ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৬. *আল কুরআন*, ৪:৩

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন সাম্ভলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

১৮ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৯. আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং ৫৭৭৬, খ. ৭, পৃ. ১৩৯

২০. *আল কুরআন*, ৭:১৩১

২১. *আল কুরআন*, ১৪:৩৫-৪০

২২. *আল কুরআন*, ৩:৩৮

২৩. *আল কুরআন*, ৩১: ১৩-১৯

২৪ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

২৫ আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৮৪, হাদিস নং : ২২৩৭

২৬ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

২৭ ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০) পৃ. ১০৫

২৮ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আন-নিশাপুরি, *আস সহিহ* (বৈরুতঃ দারু এহয়া তুরাসুল আরবি, তা.বি.), হাদিস নং ২২০৫, খ. ৪, পৃ. ১৭৯৫

২৯ আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং ২৮৮১, খ. ৪, পৃ. ৩৩

৩০ ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০) পৃ. ১০৪-১০৫

৩১ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩২ *আল কুরআন*, ৪৯:১৩

৩৩ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান* (মিসরঃ দারু ইহয়াউ কুতুবুল আরাবীয়্যা, তা.বি), হাদিস নং ২২৪, খ. ১, পৃ. ৮১

৩৫ আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং ১০১, খ. ১, পৃ. ৩২

৩৬ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

৩৭ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, অনূবাদ: মুফতী যোবায়ের হোসাইন রাফীকী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৬), পৃ. ২২

৩৮ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২১

৩৯ *আল কুরআন*, ৩৩:৫৯।

৪০ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৪১ *আল কুরআন*, ৫৪:৪৯

৪২ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৪৪০, খ. ২, পৃ. ১০৬৫

৪৩ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৮৯৩, খ. ২, পৃ. ৫

৪৪ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৪৫ *আল কুরআন*, ৬৫:৭

৪৬ আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআস, *আস সুনান* (বৈরুতঃ মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং ২১৩৩, খ. ২, পৃ. ২৪২

৪৭ *আল কুরআন*, ৪:১২৯

৪৮ আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪২, হাদিস নং : ২১৩৪

৪৯ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৬০, হাদিস নং : ১৪৩৭/১২৩

৫০ ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৯৭৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৬

৫১ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৫২ *আল কুরআন*, ৯:৬০

৫৩ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

৫৪ *আল কুরআন*, ৪:৫৮

৫৫ *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫৬ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *"শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনি জটিলতা : ইসলামী সমাধান"* ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ.৯, সংখ্যা. ৩৫, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১২৪

৫৭ মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, *"ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর বয়সসীমা : সমস্যা ও সমাধান"* ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন ২০০৯, পৃ. ১৯৫

৫৮ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৩৮, হাদিস নং : ১৪২২/৬৯

৫৯ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৬০ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-১* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২), পৃ. ১৩৯

৬১ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-৫* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৭), পৃ. ৩৮০

৬২ *আল কুরআন*, ২:২৮২

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ১৬.১১.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তায় ‘সুর’: রবীন্দ্রসংগীত নির্মাণে এর প্রতিফলন

ঝুমুর আহমেদ*

Abstract

Rabindranath Tagore is simultaneously a littérateur, artist and music theorist. His musical proficiency reflects his diversified perceptions of the 'tune' of the song. This study uncovers how Rabindranath reconnoitred the tune. At the same time, it analyzes the attributes of the tune of Rabindra's music and investigates how his music perception is reflected in his songs. The study followed the methodologies of 'Literature Review', 'Comparative Analysis' and 'Descriptive Method' and revealed that Classical Music only had the majesty of tune while text dominated the kirtan, Panchali and Kabigan; however, Rabindranath's songs displayed a perfect combination of text and tune instead of the prevalence of only text or only tune--which is the triumphant reflection of his musical aptitude. Rabindranath created a unique style of his song known as 'Rabindra Sangeet' equally emphasizing text and tune, which reflects his musical excellence.

চাবিশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, সংগীতচিন্তা, সুর, রবীন্দ্রসংগীত, স্বকীয়তা।

ভূমিকা

বাংলা গানের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) প্রধান পুরুষ– প্রাতিস্বিকতায় উজ্জ্বল সুরকার। তাঁর সংগীতচিন্তার বড়ো একটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ‘সুর’ প্রসঙ্গ। সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী ভেবেছেন তার অনুসন্ধান করে রবীন্দ্রনাথের গানে সুরগত-বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রভাবনার কতটুকু প্রতিফলন ঘটল, তা যাচাই করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনায় বিস্তারিত ‘সুর’-এর নানান মহিমার খবর পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ তিনি কল্পনা করেছেন।[১] তিনি মনে করেছেন, তুচ্ছ বাণীকেও সুরের অপূর্ব সহযোগ দিতে পারে বৈরাগ্যের ব্যাকুলতা। শিল্পতাত্ত্বিক ও লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্রালাপে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাঁর শেষ বয়সের গানের বাণীবাহিত কল্পনার রূপলীলা কখনো-বা ভৈঁরোতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কনাড়ায় যথার্থভাবে প্রকাশ পেতে পারে।[২] শিল্পরসিক দীলিপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, তাঁর গানের কবিতায় তিনি বাক্যের আসুরিতাকে প্রশ্রয় দেননি; সেই-সব ভাব, সেই-সব কথা তিনি ব্যবহার করেছেন, সুরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আপন আসন ভাগ করে প্রতীক্ষা করে।[৩]– রবীন্দ্রনাথের এমন নানান সংগীতচিন্তাকে আশ্রয় করে দেখব তাঁর নিজস্ব সংগীত সৃষ্টিতে তিনি তাঁর চিন্তাসমূহের কতটুকু প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘সুর’-ভাবনা তাঁর সংগীত-বিষয়ক নানান প্রবন্ধ ও পত্রালাপে ছড়িয়ে রয়েছে। ‘সংগীত ও ভাব’, ‘সংগীত ও কবিতা’, ‘গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ’, ‘অন্তর-বাহির’, ‘সংগীত’, ‘সোনার কাঠি’, ‘সংগীতের মুক্তি’, ‘আমাদের সংগীত’, ‘শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান’, ‘কথা ও সুর’ প্রবন্ধে সুরসম্পর্কিত চিন্তার সারাৎসার পাওয়া যায়। তাছাড়া দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রালাপ ও আলোচনা, 'জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা', 'ছিন্নপত্রাবলি'র রচনায়ও সুর-বিষয়ক সরস অভিমত আমরা পাই। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপিসমূহে তাঁর গানের সুর বিন্যস্ত রয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের সুর-ভাবনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিচারযোগ্য।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গবেষণা-পদ্ধতি

হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গৎ, তেলেনা, প্রাদেশিক, বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, কীর্তন, রামপ্রসাদী এবং স্বকীয় নানান সুরের গানগুলির বিশ্লেষণ করে তার সঙ্গে কী করে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা সম্পর্কিত, তা যাচাই করা এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণা করতে গিয়ে 'পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি', 'তুলনামূলক পদ্ধতি' ও 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি' ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে অনুসন্ধান করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ 'সুর' প্রসঙ্গে কী বলেছেন তাঁর রচনায়। তারপর রবীন্দ্রসংগীতের সুরবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার কতটুকু প্রতিফলন ঘটল রবীন্দ্রসংগীতের সুর-সৃষ্টিতে তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে।

সাহিত্য-পর্যালোচনা ও গবেষণাকর্মের তাৎপর্য

প্রায় ৮০ বছরের অধিককাল আগে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীমণিলাল সেনশর্মা রচিত 'রবীন্দ্রনাথের সুর' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা সম্প্রতি 'সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র সংকলন গ্রন্থ ১-এ ঠাঁই পেয়েছে।[৪] সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানে বিভিন্ন সুরের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে; রবীন্দ্রনাথের সুরভাবনা প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা নেই। সিতাংশু রায়ের 'সংগীতচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ'[৫] গ্রন্থে সংগীতসমালোচক রবীন্দ্রনাথের নানান দিকের উন্মোচন করা হলেও আলাদাভাবে গানের 'সুর' তাঁর সংগীতচিন্তায় কতটুকু জায়গা জুড়ে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার প্রত্যাশিত বিবরণ নেই। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর 'সংগীত– সংজ্ঞার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ'[৬] গ্রন্থে বিভিন্ন রাগে রবীন্দ্রসংগীতের বিন্যাসের খবর পাওয়া যায়, এমনকী মিশ্র রাগের গান সম্পর্কিত তথ্যও সেখানে রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতচিন্তা প্রসঙ্গে আলোচনা অনুপস্থিত। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর অপর একটি গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসংগীতবীক্ষা: কথা ও সুর'[৭] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'-'প্রেম'-'স্বদেশ'-'প্রকৃতি'-'বিচিত্র' নানান পর্যায়ের গান প্রসঙ্গে আলোচনা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তায় 'সুর' প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়নি এবং তাঁর সৃষ্ট-গানে রবীন্দ্রধারণা কতটুকু প্রতিফলিত হলো বা কতটুকু প্রতিসরণ ঘটল সেটি দেখানো হয়নি, যা এই গবেষণার অভীষ্ট। অর্থাৎ, বিমূর্ত 'সুর' প্রসঙ্গে যুগপৎ শিল্পতাত্ত্বিক ও সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তুলে আনার কাজটি অভিনব। এবং রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাবনা কতটুকু বিকশিত হতে পারল তাঁর সৃষ্ট সুরে, সেই অনুসন্ধানটিও জরুরি– যা এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তায় সুর

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, তিনি প্রথম বয়সে হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন গানে। পরে, তিনি সেটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন, পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য।[৮] অর্থাৎ, আমরা এ থেকে বুঝে নিতে পারি , প্রথম বয়সের গান ইমোশনাল, আর শেষ বয়সের গান ইসথেটিক।

চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে– সুর বড়ো কি কথা বড়ো এ তর্ক ওঠেইনি। তাঁর মতে, সংগীতই স্বামী, ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে।[৯] প্রথম জীবনে রচিত বহ্মোপাসনা-উপযোগী গানগুলিতে তাঁর এই চিন্তার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। সেখানে শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরকে আশ্রয় করে উপাসনা-উপযোগী কথা বসিয়ে গেছেন তিনি। একই চিন্তার অভিক্ষেপ আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক বোধের সূচনায়– "...তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।[১০] কেবল ভাবকে বাৎলাবার জন্যে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরের আধিপত্যকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি এই আধিপত্য চাননি। ভাব প্রকাশে বাংলা ভাষার যে গুরুত্ব রয়েছে, বাংলা গানে তার প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে বিরল ছিল। ফলে, তিনি চাইতেন যথাযথ ভাব প্রকাশিত হোক সুরের সঙ্গে সমান আসন ভাগ করে– ""এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন, "বাঃ ইহার সুর কী মধুর", এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, "বাঃ কী সুন্দর ভাব!"""[১১] তিনি আরও বলেন, "...ভাবই মূল লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়-স্বরূপ।... সংগীত সুরের রাগরাগিণী, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী।"[১২]

শেষ বয়সে এসে তিনি তাঁর নিজের গানের সুর বজায় রাখার ব্যাপারে সংবেদনশীল ছিলেন। সুর যেন-বা তাঁর মহিমাময় বাণীর অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল–

> তোমাদের কাছে আমার মিনতি– তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি-না বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়।...বুলাবাবু তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ– এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো– এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব।... আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, সংগীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে।[১৪]

আবার, খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, 'সুর' প্রসঙ্গে, 'ভাব' প্রসঙ্গে তিনি নানা সময়ে মত বদলেছেন, কতবার বদলেছেন সেই মত, তা তার ঠিক নেই।[১৫] আর তাই, কখনো-বা তাঁর মতে, সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে।[১৬]

আমরা জানি, সুর মূর্ত নয়। কথা যে উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে পারে না, সুর তা অনায়াসে প্রকাশ করে মানুষকে অনির্বচনীয়তার আস্বাদন এনে দেয়। শব্দের অর্থ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারিত শব্দ মানব-মনকে প্রত্যাশিত অনুভূতিতে পৌঁছে দিতে পারে না। কিন্তু সুর সেই বচনকে সঙ্গে করে কথা ও সুরের মিলনে এক সর্বপ্রান্তস্পর্শী বোধে আমাদের পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না মনে" গানটির ভাবকে গুরুত্ব দিয়ে সুর সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করেছিলেন– "সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, "আমাদের সুর যেন ঠিক মানুষের গান নয়, যেন সমস্ত জগতের"[১৮]। এই সুর আমাদের মুক্তি দেয় সমস্ত কথার বন্ধন থেকে, সমস্ত দৈনন্দিন আবেষ্টন থেকে। কথা শুনতে-শুনতে মনে হয়, কথা হঠাৎ হারিয়ে গেছে সুরের বেদনার গভীরতায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–"বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।"[১৯]অনিবার্যভাবেই বাক্যকে জড়ধর্মিতা থেকে মুক্তি দেয় 'সুর', যার মধ্যে সর্বজনীনতার প্রসাদ উপ্ত থাকে।

শাস্ত্রীয় সুর-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয়সংগীতকে কখনোই প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং, শাস্ত্রীয়সংগীত থেকেই প্রেরণা লাভ করেছেন। এ ব্যাপারটি যারা জানেন না, তারা হিন্দুস্থানি সংগীত জানেন না বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।[২০]রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক সাংগীতিক পরিবেশের কারণে খুব সহজেই গান তাঁর প্রকৃতিতে প্রবেশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের অনেক আগে থেকেই তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে হিন্দুস্থানি সংগীত-শিক্ষার জন্য গুরু নিযুক্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রমুখ গুণী সংগীতশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। অথচ, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে নিয়মিত শিক্ষা নেবার অভ্যাস ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দরোজার আড়ালে-আবডালে'[২১], 'কুড়িয়ে-বাড়িয়ে'[২২] তিনি সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। নিয়ম-মাফিক শিক্ষা না পাওয়ায় তাঁর শিক্ষা যথার্থ হয়নি বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর পারিবারিক সাংগীতিক রুচি শাস্ত্রীয়-সংগীতের অনুরাগী সংগীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠনে সহায়তা করেছিল, যা পরবর্তী সময়ে বিচিত্রগামী হয়েছিল।

শৈশবে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আওড়িয়েছেন[২৩] সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিয়ানোচর্চায় তিনি অনেক অনুপ্রেরণা[২৪] পেয়েছেন। যথার্থ সাংগীতিক পরিবেশে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। সংগীত রচনার প্রারম্ভে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত, পাশ্চাত্য সংগীত, বাউল সংগীত ও কীর্তন সংগীতের জাত নয়, প্রাণটিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সংগীতকার হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ব্রহ্মোপাসনার জন্যে গান লিখে। এবং সেই গানগুলি ছিল হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরের প্রভাবান্বিত। শাস্ত্রীয় সংগীত ভেঙে যে গানগুলি সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছিল মূল গানের স্বরধ্বনির বিন্যাস, ঝোঁক অনুযায়ী, কখনো-বা মূল গানের ধ্বনি দিয়ে প্রভাবিত গান।[২৫] পারিবারিক সাংগীতিক ঐতিহ্যের কারণে রবীন্দ্রনাথের শিশুবয়স থেকে হিন্দুস্থানি সংগীতের বৈভব তাঁর সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের শিশুবয়সের এই প্রাপ্তিকে তিনি জীবনের শেষ গান সৃষ্টির মুহূর্ত পর্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানি সংগীতের অন্তর্গত রসকে তিনি আত্মীকৃত করতে পেরেছিলেন বলেই সংগীতস্রষ্টা হিসেবে শেষ জীবনে শাস্ত্রীয় সংগীতের সরাসরি প্রভাব এড়িয়ে নিজের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। হিন্দুস্থানি সংগীতকে ভেঙে যে গান তিনি রচনা করেছেন তা ছিল অর্থঘন, ভাবগম্ভীর, গভীর অনুভূতির রূপায়ণ। কেননা, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল গান থেকে তাঁর ভাঙা গানের পার্থক্য মূলত বাণীর অর্থগৌরবজনিত। এ ধরনের গানের ক্ষেত্রে এমনকি মূল গানের অর্থবিহীন বাণীতে ঈশ্বর-বন্দনার নানান স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উল্লিখিত গান তিনি ব্রহ্ম-উপাসনা, মাঘোৎসবের প্রয়োজনে, কখনো-কখনো কোনো উপলক্ষ ছাড়াই রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুসৃত মূল গান ছিল হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গৎ, তেলেনা, প্রাদেশিক,কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, রামপ্রসাদী ইত্যাদি। আবার, বিলাত গমনসূত্রে শেখা মূল সুর ভেঙেও তিনি গান সৃষ্টি করেছেন। যেমন, তাঁর গীতিনাট্য*কালমৃগয়া*র অনেক গানই ইংরেজি বা স্কচ ও আইরিশ গানের সুর-ভাঙা। রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির সূচনালগ্নে যে সকল ভাঙা গান রয়েছে তা তাঁর সংগীতসৃষ্টির ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সংগীতের প্রভাব-বিচারে তিনি কতোটা স্বকীয় তা যাচাই করতে তাঁর হিন্দুস্থানি সংগীতচিন্তা তথা শাস্ত্রীয় সুর প্রসঙ্গে উপলব্ধি উন্মোচন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল গানের সুরের বাঁধন মেনে চলেছে ভাঙা গানের সুর– তা আমরা জানি। মূল গানের সুরের সঙ্গে ভাঙা গানের সুর সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করলে সামান্যই প্রভেদ লক্ষ করা যায়। কখনো-বা ভাঙা গানটির সুর মূল গানের সুরের রাগের কাঠামোকে হুবহু মান্য করেছে। কখনো-কখনো তিনি রাগের চলন ঠিক রেখে সুরের বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন করেছেন। ভাঙা গানের সুরারোপে তিনি মূল গানকে অনুসরণ করলেও, মূল গানের বাণীর অর্থকে অনুসরণ করেননি। কারণ, তিনি জানতেন, "...আমাদের সংগীত ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের গানের মধ্যে 'প্রথম আদি তব শক্তি', 'শুভ্র আসনে বিরাজ', 'জগতে তুমি রাজা', 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', 'মধুর রূপে বিরাজ', 'ডুবি অমৃত পাথারে'; ধামার অঙ্গের গান 'বীণা বাজাও', 'সুধা সাগর তীরে', 'জাগে নাথ জোছনা রাতে',; খেয়ালাঙ্গের গান–'ডাকে বারবার', 'কোথা হতে বাজে', 'তব প্রেমসুধা রসে মেতেছি' ; টপ্পাঙ্গের গান– 'কোথা যে উধাও', 'কে বসিলে আজি হৃদয় আসনে', 'এ পরবাসে রবে কে'; ঠুংরি অঙ্গের গান 'তুমি কিছু দিয়ে যাও'; তেলেনা ভাঙা গান– 'সুখহীন নিশিদিন'; গৎ ভাঙা গান–'এসো শ্যামল সুন্দর' ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার যথাযথ প্রতিফলন দেখতে পাই। এবার, নমুনা হিসেবে বিভিন্ন সুর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের উল্লেখ করা যেতে পারে–

ধ্রুপদ সুর

রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ প্রসঙ্গে বলেছিলেন–

> ...আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি– একদিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর– এক দিকে তার আত্মদমন, সঙ্গতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা...[২৭]

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ গান 'ডুবি অমৃত পাথারে' গানটি এবার লক্ষ করি–

ঋসা ঋা II { গা -মা | মা মা|-াঃ মঃ |মক্ষা -া |মা -ক্ষগা|(-ঋসা সঋা)}I[২৮]

ডু বি অ ০ মৃ ত ০ পা থা ০ রে ০০ ০০ ডুবি

উপরিউক্ত গানে ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তবে, রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গায়কীর মূল স্বভাবকে গ্রহণ করেননি। মূল ধ্রুপদ গান থেকে ধ্রুপদের ধরনটি গ্রহণ করে ভাঙা গানে তা নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। মূল ধ্রুপদ গানের আলাপ ও বিস্তারে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি লয়ের কৌশল দেখানোর রীতি রয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথ নিজের গানে ব্যবহার করেননি। ধ্রুপদের

গানের বাণীর চার-তুক বিন্যাস রয়েছে, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষ অবধি তিনি তাঁর গানে ধ্রুপদ গানের সুরের মধ্যে যে গাম্ভীর্য রয়েছে, তা রক্ষা করে চলেছেন।

ধামার সুর

ধামার ধ্রুপদের তুলনায় লঘু ভাবের গান। লঘু ভাবের ধ্রুপদ ধামার তালে গেঁথে ধামার গান হয়। এই অঙ্গের শাস্ত্রীয় মূল গানের বাণীর আর্থবৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করে তিনি সুরের বৈশিষ্ট্যটুকু গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, 'বীণা বাজাও' [মূল গান : বীণ বজায় রে মন লে গয়ে]; 'সুধা সাগরতীরে' [মূল গান : আয়ো ফাগুন বড়ো মান]; 'জাগে নাথ জোছনা রাতে' [মূল গানঃ আজু রঙ্গ খেলত হোরি ব্রজমে ধুম মচোরি]।[২৯]

লক্ষ করা যায়, যেখানে ধামারের মূল রস শৃঙ্গার, রবীন্দ্রনাথ সেই রসের অনুগামী না হয়ে বেশিরভাগই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করলেন। মূল ধামারের বোলতান, মীড় ও গমকের ব্যবহার; দেড়গুণ, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণের ব্যবহার পরিহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধামার-ভাঙা গানে।[৩০] একটি গানের স্বরবিন্যাস লক্ষ করলে তা স্পষ্ট হবে–

II ন্া -সা -া |-গা -া পা ক্ষা I

বী ০ ০ ০ ০ ণা বা

I পা -া -া |-া -া |^{ধ}ক্ষা -া I ^{গ}মা -া -গা | -া ধা পা -ক্ষা I

জা ০ ০ ০ ০ ও ০ হে ০ ০ ০ ম ম ০

Iগা -মা -গা | ঋা -া | সা -া II[৩১]

অ ০ ন্ ত ০ রে ০

খেয়াল সুর

খেয়াল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

... কী কী সুর কী রূপে বিন্যাস করলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই-বা তাহা প্রকাশ করে তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।[৩২]

রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত বোধেরই প্রতিফলন রয়েছে তাঁর খেয়ালাঙ্গ গানে–

রমরা মা মা I I{পা -া না নাI

কো০০ থা হ তে ০ বা জে

I র্সা -র্ণরা র্সা ণধা | পা মণা ধপা -মগা |-রা(রমরা মা মা)}| মা -রা রা |রা সা রা রা I[৩৩]

প্রে ০০ ম বে০ দ না০ রে০ ০০ ০ কো০০ থা হ ধী ০ রে ধী রে বু ঝি

রবীন্দ্রনাথের খেয়ালঙ্গের গান খুব বেশি নয়। খেয়ালের যে মূল বৈশিষ্ট্য– আলাপ, বিস্তার, বোলতান, তান– এ সবকিছুকেই তিনি তাঁর খেয়ালাঙ্গ গান থেকে পরিহার করেছিলেন। খেয়ালের লঘু সুরে প্রভাবিত হয়ে অনেক সময় তাঁর গান রচনায় সুরের গাম্ভীর্যকে তিনি পরিহার করেছিলেন। এমনকী খেয়ালাঙ্গের না হওয়া সত্ত্বেও 'ঝর ঝর বরিষে', 'তিমির অবগুণ্ঠনে', 'জ্বলেনি আলো অন্ধকারে' ইত্যাদি গানে খেয়ালের মূল ধরনটা বিদ্যমান।

ঠুংরি সুর

শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যান্য শাখার তুলনায় ঠুংরি চটুল প্রকৃতির সংগীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি ঠুংরি অঙ্গের গানের মধ্যে 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথ ঠুংরির মূল আদর্শকে না মেনে তা গম্ভীর-প্রকৃতির হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ গানটির সুরে মানব মনের বেদনা এত বেশি প্রবল যে, সুরবিন্যাসের ছন্দটি মেনে গানটি গাওয়া খুব কঠিন– গানটির অন্তরা অংশের সুর লক্ষ করলে তা অনুভব করা যায়–

সা সা রা I রা -া -গা -া | -া -মা মধা (ধ)পা I

তু মি কি ছু ০ ০ ০ ০ ০ নি০ য়ে

I মগা -রগা -া -া | গণা ণা ণা ণা I (ণ)ধা -া -মা -া | ধা -ণর্সা ধর্সা -ণর্সণধা I

যা০ ০০ ০ ও বে০ দ না হ তে ০ ০ ০ বে ০০ দ০ ০০০০

I (ধ)পা -া -া -া | -া [৩৪]

নে ০ ০ ০ ০

টপ্পা সুর

রবীন্দ্রনাথ টপ্পা অঙ্গের গান মূল টপ্পা থেকে অনেক বেশি স্বতন্ত্র। শাস্ত্রীয় টপ্পায় অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিধুবাবুর বাংলা টপ্পা গানের আদর্শকে মেনেছিলেন। টপ্পা গানের সুরে রাগরাগিণী এবং প্রেমের আবহ প্রকাশিত হতো। মূল টপ্পায় গিটকারি, মুড়কিযুক্ত সুরবিস্তার এবং একই পঙ্ক্তিকে বারবার গাইবার রীতি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, টপ্পার অলঙ্কারে যে বাহুল্য রয়েছে, তা বর্জন করেছিলেন বাণীর ভাবকে সংহতরূপে প্রকাশ করবার জন্য। তিনি পাঞ্জাবি টপ্পা ভেঙে গান রচনা করেছেন– 'কে বসিলে আজি', 'এ পরবাসে রবে কে'। তিনি স্বকীয় সুর দিয়ে কিছু টপ্পা গান রচনা করেছেন, যেমন 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'। 'যা হবার তা হবে' গানটিও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় টপ্পা; লক্ষ করবার বিষয় গানটিতে টপ্পা অঙ্গের স্বরূপ খুব পরিমিতভাবে রয়েছে।'কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ উদাসী'[৩৫]বিশ্লেষণ করলে আমরা অনন্য এক টপ্পার নমুনা পাই–

এই গানটির স্বরলিপির উপরে এটিকে মিশ্র মল্লার রাগে বিন্যস্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে[৩৬]। গানটির সুরের বিন্যাস সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে কিছু অংশ শুদ্ধ মল্লার, কিছু অংশ মিঞা মল্লার, কিছু অংশ কাফি, কিছু অংশ রামদাসি মল্লার পাওয়া যায়। এই গানে শুদ্ধ মধ্যম, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ ঋষভ এবং ষড়জের চলন লক্ষ করা যায়; এই চলনটি অনেকটা কাফি রাগের চলনের মতো। কিন্তু

শুদ্ধ মল্লার ও মিঞা মল্লারের ক্ষেত্রে কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, শুদ্ধ ঋষভ, ষড়জে আসতেই হবে। গানটির অন্তরা অংশের শেষাংশে রামদাসি মল্লারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গানটিতে কাফি রাগের প্রভাব থাকায় এটিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে 'মিশ্রমল্লার' বলা যায় না, যদিও গানটির স্বরলিপিতে তার উল্লেখ রয়েছে।

এবার গানটির স্থায়ী অংশের সুর লক্ষ করি :

ণা II-ধা -র্সর্সণা -ধণা পা| -মা -া পমা পা I

কো ০ ০০০ ০০ থা ০ ০ যে০ উ

I পা -র্সা -া -া | -া -া মপা -া|মজ্ঞা -রসা -রা -া|-া -া [৩৭]

ধা ০ ০ ০ ০ ও হো ০ লো০ ০০ ০ ০ ০ ০

কোমল নিখাদ থেকে শুদ্ধ ধৈবত হয়ে তার সপ্তকের ষড়জে এবং কোমল নিখাদ হয়ে টপ্পার ছোটো ছোটো মুড়কি সহযোগে ধৈবত-কোমলনিখাদ হয়ে পঞ্চম হতে মধ্যমে মীড়ের মাধ্যমে গড়িয়ে আসার সময় যেন শুদ্ধ মল্লার প্রকট হয়ে ধরা দেয় এই গানে। 'উধাও' বলবার সময় সুরে পঞ্চম হতে তার-সপ্তকের ষড়জে গড়িয়ে যাওয়া বাণীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'হলো'র স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে কাফি রাগের আবির্ভাব ঘটলো হঠাৎ। তা যেন বাণীর প্রয়োজনেই। স্থায়ীর শেষাংশ 'বাদরে'-র সুরবিন্যাস এবার লক্ষ করি :

I -পা -া মা পা | -া মপা -নর্সা -র্রা|-র্সা -া -ণর্সা -র্রর্সণর্সা|-ণা -দা -ণা -া I

০ ০ বা দ ০ রে০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০০০ ০ ০ ০ ০

I -পা -া -া -া | -া -া -া ণাII[৩৮]

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "কো"

লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথ কোমল ধৈবতের প্রকট ব্যবহার করেছেন উপরিউক্ত অংশে যে স্বরটি মল্লারে লাগে না। স্বরলিপিতে এই ব্যবহার যতটা দৃশ্যমান, টপ্পা অঙ্গের হওয়ায় গানটি শুনবার সময় তা অনেক বেশি লক্ষণীয়। এবার অন্তরার আংশিক সুর লক্ষ করব :

ণধা ণধা ণধা|ণধা না -র্সা -র্সা|-া র্সা র্সা র্সা I

ঝ০ রো০ ঝ০ রো০ না ০ মে ০ দি কে দি

I নর্সা -র্রর্গা -র্মা -া | -া -র্রা -াঃ -র্জ্ঞঃ|র্সা -া -া [৩৯]

গ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ তে ০ ০

অন্তরার 'ঝরো ঝরো নামে দিকেদিগন্তে'-র 'ঝরো ঝরো' অংশটির সুর চারমাত্রায় দুইটি স্বরের (ণধা) মধ্যে বিরাজমান এবং 'নামে' অংশটিতে সুর যখন শুদ্ধ নিখাদ থেকে তারসপ্তকের ষড়জে সরাসরি পৌঁছে বিরহবেদনার অনুভূতির সঞ্চার করলো। অপরদিকে, 'দিকেদিগন্তে' অংশের বিস্তৃত সুরে

সেই বেদনাই বিস্তার লাভ করেছে। 'মন ছুটে শূন্যে শূন্যে' অংশে সুর অনির্বচনীয় এক বোধে আমাদেরকে নিয়ে যায়:

|মপা পা ণধা -না I না -র্সা -নর্সা র্সা | র্সা -না -র্সা র্সা।[৪০]

মন ছু টে০ ০ শূ ০ ০ন্ নে শূ ০ ন্ নে

প্রাদেশিক সুর-ভাবনা

প্রাদেশিক সুরে রচিত গানগুলি মধ্যে মাদ্রাজি (দক্ষিণী) সুরের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী'[৪১], 'বাজে করুণ সুরে'[৪২], 'নীলাঞ্জন ছায়া'[৪৩] অন্যতম। তাছাড়া, মহীশূরের ভজন ভেঙে করেছেন 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'[৪৪], শিখদের বিখ্যাত দোঁহা ভেঙে রচনা করেছেন 'বাজে বাজে রম্যবীণা'[৪৫], আর মাদ্রাজি গান ভেঙে রচনা করেছেন, 'বাজে করুণ সুরে', যা তাঁর সুরভাবনার অনন্য স্বাক্ষর। কানাড়ি মূল গান ভেঙে 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে'[৪৬] 'বড়ো আশা করে এসেছি'[৪৭], 'আজি শুভ দিনে'[৪৮] গান তিনটি সুরবিন্যাসের ধরনের কারণে জনপ্রিয় হয়েছে। আমরা জানি, উত্তর ভারতীয় সুরপদ্ধতি ও তালপদ্ধতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় সুরপদ্ধতি ও তালপদ্ধতির ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে প্রাদেশিক গানের উল্লেখ করা হলো তার মধ্যে মাদ্রাজি (দক্ষিণী) সুরের অনুসরণে 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী' গানটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো।এই গানের সুর বিবেচনায় এনে দক্ষিণীর লক্ষণ হিসেবে 'বাসন্তী'-র মধ্যবর্তী ধ্বনিটির সুর, 'হে' ধ্বনির স্বরবিন্যাস, 'মোহিনী'-র প্রারম্ভের ধ্বনির স্বরবিন্যাস যাচাই করলে পাওয়া যায়– একমাত্রায় একটি/দুটি/তিনটি স্বরের চলন; 'বনান্তে'-র 'ব' ও 'না' ধ্বনিতে একমাত্রায় চারটি স্বরের ব্যবহার করে যে সুর তিনি প্রয়োগ করেছেন, তা দক্ষিণী । দেখা যায়, দক্ষিণী সুরকেই উত্তর-ভারতীয় ছাঁচে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন পুরো গানে। 'অভ্রছায়ে' অংশের সুরে রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ ঋষভ ব্যবহার করেছেন, তাতে এই গানে ব্যাপকভাবে কড়ি মধ্যম, কোমল ঋষভ, কোমল ধৈবতের ব্যবহারের পর ভিন্নতর আবহ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণীর সুর উত্তর ভারতীয় সুরের থেকে একেবারেই আলাদা ও অনন্য আমেজের। আলোচ্য, 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী' গানের স্বরলিপি লক্ষ করলে উপরিউক্ত কথাগুলোর সমর্থন মেলে–

[গা -ঋা]

II সা -া সন্া -ঋসা | -ন্সা -ধ্া -সঋা -গা I -গপা -ক্ষপা -গা -ঋা | -গা -পা পা -া I

বা ০ স০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ন্ তী ০

I পক্ষা -ধপা -ক্ষপা গক্ষা | গা ঋা গা -ধপা I -ক্ষপক্ষা -গা -ঋা -গা |ঋা সা -া -া I

হে০ ০০ ০০ ভু০ ব ন মো ০০ ০০০ ০ ০ ০ হি নী ০ ০

Iসা -া সা সা | -ধ্সা -প্ধ্া প্া -া I সঋা -গা গা গপক্ষপা | গপক্ষপা -গা -ঋা সা I

দি ০ ক প্রা ০০ ০ন্ তে ০ ব০ ০ ন ব০০০ না০০০ ০ ন্ তে

I{পক্ষা -ধপা -ক্ষা গা | গা -ঋা -া সা I সঋা -গা -া -ঋা | -গা -া -া -া I

শ্যা০ ০০ ০ ম প্রা ০ ন্ ত রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I গপা পরা গপা -ক্ষাপদা | দপা -া -া -া I (-পদপদা -পক্ষা -গঋা -গা |-া -া -া -া)}I[৪৯]

আ০ স্র০ ছা০ ০০০ য়ে০ ০ ০ ০ ০০০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

লোক সুর-ভাবনা

বাউলের সুর-প্রভাবিত গান মূলত তৎকালীন পূর্ববাংলার শিলাইদহের পদ্মানদীর তীরবর্তী গ্রামীণ জীবনের লৌকিক অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সম্পর্কের অধ্যায়। বাউলদের ধারণায় মানবদেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক।[৫০] দেহই তাঁদের মরমী সাধনার আকর। রবীন্দ্রনাথকে বাউলদের জীবন ও নিঃসঙ্গ সরল সুরের গান আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বাউলের সহজ সাধনাকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাউলের তত্ত্বগত ব্যাপার রবীন্দ্রনাথকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করেনি এবং তা রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে ঠাঁই পায়নি। বাউল সুর রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছে। বাউলের সুর পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-বিচিত্র পর্যায়ের গানে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে সর্বসাধারণের সঙ্গে বাউলের সহজ সুরকে সফলভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন গানের মধ্য দিয়ে। তাই, স্বদেশ পর্যায়ের গানে এসে সর্বাধিক সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বাউলের ঢং। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বেশকয়েকটি স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনা করেছিলেন। গানগুলি হলো, 'আমার সোনার বাংলা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'ছি ছি, চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি'[৫১] উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন,

> শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল– কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে![৫২]

–এই গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ যে গান তৈরি করেন, তার আংশিক আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আমরা জানি 'বাউল গান' রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। "... একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল–

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি

কমনে আসে যায়,

ধরতে পারলে মনোবেড়ি

দিতেম পাখির পায়।"[৫৩]

গানটি শুনে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে![৫৪]

আমরা বাউল-প্রভাবিত গানের বাণী যদি লক্ষ করি তবে দেখব, রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে বাউলের ভাবনাটা নেই। তবে, বাউলের সুর দিয়ে তিনি প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাউলাঙ্গ গানসমূহে বাউলের ঢংটাকেই গ্রহণ করেছেন; তত্ত্বগত বিষয়সমূহ রবীন্দ্রসংগীতে অনুপস্থিত থাকায় বাণী ও সুরের সম্মিলনে তা নির্ভার ও স্বকীয় হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে তিন-তিন ছন্দে নিবদ্ধ নিম্নলিখিত গানটির বিন্যাসকে পরিলক্ষ করে–

ন্‌া | ন্‌া ন্‌া -া II{ সা -া সা | রা রা -া I[র]পা -া -া | মা -া -া I

য দি তোর্‌ ডা ক্‌ শু নে কে উ না ০ ০ আ ০ ০

I গমা -গা -া | রা সা -া I রা -া গা | গা রা -গরাI সা -া [৫৫]

সে০ ০ ০ ত বে ০ এ ক্‌ লা চ লো ০০ রে ০

কীর্তন সুর-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, কীর্তনের মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি রয়েছে, তা অন্য কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে নেই। কীর্তনের প্রাণ, গতি ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র– যা তাঁর গানেও যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন–

> ...আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সংগীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেই জন্যেই কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে।[৫৬]

> ...বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত। ... কীর্তনে সুরও অবশ্য কম না; তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে।[৫৭]

> ... দেখা যাচ্ছে কীর্তনে– সুরে বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। যোগের এই দুই অঙ্কের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে।[৫৮]

শিলাইদহে বাস করবার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তন গানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু কীর্তনাঙ্গ গান পাই। কীর্তন গানের ধরন ও গভীরতাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষাবধি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। মূল কীর্তনে 'আখর' কীর্তনের বাণীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অনিবার্য বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রে এই আখরকেই বাদ দিয়েছেন কীর্তনাঙ্গ গানে। কীর্তন গানের নাটকীয়তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর অন্যান্য গানেও ব্যবহার করেছেন। কীর্তন গানের আখরকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কথার তান'[৫৯]। মূল কীর্তনের অধ্যাত্ম ভাব এবং রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানের নিবেদনের ভাবটি অনেকাংশেই

সমধর্মী। স্বদেশ পর্যায়ের বাউল অঙ্গের গানে তিনি কীর্তনাঙ্গের অপূর্ব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। যেমন : "আমার সোনার বাংলা" গানে "আমি নয়নজলে ভাসি" বলতে গিয়ে সুরে তিনি কীর্তনাঙ্গের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ "ওহে জীবনবল্লভ" –

গা মা I I পধা -নর্সা না | ধা -পা ধপা | মা -গমপা পা | -া সা সা I

ও হে জী০ ০০ ব ন ০ বল্ ল ০০০ ভ ০ ও হে

I সা -ন্সরা রা | রা -গরা গা | গমা -পধপা -মপা | মা -গা গমা II[৬০]

সা ০০০ ধ ন ০০ দুর্ ল০ ০০০ ০০ ভ ০ "ওহে"

আমরা দেখি, স্থায়ী অংশে একমাত্রায় তিনটি স্বর 'গমপা', 'ন্সরা', 'পধপা' এবং কখনো-বা দুটি স্বর 'পধা', 'নর্সা', 'ধপা', 'গরা', 'গমা' একমাত্রায় বিন্যস্ত। স্বরের এই ধরনের প্রয়োগ কীর্তনের সুরের মূল অভিব্যক্তি। পুরো গানের যথাস্থানে এই সুরটিই বিন্যস্ত, এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। দীর্ঘ এ গানটি আখরযুক্ত কীর্তনের সুর হিসেবে স্বরলিপিতে চিহ্নিত রয়েছে এবং গানেও সেই আখর আমরা লক্ষ করি। কীর্তনের মূল রস বাণীর ঘুরে-ফিরে আসা এই গানটিতে প্রকটভাবে রয়েছে।

পাশ্চাত্য সুর-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সভ্যদেশে যে যে সুর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত তার মধ্যে একটা গভীরতা আছে। এই গভীরতাকে তিনি তাঁদের 'national air'-হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যাতে তাঁদের আবেগ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন Home, sweet home, Auld lang Syne– বাংলাদেশের প্রচলিত সুরে তিনি বিলেতি ওইসব গানের মতো গাম্ভীর্য, স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা খুঁজে পাননি। সে কারণে বাংলাদেশের গানকে তিনি 'national air' বলতে পারেননি।[৬১]

বাংলা গানের স্বভাবকে কোনোভাবেই ক্লিষ্ট না করে ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য সুরের মূল গানগুলিকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে অনেক সময় সুরের কিছু অংশ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাণীর ভাবের কিছু অংশ নিজের মতো করে নিয়েছেন। বিলেতি ভাঙা গানের ক্ষেত্রে সুর বা বাণীর তেমন অনুসরণ লক্ষ করা যায় না, যা শাস্ত্রীয় সংগীত ভাঙা গানে লক্ষ করা যায়। মাত্র কয়েকটি গানেই তিনি পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগ করেছেন; অধিকাংশই জীবনের প্রারম্ভে, ইউরোপ থেকে ফিরে এসে। ভারতীয় সংগীত ধারায় তালকে, ছন্দকে সমমাত্রা বা বিষমমাত্রায় পাওয়া যায়। বিলেতি সুরের কোথাও বিষমমাত্রার ছন্দ দুর্লক্ষ। সেখানে সম ফাঁকের ব্যাপারগুলো আলাদা নয়, নির্দিষ্ট মাত্রা পর পর শুধু বিট (তালি) রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিলাতি সমমাত্রিক ছন্দের ধরনটাকে মেনে ভারতীয় ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাঁর বিলাতি ভাঙা গান রচনা করেছেন। তিনি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যন্ডের মূল সুরের গান ভেঙেছেন। স্কটিশ মূল গান "Auld Lang Syne" গানটি ভেঙে "পুরানো সেই দিনের কথা" রচনা করেছিলেন, যা খুবই জনপ্রিয়। লক্ষ করা যায়, মূল গানের সুরের পাশাপাশি বাণীর ভাবের মিল রেখে ভাঙা গানটি সৃষ্ট। মূল গান চার-চার ছন্দে থাকলেও ভাঙা গান তিন-তিন ছন্দে বিভক্ত করেছেন। ভারতীয় সংগীতে একমাত্রায় দুই/তিন/চার স্বরের ব্যবহার লক্ষণীয়। বিলাতি ভাঙা গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্রায় তিনটি স্বর ব্যবহার করেছেন। পুরানো সেই দিনের কথা গানটির 'সে কি ভোলা যায়'-এর 'ভোলা'-র শেষাংশে তিনটি

স্বর ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, ভাঙা গানে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীতের অলংকার প্রয়োগ করেছেন, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ‘পুরানো সেই দিনের কথা’ গানটিতে দেখা যায় মূল গানের অবরোহণের গতিকে পালটে আরোহণের গতি করেছেন। যেমন–

I সা -া -া ধ্া ধ্া -া প্া -া I

(অ্যান্ড) ডে ০ জ্ অভ্ অ ল্ড্ ল্যা ঙ্

মূল– Auld Lang Syne

I প্া -া প্া । ধ্া ধ্া -ন্সরা I

শেষাংশ– সে ০ কি ভো লা ০০০

ভাঙা– পুরানো সেই দিনের কথা ...

|ধা -া -া -া -া ধা ধা -া| পা -া -া গা গা -া সা -া |[৬২]

(নেভার ব্রট টু) মা ০ ০ ০ ০ ইন্ড্ শু ড অ ০ ল্ড্ অ্যা কোয়ে ন্ টে ন্স্

I ধা -া -র্সা |র্সা র্সা -া I ধা পা -া | গা সা -া I”[৬৩]

(ভুলবি কি রে) হা ০ য়্ ও সেই ০ চো খে র্ দে খা ০

‘পুরানো সেই দিনের কথা’ গানটিতে প্রতি তিনমাত্রা পরপর সুরের ঝোঁক পড়ছে শব্দাংশে, যা ভারতীয় সংগীতে বিরল।

সকল সুর ও গান– যা রবীন্দ্রসংগীতে ‘প্রভাবক’ হিসেবে কাজ করেছিল, তা ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের ক্রমযাত্রা ছিল স্বকীয়তার দিকে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব নিয়মে জগতের সুখ-দুঃখের সঙ্গে গানের সুরের দুঃখ-সুখকে একাকার করে ভাবতে পেরেছিলেন, যা তাঁকে অনন্য হবার পথ দেখিয়েছিল :

কোন সুরগুলি দুঃখের ও কোন সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কীরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি– হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সঙ্গীতের ভাবই– ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন।... তবে আমাদের দেশের সঙ্গীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।[৬৪]

রবীন্দ্রনাথ আরো লক্ষ করেছেন–

আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেখানে নিয়ে যায়...[৬৫]

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা যায়,গানের ক্ষেত্রে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর, বিদেশি সুর, প্রাদেশিক সুর, কীর্তন সুর ও লোক সুরের অনেক বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনো ভোলেননি আমাদের গানের গন্তব্যস্থল। তাঁর উল্লিখিত কথায় আমরা জেনেছি, তিনি সুখ-দুঃখকে সুরে প্রকাশ করবার নিজস্ব নিয়ম জেনে গিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের গান প্রাত্যহিক জীবনের জীর্ণ-আবর্তের বাইরের বৈরাগ্যের দেশে আমাদেরকে নিয়ে যায়, তার মর্মমূলে ছিল গানের সুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর বোধ ও পরিণত চিন্তা।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের মতে, "...Art is never an exhibition but a revelation। 'exhibition'-এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, 'revelation'-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি।"[৬৬] রবীন্দ্রনাাথের নিজের গানের ক্ষেত্রে এই সংযম তিনি বজায় রেখেছিলেন।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গানের ধারাতে বাণী এবং সুরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে 'রবীন্দ্রসংগীত' নামের এক অনন্য গীতধারা তৈরি করেছেন, যা তাঁর সংগীতচিন্তার সমার্থক। শাস্ত্রীয়সংগীতে ছিল কেবল সুরের মহিমা; কীর্তন, পাঁচালি, কবিগানে ছিল বাণীর প্রাধান্য; কেবল 'বাণী' কিংবা কেবল 'সুর'-এর প্রাধান্য নয়– বাণী ও সুরের যাথার্থ সম্মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে, যা তাঁর সংগীতচিন্তারই সফল রূপায়ণ। তাঁর সংগীতচিন্তা ও সংগীতসৃষ্টির ক্রমবিকাশে আমরা লক্ষ করি, তিনি সুর সম্পর্কে নানানকিছু ভেবেছেন, নানান সুরের নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু শেষাবধি তাঁর গানের সঙ্গে ছিল ধ্রুপদের গাম্ভীর্য, কীর্তনের বাণীর প্রাধান্য, আর শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রতার মহিমা। ফলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মিলনে 'রবীন্দ্রসংগীত' নামের এক অনন্য গীতধারার স্রষ্টা হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী ১৩৯৯), পৃ. ১০৬

২ তদেব, পৃ. ১৭২

৩ তদেব, পৃ. ১৭৮

৪ সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., *সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ২০১৫), পৃ. ১১২

৫ সিতাংশু রায়, *সংগীতচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা: চয়নিকা ১৯৯৭)*

৬ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *সংগীত–সংজ্ঞার সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা: একুশ শতক ২০০৮)

৭ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রসংগীতবীক্ষা: কথা ও সুর* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা ১৯৮৩)

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৯ তদেব, পৃ. ৮৩-৮৪

১০ তদেব, পৃ. ২৭২

১১ তদেব, পৃ. ১৩–১৪

১২ তদেব, পৃ. ১৫

১৩ তদেব, পৃ. ২৬২

১৪ তদেব, পৃ. ২৫১

১৫ তদেব, পৃ. ২৪১

১৬ তদেব, পৃ. ২২৬

১৭ তদেব, পৃ. ২৩

১৮ তদেব, পৃ. ৪৮

১৯ তদেব, পৃ. ২২

২০ তদেব, পৃ. ১৩০

২১ তদেব, পৃ. ১১৮

২২ তদেব, পৃ. ১৭৭

২৩ তদেব, পৃ. ১৭৭

২৪ তদেব, পৃ. ১৭৮–৭৯

২৫ ফজলে এলাহি চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতার স্বরূপ', *ভাষা সাহিত্য পত্র* (বাংলা বিভাগ), অষ্টাবিংশ বার্ষিক সংখ্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০০২, পৃ. ১৫৭

২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

২৭ তদেব, পৃ. ১৫৮

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* অষ্টম খণ্ড *(কলকাতা:* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৮০),পৃ. ২৫

২৯ সুনির্মল ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রসংগীতের ভাঙা গানের উৎস সন্ধানে* প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ ২০০৪), পৃ. ৬১–৬৮

৩০ করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৫), পৃ. ৩৯০–৩৯১

৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* পঞ্চবিংশ খণ্ড *(কলকাতা:* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৮), পৃ. ৫২

৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* ষড়ুবিংশ খণ্ড *(কলকাতা:* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৮১), পৃ. ২৭

৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* পঞ্চম খণ্ড *(কলকাতা:* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৮), পৃ. ৮৪

৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* দ্বিতীয় খণ্ড *(কলকাতা:* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৪০১), পৃ. ১৫৩–৫৪

৩৬ তদেব, পৃ. ১৫৩

৩৭ তদেব

৩৮ তদেব

৩৯ তদেব, পৃ. ১৫৪

৪০ তদেব

৪১ প্রফুল্লকুমার দাস, *রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা* তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা: সুরঙ্গমা ১৩৮১), পৃ. ১০০

৪২ তদেব, পৃ. ৯৯

৪৩ তদেব, পৃ. ৯৯

৪৪ তদেব, পৃ. ১০১

৪৫ তদেব, পৃ. ১০৫

৪৬ তদেব, পৃ. ১০৫

৪৭ তদেব, পৃ. ১০৬

৪৮ তদেব, পৃ. ১০৫

৪৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান পঞ্চম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৪০১), পৃ. ৩২

৫০ করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭২

৫১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী* (কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৪১০), পৃ. ১০৫–১০৮

৫২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১

৫৩ তদেব, পৃ. ২৪

৫৪ তদেব

৫৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৬), পৃ. ৫২

৫৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৫৭ তদেব, পৃ. ৮৯

৫৮ তদেব, পৃ. ৯০

৫৯ সন্‌জীদা খাতুন এরূপ কথার তানবিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ গান হিসেবে 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' গানটির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, ওই গানে 'এসো' শব্দের বিভিন্ন সুরে আবৃত্তি দাঁড়ায় মোট তেত্রিশবার।
দ্র. –সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী ১৯৯৯), পৃ. ১৪৪

৬০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান চতুর্থ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৮), পৃ. ১০৭

৬১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১-২২২

৬২ অনুরাধা পাল চৌধুরী, *বিলাতীগানভাঙা রবীন্দ্রসংগীত* (কলকাতা: সুবর্ণরেখা ১৪০৯), পৃ. ২১–২২

৬৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান দ্বাত্রিংশ খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৪০১), কলকাতা, পৃ. ৩৭

৬৪ রবীন্দ্রনাথঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯–৭০

৬৫ তদেব, পৃ. ১৮৯–৯০

৬৬ তদেব, পৃ. ১৩১

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ১২.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতবৈচিত্র্য : কারণ, ধরন ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ*

Abstract:

Disagreement is an inevitable reality. There a differences of opinion among Islamic jurists on fiqh. During the Prophet's era, there was very little room for disagreement since in any crisis he would give immediate solution. But after his death, in the age of his Companions, differences arose among them while solving various issues of Islam due to various reasons. Becaus of this, the level of disagreement between the later Imams became more extensive. Currently its adverse effects are being noticed among their followers. Why their is so much disagreement between them? The prime objective of this study is to investigate the reasons for their discord so that the distance between the Muslim nations can be reduced and the road to unity can be widened.

চাবিশব্দ: ইখতিলাফ, মুজতাহিদ, ফিকহ, আসবাবুল ইখতিলাফ, শিষ্টাচার

ভূমিকা

মতপার্থক্য একটি অনিবার্য বাস্তবতা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এ শাশ্বত জীবনবিধান অবতরণকালে মতবৈচিত্র্যের সুযোগ খুবই কম ছিল। এ সময় কোনো বিষয়ে মতভিন্নতা সৃষ্টি হলে নবি (সা.) তা সমাধান করে দিতেন। মহানবি (সা.) এর ইন্তিকালের পরে এক নতুন পরিবেশের উদ্ভব ঘটে। সাহাবা কিরাম দীনের দাওয়াত নিয়ে যখন ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে, তখন আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত যৌক্তিক কারণে কিছু ফিকহী[১] বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাদের মতপার্থক্যের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ কিছু অনুসিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে। তাদের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী যুগে মাযহাবের ভিন্নতা, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, একই মাসআলায় পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য হওয়ায় এ মতপার্থক্যের পরিধি আরো বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ইসলামের সোনালি যুগের ইমামগণের মতবৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ও সৌজন্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি চূড়ান্ত পর্যায় তা দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর বিচ্ছিন্নতার রূপ পরিগ্রহ করছে। এমতাবস্থায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে ইমামগণের মতবৈচিত্র্যের মৌলিক কারণসমূহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

গবেষণার উদ্দেশ্য: উল্লিখিত বিষয়ে বাংলা ভাষায় কোনো গবেষণামূলক প্রবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়নি। অথচ ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদের প্রভাবে প্রান্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদের কারণ, ধরন, প্রকৃতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হবে। এ বিষয়ের জ্ঞানান্বেষীরা যাতে ফিকহশাস্ত্র ও ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে মতভেদের কারণ অবগতির মাধ্যমে পারস্পরিক দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারেন। এ ছাড়াও যাতে মুসলিম উম্মাহর

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

মাঝে সংলাপের মূলনীতির ভিত্তি রচনার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সুধারণা, নৈকট্য ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষত ইসলামি আইনবিদগণের মতবৈচিত্র্যের বাস্তবতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর অনিবার্যতা সুস্পষ্ট হবে এবং মুসলিম ঐক্য সুসংহত করতে অবদান রাখবে। ফলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দূরত্ব লাঘব করবে এবং ঐক্য-সংহতি প্রক্রিয়ার জগতে এক নব দিগন্তের সৃষ্টি করবে।

গবেষণা পদ্ধতি: প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical Mathod) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে কুরআন মাজিদ, হাদিস শরিফ ও ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে দেশিবিদেশি বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িকীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসুত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা ‘শিকাগো শৈলী’ এর অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন : ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের গবেষণার প্রাথমিক উৎস ছিল– কুরআন ও হাদিস। তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল উক্ত প্রাথমিক উৎসদ্বয়ের আলোকে মানবজীবনে উদ্ভূত সমস্যাবলির শরয়ী সমাধান অনুসন্ধান করা। এ ক্ষেত্রে গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। তাদের গবেষণার উৎস, বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কেন এত মতপার্থক্য? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

১. ইখতিলাফ শব্দের বিশ্লেষণ

ক. আভিধানিক অর্থ

ইখতিলাফ (اختلاف) শব্দটি একটি আরবি পরিভাষা। এটি বাব ইফতি‘য়াল (افتعال) এর ক্রিয়া মূল। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মতভেদ, মতানৈক্য, বিতর্ক, ভিন্নতা, অমিল, বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, পার্থক্য ও অসঙ্গতি ইত্যাদি।[২] সাধারণত যেকোনো রকমের বৈপরীত্য বোঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে মত, চিন্তা ও দর্শনগত অমিলের ক্ষেত্রেই ‘ইখতিলাফ’ শব্দটির ব্যবহার সমধিক পরিলক্ষিত হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইখতিলাফের সংজ্ঞায় রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, “ইখতিলাফ অর্থ একজন অপর জন হতে স্বতন্ত্র গতিবিধি বা পৃথক মত অবলম্বন করা।”[৩] আলী ইবন মুহাম্মদ আলীর মতে, - هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل অর্থাৎ পরস্পর মতভেদপূর্ণ কোনো বিষয়ে মিথ্যাকে মিথ্যা কিংবা সত্যকে সত্য হিসেবে উন্মোচন করার নিমিত্ত দু‘পক্ষের মধ্যে চলমান বিতর্ককে ইখতিলাফ বলে।[৪] ফিকহের পরিভাষায়, ইসলামের যে কোনো ব্যবহারিক বিষয়ে শরিয়তের দলিলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণের পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করাকে ইখতিলাফ বলে।[৫] অতএব, মুজতাহিদগণের মধ্যকার মতবৈচিত্র্য সাধারণত দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, দলিলের প্রচ্ছন্নতা কিংবা প্রমাণ সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে হয়ে থাকে।

২. ইসলামের দৃষ্টিতে ইখতিলাফ

মতের ঐক্য কখনোই সম্ভব নয়। এটা যদি সম্ভবই হতো তবে পৃথক পৃথক মস্তিষ্ক না হয়ে সকলের একটিই হতো। সুতরাং ইখতিলাফ মানে হলো– জ্ঞানের পরাগায়ণ, সৃজনশীলতা, বৈচিত্র্য ও ইজতিহাদ।[৬] এই ইখতিলাফ সংঘটিত হয় সাধারণত দু'টি ভিত্তিকে কেন্দ্র করে। ক. হিংসা, অহংকার ও গোঁড়ামি ভিত্তিক, খ. তথ্য-প্রমাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা ভিত্তিক।

ক. নিন্দনীয় মতবিরোধ

মতের অমিল একটি অবধারিত ও শাশ্বত বিষয়। কারণ সকল মানুষের চিন্ত-চেতনা, বুদ্ধি-বিবেচনা, ইচ্ছা, রুচি ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীতে ইখতিলাফের ইতিহাসের গোড়া পত্তন করেন আদি পিতা আদম (আ) এর দুই সহোদর পুত্র হাবীল ও কাবীল। তাদের পারস্পারিক মতবিরোধ থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত; চূড়ান্ত পর্যায় তা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়িয়েছিল।[৭] তাদের ধারাবাহিকতায় তা চলতে থাকে যুগ যুগান্তর জুড়ে। তবে কোনো বিষয়ে মতভেদের মাত্রা কতটুকু হবে সেটাই অনুসন্ধানের বিষয়। তাই দেখা যায়, কুরআন-হাদিসের বহু স্থানে সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে এবং পরস্পর মতপার্থক্য সৃষ্টি না করতে নির্দেশনা এসেছে বার বার। সাথে সাথে এ বিধান অমান্যকারীর জন্য কঠিন পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন: মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ "তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর দ্বীনকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর। আর তোমরা পরস্পরে মতভেদ করে পৃথক পৃথক হয়ে যেওনা।"[৮] এ আয়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকাকে ফরজ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে মতভেদ করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পৃথক-পৃথক উপদলে বিভক্ত হওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "আর তোমরা তাদের মতো হয়ে যেও না, যাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পরেও বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এরাই হচ্ছে সে সকল লোক, যাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ "নিশ্চয়ই যারা এ কিতাব (কুরআন) নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে, তারা সত্য-ন্যায়ের পথ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।"[১০] এ প্রসঙ্গে নবি কারীম (সা.) বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল এ জন্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তার (আল্লাহর) কিতাব নিয়ে মতবিরোধ করতো।"[১১] তিনি আরো বলেন, "তোমরা মতভেদ করো না। কেননা এতে তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যেও দূরত্ব সৃষ্টি হবে।"[১২] অতএব, সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও বিরোধিতার প্রয়োজনে বিরোধিতা ও প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে হিংসা কিংবা অহংকার বশত যে কোনো প্রকারের মতবিরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে নিন্দনীয়।

খ. অনুমোদিত মতবৈচিত্র্য

প্রাণিজগতে মানুষের একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো চিন্তন-ক্ষমতা। মানুষের চিন্তা শক্তির দরুণ সে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা। চিন্তার গতিপথ ভেদ করে সে প্রগতির পথে পা বাড়ায়। আর মতভেদের মূলে রয়েছে মানুষের চিন্তন শক্তি। সৃষ্টিগতভাবে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন। তাই পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকাটা তাদের স্বাধীনতার প্রতীক। তবে সকলের মেধা, যোগ্যতা, পর্যবেক্ষণ

ক্ষমতা ও বুদ্ধি-বিবেক সমান্তরাল নয়। সে কারণেই ক্ষেত্রবিশেষে মতবৈচিত্র্য হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। আর আল্লাহ তা'য়ালা এ অনিবার্য বিষয়টির বৈধতা দান প্রসঙ্গে বলেন, وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ... "আর তোমার রব চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি কারো ওপর তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেন না) আর এভাবে তারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে। তবে তোমার প্রভূ যার প্রতি করুণা করেন তাদের ব্যাপার ভিন্ন।"[১৩] বনু নযীরের (ইয়াহুদী) বসতি অবরোধ কালে তাদের খেজুর বাগান ধ্বংস করার নির্দেশনা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে মুহাজির সাহাবিগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। একদল বলে, এগুলো মুসলিমদের গনিমত। তাই এগুলো কাটা ঠিক হবে না। অপর দল বলে, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করতে ও তাদের অন্তর্দাহ বৃদ্ধিতে এগুলো কর্তন করা আবশ্যক।[১৪] এ প্রসঙ্গে কারো প্রতি তিরস্কার না করে বরং উভয় দলের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

"(ইয়াহুদী বসতি অবরোধের সময়) তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো না কেটে কাণ্ডের উপর রেখে দিয়েছ, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করেন।"[১৫] হাদিস শরিফেও মতবৈচিত্র্য সমর্থনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন: খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় নবি (সা.) সাহাবিদের এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ "তোমাদের কেউ যেন বনু কুরায়যা গোত্রে পৌঁছার পূর্বে আসরের সালাত আদায় না করে।" পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত শেষ পর্যায় চলে এলে একদল সাহাবি বলেন, বুনূ কুরায়যায় পৌঁছার পূর্বে [ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলেও] আমরা আসর সালাত আদায় করবো না। অপরদল বলেন, পথেই সময়মত সালাতুল আসর আদায় করে নিবো। [কেননা সালাত কাযা করানো রাসুল (সা.) এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমাদের দ্রুতগতিতে আসরের পূর্বে তথায় পৌঁছাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।] উল্লিখিত ঘটনাটি শুনে নবি (সা.) কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি।[১৬]

এ বিষয়ে অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দু'জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে সালাতের সময় হয়। কিন্তু তাদের সাথে ওজু করার মতো যথেষ্ট পানি ছিল না। ফলে তারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেন। পরক্ষণে, (ঐ সালাতের ওয়াক্তের মধ্যেই) তারা পানির সন্ধান পান। একজন পানি দিয়ে ওজু করে পুনরায় সালাত আদায় করেন। অপর জন তা করলেন না। পরবর্তীতে তারা দু'জন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সান্নিধ্যে এসে তাদের সফর কাহিনি বর্ণনা করেন। যে পুনরায় সালাত আদায় করেনি তাকে নবি (সা.) বলেন, "তুমি সঠিক নিয়ম পালন করেছ।" আর যে অজু করে পুনরায় সালাত আদায় করেছিলেন তাকে বলেন,"তোমার জন্য দুইটি পুরস্কার রয়েছে।"[১৭] উল্লিখিত আয়াত কারীমা ও হাদিস শরিফ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মানুষের মাঝে যে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মতবৈচিত্র্য দেখা দেয় তা মূলত মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয় এবং মহান রবের সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি উত্তম উপমা। এ ধরনের মতভিন্নতা যদি যুক্তিগ্রাহ্য, প্রমাণভিত্তিক হয় এবং শিষ্টাচার ও নিয়মনীতি বিবর্জিত না হয় তবে তা মোটেই নিন্দনীয় কিংবা দূষণীয় নয়; বরং ইসলামি শরিয়াহ পরিপালনের পথকে তা প্রশস্ত করে।

গ. গবেষণার প্রতি উৎসাহ

ইসলাম গবেষণাধর্মী একটি ধর্ম। ধর্মন্ধতার স্থান এতে নেই। জ্ঞানগত প্রগতি ও ইসলামের সোনালি যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে ইখতিলাফকে বিবেচনা করা হয়। আল-কুরআনে শতাধিক স্থানে সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কোনো মুজতাহিদ যখন স্বাধীনভাবে গবেষণা করেন তখন গবেষণার ফলাফল অন্য কোনো গবেষকের সাথে আংশিক মিলে যাওয়া কিংবা ভিন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। গবেষণার ফলাফল ভুল কিংবা শুদ্ধ যাই হোক, তাতে গবেষক পুরষ্কার বঞ্চিত হবেন না। ইসলাম যে গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করে এটাই তার উৎকৃষ্ট উপমা। এ প্রসঙ্গে নবি (সা.) বলেন,

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

"একজন বিচারক যখন গবেষণা করে সঠিক বিষয়টি উন্মোচন করেন তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর সে যদি গবেষণায় ভুল করে তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার।"[১৮]এভাবে নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণালব্দ মতামতের কারণে ইসলামি আইনবিদগণের মাঝে যে ধরনের মতবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তাতে ইসলাম শুধু অনুমোদনই দেয় না; বরং পুরস্কার ঘোষণা করে গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করে। যাতে মুসলিম উম্মাহ গবেষণার বন্ধ্যাত্ব ভেঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখতে পারে।

৩. ফিকহ শাস্ত্রে মতবৈচিত্র্যের স্বরূপ

কেবল আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবন পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কালাম ও তার রাসুলের সুন্নাহ। এতদুভয়ে বর্ণিত মৌলিক বিশ্বাসগত বিষয় (আকাঈদ) তথা তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি ও মৌলিক বিধানগত বিষয় (আহকাম) তথা সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ প্রভৃতি ফরয হওয়া সম্পর্কিত বিধি-বিধান সর্বসাধারণের বোধগম্য, সহজ-সরল ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে ইমাম মুজতাহিদগণের মাঝে কোনো মতভিন্নতা নেই। পক্ষান্তরে শরিয়তের অমৌলিক ও শাখাগত কিছু খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে যেগুলোর বিধান বর্ণিত হয়েছে প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কিংবা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে, যা চিন্তা-গবেষণা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। তদ্রূপ সময়ের পালা বদলে, যুগের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা; যার প্রত্যক্ষ সমাধান কুরআন ও হাদিসে আলোচিত হয়নি। সে সকল ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত (উসূল) নীতিমালার আলোকে শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় (ইজতিহাদ) গবেষণার নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সকল বিধি-বিধান শরিয়তের (উসূল) মৌল নীতিমালার আলোকে প্রবর্তিত বিধিবদ্ধ গ্রন্থই ফিকহ শাস্ত্র হিসেবে পরিচিত।

ইসলামি আইনবিদ, মুজতাহিদ ইমামগণের গবেষণা পদ্ধতি, মূলনীতি ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে মেধা-যোগ্যতা ও চিন্তা-গবেষণার পরিধি সবার সমান ছিল না। ফলে তাদের উদ্ভাবিত ফিকহী মাসায়েলেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু উত্তম-অনুত্তমের মতপার্থক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের ইজতিহাদের এই স্বাভাবিক মতান্তর কখনোই পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা দেয়নি। বরং পূর্ণ ইখলাসের সাথে গবেষণা পদ্ধতি ও নীতিমালার

আলোকে কুরআন-সুন্নাহ ইজতিহাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই ছিল তাঁদের সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মোটকথা, শরিয়তের মৌলিক, দ্ব্যর্থহীন ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। দ্ব্যর্থবোধক, বিশ্লেষণসাপেক্ষ, অমৌলিক ও উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ে ইসলামি আইনবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য সীমিত ছিল। তবে হালাল-হারাম ও জায়েয না-জায়েযের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।

৪. ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতবৈচিত্র্যঃ কারণ, ধরন ও প্রকৃতি

মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদের কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ইখতিলাফের সিংহভাগ কারণ হাদিসের সাথে সংযুক্ত, কিছু কারণ রয়েছে কেবল কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত, আর কিছু কারণ আছে কুরআন-হাদিস উভয় এবং অন্যান্য উৎসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়া পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু কারণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাদের মতবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণসাপেক্ষ, অমৌলিক ও উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেথায় হালাল-হারাম কিংবা বৈধ-অবৈধের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। নিম্নে এ সম্পর্কিত পার্যালোচনা উপস্থাপিত হলো—

এক : আল্লাহর কিতাব সংক্রান্ত মতবৈচিত্র্যঃ ধরন ও পদ্ধতি

আল-কুরআনে ব্যবহৃত কিরা'আতের তারতম্য, বাক্যের বিন্যাস, অব্যয় পদের ব্যবহার, শব্দের প্রচ্ছন্নতা, দ্ব্যার্থতা, মর্মোদ্ধার, রূপকার্থে ও একাধিক অর্থে ব্যবহার, আমর-নাহি, মুতলাক-মুকায়্যিদ, 'আম-খাস, সরিহ-কিনায়াহ ইত্যাদির বিধান ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে যৌক্তিক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আল-কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি বিধানে ইমামগণের মতভেদের ভিত্তি ও ধরনগত দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো-

ক. কিরা'আতের তারতম্য : কুরআন মাজীদ সাত কিরা'আতে অবতীর্ণ।[১৯] অনেক আয়াত ভিন্ন ভিন্ন অর্থের একাধিক তিলাওয়াত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। ফলে একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করতে গিয়ে কিংবা উভয় অর্থের মধ্যে সমন্বয়ের স্বার্থে ইমামগণের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছে। মহান আল্লাহ ওজুর বিধান প্রসঙ্গে বলেন, فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين "আর তোমরা মাথা মাসাহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত/ মাসাহ করবে।"[২০] এখানে ارجلكم শব্দটি দুই কিরা'আতে পঠিত হয়। প্রথমত: ارجلكم এর 'লামের' উপরে যবরযোগে; যার অর্থ দাঁড়ায় মুখ ও হাতের সাথে পা দু'টোও ধৌত করতে হবে। অধিকাংশ ইমাম এ কিরা'আতের উপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছেন যে, পা ধৌত করা ওজুর ফরযের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত: ارجلكم এর 'লামের' নীচে যেরযোগে; সে ক্ষেত্রে শব্দটির সম্পর্ক হবে رؤوس (মাথার) সাথে, যার অর্থ দাঁড়াবে, মাথার অনুরূপ পা মাসেহ করতে হবে। এ কিরাআতের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ অধিকাংশের মতের বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন।[২১] অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের কিরাআতের তারতম্যের কারণে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

খ. শব্দের রূপকার্থে ব্যবহার : রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার অলংকার শাস্ত্রের একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। আল-কুরআনে এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ জাতীয় শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়

করতে গিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ প্রকৃত অর্থ নিয়েছেন; কেউ আবার রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্রতার বিধান প্রসঙ্গে বলেন, او لامستم النساء "অথবা তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করো কিংবা তাদের সাথে সংগম করো।"[২২] এখানে ملا مسة শব্দটি প্রকৃত অর্থ পরস্পর স্পর্শ করা। আর রূপকভাবে যৌন সংগম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছেন। ফলে তার মতে, যৌন সংগম নয়, কেবল কোনো নারীকে স্পর্শ করলেই অজু ভঙ্গ হবে। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রূপক অর্থ নিয়েছেন। ফলে তার মতে, পারস্পরিক স্পর্শে নয়, যৌন সংগমের কারণে অজু ভঙ্গ হবে।[২৩]

গ. শব্দের প্রচ্ছন্নতা : আল-কুরআনের এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এ ধরনের শব্দ থেকে বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন: আল-কুরআনে ব্যবহৃত "قروء" শব্দটি আরবি ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যথা: ক. (الحيض) ঋতুকাল ও খ. (الطهور) পবিত্র অবস্থা। হযরত উমর, আলী, ইবন মাসউদ, আবু মুসা আশয়ারী (রা) প্রমুখ প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে হানাফী মাযহাব উক্ত মতটি আমল করেছেন। অপরপক্ষে হযরত আয়েশা, ইবন উমর, যায়দ ইবন সাবিত (রা) প্রমুখ সাহাবিগণ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী ও মালিক (রহ.) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।[২৪] ফলে এ সংক্রান্ত বহু শাখাগত মাসআলায় তাদের মধ্যে মতবৈচিত্র্য পলিক্ষিত হয়।

ঘ. শব্দের প্রয়োগিক দ্ব্যর্থতা: কুরআনে বর্ণিত বিধানগুলো অকাট্য। কিন্তু এগুলোর প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে পদ্ধতিগত মতভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন: চোরের হাত কাটা আল্লাহর বিধান। তাই আল্লাহ বলেন, السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما "তোমরা পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও।"[২৫] এখানে (السارق) শব্দটি চোর অর্থে অকাট্য ও সন্দেহ মুক্ত। কিন্তু কখন, কোথা থেকে, কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে, কোনো হাত, কতটুকু পরিমাণে কাটা হবে? এ সব বিষয়েকে কেন্দ্র করে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

দুই. হাদিস সংক্রান্ত মতবৈচিত্র্য: ধরন ও পদ্ধতি

ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে ফিকহী বিষয়ে মতভেদের যত কারণ রয়েছে তন্মধ্যে সিংহভাগ হাদিসের সাথে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো-

ক. কোনো হাদিস সংগ্রহে না থাকা

রাসুলুল্লাহ (সা.) নানা সময় বিভিন্ন মজলিসে প্রয়োজন মোতাবেক দ্বীন শিক্ষা দিতেন। কখনও এমনটিও ঘটেছে যে, একটি হাদিস মাত্র দু'একজন ছাড়া কেউ শোনেননি। আবার রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সান্নিধ্যে সব সাহাবির পক্ষে সর্বদা উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। কেউ সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে খেয়ে না খেয়ে ছায়ার মতো রাসুল (সা.) এর সংস্পর্শে থেকে জ্ঞানার্জন করতেন। তন্মধ্যে আবু বকর (রা.), উমর (রা.), আবু হুরায়রা (রা.) প্রমুখ ও আহলে সুফফার সাহাবিগণ মসজিদে নববীর চত্বরে সর্বদা জ্ঞানার্জনের জন্য উন্মুখ থাকতেন। আবার অনেকে মাত্র সামান্য কিছু সময় নবির সোহবত নিয়ে পুনরায় নিজ এলাকায় ফিরে যেতেন, আর কোনো দিন উপস্থিত হওয়ার সুযোগও হয়তো হয়নি। কাজেই সব সাহাবির পক্ষে সকল হাদিস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি; ফলে কখনও বাধ্য হয়েই তাদেরকে ইজতিহাদ করে সমাধান বের করতে হয়েছে। পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ, ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[২৬] একদা আমীরুল মুমিনীন

হযরত আবু বকর (রা.) দাদীর মীরাস সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, দাদী মীরাস সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে পাইনি। তবে আমি অন্যদের কাছে জানার চেষ্টা করবো। অতঃপর তিনি সাহাবিদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে মুগীরা ইবন শু'বাহ ও মুহাম্মদ ইবন মাসলামাহ (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসুল (সা.) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ মীরাস দিয়েছেন।[২৭] হযরত আবু বকরের (রা) মত ব্যক্তিত্ব যিনি রাসুল (সা.) এর তিরোধান পর্যন্ত তাঁর সংস্পর্শ ত্যাগ করেননি, তা সত্ত্বেও এ হাদিসটি তাঁর সংগ্রহে ছিল না।

ক.১ মুজতাহিদ সাহাবিগণের কতিপয় মতবৈচিত্র্যের প্রকৃতি

কোনো সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একজন সাহাবির হাদিস জানা ছিল, পক্ষান্তরে অন্য সাহাবির সে বিষয়ের হাদিস হয়তো জানা ছিল না। ফলে সে বিষয়ে তিনি অন্যের কাছে নবির (সা) হাদিস জানার চেষ্টা করতেন কিংবা বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ করতেন। এই ইজতিহাদ কখনও নবির (সা) হাদিসের সাথে মিলে যেত আবার কখনও ভিন্ন হতো। ফলে মতভেদ পরিলক্ষিত হতো। যার ধারাবাহিকতা পরবর্তী স্তরসমূহে চলতে থাকে।

এক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) নারীদেরকে ফরজ গোসলের সময় মাথার চুল খুলে নিতে নির্দেশ দিতেন। এ সংবাদ হযরত আয়শা (রা) এর নিকট পৌঁছলে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন,

فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنّ، أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنّ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم من إناءٍ واحدٍ، ولا أزيد على أن أُفْرِغَ على رأسي ثلاث إفراغات

"ইবন 'আমরের কি হলো ! কেন তিনি গোসলের সময় নারীদের চুল খোলার নির্দেশ দেন? এমন হলে তো তাদেরকে চুল কামিয়ে ফেলতে বললেই হয়। অথচ আমি ও নবি (সা) একই পাত্রে গোসল করতাম। আমি কখনো চুল খুলতাম না, শুধু মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিতাম।"[২৮] ইবন 'আমরের কাছে আয়েশা (রা) এর হাদিসটি পৌঁছেনি। ফলে নারীদেরকে ফরজ গোসলের সময় মাথার চুল খুলে ধৌত করতে হবে কি না সে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী মুজতাহিদগণের মধ্যেও এ মাসআলার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

দুই. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর নিকট এমন একজন নারীর মোহর প্রসংঙ্গে প্রশ্ন করা হয়, যার স্বামী তার মোহর নির্ধারণ কিংবা সান্নিধ্যে গমনের পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। (এখন তার মোহর কোনো হিসেবে আদায় করা হবে?) তিনি বললেন, এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা) এর কোনো ফায়সালা আমার জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো একটা ফয়সালা দেওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এক মাস পরে তিনি (অনন্যোপায় হয়ে) এ বিষয়ে ইজতিহাদ করে এই সমাধান দেন যে,

فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود

ইবন মাসউদ (রা) বলেন, "তাকে মোহর মাসাল (পরিবারস্থ অন্যদের সমপরিমাণ) দেয়া হবে। কমও নয়, বেশিও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে মিরাসেরও অংশীদার হবে।" সেই মজলিসে মা'কিল ইবন সিনান (রা) তখন দাড়িয়ে সাক্ষ্য দেন যে, "রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের এক (বিধবা) মহিলার ব্যাপারে এমন ফয়সালাই করেছিলেন।" ইবন মাসউদ (রা) এ কথা শুনে এমন আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর এমন আনন্দিত কোনো দিন হননি।[২৯] এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী মুজতাহিদগণের মধ্যে দুই ধরনের মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেছেন, সে মোহর মিসাল (পরিবারস্থ অন্যদের সমপরিমাণ) পাবে, অন্যরা বলেন, কিছুই পাবে না। এ মতভেদের কারণ হচ্ছে, উক্ত হাদিসটি প্রমাণিত হওয়া বা না হওয়ার উপর ভিত্তি করে।

ক.২ তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের মতবৈচিত্র্যের ধরন

এক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ওয়াকফ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার (রহ.) ফাতওয়া– কোনো জিনিস ওয়াকফ করার পর সেটা ওয়াকফকারীর উপর আবশ্যিক হয়ে যায় না, বরং যেকোনো সময় ওয়াকফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্য যদি সেটা ওসিয়্যতের পর্যায়ে হয়, যা কাযী কতৃক ফয়সালাকৃত, তখন আর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে না। ইমাম আবু হানিফার এ ফতোয়া ছিল অধিকাংশ ইমামের পরিপন্থি এবং সহিহ হাদিসের বিপরীত। সম্ভবত এ সংক্রান্ত হাদিস তার সংগ্রহে ছিল না। ইমাম আবু ইউসুফও ইমাম আবু হানিফার মতের অনুকূলেই মত ব্যক্ত করতেন। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি হাদিসটি সম্পর্কে অবগত হন এবং মদিনাবাসীদের আমল প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি নিজের মত প্রত্যাহার করে বলেন, "এমন স্পষ্ট ও সহি হাদিসের বিপরীত মত পেশ করার অধিকার কারো নেই। ইমাম আবু হানিফাও এ হাদিস পেলে ভিন্নমত পোষণ করতেন না।"[৩০] ইমাম আব হানিফার (রহ.) মত ব্যক্তিত্ব, যিনি শুধু ফিকহ শাস্ত্রেই নয়; বরং হাদিস শাস্ত্রেও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তার পক্ষেও কোনো কোনো হাদিস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে উক্ত মাসআলায় মতভেদ দেখা দিয়েছে।

দুই. ইমাম মালিক (রহ.)

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াহাব বলেন, একদা ইমাম মালিককে (রহ.) জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ওজুর মধ্যে পায়ের আঙুল খিলাল করার বিধান কি? তিনি বলেন, এটা জরুরী নয়। পরে তাকে বললাম, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট রাসুল (সা.) এর হাদিস রয়েছে। ইবন শাদ্দাদ আল-কারশী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فخلل اصابع رجليه بخنصره "আমি রাসুলুল্লাহকে (সা) ওজুর সময় তাঁর হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা দুই পায়ের অঙ্গুলীর ফাঁকে খিলাল করতে দেখেছি।" ইমাম মালিক (রহ.) বললেন, নিঃসন্দেহে হাদিসটি হাসান। এই হাদিস ইতঃপূর্বে আমি কখনও শুনিনি। ইবন ওয়াহাব বলেন, এরপর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি খিলাল করার নির্দেশ দিতেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে এরপর থেকে তিনি ওযুতে যত্নের সাথে পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করতেন।[৩১]

তিন. ইমাম আহমদ (রহ.)

আলী ইবন মুসা আল হাদ্দাদ বলেন, একবার আমি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ আল-জাওহারী (রহ.) এর সাথে কোনো এক জানাযায় উপস্থিত হলাম। দাফন শেষে জনৈক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখে ইমাম আহমদ (রহ.) বললেন, কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা বিদ'আত। অতঃপর মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ স্বীয় সনদে তাঁকে হাদিস বর্ণনা করেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) তাঁর কবরের পাশে সুরা বাকারার প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করার জন্য অসীয়ত করেছেন। এ কথা শুনে ইমাম আহমদ (রহ.) বললেন, লোকটিকে তিলাওয়াত করতে বলে এসো।[৩২]

খ. বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ হাদিস

বহু হাদিসে বাহ্যিকভাবে একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। অনুসন্ধিৎসু হৃদয়পটে কৌতুহল জাগে, কেন এই বৈসাদৃশ্য? এর রহস্য কী? মূলত এ ধরনের মতবৈচিত্র্যের পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে। কয়েকটি নিম্নরূপ–

খ.১. হাদিস বর্ণনাকারীর বিচক্ষণতা : রাসুলুল্লাহ (সা) এর উপর যখন কোনো বিধান আসতো, তখন সাহাবাগণকে তা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু কোনটা ফরয, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা সুন্নাত, কোনটা মুস্তাহাব তা শিক্ষা দিতেন না; বরং কাজটা কীভাবে করতে হবে তা শেখাতেন। এতে কাজের কোনো অংশের কী গুরুত্ব, সেটা সকলের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হতো না। কেবল সেসব ব্যক্তিত্ব; যারা বিচক্ষণ ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী তারাই অনুধাবন করতে সক্ষম হতেন। ফলে সাধারণ বর্ণনাকারী ও ফকীহ রাবী বর্ণিত হাদিসের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতো। এভাবে একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী হাদিস পরবর্তী স্তরের মুজতাহিদ ইমামগণ পর্যন্ত পৌঁছে এবং কালক্রমে সংকলিত হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত উভয় ধরনের রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহ স্থান পেয়েছে। ফলে প্রাপ্ত হাদিসভিত্তিক ইমামগণের মাঝে মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে।

খ.২. ব্যক্তি বিশেষে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর : কখনও কখনও সাহাবা কিরাম নবিকে (সা.) প্রশ্ন করতেন এবং তিনি সেগুলোর উত্তর দিতেন। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার প্রেক্ষিতে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন জবাব পরিলক্ষিত হতো। পরবর্তী সময়ে সেটাই হাদিসের পারস্পরিক মতভেদের রূপ পরিগ্রহ করছে।

খ.৩. ক্রমবিকাশের ধারায় ইসলামের পূর্ণতা : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই পূর্ণতা ক্রমবিকাশের ধারায় সম্পন্ন হয়েছে। এমনও অনেক সাহাবি ছিলেন যারা ইসলামের প্রথমদিকের বিধান শিখে নিজ দেশে ফিরে গেছেন, তাঁর হয়তো আর নবির (সা) সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়নি। তিনি তার শিক্ষানুপাতে হাদিস প্রচার করেছেন। পরবর্তীকালে ইসলামে যা কিছু সংযোজিত হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শীগণ সে সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন। ফলে উভয় শ্রেণির রাবীর বর্ণিত হাদিসের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

খ.৪. নিজস্ব ইজতিহাদ : সকল হাদিস সব সাহাবি জানতেন না। অপরদিকে ইসলামি খিলাফাত বিস্তার লাভ করায় সাহাবিগণও বিভিন্ন দায়িত্বে ছড়িয়ে ছিলেন সর্বত্র। ফলে কখনও কোনো হাদিস না জানার কারণে সে বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার স্বার্থে বাধ্য হয়েই ইজতিহাদ করেছেন এবং তার শিষ্যগণ তা বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে নবি (সা.) হতে সে বিষয়ে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা সাহাবি প্রদত্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। ফলে দুই রাবীর বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

এ ছাড়াও বিধান রহিত হওয়ার ধারণা না থাকা, হাদিসের প্রেক্ষাপট না জানা, হাদিসের নির্দেশাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট নানা দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থার চাহিদার আলোকে ইজতিহাদ ও ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ কারণে হাদিসের মধ্যে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় সামঞ্জস্যনীতিমালা অনুসরণ করে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হাদিসগুলোর মাঝে সুসমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার প্রয়াস চালাতে হবে। তাই দেখা যায়, ইমাম শাওকানী (রহ.) রচিত *'ইরশাদুল ফুহুল'* গ্রন্থে হাদিসের পারস্পরিক বিরোধের ১৬০টি কারণ উল্লেখ করেছেন এবং সামঞ্জস্য বিধানের নীতিমালার আলোকে বিরোধ মীমাংসার প্রয়াস চালিয়েছেন।

গ. হাদিস বর্ণনাকারীর কোনো হাদিস ভুলে যাওয়া

মুজতাহিদগণের হাদিস ভুলে যাওয়াটা ফিকহী মতভেদের উল্লেযোগ্য একটি কারণ। ফলে কখনো তার কিয়াস হাদিসের সাথে মিলে যায়; আবার কখনো বৈপরীত্ব সৃষ্টি করে। এর দৃষ্টান্ত– একবার হযরত উমারকে (রা) জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, গোসল ফরয হলে পানি না পাওয়া গেলে করণীয় কি? তখন তিনি বলেন, পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। অতঃপর হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কী মনে পড়ে যে, এক অভিযানে আমাদের দুজনেরই গোসল ফরয হয়েছিল। আমরা পানি পাচ্ছিলাম না। আপনি সালাত থেকে বিরত থাকেন। আর আমি মাটির মধ্যে গড়াগড়ি করে সালাত আদায় করি। অতঃপর (মদিনায় ফিরে উল্লিখিত ঘটনা নবিকে (সা) জানালে) তিনি তার দুই হাত মাটিতে স্পর্শ করে চেহারা, এবং দুই হাত মাসাহ করলেন এবং বলেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। উমর (রা) বলেন, হে আম্মার, তুমি আল্লাহকে ভয় কর! সে বলল, আপনি যদি নির্দেশ দেন তবে এই হাদিস অন্য কারো কাছে বর্ণনা করবো না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, সে দায়-দায়িত্ব তোমার নিজের।[৩৩] এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, হযরত উমরের (রা) তায়াম্মুম সংক্রান্ত হাদিস ভুলে যাওয়ার কারণে ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দেন, যা সহি হাদিসের পরিপন্থী হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

ঘ. নিজস্ব ভাষায় হাদিস বর্ণনা

রিওয়ায়াতুল হাদিস বিল মা'না তথা নবি (সা.) এর মুখ নিঃসৃত বাণী হুবহু শব্দে বর্ণনা না করে শুধু ভাবার্থ বর্ণনা করা। ইসলামি আইনবিদগণ এ ধরনের বর্ণনা শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের হাদিসে সাধারণ আলিমদের চোখে তেমন কোনো তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে তাতে গবেষকদের দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভূত হয়। যেমন: হাদিস শরিফে এসেছে, إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "যখন তোমরা ইকামাত শুনবে তখন সালাতে আসবে। তোমরা সালাতে শান্তভাবে আসবে, তাড়াহুড়া করবে না। অতঃপর (ইমামের সাথে) যে কয় রাকাত পাবে পড়ে নিবে। আর যা ছুটে যাবে তা পুরা করে নিবে।"[৩৪] অন্য বর্ণনায় (فأتموا) [পুরা করে নিবে] এর স্থলে (فاقضوا) [কাযা করে নিবে] এসেছে। বাহ্যত উক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য মনে না হলেও মুজতাহিদগণের মধ্যে তা বড় ধরনের মতভেদ সৃষ্টি করেছে।[৩৫]

ঙ. হাদিসের পাঠোদ্ধারে মতপার্থক্য

কোনো একজন ইসলামি আইনবিদ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কোনো হাদিসের একটি অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অন্যজন ভিন্ন অর্থকে অগ্রাধিকার দেন। ফলে সে মাসআলায় মতভেদ দেখা দেয়। যেমন: হাদিস শরিফে এসেছে, (المتبا يعان بالخيار ما لم يتفرقا) "ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছাধীন থাকবে, যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়।"[৩৬] এ হাদিসে (التفرق) 'বিচ্ছিন্ন হওয়া' শব্দটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে দুটি অর্থ হতে পারে। ইমাম শাফিয়ীর (রহ.) মতে, (খিয়ারুল মজলিস) দৈহিকভাবে স্থানগত বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বোঝায়। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে, (খিয়ারুল কবুল) কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনার থেকে বিচ্ছিন্নতাকে বোঝায়। এ হাদিসের পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে ইমামগণের একাধিক ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হওয়ায় 'বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত হওয়া' কিংবা 'চুক্তির পর স্থান ত্যাগ করা' কখন থেকে কার্যকর হবে, তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

চ. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আমল অনুধাবনে মতভেদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি হাদিস হিসেবে গণ্য। সাহাবিগণ তাঁর কথা যেভাবে মান্য করতেন, অনুরূপ তাঁর আমলকেও অবশ্য পালনীয় মনে করতেন। তবে তাদের মধ্যে তাঁর আমলের মর্যাদার মূল্যায়ন, স্বরূপ নির্ণয় ও বিধান রহিত হওয়া নিয়ে মতভিন্নতা ছিল। যেমন: "বিদায় হজ্জে নবি (সা.) এর কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করে কোনো কোনো সাহাবি মনে করেছিলেন, নবিজি 'কিরান' (একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা) হজ্জ পালন করছেন। কেউ ধারণা করেছিলেন, তিনি 'তামাত্তু' (প্রথমে ওমরা পরে ও হজ্জ) হজ্জ আদায় করছেন। আবার কারো দৃষ্টিতে তিনি 'ইফরাদ' (কেবল হজ্জ) হজ্জ পালন করেছেন।[৩৭] এ কারণে সাহাবিগণ থেকে পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ফলে কোনো হজ্জ উত্তম সে ব্যাপারে ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

জ. কোনো হাদিস আমলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ

কোনো একটি হাদিসের সূত্র ও বর্ণনাগত বিভিন্ন পার্থক্য, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে একজন মুজতাহিদের নিকট তা সহি ও আমলযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও অন্য জনের নিকট তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। এই মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট হাদিস থেকে নির্গত মাসআলাগুলোতে মতবৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো-

জ.১ অগ্রহণযোগ্য সনদে হাদিস প্রাপ্ত হওয়া: সাহাবা কিরাম বা পরবর্তী যুগের ইমামদের নিকট কোনো হাদিস পৌঁছার পর হাদিসটি বিশুদ্ধ কি-না এবং আমলের যোগ্য কি-না সে বিষয়ে বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করে নিতেন। এ ছাড়া হাদিস বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা এবং হাদিসের সনদের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উর্ত্তীণ হলেই কেবল তাঁরা আমল করা শুরু করতেন। যেমন: আবু বকর (রা.) এর নিকট 'দাদীর মীরাস' সংক্রান্ত হাদিসটি পৌঁছার সাথে সাথেই সে অনুযায়ী ফায়সালা করেননি বরং তিনি প্রথমে তার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন।[৩৮]

জ.২. ইত্তিসাল সনদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য: কোনো হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে রাবীর (বর্ণনাকারী) বিশ্বস্ততার উপর। সনদের প্রতিটি রাবী যত বিশ্বস্ত ও ধীশক্তিসম্পন্ন হন হাদিসের গুণগতমান ততই উন্নত হয়। কোনো হাদিস বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।[৩৯] এ ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। যথা: ইমাম বুখারীর মতে, যার থেকে হাদিসটি বর্ণিত তার সাথে বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ হতে হবে। ইমাম মুসলিমের মতে, যদি বর্ণনাকারী যার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া জরুরী নয়; একই যুগের হওয়াটাই যথেষ্ট। ফলে ইমাম মুসলিম সংকলিত হাদিসের উপর ভিত্তি করে যেসব ফাতওয়া গবেষণা করা হয়, তাতে ইমাম বুখারীর সাথে মতের ভিন্নতা দেখা দেয়।

জ.৩. মুরসাল হাদিসের বিধানগত ইখতিলাফ: কোনো তাবিঈ কর্তৃক তার ঊর্ধ্বতন সাহাবির নাম উল্লেখ না করে সরাসরি নবির (সা) থেকে বর্ণিত হাদিসকে মুরসাল বলা হয়।[৪০] এ জাতীয় হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারেও ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে, মুরসাল হাদিস দুর্বল হাদিস বলেই বিবেচিত। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানিফাসহ অনেক ফকীহের নিকট হাদিসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য। তবে ইমাম শাফি'য়ী কয়েকটি শর্তে মুরসাল হাদিস গ্রহণ করে থাকেন।[৪১]

জ.৪. হাদিস বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার মাপকাঠির ক্ষেত্রে মতপার্থক্য: হাদিস সহি বলে প্রমাণিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, বর্ণনাকারী (আদিল) বিশ্বস্ত হওয়া। কিন্তু বিশ্বস্ততার মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো বর্ণনাকারীর বিশেষ কোনো দুর্বলতা এক ইমামের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অন্য ইমামের নিকটে হয়নি। ফলে একই বর্ণনাকারী সম্পর্কে কেউ বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেছেন, আর অন্যরা অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

জ.৫. রাবীর স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতার ব্যাপারে মতভেদ: হাদিস বর্ণনাকারীকে পরিপূর্ণ স্মরণ শক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণের অপরিহার্য শর্ত। তবে কেউ হাদিস বর্ণনাকারীর লিখিত সংরক্ষণ ও স্মৃতির সংরক্ষণ উভয়টিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর শর্ত হল, হাদিসটি শোনার সময় থেকে বর্ণনা করা পর্যন্ত বর্ণনাকারীর পূর্ণ স্মরণ থাকতে হবে। মাঝে কখনো ভুলে গিয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ শর্তের প্রেক্ষিতে তার সাথে অন্যান্য ইমামের অসংখ্য হাদিসের ব্যাপারে সহি কিংবা দুর্বল হওয়ার মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

জ.৬. হাদিসের প্রচ্ছন্ন ত্রুটি ('ইল্লাত') প্রসঙ্গে মতপার্থক্য: হাদিসের মধ্যে 'ইল্লাত' বা প্রচ্ছন্ন কোনো দোষ না থাকা হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যক। বাহ্যিক দিক থেকে হাদিসটিকে বিশুদ্ধ মনে হয়, তার রাবীগণও নির্ভরযোগ্য এবং সনদও নিরবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ প্রচ্ছন্ন কোনো ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশেষজ্ঞদেরও কেউ কখনও বিশ্লেষণের অপূর্ণতার কারণে নির্দোষ হাদিসকে মালূল (প্রচ্ছন্ন ত্রুটিযুক্ত) বলে থাকেন। একটি হাদিস যার চোখে মালূল তিনি যেহেতু সে হাদিসকে বিশুদ্ধ মনে করেন না, তাই সে হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী তার কাছে ফিকহী কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয়। কিন্তু অপর একজনের কাছে হাদিসটি ইল্লত মুক্ত। সুতরাং সেটি বিশুদ্ধ এবং তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য এবং সম্পূর্ণ সঠিক।

জ.৭. বিরল (শায) হাদিসের বিধান সম্পর্কে মতভিন্নতা : শায বা বিরল না হওয়া হাদিস সহি হওয়ার জন্য আবশ্যক। কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করে যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিরোধী হয়। এমতাবস্থায় যে হাদিসটির বর্ণনা অপরাপর সহি হাদিসের বর্ণনাসমূহের বিপরীত তাই শায।[৪২] ফকীহগণ কখনো কখনো একটি সহি হাদিসকে তার বিপরীত অনেকগুলো সহি হাদিসের বিপরীত মনে করে সেটাকে গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে মতভেদ করেছেন, যা ফিকহী মতভেদে প্রভাব ফেলে।

তিন. ইজমাকেন্দ্রিক মতপার্থক্যঃ ধরন ও পদ্ধতি

ইজমা' ইসলামি শরিয়তের অন্যতম প্রধান উৎস। "নবি (সা.) এর ইন্তিকালের পর কোনো যুগে শরিয়তের কোনো বিধানের ব্যাপারে উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা' বলে।"[৪৩] কোনো বিষয়ে ইজমা হওয়ার পরে সে বিষয়ে ইখতিলাফ করাটা বৈধ নয়। তবে মদিনাবাসীদের ঐকমত্য ইজমার মর্যাদা রাখে কিনা, আর তা দ্বারা শরঈ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করা যায় কিনা, সে ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক (রহ.) মদিনাবাসীদের ঐকমত্য দ্বারা ইজমা সংঘটনের ব্যাপারে মত দিয়েছেন; তবে অন্যরা এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইমাম মালিকের (রহ.) মতে, 'যাবিল-আরহাম' শ্রেণির আত্মীয়গণ কোনো অবস্থাতেই মীরাসের উত্তরাধিকারী হয় না। তিনি বলেন, "মদিনাবাসী ওলামা কিরাম ইজমা করেছেন যে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, নানা, পিতার বৈপিত্রেয় ভাই, মামা, মায়ের দাদী, আপন ভাইয়ের কন্যা, ফুফু ও খালা আত্মীয়তা সূত্রে উত্তরাধিকারী হবে না।"[৪৪] অন্য ইমামগণ এতে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

চার. কিয়াসকেন্দ্রিক মতানৈক্যঃ ধরন ও প্রকৃতি

কিয়াস ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস। ইসলামকে যুগোপযোগী রাখতে এর ভূমিকা অপরিসীম। "কুরআন-হাদিসে উল্লিখিত কোনো বিষয়ের সাথে এতদুভয়ে উল্লিখিত হয়নি এমন কোনো বিষয়ের কার্যকারণগত সাদৃশ্য থাকার কারণে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিষয়ের বিধানটির অনুরূপ বিধান এতদুভয়ে অনুল্লেখিত বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করাকে কিয়াস বলে।"[৪৫] কিয়াসভিত্তিক মতভেদের ক্ষেত্রে দুটি দিক লক্ষণীয়; প্রথমত, কিয়াসকে যারা শরিয়তের প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন তার সে 'কারণের' ভিত্তিতে সে সব বিষয়কেও কুরআন-হাদিসে প্রদত্ত হুকুমের আওতায় বিবেচনা করেন। আর যারা শরিয়তের প্রমাণের মর্যদা দিতে নারাজ তাদের কথা ভিন্ন। ফলে উভয় দলের মধ্যে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। যেমন: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاده استازاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء "সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করবে (মাপে) সমান সমান ও নগদ নগদ। যদি কেউ এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে তা সুদ, দাতা-গ্রহীতা তাতে সমান পাপী হবেন।"[৪৬]

উল্লিখিত হাদিসের মধ্যে ছয়টি বস্তুর কথা বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর সমজাতীয় বস্তুর লেনদেনের ক্ষেত্রে কমবেশী করাটা সুদ বলে প্রমাণিত। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ হাদিসের বিধান উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? এ ছাড়া উক্ত হাদিসে সুদ হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (কারণ) কী? কেউ বলেছেন 'জিনস' (সমজাতীয়) ও 'মিকদার'

(সমপরিমাণ); কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যরা ভিন্ন মত দিয়েছেন। আর যারা কিয়াসকে শরিয়তের দলিল মানেন না তারা হাদিসের শব্দাবলির বাইরে অন্যবস্তুর ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয় বলে রায় দিয়েছেন।

পাচ. শরিয়তের অন্যান্য মতভেদপূর্ণ দলিলঃ ধরন ও স্বরূপ

ইসলামি শরিয়তের আরো কিছু অমৌলিক উৎস রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে অনেক মাসআলার সমাধান করা হয়েছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ–

ক. আল-ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস): প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীতে প্রতিটি দলিলকে ইসতিহসান বলে। চাই দলিলটি নস হোক, কিংবা ইজমা, অথবা জরুরাত বা প্রচ্ছন্ন কিয়াস।[৪৭] কিয়াসের ইল্লতের (কারণ) কার্যকারিতা বিবেচনায় তা স্থুল কিংবা সূক্ষ্ম হতে পারে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে ইল্লতের প্রভাব বিবেচনায় সূক্ষ্ম কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। যেমন: হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট নাপাক কি না? এটি একটি মতভেদপূর্ণ জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নায় সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে এ মাসআলাটি হিংস্র পশুর ওপর কিয়াস করা হয়েছে। হিংস্র পশুর ন্যায় হিংস্র পাখিরও মাংস হারাম। তদরূপ উভয়ের উচ্ছিষ্টও নাপাক; কেননা উচ্ছিষ্টে লালা মিশ্রিত হয়। আর লালা যেহেতু হারাম মাংস হতে নিঃসৃত তাই তা নাপাক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব মতে, জীবিত-মৃত সকল প্রাণীর হাড় (সকলের মতে) পাক। পাখি চঞ্চু দিয়ে পানাহার করে। চঞ্চু যেহেতু হাড় দ্বারা নির্মিত; ফলে ইসতিহসানের (সূক্ষ্ম কিয়াস) ভিত্তিতে হাড়ের স্পর্শে উচ্ছিষ্ট নাপাক হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ইসতিহসানকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে না।[৪৮]

খ. আল-মাসালিহুল মুরসালাহ: জনসাধারণের এমন কল্যাণ কিংবা ক্ষতিকারক বিষয় যে সম্পর্কে শরিয়াত কল্যাণ বিবেচনায় উৎসাহ কিংবা ক্ষতিকর বিবেচনায় তা বাতিল ঘোষণা করেনি। তবে এগুলো বিবেচনায় নিলে শরিয়তের যে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, এমন বিধানকে আল-মাসালিহুল মুরসালাহ বলে।[৪৯] যেমন: জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে ব্যস্ত সড়কে ট্রাফিক সিগনাল স্থাপন করা। এ আইন লঙ্ঘনকরীর জন্য শাস্তি বিধান করা।

গ. ইসতিসহাবুল হাল: কোনো বিষয়ে বর্তমানকে অতীতের সাথে যুক্ত করে অতীতের বিধান বর্তমানে কার্যকর করাকে ইসতিসহাবুল হাল বলে।[৫০]

ঘ. শার'উ মান কাবলানা: এমন সকল শরিয়াতের বিধানকে বোঝায় যেগুলো রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের পূর্বে যুগে যুগে মহান আল্লাহ তার নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উম্মতদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং তা বিশুদ্ধ সূত্রে অবিকৃত অবস্থায় আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।[৫১]

ঙ. আল-উরফ: ইমামগণ কোনো কোনো বিষয়ের বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত অনেক রীতির ওপর নির্ভর করেছেন; যেগুলো শরিয়াতের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী নয় এবং সে সকল বিষয়ে কুরআন-সুন্নায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই এমন বিধানকে উরফ বলে।[৫২]

চ. সাদ্দুয যারা'ই: মূলগতভাবে বৈধ ও অনুমোদিত; কিন্তু তা যে কোনো অকল্যাণকর ও নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে এমন সকল মাধ্যম রুদ্ধ করে দেওয়াকে সাদ্দুয যারা'ই বলে।[৫৩] উল্লিখিত বিষয়গুলো শরিয়তের প্রমাণ হিসেবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ছয়. মতানৈক্যের শিষ্টাচার: অতীত ও বর্তমান

ক. অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

কুরআন-হাদিসে সরাসরি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি এ ধরনের মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই মূলত ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই মতবৈচিত্র্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কখনও দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা দলাদলি পরিলক্ষিত হয়নি; বরং তাঁরা পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা বজায় রাখতেন। যেমন: একবার ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কবরের নিকট ফজরের সালাত আদায় করেন। সেদিন তিনি ফজর সালাতে দু'আ কুনুত পড়েননি; যদিও তার মতে, এটা আবশ্যক। কারণ তিনি বলেন, এই কবরবাসী ইমাম ফজর সালাতে দু'আ কুনুত পড়তেন না। তাই তার প্রতি সম্মান দেখাতে চাই, আদব রক্ষা করতে চাই।[৫৪] মুজতাহিদ ইমামগণের ইখলাস ও উদারতার মাত্রা এতই উচু স্তরে উন্নিত হয়েছিল যে, যখনই তারা বিশুদ্ধ দলিল পেতেন কিংবা অন্যের যুক্তি হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হতেন তখনই তা প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতেন। এমনকি তারা শিক্ষক হয়েও ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্রের যুক্তি মেনে নিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রান্তিক অনুসারীরা পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার সবক ভুলতে বসেছেন।

খ. কেবল নিজের মতকেই সঠিক না ভাবা

মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইসলামের অমৌলিক বিভিন্ন মাসআলায় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি নিজের মতকে একমাত্র সঠিক এবং অপরেরটা নিশ্চিত ভুল বলে মনে করতেন না। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন যে, তাঁর মতটি তাঁর গবেষণায় দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিক; কিন্তু ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকতে পারে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "আমি কেবল একজন মানুষ। ভুল ও সঠিক উভয়টি করতে পারি। সুতরাং তোমরা আমার মত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। যদি তা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ কর, অন্যথায় তা বর্জন কর।" [৫৫] এভাবে সকল ইমাম তাদের মতামত প্রদানের পরে কুরআন-সুন্নাহর আয়নায় তা যাচাই করে নিতে বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের অনুসারীদের মধ্যে ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ. নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া মতভেদ না করা

জ্ঞান মানুষকে আলোর পথ দেখায়। জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়েই সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয়। পূর্ববর্তী ইমাম মুজতাহিদগণ কোনো বিষয় না জেনে তাড়াহুড়া করে মনগড়া কোনো মত ব্যক্ত করতেন না। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন "যদি আল্লাহ প্রদত্ত ইলম বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো, তবে আমি ফাতওয়া প্রদান করতাম না। কেননা প্রশ্নকারী বিনা পরিশ্রমে উত্তর পেয়ে গেলেও উত্তর প্রদানের দায়ভার আমার ওপরই রয়ে যায়।"[৫৬] অনুরূপভাবে ইমাম মালিককে (রহ.) একবার চল্লিশটি প্রশ্ন করা হয়। তিনি মাত্র চারটির উত্তর প্রদান করেন। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে 'আমি জানি না' বলে জানিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মাসআলার উত্তর দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নেয়, অতঃপর জবাব প্রদান করে।"[৫৭] অনুরূপভাবে সকল ইমাম নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানভিত্তিক সমাধান পেশ করতেন।

ঘ. প্রমাণ পাওয়া গেলে নিজের মত প্রত্যাহার করা

সত্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়। বিভিন্ন গবেষকের গবেষণার ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক; কিন্তু ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ যখনই তাদের মতের বিপরীতে সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো দলিল পেতেন, তখনই তারা প্রসন্নচিত্তে নিজের মত পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে মত ব্যক্ত করতেন।

ঙ. মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ভিন্নপন্থা অনুসরণকারীর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ না করা

ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে গবেষণালব্ধ বিষয়ে পারস্পরিক ভিন্নমত থাকলেও তাদের মতের বিপরীতে প্রমাণের ভিত্তিতে কেউ কোনো আমল করলে তা তারা অপছন্দ করতেন না। ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলেন,"মতভেদপূর্ণ কোনো মাস'আলায় কাউকে তোমরা বিপরীত আমল করতে দেখলে বাধা দিও না।"[৫৮] কারণ ইসলামি শরিয়তের একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে, لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه "মতভেদপূর্ণ কোনো বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে না। কেবল সর্বসম্মত বিষয়ে বাধা প্রদান করা যায়।"[৫৯] অথচ বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ভিন্ন মতের অনুসারীদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ; একে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ-সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতার চিত্র প্রতিভাত হচ্ছে।

চ. ইমামগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইমামগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তাঁদের একে অপরের প্রতি অসম্মান সূচক উক্তির কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। জ্ঞান ও দ্বীনদারীর ব্যাপারে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতেন না; বরং একে অপরের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রশংসা জ্ঞাপন করতেন। ইসলামের সোনালি যুগের মুজতাহিগণের মাঝে এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন: ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রসঙ্গে বলেন, "কেউ যদি ফিকহ শিখতে চায়, সে যেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। ইমাম আবু হানিফার (শিষ্যদের) গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে আমি ফকীহ হতে পেরেছি। যদি আমি তাকে পেতাম তবে সর্বদা তার মজলিসে বসে থাকতাম।"[৬০] তিনি আরো মন্তব্য করেন, "কেউ ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে তাকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর শিষ্যত্ব বরণ করতেই হবে।"[৬১] তিনি আরো বলেন, "আমি ইমাম আবু হানিফার (রহ.) চেয়ে বিজ্ঞ কোনো ফকীহ দেখতে পাইনি।"[৬২] ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (রহ.) সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো কিতাব পৃথিবীতে নেই।"[৬৩] অপরদিকে ইমাম মালিক তার ছাত্র সম্পর্কে বলেন, ইমাম শাফিয়ীর চেয়ে মেধাবী কোনো তরুণ আমার কাছে আসেনি।[৬৪] ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) তার সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে প্রিয় বৎস! ইমাম শাফিয়ী (রহ.) হলেন মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য এবং জগতের জন্য সূর্য সমতুল্য।"[৬৫] তিনি আরো বলেন, "ফিকহের আলোচনায় তার চেয়ে কম ভুল আর কারো নেই।"[৬৬]এভাবে ইসলামের সোনালি যুগের ইমামগণ পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন; যা বর্তমানে বিরল।

ছ. ফাতওয়ার দায়িত্ব অভিজ্ঞ মুফতীদের ওপর অর্পণ করা

ফাতওয়া প্রদান একটি জটিল কাজ। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিজেরা পারত পক্ষে ফাতওয়া দান থেকে বিরত থাকতেন এবং আন্তরিকভাবে কামনা করতেন অন্য কেউ ফাতওয়া দান করুক।

অনেকে মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও অন্যের নিকট ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করতে চাইতেন। মদিনার বিশিষ্ট শায়খ আবু ইসহাক বলেন, "আমি তাবিয়ী যুগের লোকদেরকে দেখতাম যে, যখন তাদের কেউ কোনো মাসআলা নিয়ে আসতো, তখন তারা তাকে এক মজলিস থেকে অন্য মজলিসে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে তাকে মদিনার বিশিষ্ট ফকীহ সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এর নিকট পাঠানো হতো। এটা এ জন্য যে, তারা ফাতওয়া দিতে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে এ জন্য দুঃসাহসী নামে অভিহিত করতেন।"[৬৭] দ্বীনের কোনো মাসআলায় অনর্থক মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। কোথাও ফাতওয়া প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সম্মান, মর্যাদা ও মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বর্তমানে যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ঝ. শর'য়ী দলিল নির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখা

কোনো জনপদে যখন একজন মুজতাহিদ ইমামের মতানুযায়ী আমল প্রচলিত থাকে তথায় তার পরিপন্থী ফাতওয়া প্রচার করা এবং সে আলোকে সাধারণ মানুষদের আমল করতে উৎসাহিত করে উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, তাদেরকে বিভক্ত করা মোটেই সমীচীন নয়। এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, একদা হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম কাজী ইয়ালার (রহ.) নিকট জনৈক ফকীহ এসে হাম্বলী মাযহাব অধ্যয়ন করতে চাইলে তার দেশ সম্পর্কে জানতে চান। অতঃপর তাকে বলেন, তোমার দেশের সকলেই শাফিয়ী ফিকহ অধ্যয়ন করে। তুমি এখানে কেন এসেছো? সে বলল, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই শাফিয়ী মাযহাব ছেড়ে হাম্বলী ফিকহ অধ্যয়নের মনস্থির করেছি। তখন তিনি বলেন,

> "এরূপ করাটা তোমার জন্য সমীচীন নয়। কেননা তুমি যদি তোমার দেশে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হও, আর বাকীরা শাফিয়ী হয়, তবে তুমি এমন কোনো লোককে খুঁজে পাবে না যে তোমার সাথে ইবাদত করবে এবং একসাথে বসে জ্ঞান চর্চা করবে। এমতাবস্থায় তোমার এ কাজ সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করবে। ফলে তোমার দেশে অনুসৃত মাযহাব অনুসরণ করাটাই তোমার জন্য অধিকতর কল্যাণকর।"[৬৮]

বর্তমান সমাজে ভিন্ন মতাবলম্বীরা প্রচলিত আমলের বিপরীতে নিজেদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানোর ফলে সাধারণ জনগোষ্ঠির মাঝে বিভ্রান্তি, সংঘাত ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হচ্ছে।

ফলাফল ও সুপারিশমালা

১. মানুষের মাঝে মতানৈক্য আল্লাহর চিরন্তন বিধান। এ বিরোধ দূর করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে অবশ্যই আমাদের এ বিষয়টি শরয়ী বিধান মোতাবেক প্রশমন নীতি অবলম্বন করতে হবে।

২. আইনবিদগণ কোনো বিরোধপূর্ণ মাসআলায় মতপার্থক্যের সকল দিক বিবেচনায় নেন এবং প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রগণ্য ও সর্বোত্তম দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমল করেন। এ ক্ষেত্রে দলিলের ভিত্তিতে যে আমল কোনো অঞ্চলে প্রচলিত থাকলে সেখানে অন্য কোনো দলিলের ভিত্তিতে ভিন্ন আমল প্রচলনের চেষ্টা শিষ্টাচার বিরোধী কাজ। এমকি এ ধরনের কাজ সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে এবং বিশৃঙ্খলার বীজ উপ্ত হয়। ফলে এ ধরনের কর্ম বর্জনীয়।

৩. ইসলামি আইনশাস্ত্রের প্রশস্ততা ও এর অভিব্যক্তির শক্তি এবং নমনীয়তা যে কোনো মতবিরোধের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ফলে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন কোনো ভাবেই কাম্য নয়।

৪. ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণের গবেষণার ফলাফল ভিন্ন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ ভাষ্য উপলব্ধির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ফলে মতবৈচিত্র্যপূর্ণ যে কোনো মাসআলায় কঠোরতার পথ পরিহার করে নমনীয়তা সূচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা উচিত।

৫. মুজতাহিদ ইমামগণ এবং যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতায় উন্নিত হয়েছেন; তাদের জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক নয়। তাদের গবেষণা লব্ধ মতামত ক্ষেত্র বিশেষ অন্য গবেষকদের মতের বিপরীত হতে পারে। অতএব তাদের গবেষণা শরিয়তের কোনো একটি (নস) ভাষ্য এবং (ইজমা) উম্মাহর ঐকমত্যের বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত তাদের গবেষণা সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

৬. কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতুর রাসুল শরিয়তের মূল উৎস। বাকী সবই ইমামগণের ইজতিহাদ; যা গবেষণার ক্ষেত্র। সেগুলো যদি কুরআন-সুন্নাহ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণীয় নতুবা তা প্রত্যাখ্যাত। তারা যেহেতু বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে আমাদের জন্য দ্বীনকে সহজবোধ্য করেছেন, সেহেতু তাদের প্রতি আমাদের দু'আ, সৌজন্য, কৃতজ্ঞতাবোধ ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

উপসংহার

মতের ঐক্য একটি অসম্ভব বিষয়। কারণ উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে ইখতিলাফ হওয়াটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। কুরআনের শাব্দিক দ্ব্যার্থতা, রূপকার্থে ব্যবহার, প্রয়োগিক প্রচ্ছন্নতা, অর্থের বহুমাত্রিকতা, কিরা'আতের তারতম্য; এছাড়া প্রয়োজনীয় হাদিস সংগ্রহে না থাকা, কোনো হাদিস আমলযোগ্য প্রামাণিত হওয়া বা না হওয়া ও হাদিসসমূহের পারস্পরিক বাহ্যিক বিরোধ এবং ইজমা, কিয়াস ও অন্যান্য শরয়ী দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ইত্যাদি তাদের মতভেদের প্রধান কারণ বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলামের সকল বিধান (কাতঈ) অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে অবতীর্ণ হয়নি; বরং অনেক বিধান রয়েছে, যা (জন্নী) অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক নয়। এর উদ্দেশ্য হলো– দ্বীনকে সহজ করা এবং তা পরিপালনের পথ উন্মুক্ত রাখা। জ্ঞান-গবেষণাকে কেন্দ্র করে মতবৈচিত্র্য আবর্তিত হয়। তাই ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ফিকহের কিছু অমৌলিক বিষয়ে মতবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা গোঁড়ামি স্থান পায়নি বলেই তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল ঈর্ষণীয়। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মুজতাহিদগণের উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মহাবাণী বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনুসারীরা মতভেদ করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিষ্টাচারটুকু রক্ষা করেন না। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতবাদকে কেবল সঠিক, আর অন্যরা ভ্রান্ত আখ্যা দিতে তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় না। কোথাও এ মতভেদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন মতবাদ, বিচ্ছিন্নতা ও উপদল। এ জাতীয় মতভেদের মূলে পরমত অসহিষ্ণুতা, প্রবৃত্তিপ্রীতি, পার্থিব মোহ, অন্ধ অনুসরণ ও সঠিক জ্ঞানের অভাব বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে তা জাতীয়ভাবে হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করছে এবং উম্মাহকে করছে নানা উপদলে বিভক্ত। তাই শতধাবিভক্ত উম্মাহকে পরমতসহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করাটাই এখন সময়ের দাবি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ ফিকহ শব্দটির সম্বন্ধপদ ‘ফিকহী’। কোরাআন হাদিসের যে সকল বিধি-বিধান শরিয়তের মূলনীতির আলোকে প্রবর্তিত হয় তা-ই ফিকহ।

২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৩৯

৩ রাগীব আল-ইস্পাহানী, *মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন*, (দামেস্ক: দারুল কলাম, ১৯৯২), পৃ. ২৯৪

৪ আলী ইবন মুহাম্মদ আলী (মৃ.১৯৮৩খ্রি.), *আত-তা'রীফাত*, খ.১, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, পৃ.১০১; মুফতী আমীমুল ইসান মুজাদ্দেদী আল-বরকতী (মৃ. ১৯৮৬খ্রি.), *আল-কাওয়ায়েদু ফিকহ*, পাকিস্তান: আসাদাফ বিবিলশারায, খ.১, তা.বি, পৃ. ২৮০

৫ ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ*, খ.১, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিকল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮খ্রি., পৃ. ৯২

৬ ড. সালমান আওদাহ, অনু: জোবায়ের আব্দুল্লাহ, *(কাইফা নাখতালিফু) ভিন্নমতের নান্দনিকতা*, ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ২০২২খ্রি., পৃ. ১৬১

৭ *আল-কুরআন*, ৫:২৭-৩০

৮ *আল-কুরআন*, ৩:১০৩

৯ *আল-কুরআন*, ৩:১০৫

১০ *আল-কুরআন*, ২:১৭৬

১১ ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, বৈরূত: দারুল জীল, তা.বি, খ.৮, পৃ. ৬৯৪৭

১২ *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.৩০

১৩ *আল-কুরআন*, ১১:১১৮

১৪ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ قال: نخلة. قال: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين، ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه.

১৫ *আল-কুরআন*, ৫৯:০৫

১৬ ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, বৈরূত:দারু ইবনি কাসীর, ১৯৮৭ খ.৪, পৃ. ১৫১০

১৭ ইমাম আবু আবু দাউদ, *আস-সুনান*, বৈরুত:দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি, খ.১, পৃ. ১৩৩

১৮ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, খ.৫, বৈরূত: দারুল জীল, তা.বি., পৃ. ১৩১

১৯ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর, অনু: অধ্যাপক আখতার ফারুক, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, খ.২, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯০খ্রি., পৃ.৪৪৮

২০ আল-কুরআন, ৫: ৬

২১ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, রিয়াদ: দারু ‘আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ.৩, পৃ.২০৬-৭; ইমাম আবুল ফিদা ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, খ.৩, রিয়াদ: দারুত তায়্যিবাহ, ১৯৯৯খ্রি., পৃ.৫২

২২ আল-কুরআন, ৫: ৬

২৩ নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আস-রারুত তাভীল*, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, পৃ.১৯২

২৪ কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ.১১৩

২৫ আল-কুরআন, ৫: ৩৮

২৬ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলাবী, (*আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ*) অনু.: আবদুস শহীদ নাসিম, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১খ্রি., পৃ.১৪;

ড. আবূ বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার, *বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩খ্রি., পৃ.১০৭

২৭ فقال المغيرة بن شعبة: "حضرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعطاها السدس"، فقال أبو بكر: "هل معكَ غيرك"؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصدّيق) ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুওয়াত্তা মালিক*, তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, খ.২, মিসর: দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা.বি, পৃ.৫১৩

২৮ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.১৭৯

২৯ ইমাম আহমদ ইবন শুয়াইব আন-নাসাঈ, *সুনান আন-নাসাঈ*, তাহকীক: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, খ.৬, সংস্ক.২, আলেপ্প: মাকতাবাতুল মাতবায়াতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬খ্রি., পৃ. ১২১

৩০ ড. আহমাদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৯

৩১ আব্দুর রহমান ইবনু হাতীম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, খ.১, হায়দারাবাদ: মজলিসু দায়িরাতিল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৫২খ্রি., পৃ.৩১-৩২

৩২ ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আল-যাওযিয়্যাহ, *কিতাবুর রূহ*, রিয়াদ: দারু ইবন তাইমিয়্যাহ, ১৯৮৬খ্রি., পৃ.৩১

৩৩ فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا، فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكت في التراب وصلّيت، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر: اتّق الله يا عمّار، قال: إن شئت لم أحدِّث به، وفي رواية أن عمر قال له: نولّيك ما تولّيت [আহমদ আবু নু'আইম, *আল-মুসনাদ আল-মুস্তাখরাজ 'আলা সহীহ মুসলিম*, বৈরূত: দারুকুতুবিল ইলামিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি, খ.১, পৃ.৪০৪]

৩৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৭খ্রি., পৃ.১২৯

৩৫ কোনো মুক্তাদি চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতের চতুর্থ রাকাতে গিয়ে ইমামের সাথে শরিক হন। ইমামের সালাম ফিরানোর পরে ছুটে যাওয়া তিন রাকাত সালাত কিভাবে আদায় করবেন? এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ীর (রহ.) মতে, (فأتموا) 'তোমার অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে নিবে।' এর অর্থ হচ্ছে, মুক্তাদি ইমামের সাথে যে রাকাত আদায় করেছে সেটি ছিল তার প্রথম রাকত। সুতরাং সে দাড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাত থেকে শুরু করবে। ফলে তার সানা পড়তে হবে না। দ্বিতীয় রাকাত শেষে শুধু তাশাহুদ পড়ে দাড়িয়ে পরবর্তী দুই রাকাতে সুরা না মিলিয়ে যথানিয়মে শেষ করবে। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে, (فاقضوا) 'ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো আদায় করে নিবে।' তথা ইমামের সালাম ফিরানোর পরে তিনি দাড়িয়ে যে রাকাত আদায় করবেন তা হবে তার প্রথম রাকাত। ফলে সে সানা পড়বে এবং সূরা মিলিয়ে দুই রাকাত শেষ করবে। শেষ রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়ে যথানিয়মে সালাত শেষ করবে।

৩৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১৭

৩৭ শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৩৮ ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুওয়াত্তা মালিক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫১৩

৩৯ হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি: ১.সূত্র পরম্পরা অক্ষুন্ন থাকা; ২.বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ত হওয়া; ৩.হাদিসটি বর্ণনাকারীর নিখুঁতভাবে স্মরণ থাকা; ৪.হাদীসের সনদ ও মতন (শায) বিরলতা থেকে মুক্ত হওয়া এবং ৫. (মু'আল্লাল) মারাত্মক ধরনের প্রচ্ছন্ন ত্রুটি ও আপত্তিদুষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা। [ড. মাহমুদ আত-ত্বহান, *তাইসীরু মুসতালহুল হাদিস*, দিল্লি: কুতুব খানা ইশাআতে ইসলাম, ১৯৮৫খ্রি., পৃ.৩৫]

৪০ ড. মাহমুদ আত-ত্বহান,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১

৪১ মুরসাল হাদিস গ্রহণের শর্তাবলি: ১.সাহাবীর হাদীসে মুরসাল; ২.অথবা হাদিসটি অনুসূত্রে মুসনাদরুপে বর্ণিত; ৩.হাদিসটির অনুকূলে কোনো সাহাবীর ফতোয়া রয়েছে; ৪.হাদিসটির অনূকূলে অধিকাংশ আলেমের ফতোয়া রয়েছে; ৫. এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তিনি কোনো অবিশ্বস্ত রাবী বা বর্ণনাকারীর ব্যাপারে ইরসাল করেন না। যেমন সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব। [*প্রাগুক্ত*]

৪২ ড. মাহমুদ আত-ত্বহান, *তাইসীরু মুসতালহুল হাদিস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১৮

৪৩ আব্দুল আযীয আলাউদ্দীন আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ.৩, বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৭৮খ্রি., পৃ.৩৩৭

৪৪ ইমাম মালিক, *মুআত্তা*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.৭৯১

৪৫ ড. ইয়াদ ইবনু নামী সুলামী, *উসূলুল ফিকহ আল্লাযী লা ইয়াস'য়াউল ফাকীহা জাহলাহু*, রিয়াদ: তা.বি, পৃ.১০৩

৪৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২৭

৪৭ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর*, খ.৩, বৈরূতঃ দারুল ফিকার, ১৯৯৬খ্রি., পৃ.২৯৫-৯৬

৪৮ ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪৬

৪৯ ইমাম আবু ইসহাক ইব্রাহীম শাতেবী, তাহকীকঃ আবু উবাইদাহ মাশহুর, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ.১, কায়রোঃ তা.বি, পৃ.৩২

৫০ আব্দুর রহীম জামালুদ্দীন ইসনাভী, নিহায়াতুস সুল শারহু মিনহাজিল উসূল, খ.২, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬খ্রি.,পৃ.২৩৮

৫১ ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯৮

৫২ ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭২

৫৩ শিহাবুদ্দীন আহমদ কারাফী, *আল-ফুরূক*, বৈরূতঃ দারুল গরব, তা.বি, খ.৩, পৃ. ৪৫

৫৪ শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, তাহকীকঃ সাইয়িদ সাবিক, কায়রোঃ দারুল কুতুবিল হাদিসাহ, তা.বি, পৃ. ৩৩৫

৫৫ ইবন হাযম, *আল-আহকাম*, কায়রোঃ দারুল হাদিস, ১৪০৪হি., খ,৬, পৃ.৭৯০

৫৬ আবু যাকরিয়া ইয়াহইয়া নবাবী, *আদাবুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুস্তাফী*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৮হি. পৃ.১৬

৫৭ *প্রাগুক্ত*

৫৮ আহমদ আবু নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৫হি., খ.৬, পৃ.৩৬৮

৫৯ হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৩৯২হি., খ.২, পৃ. ২৩

৬০ আব্দুল আযীয আলাউদ্দীন আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার আন উসূলি ফখরিল ইসলাম আল-বাযদাভী*, খ.১, বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৭৪ খ্রি., পৃ.৩০

৬১ খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, খ.১৩, পৃ.৩৪৬

৬২ *প্রাগুক্ত*

৬৩ আব্দুর রহমান ইবন আবিল হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল*, হায়দারাবাদঃ মজলিসু দায়িরাতিল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৫২খ্রি., খ.১, পৃ.১২

৬৪ আব্দুর রহমান ইবন আবিল হাতিম আর-রাযী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৮

৬৫ আবুল কাসিম আলী ইবনুল আসাকীর, *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক*, খ.৫১, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি, পৃ. ৩৪৯

৬৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫০

৬৭ আাবু আমর ইউসুফ ইবনু আবদিল বারর, *জামি'উ বায়নিল ইলম*, খ.২, রিয়াদঃ মুওয়াসসাসাতুর রিয়াদ, ২০০৩খি., পৃ.৩১৭

৬৮ ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসূলিল ফিকহ*, কায়রোঃ মাতবা'তুল মাদানী, তা.বি, পৃ.৪৮৩

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ০১.১১.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

ক্যাথে কোলয়িজের চিত্রকর্মে সহমর্মিতা ও স্মৃতির দৃশ্যায়ন

মোহাম্মদ জাহিদুল হক*

Abstract

Käthe Kollwitz is one of the notable graphic artists of the 20th century. She reflects on her experiences and the passage of time in her prints. Her works represent the fight for human rights and give a picture of war's terrible effects. Most of her prints are characterized by women, children, and death. Her artwork portrays the tragic circumstances that the two world wars in Europe brought about for her. She never lost sight of the suffering she had experienced in the past, and she never shied away from sharing her feelings with others. With great compassion, she portrays the events of her past and the recollections of others close to her. The relevance of the integrated expression of empathy and memory in her work is emphasized in this study using comparative and textual analysis methods. This paper provides an overview of how she portrays universal humanity in her creations.

চাবিশব্দ: অভিব্যক্তিবাদ, ছাপচিত্র, দৃশ্যশিল্প, মাতৃত্ববাদ, সহমর্মিতা, স্মৃতি, সামাজিক অবিচার, মৃত্যু

ভূমিকা

জার্মান অভিব্যক্তিবাদী চিত্রশিল্পী ক্যাথে কোলয়িজ (১৮৬৭-১৯৪৫) ইউরোপের দুটি বিশ্বযুদ্ধের বেদনার্ত সাক্ষী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জ্যেষ্ঠপুত্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তার পৌত্র রণাঙ্গণে মৃত্যুবরণ করে; দুজনেরই নাম পিটার কোলয়িজ। তথাপি এই শিল্পীর শিল্পকর্ম কেবল ব্যক্তিগত মর্মবেদনার মর্সিয়া না হয়ে বরং সামগ্রিক সহমর্মিতার স্মারক হয়ে ওঠে। শিল্পকর্মের অভিব্যক্তি বিষয়ে তিনি সর্বদা তার সময় ও নিজের কাছে সৎ ছিলেন।[১] জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা, বিশেষকরে নারীদের জীবনকে তিনি তার শিল্পকর্মের মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার সাধারণ মানুষের জীবনে, বিশেষকরে নারীদের জীবনে কি ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনে তার এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ক্যাথে কোলয়িজের চিত্রকর্ম। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, হতাশা আর মৃত্যু তার চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ক্যাথে চিত্রায়ন, অঙ্কন, ভাস্কর্য এবং ছাপচিত্রসহ দৃশ্যশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন। তবে তার বেশিরভাগ কাজ ছাপচিত্র মাধ্যমে করা। তিনি জার্মানির একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সফল ছাপচিত্র শিল্পী। পদ্ধতিগত দিক বিবেচনায় ছাপচিত্র শিল্পকলার সর্বাধিক গণতান্ত্রিক মাধ্যম।[২] এই পদ্ধতিতে মূল শিল্পকর্মটি তুলনামূলক অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছাপচিত্র শিল্পীকে Graphic Historian of Society বলা হয়ে থাকে।[৩] একজন *সমাজ বাস্তবতাবাদী*[৪] শিল্পী হিসেবে তিনি দৃশ্যপটের অমানিশা ও মুখাবয়বের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার সময়কার মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেন। সুদৃঢ় রেখা এবং বর্ণের চরম বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তিনি অসহনীয় সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের যাপিত জীবনের করুণ ইতিহাস বর্ণনা করেন। 'সহমর্মিতা' ও 'স্মৃতি' এই দুটি দিক ক্যাথে কোলয়িজের কাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রবন্ধে মূলত ক্যাথে কোলয়িজের শিল্পকর্মে প্রতিফলিত সহমর্মিতা ও স্মৃতির তাৎপর্যের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

সহমর্মিতা

সহমর্মিতা (Empathy) শব্দটি উনিশ শতকে প্রচলিত জার্মান শব্দ 'Einfühlung' থেকে বিকাশ লাভ করে, যার শাব্দিক অর্থ 'feeling into'।[৫] শুরুর দিকে শিল্পতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে 'Einfühlung' ধারণাটিকে প্রায়শই শিল্পকর্মের গড়ন, শৈলী, বর্ণনা কিংবা মূলভাবকে অনুধাবনের একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হত। বর্তমানে সহমর্মিতা (Empathy) শব্দটি কোন শিল্পবস্তুর চেয়ে বরং অপরের আবেগ অনুভূতির সাথে আরো গভীরভাবে একাত্ম হওয়ার ভাবকে প্রকাশ করে। সমাজের যেসকল বিষয় মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সহমর্মিতা সেসব অতিক্রম করে সবাইকে একীভূত হতে সাহায্য করে। যে সার্বজনীন জীবনবোধের মধ্যে আমরা সম্মিলিতভাবে বসবাস করি তা কখনো কখনো আমাদের মধ্যকার আপাত অমিলগুলোর নিচে চাপা পড়ে যায়। সহমর্মিতা আমাদের জীবনের সেই চাপা পড়া দিকটিই উদ্ভাসিত করে।[৬] সহমর্মিতা অপরিহার্যভাবে 'অপরের তরে' অনুভবটিকে ধারণ করে, যা অপরের প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করে আত্মস্থ করতে হয়। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় সহমর্মিতা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধির মনোভাব তৈরি করতে সাহায্য করে।[৭] সহমর্মিতা ব্যক্তিগত সংকটগুলোকেই কেবল বড় করে দেখার প্রবণতা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। ফলশ্রুতিতে একজনের আত্মঘাতী বা প্রতিশোধ প্রবণ হওয়ার সম্ভবনা কমে যায়। দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসে মানবিক বিপর্যয়কে বিষয়বস্তু করে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে। যেসকল শিল্পী কারিগরি মুন্সিয়ানা প্রদর্শনের প্রবণতাকে পাশ কাটিয়ে প্রকৃত অর্থেই সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবি পৃথিবীবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে জার্মান অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী ক্যাথে কোলয়িজ অগ্রগণ্য। তার শিল্পকর্ম মানুষের প্রতি দরদ আর সহমর্মিতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ক্যাথে কোলয়িজ পারিবারিকভাবে ধর্ম, দর্শন ও বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তার একটি পরিসরের মধ্যে বেড়ে ওঠেন, যা তার শিল্পীজীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।[৮] ব্যক্তিগত ব্যথা-বিরহের উর্ধ্বে উঠে পরম সমব্যথী হয়ে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেন। সকলের দুঃখ-যাতনা দরদ দিয়ে অনুধাবনের বোধ ক্যাথে কোলয়িজের কাজে প্রচন্ড রকম অর্থবহ হয়ে ওঠে। এই বিশেষ দিকটি ব্যতিরেকে তার কাজের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করা অসম্ভব। জার্মান শব্দ *Mitleid*[৯] এর প্রকৃত অভিব্যক্তি ক্যাথে কোলয়িজের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ক্যাথের শিল্পকর্ম তার আশেপাশের মানুষের দুঃখ-দুদর্শা, আন্দোলন-সংগ্রাম আর হাসি-কান্নার এক ঐতিহাসিক বিবরণ। তিনি তার আপন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেসকল মানুষের স্বজন হারানোর শোক, ভয়-ব্যথা-ভোগান্তি, তাদের মর্মবেদনা, এমনকি তাদের শক্তি-সাহসের জায়গাটিও বুঝতে পারতেন।[১০] প্রতিটি মানুষ ইতিহাসের যে কালপর্বে বেঁচে থাকে সেই সময়কার ঘটনাপ্রবাহ তাদের জীবন এবং কর্মপরিকল্পনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ঐতিহাসিক কারণেই ইউরোপের দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের জীবনে এর ভয়াবহ পরিণতি ক্যাথে কোলয়িজের শিল্পভাবনার মূল বিষয় হয়ে ওঠে। এরকম সংকটপূর্ণ সময়ে একজন শিল্পীর যে সামাজিক দায় থাকে ক্যাথে তা এড়িয়ে যাননি।

ক্যাথে কোলয়িজ তার কালে নারীদের অধিকারের পক্ষে এক দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। নারীদের এজেন্সি হিসেবে তিনি মাতৃত্বের প্রতিরূপ বার বার সামনে তুলে আনেন। Weimar Republic এর সময় নারীবাদী আন্দোলনকারীরা মাতৃত্ব এবং নারীদের যৌনতার মত একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে জনপরিসরের মধ্যে আলোচনায় নিয়ে আসে। "Women of the period used the issues

around maternity to stage a genuine intervention into popular political arguments of the day."[১১] কী প্রকাশযোগ্য আর কী প্রকাশযোগ্য না কিংবা নারী ও পুরুষ, কার কী দায়িত্ব এই সংক্রান্ত সামাজিক বিধি-বিধানগুলো যখন ধারাবাহিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হচ্ছিল, তখন এই *মাতৃত্ববাদ (Maternalism)*[১২] গৃহস্থালি পরিবেশের বাইরে নারীর অবস্থানকে ন্যায্যতা প্রদান করে। মায়েদের সমস্যাগুলো মায়েদের নিজেদের মুখে উচ্চারিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। Weimar সময়কালে পুরুষ শিল্পীরা যেখানে ধারাবাহিকভাবে মা ও শিশুর এক কাল্পনিক আদর্শবাদী ও প্রশান্ত রূপ চিত্রিত করে যাচ্ছেন সেখানে নারী শিল্পীরা মায়েদের নানাবিধ সংকট মানুষের সামনে তুলে ধরেন। মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক জীবনের জন্য তাদের লড়াইয়ের দৃশ্যও তাতে ফুটে উঠছে। ক্যাথে কোলয়িজের মত ঐ সময়কার নারীশিল্পীদের জন্য মাতৃত্বের ইমেজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য অর্জনের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ক্যাথে কোলয়িজের শিল্পী জীবনের শুরুর দিককার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ছাপচিত্র সিরিজ *Peasants' War* ও *A Weavers' Rebellion*। এই সিরিজদুটিতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সংগ্রামের কাহিনি ফুটে উঠেছে। *Peasants' War* সিরিজটি ১৫২৫ সালের মহান কৃষক বিদ্রোহের ঘটনাবলির আলোকে রচিত। মধ্য ইউরোপের জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে এই গণআন্দোলন সংঘটিত হয়। শাসক শ্রেণীর নির্মম দমননীতির ফলে আন্দোলনটি ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রায় একলাখ কৃষক এতে প্রাণ হারায়। Zigrosser মতে, ক্যাথে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবরণ Wilhelm Zimmermann এবং August Bebel এর গবেষণা গ্রন্থ থেকে পেয়েছেন।[১৩] *Peasants' War* সিরিজের *Battle Field* (চিত্র-০১) শিরোনামের কাজটিতে দেখা যায় একজন বৃদ্ধ মা লাশের স্তুপ থেকে তার মৃত সন্তানকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধা কম্পমান হাতে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় এক নিহত তরুণের চিবুক ধরে মুখটা দেখার চেষ্টা করছেন অথবা গোটা দুনিয়াকে দেখানোর চেষ্টা করছেন। আলো-আধারের তীব্র বৈপরীত্য ক্যাথে কোলয়িজের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার বেশিরভাগ কাজ বর্ণহীন; ধূসর। Battle Field কাজটিতে তমসাচ্ছন্ন দৃশ্যপটের মাঝে বৃদ্ধার হাত ও মৃতদের একজনের মুখে আলোক প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। শিল্পী আনুপুঙ্খিক চিত্রায়নরীতি বাদ দিয়ে কেবল বৃদ্ধার হাত ও মৃতের মুখে আলোছায়ার বৈপরীত্য আরো প্রকট করে দর্শকের চোখে তা স্পষ্ট করে তোলেন। চিত্রটিতে শক্তিশালী কালো রেখার মাধ্যমে আরো কিছু অবয়বের উপস্থিতি দৃশ্যমান করে ধূসর দৃশ্যপটের সমতলধর্মীতা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। মৃতের স্তুপের মধ্যে এই ক্ষীণ আলোয় শোকের অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসা মায়ের চোখে প্রতিটি নিহত তরুণের মুখই তার নিজের ছেলের মুখের মতো। ক্যাথে তার চিত্রে সর্বদা এক সার্বজনীন মাতৃরূপের উপস্থাপন করেন। তিনি এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, প্রতিটি জনপদের প্রতিটি মা-ই তার মতো একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। 'নিজের' আর 'পরের', এই ভেদাভেদ তিনি তার স্বীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই অতিক্রম করে যান।

চিত্র-১
Battle Field
1907
Sheet 6 of the cycle *Peasants' War*
Käthe Kollwitz Museum Köln

জার্মান শিল্পতাত্ত্বিক Julius Elias-এর শিক্ষা তাকে ঘটনাসমূহের রূপকাশ্রয়ী উপস্থাপনের পথ পরিহার করে নির্মম-কঠোর প্রকৃত সত্য উপস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে।[১৪] বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় দৃশ্যশিল্পের জগতে চলমান অভিব্যক্তিবাদী (Expressionism) শিল্প আন্দোলন ও সেই সাথে বিকাশমান মনোবিশ্লেষণের ধারা ক্যাথের কাজের প্রকাশভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। উনিশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পকলা মূলত উপরি বাস্তবতার এক রোমান্টিক জগতের মধ্যেই তার বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখে, অপরদিকে অভিব্যক্তিবাদের আবেদন মানুষের মরমী বোধের নিকট প্রকাশিত।[১৫] বস্তুগত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অভিব্যক্তিবাদ মানুষের অন্তর্গত আবেগ-অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করে। ক্যাথে কোলয়িজের চিত্রকর্মের অবয়বধর্মী প্রকাশ এবং সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলির দৃশ্যায়ন তৎকালীন বিমূর্ত শিল্পধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু তার শিল্পচর্চা যন্ত্রবৎ বাস্তবধর্মীতার ঘেরাটোপেও বন্দি হয়ে যায়নি। তিনি শিল্পের বিষয়বস্তু এবং গড়নগত নিরীক্ষার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটান। তার শিল্পকর্ম হৃদয়বৃত্তিক অনুভূতির এক সাবলীল বহিঃপ্রকাশ।

ক্যাথে কোলয়িজের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের পুরোটা জুড়ে ছিল মৃত্যু– বিশেষকরে শিশুমৃত্যু ও শোকাতুর মা। ক্যাথে পুত্রশোককে উপজীব্য করে যে কয়টি চিত্র রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি কাজ *The Downtrodden* ও *Woman with Dead Child*। *The Downtrodden* (চিত্র-২) কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি মূলত ম্যারী ও যিশুর মহাআখ্যানের মাঝে জগতের নিপীড়িত ও দলিত মানুষের বেদনার চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। খ্রিষ্টীয় দৃশ্যশিল্পের ঐতিহ্যে যিশুর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে শোক প্রকাশের যে কয়েকটি প্রকাশভঙ্গি প্রচলিত আছে Stabat Mater তার মধ্যে একটি, যেখানে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পাশে ম্যারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। *The Downtrodden* কাজটির সাথে প্রাক-রেঁনেসা যুগের ভাস্কর Niccolò dell'Arca'র *Lamentation over the Dead Christ* ভাস্কর্যটির সাদৃশ্য বিদ্যমান। যদিও Arca'র কাজে আবেগের অত্যাধিক নাটকীয় বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ক্যাথে বরং এক্ষেত্রে এমন দৃশ্যের অবতারণা করেন যেখানে সন্তানহারা মায়ের বুকভাঙ্গা হাহাকারের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়, যে মা নিজ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর মত শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। এই কাজটির সীমাবদ্ধতা হল এর রূপকধর্মী প্রকাশ, যেখানে ম্যারী প্রথাগত দৃশ্যায়নের সীমা অতিক্রম করতে পারলেও যিশুর দৃশ্যায়ন খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের বাইরে বেরুতে পারেনি। এই চিত্রকর্মটিতেও আলো-আঁধারির চরম

বৈপরীত্য ফুটে ওঠে। পশ্চাৎপট সমতল। অবয়বগুলো চিত্রায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতাবাদী চিত্ররীতির অনুসরণ পরিলক্ষিত হয় যা তার বেশিরভাগ কাজে অনুপস্থিত। শক্তিশালী রেখা যা ক্যাথের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এর বদলে রঙের মাত্রাবিন্যাসের মাধ্যমে অবয়বগুলোর ত্রিমাত্রিক গড়নকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চিত্রপটের সবগুলো অবয়বে একইরকম আনুপুঙ্খিকতা উপস্থিত।

চিত্র-২
The Downtrodden
1901
Käthe Kollwitz Museum Köln

ক্যাথে কোলয়িজ *The Downtrodden* কাজটির মধ্য দিয়ে তার *A Weavers' Rebellion* সিরিজটি সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পতাত্ত্বিক Julius Elias, যে প্রথম তার কাজের সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তার পরামর্শে তিনি এই কাজটি সিরিজ থেকে বাদ দেন । Julius এর মতে এই কাজটির ধর্মনির্ভর রূপকাশ্রয়ী উপস্থাপন, ক্যাথের কাজের মধ্যে যাপিত জীবনের মর্ম-বেদনার যে অকৃত্রিম প্রতিফলন তার সাথে সূত্রবদ্ধ করা যায় না।[১৬] ক্যাথে পরবর্তী কাজগুলোতে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠেন। মর্ম-বেদনার প্রকৃত স্বরূপ, আশেপাশের মানুষ ও স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এই শিল্পীর কাজের মধ্যে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। *Woman with Dead Child* (চিত্র-৩) চিত্রকর্মটি সন্তানহারা মায়ের বুকভাঙ্গা আর্তনাদের এক অভূতপূর্ব দৃশ্যায়ন– ক্যাথে কোলয়িজ তার জীবদ্দশায় যত কাজ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী অভিব্যক্তি।[১৭] ১৯০৩ সালের দিকে তার চিত্রকর্মের বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। পূর্বেকার বর্ণনামূলক বিন্যাসের বদলে ক্যানভাস জুড়ে বৃহত্তর পরিসরে একীভূত দৃশ্যায়নের আবির্ভাব ঘটে। নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে *Woman with Dead Child* কাজটি– যার কয়েকটি সংস্করণ ক্যাথে কোলয়িজের নিজের ভাষায় *Pieta*[১৮], একটি যথার্থ পরিণতি লাভ করে। ওয়াশিংটনের জাতীয় শিল্পকলা গ্যালারীতে সংরক্ষিত *Pieta (*1903*)*-শীর্ষক কাজটিতে একজন মা তার মৃত সন্তানের লাশ পরম মমতায় আগলে রাখার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। ক্যাথে কোলয়িজের চিত্রভাবনা শোকাহত মাতৃমূর্তির প্রতি নিবিষ্ট থাকার পিছনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বাস্তবতা দুটোই কাজ করেছে। তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউকেউ ধারণা করেন শিল্পীর *Woman with Dead Child* সিরিজটির পিছনে স্বীয়পুত্র ও পৌত্রের মৃত্যুর দুঃখবোধ কাজ করেছে।[১৯] বাস্তবিক পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা লাভের বহুপূর্বেই ১৯০৩ সালে তিনি *Woman with Dead Child* সিরিজের সবচেয়ে

সংবেদনশীল চিত্রটি (চিত্র-৩) রচনা করেন। এই চিত্র রচনার জন্য তিনি নিজেকে এবং তার জ্যেষ্ঠপুত্র পিটারকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেন, পরবর্তীতে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয়। এই রহস্যময় চিত্রটি অদ্ভুতভাবে পিটারের মৃত্যুর পূর্বাভাস হয়ে থাকবে। চিত্রকর্মটিতে ধূসর দৃশ্যপটে শক্তিশালী গতিশীল রেখার মাধ্যমে তিনি অবয়বের অনুপুঙ্খ ছবি ফুটিয়ে তুলেন। অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট রচনা বিন্যাসে মায়ের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তিনি এক অসহনীয় যন্ত্রনার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলেন। একজন মা– আদিম এবং জান্তব, নগ্ন, সুদৃঢ় উরু আর বাহুর বন্ধনে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছেন তার হারানো খোকাকে। তার চোখ, অধর ও নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তিনি যেন তাকে আবার জীবন্ত করে তুলতে চাইছে। এই চিত্রটি এমন এক অসহনীয় যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি যা তার পারিপার্শ্বের প্রতিটি মা-ই নিজের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছে।[২০]

চিত্র-৩
Woman with Dead Child
1903
Private collection

Woman with Dead Child (Pieta) শীর্ষক চিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি আবার ম্যারী ও যিশুর লোকায়ত খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যান, তবে প্রথাগত দৃশ্যায়নের মাধ্যমে নয়। মাইকেঞ্জেলোর *Pieta* যে স্বর্গীয় দুঃখবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তার বিপরীতে ক্যাথে এক পার্থিব মাকে উপস্থাপন করেন, যে সন্তান হারানোর দুঃখে *উঠানে ধানের সাথে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদে*[২১]। "Her silent lines penetrate the marrow like a cry of pain; such a cry was never heard among the Greeks and Romans."[২২] একজন শিল্পীর রঙ ও রেখা মানুষের প্রতি কতটা দরদী হয়ে উঠতে পারে ক্যাথে কোলয়িজের শিল্পকর্ম দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খ্রিষ্টীয় দৃশ্যশিল্পের ঐতিহ্যে যে *Pieta* ভাস্কর্য আমরা দেখি এরকম কোন ঘটনার বর্ণনা বাইবেলে নেই। শুরু থেকেই মানুষ তার নিজের দুঃখবোধের মাঝে ম্যারীর দুঃখকে একাত্ম করে নেয়। পরবর্তীতে গির্জার কঠোর প্রতিমাশাস্ত্র মেনে রচিত *Pieta* এক অপার্থিব দুঃখের ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে লোকমানুষের ব্যথা-বেদনার নিজস্ব বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্যাথে কোলয়িজ সেই ভাঙ্গাসেতু পুনর্নির্মাণ করেন। দুঃশাসন মহাভারতের একটি চরিত্র থেকে যেমন করে একটি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে, ক্যাথে তার কাজের মধ্য দিয়ে ঠিক বিপরীতভাবে ম্যারী ও যিশুকে কেবল বাইবেলের চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পৃথিবীর সকল সন্তানহারা মা ও অত্যাচারে-নিপীড়নে হৃতপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধি করে তোলেন।

ক্যাথে কোলয়িজের *War (1922-23)* ছাপচিত্র সিরিজের *The Parents* (চিত্র-৪) চিত্রকর্মটিতে ব্যথিত মাতাপিতার যুগল মূর্তির উপস্থাপন দেখা যায়। ক্যাথে কোলয়িজের প্রায় সবকটি চিত্রকর্মের প্রধান বিষয়বস্তু নারীদের দুঃখ-যাতনার দৃশ্যায়ন হলেও তিনি এটা ভুলে যান না যে সন্তান হারানোর শোক পিতাকেও কাতর করে। পুরুষতান্ত্রিক দুনিয়ায় যাদের দুঃখ লুকানোর স্বভাব তাদেরকে তিনি বুকভরে কাঁদতে শেখান। সমাজ যেখানে প্রতিনিয়ত এক কঠোর পুরুষমূর্তি নির্মাণ করতে সচেষ্ট, ক্যাথে সেখানে বাৎসল্যবোধে বিগলিত এক পিতৃমূর্তি আমাদের সামনে হাজির করেন। নৃশংসতার দৃশ্য চিত্রায়নের প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে যুদ্ধ পরিবারের প্রতিটি মানুষের হৃদয়বৃত্তিক অনুভূতিগুলোকে কি ভয়ানক রকম আহত করে তার ছবি ক্যাথে সবার সামনে তুলে ধরেন। হাত এবং মুখাবয়ব– যা তার চিত্রকর্মে প্রায়শই স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে প্রলম্বিতভাবে উপস্থাপিত হয়, তার অভিব্যক্তি প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।[২৩] কাঠখোদাই মাধ্যমে করা এই চিত্রটিতে ক্যাথে প্রায় দ্বিমাত্রিকভাবে অবয়বগুলোকে উপস্থাপন করেন। পশ্চাৎপটে নিরেট শূণ্যতা তৈরি করে একীভূত বিন্যাসে তিনি মাতা-পিতাকে হাজির করেন। ভঙ্গুর রেখা আর আলোছায়ার বৈপরীত্যের মাধ্যমে তিনি অবয়বগুলোকে স্পষ্ট করে তোলেন। মাতাপিতার এই যুগল মূর্তি নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরেই কাজ করে আসছিলেন। এই অভিব্যক্তিটি কেবল তার চিত্রকর্মের বিষয় ছিলনা। তিনি তার মৃতপুত্র পিটারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন কাজটি তার একটি প্রাক-পরিকল্পনা।[২৪] পরবর্তীতে ১৯৩২ সালে তিনি ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। ভাস্কর্যটি কেবল শিল্পীর স্বীয় পুত্রের স্মৃতিস্মারক না হয়ে বরং সকল মৃত সন্তানের স্মৃতির ধারক হয়ে ওঠে।

চিত্র-৪
The Parents
1921/1922
Sheet 3 of the series *War*
Käthe Kollwitz Museum Köln

ক্যাথে কোলয়িজ কখনোই ভূদৃশ্য কিংবা ভিনগ্রহের কোন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেননি। তার শিল্পকর্মের মূল বিষয় ছিল মানবতা। তার সময়কার আভাগার্ড শিল্পের মূল প্রবণতার বিপরীতে কেবল এবং কেবলমাত্র মানুষই ক্যাথে কোলয়িজের শিল্পকর্মের কেন্দ্রীয় ও প্রধানতম বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিমূর্তায়ন বা কোলাজের মাধ্যমে তিনি তার চিত্রের গড়নে কোন বিকৃতি ঘটাননি কিংবা ভাঙচুর করেননি।[২৫] আজীবন তিনি মানব অবয়বকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেন– যাতে আমরা সহজেই পরস্পরকে চিনতে পারি ও একে অন্যের মর্মবেদনা অনুধাবন করতে পারি। তার নিজের ভাষ্যে, "... surely, true art, which is simple, will please him (the spectator). I firmly believe that there must be an understanding between the artist and the people; this has always been so in times when art was great."[২৬]

স্মৃতি

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ক্যাথে কোলয়িজের আঠারো বছর বয়সী তরুণ পুত্র পিটার নিহত হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি নিহত স্বেচ্ছাসেবকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ শুরু করেন। নানা ভাঙ্গা-গড়ার পর ১৯৩২ সালে কাজটি সম্পন্ন হয় (চিত্র-৫)। Dixmuiden এর নিকটবর্তী Soldiers' Cemetery of Eessen-Roggeveld তে ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়। পূর্ণাবয়বে নির্মিত বাবা-মা, বাস্তবিক ক্যাথের নিজের এবং তার স্বামীর আত্মপ্রতিকৃতি।[২৭] গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সকল মৃত পুত্রের কবরের পাশে মুহ্যমান হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। অবয়ব ও পোশাকের আনুপুঙ্খিকতা বাদ দিয়ে সরলীকৃত অবয়বের মাধ্যমে বাবা-মায়ের হৃদয়ের গভীর অনুভবটুকুই কেবল এই ভাস্কর্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি এক সার্বজনীন মাতাপিতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আর তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন একজন জনমদুঃখী মায়ের প্রতিরূপ। দীর্ঘ সতের বছর ক্যাথে এই ভাস্কর্যটি নির্মাণের পিছনে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ক্যাথে অপঘাতে-অত্যাচারে মৃত মানুষের কথা স্মরণ রাখেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন। অত্যাচারীর স্মারক ভাস্কর্য আর হৃতসর্বস্বের স্মৃতির মাঝে এভাবেই তিনি শনাক্তকরণ রেখা টেনে দেন।

George স্মৃতিকে ভাস্কর্যের অপরিহার্য চৌদ্দটি উপদানের একটি হিসেবে শনাক্ত করেন।[২৮] ভাস্কর্য শিল্পীরা স্মৃতি এবং অপরাপর উপাদানের বিভিন্ন প্রেক্ষিত তাদের শিল্পকর্মে সন্নিবেশিত করে অতীত অভিজ্ঞতার অনুভবটুকু জিইয়ে রাখেন। ভাস্কর্যের অন্যান্য উপদানগুলো যেখানে বস্তুর ভৌতগুণের সাথে সম্পর্কিত, স্মৃতি সেখানে একান্তই ব্যক্তির নিজস্ব অনুভবের বিষয়। স্মৃতি এমনই এক বাস্তবতা যা আমাদের স্পর্শের সীমার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। কোন শিল্পীর পক্ষেই মৌলিকভাবে স্মৃতিকে দৃশ্যায়িত করা সম্ভব নয়। একজন প্রকৃত শিল্পী কেবল এমন দৃশ্য বা বস্তু মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন যা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবে এমন কিছু যা তার মনে রাখা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি তাকে তা ভুলিয়ে দিয়েছে।

চিত্র-৫
Grieving Parents
1932
Soldiers' Cemetery of
Eessen-Roggeveld

'নির্বাচিত স্মৃতি'– যা কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় টিকে থাকে, তার বিপরীতে 'সার্বজনীন স্মৃতি'র এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ক্যাথে কোলয়িজের কাজ। ইতিহাসের প্রাতিষ্ঠানিক (Official) বয়ানের বাইরে জনমানুষের মাঝে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য এবং স্মৃতি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। প্রচলিত ইতিহাসে গণমানুষকে যেভাবে ঘটনাবলির ভুক্তভোগী কিংবা উপকারভোগী হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তার সাথে সাধারণের নিজস্ব ভাষ্য সর্বদা খাপ খায় না। সাধারণ মানুষ উপকথা, লোককথা, লোকগাথা কিংবা কারুকাজের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার রূপকাশ্রয়ী কিংবা প্রকৃত বিরবণ সংরক্ষণ করে। সেগুলো মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মধ্যে বিস্তৃত হয়। এসব লোকসাহিত্য, সংরক্ষিত নথিপত্র, বিভিন্ন শিল্পনিদর্শন ও অতীতের পর্যায়ক্রমিক ধারাবিররণী এমন সব প্রমাণ হাজির করতে পারে যা ইতিহাসের প্রাতিষ্ঠানিক ধারাভাষ্যের মধ্যে ইচ্ছে করেই ভুলে যাওয়া হয়েছে। Maria Paula Nascimento Araújo এবং Myrian Sepúlveda dos Santos মতে– গণহত্যা, একনায়কতন্ত্র ও নিপীড়নের মত বিষয়গুলো বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে মৌখিক ইতিহাস, নারীদের ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।[২৯] যুদ্ধের ইতিহাসের অধিকাংশ বিবৃতি পুরুষদের দেওয়া, যেখানে মূলত তাদের বন্দিদশা ও প্রতিরোধের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধের মত অসহনীয় পরিবেশে নারীদের অভিজ্ঞতা কেমন হতে পারে তা সবার দৃষ্টিগোচরে আনার উপায় হল মৌখিক ইতিহাস ও নারীদের নিজস্ব ইতিহাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন। ক্যাথে কোলয়িজ সেই কাজ অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গেছেন। তার *War* সিরিজের *The Sacrifice, The Volunteers, The Parents, The Widow I, The Widow*

II, *The Mothers* এবং *The People* ছাপচিত্রগুলোতে সাধারণ মানুষের– বিশেষ করে নারীদের আত্মত্যাগ, বৈধব্য ও স্বজন হারানোর হাহাকারের এক করুণ দৃশ্যায়ন ঘটে। যুদ্ধের ঘটনাবলির উপর তখন Ludwig Meidner, Max Pechstein এবং Otto Dix মত শিল্পীরাও কাজ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের চিত্রের মূল বিষয় ছিল যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ। বিপরীতে ক্যাথে কোলয়িজ মা ও শিশু, যারা বসতি ছেড়ে যায়নি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে আনেন। তার *The Sacrifice* (চিত্র-০৬) চিত্রে দেখা যায় একজন বস্ত্রহীন নারী চোখ বুজে তার সন্তানকে উৎসর্গের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। চিত্রটিতে পশ্চাৎপটকে শিল্পী তিনটি ধাপে বিন্যস্ত করে দেন। আলোছায়ার তীব্র বৈপরীত্যের ব্যবহার ও অবয়বের লাবণ্যহীন উপস্থাপন লাঞ্ছিত-বঞ্চিত জীবনের এক নির্মোহ প্রকাশ। প্রতিটি রেখা, প্রতিটি ছোপ মায়েদের জীবনে ঘটা যাওয়া নিদারূণ ঘটনাবলির এক একটি টেস্টামেন্ট। চিত্রকর্মটি একই সাথে জার্মান মায়েদের কাছে জাতীয়তাবাদী প্রপাগান্ডার যে দাবি– সন্তানদের যুদ্ধে পাঠানোর, তার এক তীর্যক প্রতিক্রিয়া অথবা যুদ্ধকালীন মৃত্যুভয়, যা যেকোন সময় মা ও সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে পারে তার সাথে মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা।[৩০]

চিত্র-০৬
The Sacrifice
1922
Sheet 1 of the series *War*
Käthe Kollwitz Museum Köln

Theidon মতে, “The body is a place of memory, a site in which important historical experiences are inscribed.”[৩১] তবে যে শরীরে ‘স্মৃতি’ গ্রন্থিত থাকে ইউরোপের শিল্পকলায় সে শরীর দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল। যদিওবা দু’য়েকটি পুরুষ দেহাবয়বে স্মৃতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়, নারীদেহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে। যেখানে নারী তার শারীরিক সৌন্দর্যের জন্যই কেবল প্রাসঙ্গিক। নারী বিষয়ক ভাবপ্রবণতার ধারা থেকে যে কয়েকজন শিল্পী ইউরোপের শিল্পকলাকে বের করে আনেন, তাদের মধ্যে ক্যাথে কোলয়িজ অন্যতম। নারীদের শরীর ও মুখাবয়ব তিনি এমনভাবে তার চিত্রপটে তুলে ধরেন যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও সামাজিক অনাচারের ইতিহাস তাদের অবয়বের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত হয়। এমনকি তিনি নিজেকে বিষয়বস্তু করে যেসব চিত্রকর্ম রচনা করেন সেগুলোতেও তিনি সেই মর্মান্তিক ইতিহাস গ্রন্থিত করে গেছেন। ক্যাথে কোলয়িজ তার জীবদ্দশায়

বিভিন্ন পর্যায়ের যে আত্মপ্রতিকৃতিগুলো এঁকেছেন সেগুলো একসাথে করলে, সম্মিলিতভাবে সেগুলোকে একটি 'চিত্রিত আত্মজীবনী' (Visual autobiography) বলে অবহিত করা যায়। তিনি প্রায় শতাধিক আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কন ও চিত্রায়ন করেন, যেগুলোর মধ্যে তার নিজের ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। ১৮৮৮ সালে অঙ্কিত শিল্পীর প্রথম আত্মপ্রতিকৃতিটিই (চিত্র-০৭) একমাত্র ছবি যেখানে তার হাসিমুখ চিত্রিত হয়েছে। শুরুর দিকের কিছু প্রতিকৃতিতে রঙের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার মুখ মলিন হয়, ক্যাথে কোলয়িজের রঙিন জীবন ধূসর হয়ে পড়ে। ক্যাথে তার আত্মপ্রতিকৃতিগুলোতে কোনো নার্সিসাস মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাননি, বরং এসব কাজ তার নিজের জীবন এবং সময়কাল সম্পর্কে এক শক্তিশালী সাক্ষ্য।[৩২] এই প্রতিকৃতিগুলো শিল্পীর গভীর আত্ম-জিজ্ঞাসার এক স্থায়ী দলিল এবং সেই সাথে একজন গ্রাফিক শিল্পী এবং ভাস্কর হিসেবে তার সুনিপুণ দক্ষতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। শুরুর দিকের কিছু আত্মপ্রতিকৃতিতে শিল্পীর নিজেকে উপস্থাপন করার প্রবণতা প্রকাশ পায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যতই তিনি জীবনের করুণ-কঠিন বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন আত্মপ্রতিকৃতিগুলোতে তিনি ততই স্বীয় অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

মুখচ্ছবি চিত্রায়নের মাধ্যমে আত্ম-প্রতিফলনের এই শিল্পরীতি তার সমসমায়িক শিল্পীদের মধ্যে Lovis Corinth, Edvard Munch, Max Beckmann এবং Otto Dix সহ আরো অনেকেই চর্চা করেছেন। ক্যাথের কাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হলে তিনি খুব কমই পূর্ণদৈর্ঘ্য আত্মপ্রতিকৃতি সৃষ্টি করেছেন। শুরু দিকে কিছু সংখ্যক পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিকৃতি আঁকলেও ধীরে ধীরে তিনি গলা ও কাঁধ বাদ দিয়ে কেবল মুখচ্ছবির দিকে মনোযোগ দেন। কখনো বা মুখাবয়বের সাথে তিনি একটি হাত জুড়ে দিতেন যা তার কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্ব বর্জন এবং পশ্চদপটকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তিনি মুখাবয়য়ের অভিব্যক্তিকে আরো প্রকট করে তোলেন। মুখাবয়ের আনুপুঙ্খিকতা কমিয়ে এনে হাত ও মুখের স্বাতন্ত্র্যমিণ্ডত বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি কেবল প্রকৃত অভিব্যক্তিটুকু ফুটিয়ে তোলেন।

চিত্র-০৭
Self-Portrait en face Laughing
1888-1889.
Kathc-Kollwitz-Museum Berlin

চিত্র-০৮
Self-Portrait
1934
National Gallery of Art, Washington,
Rosenwald Collection

ক্যাথে কোলয়িজ কেবল দুঃখ-বিষাদের স্মৃতিই রোমন্থন করেননি, তিনি নারীদের জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তগুলোকেও তার চিত্রপটে তুলে এনেছেন। *Mary and Elizabeth* (চিত্র-০৯) চিত্রকর্মটি বাইবেলের বিষয়বস্তুর উপর রচিত তার আরেকটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও শক্তিশালী অভিব্যক্তি। সাক্ষাৎকারের *(The Visitation)*[৩৩] এই সুসমাচারে– যেখানে দুজন ভাবীমাতার পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের কাহিনি বিবৃত হয়েছে, মানুষের জন্য সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির একটি বার্তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তার ছাপচিত্রগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে মধুর এবং প্রেমময় একটি অভিব্যক্তি, যেখানে বিষণ্নতার কোন আবহ নেই।[৩৪] যিশুর মাতা মেরী এবং জন দ্যা ব্যাপ্টিস্ট এর মাতা এলিজাবেথ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। চিত্রে তাদের দীর্ঘ আলখাল্লা পরিহিত উপস্থিতি একটি একীভূত গড়ন তৈরি করে। দুজনের অবয়বে ফুটে ওঠে প্রশান্ত-পবিত্র ভাব। পশ্চাৎপটে ত্রিমাত্রিকতা বর্জন এবং আলোছায়ার তীব্র বৈপরীত্যের মাধ্যমে চিত্রটিতে কেবল দুটি দেহাবয়বের ভঙ্গিমার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। হাত ও মুখের আনুপুঙ্খিক চিত্রায়নের মাধ্যমে মায়েদের অনুভূতিকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ১৯৩১ সালে রচিত *Mother with Boy* চিত্রটিও (চিত্র-১০) তার বিষাদময় প্রকাশভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে সন্তান কোলে একজন প্রফুল্লচিত্ত মায়ের অভিব্যক্তি তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রটিতে শক্তিশালী ছন্দায়িত রেখা এবং বর্ণের মাত্রাবিন্যাস অবয়বের ত্রিমাত্রিক ডৌলতা সৃষ্টি করেছে। সন্তান তার মাতৃস্নেহ এবং মা তার সন্তানের শৈশব প্রাণ ভরে উপভোগ করার এক অনবদ্য দৃশ্যায়ন। জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও প্রাণ জুড়ানো মুহূর্তগুলোর কথা তিনি ভুলে যাননি। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে তার চিত্রে এমন সব আনন্দঘন মুহূর্তের অবতারণা নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণ করে, তার জীবনের বিষাদময় স্মৃতি তাকে হতভাগ্য আর উদভ্রান্ত করে তোলেনি, মাতৃত্বের সুখময় অতীত তার স্মৃতি থেকে কখনোই মুছে যায়নি।

চিত্র-০৯
Mary and Elizabeth
1928
Private collection

চিত্র-১০
Mother with Boy
1931
Private collection

১৯৩৫ পরবর্তী সময়ে তিনি মাত্র চারটি নতুন চিত্রকর্ম রচনা করেন। তারমধ্যে সর্বশেষটি হল ১৯৪২ সালে রচিত *Seed Corn Must Not Be Ground* (চিত্র-১১)। সেই বছরই তার পৌত্র পিটার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে। জার্মান উপন্যাসিক Johann Wolfgang von Goethe এর *Wilhelm Meister's Apprenticeship* উপন্যাসের একটি উক্তি "Seeds for Planting Must Not Be Ground" থেকে তিনি এই কাজটির অনুপ্রেরণা পান। সেনাবাহিনীতে তরুণদের বাধ্যতামূলক অন্তর্ভূক্তির বিরুদ্ধে এই চিত্রটি ছিল একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ।[৩৫] শিল্পী এই চিত্রের মধ্য দিয়ে মায়েদেরকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যহীনতার পিছনে তাদের সন্তানদের বলি দিতে দৃঢ়ভাবে বারণ করেন। মায়েদের প্রতি এটি শিল্পীর "Last Will and Testament"[৩৬]। নিদারুণ যুদ্ধক্ষেত্র নয় বরং প্রতিটি সন্তানের চূড়ান্ত আশ্রয় মাতৃস্নেহ এবং পারিবারিক পরিবেশ। চিত্রটিতে একজন মা তার শক্তিশালী বাহুর নিচে তিন সন্তানকে রক্ষার চেষ্টা করছে, বাঁ দিকে আশ্রিত শিশুদ্বয় আর মায়ের দৃষ্টি একই দিকে নিবিষ্ট। তৃতীয়জন আঁচল খানিকটা সরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। একীভূত রচনা বিন্যাস ও শক্তিশালী রেখার মাধ্যমে আনুপুঙ্খিকতার আতিশয্য বাদ দিয়ে কেবল মা ও তার সন্তানদের অভিব্যক্তিটুকুই সুনিপুণভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। দৃশ্যশিল্পের ইতিহাসে ক্যাথে কোলয়িজ একজন পুত্রশোকাতুর মা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নারীদের জীবনে যে অপরিসীম দুঃখ-যাতনা বয়ে নিয়ে আসে তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরম সমব্যথী হয়ে মহাভারতের স্ত্রীপর্বে তুলে ধরেন। বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের নারীদের জীবনে যে অহসনীয় ভোগান্তি বয়ে আনে ক্যাথে তার কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে তা তুলে ধরেন। কুরুক্ষেত্রে জয়লাভের পর পাণ্ডবগণ কৌরবমাতা গান্ধারীর কাছে আশীর্বাদ নিতে গেলে তিনি তার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়ে যুধিষ্ঠিরের পায়ের নখ দেখতে পান। সে অবধি যুধিষ্ঠিরের নখ মরে যায়।[৩৭] *Seed Corn Must Not Be Ground* চিত্রে রক্ষক মায়ের চোখ গান্ধারীর সেই শক্তিমত্তারই বহিঃপ্রকাশ। এই কাজটি আমাদেরকে মৃত্যুর বদলে জীবনের নতুন সম্ভবনা দেখায়। এই পৃথিবীর প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের প্রেরণা যোগায়। প্রতিটি বাবা মা তাদের স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার সারটুকু সন্তানদের মধ্যে জিইয়ে রাখেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শিশুরা ধারণ করে বাবা-মায়ের স্মৃতি– তাদের শরীরে, তাদের অন্তরে।

চিত্র-১১
Seed Corn Must Not Be Ground
1942
Käthe Kollwitz Museum Köln

উপসংহার

বর্তমান উত্তরাধুনিক ভোগবাদী পুঁজির যুগ একদিকে তার অতীত মনে রাখার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে আর অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানিক ভাষ্যের মাধ্যমে কিছু নির্বাচিত স্মৃতি সংরক্ষণ করছে। ইতিহাস ভুলে যাওয়া আত্মবিস্মৃতির শামিল। তবে অতীত নিয়ে মগ্ন থাকার কিছু সংকটও আছে। স্মৃতি যেমন আমাদের অতীতের ভুলগুলো অনুধাবনের সুযোগ করে দেয় তেমনি অতীতের দুঃখ-দুর্দশার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে বর্তমান বঞ্চনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি করে। ক্ষমতাবানেরা স্মৃতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তারা রাজনৈতিক স্বার্থে একদিকে যেমন বিস্মরণের পরিবেশ সৃষ্টি করে অপরদিকে কিছু বাছাই করা স্মৃতিকে মানুষের মধ্যে জিইয়ে রাখে। বিরোধীমত দমন করে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার একটি হাতিয়ার হিসেবে স্মৃতি এবং বিস্মরণকে তাদের কৌশল অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকে। তাই অতীত নিয়ে অতিরিক্ত ভাবাবেগ ও তা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে মানুষকে একটা ভারসাম্যপূর্ণ জাগয়া খুঁজে নিতে হবে। স্মৃতির সাথে সহমর্মিতার সমন্বয় না ঘটলে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ক্যাথে কোলয়িজের শিল্পকর্ম এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণে আমাদের পথ প্রদর্শক হতে পারে। তার কাজে স্মৃতি আর সহমর্মিতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তিনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেন এবং ভবিষ্যতের পথ দেখান। বিশ্বযুদ্ধের জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের কালে তিনি তার নিজ সন্তানকে রণাঙ্গনে পাঠান। সন্তানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার এক নতুন বোধদয় ঘটে। তিনি হয়ে ওঠেন নারীদের সার্বজনীন প্রতিনিধি। প্রাতিষ্ঠানিক যুদ্ধের ইতিহাসে যেখানে সামরিক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ বিধৃত হয়, সেখানে ক্যাথে যুদ্ধ নারীদের-মায়েদের-শিশুদের জীবনে কি ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনে তার এক প্রামাণ্য দলিল পৃথিবীবাসীর কাছে হাজির করেন। অতীতের বঞ্চনা তাকে একজন ঘৃণাজীবী মানুষে পরিণত না করে বরং বিগত দিনের ভুল পুনরায় না করার সতর্কবার্তা প্রচারকারীতে পরিণত করে। তার শিল্পকর্ম যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিরোধ, স্মৃতি আর সহমর্মিতার এক অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ।

তথ্যনির্দেশ ও টিকা

১. Carl Zigrosser, *Prints and Drawings of Käthe Kollwitz,* EBook (New York: Dover Publication, Inc. 1969), Introduction section

২. *lbid*

৩. সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪), পৃ.২৩০

৪. সমাজ বাস্তবতাবাদ বা Social Realism পরিভাষাটি মূলত ব্যবহৃত হয় চিত্রকর, ছাপচিত্রী, আলোকচিত্রী, লেখক এবং চলচ্চিত্রকারদের এমন সব সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে যা শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এসবের পিছনে ক্ষমতা কাঠামোর ভূমিকাকে সমালোচনা করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির মহাবিপর্যয়ের কালে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইউরোপের শিল্পীদের দ্বারা সংগঠিত শিল্প আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতেও পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে

উঠা শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ' (Socialist Realism) থেকে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

৫. Gernot, G., Pelowski, M. & Leder, H. "Empathy, Einfühlung, and aesthetic experience: the effect of emotion contagion on appreciation of representational and abstract art using fEMG and SCR." *Cogn Process* 19, 147–165 (2018). https://doi.org/10.1007/s10339-017-0800-2

৬. J. M. Bennet, *The empathic healer: An endangered species* (London: Academic Press, 2001), p. 31

৭. C. D. Batson & N. Ahmad. "Empathy-induced altruism in a prisoner's dilemma II: What if the target of empathy has defected?'' *European Journal of Social Psychology (EJSP)*, New York, 2001, P. 25–36. https://doi.org/10.1002/ejsp.26

৮. Carl Zigrosser, *op.cit.*, Introduction section

৯. Deep awareness of the suffering of another.

১০. Karin M Skawran, "Käthe Kollwitz: Art as Compassion'', *de arte*, London, 2016, P.33. https://doi.org/10.1080/00043389.1989.11761084

১১. Marsha Meskimmon, *We Weren't Modern Enough: Women Artists and the Limits of German Modernism* (Berkeley: University of California Press, 1999), p.76

১২. মাতৃত্ববাদ বা Maternalism হল মাতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত পারিবারিক মূল্যবোধগুলোর প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। এই মতবাদের মূল লক্ষ্য মা হিসেবে একজন নারীর অবস্থানকে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের নিজস্ব দাবি-দাওয়াগুলোকে সামনে তুলে ধরা। একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে সেবা-যত্ন এবং প্রতিপালনের মত নৈতিক মূল্যবোধগুলো, যেগুলো নারীরা দীর্ঘদিন যাবত চর্চা করে আসছে সেগুলোর একটি সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে মাতৃত্ববাদকে সঙ্গায়িত করা হয়।

১৩. Carl Zigrosser, *op.cit.*, Introduction section

১৪. Elizabeth Prelinger, *Käthe Kollwitz* (Washington: National Gallery of Art, 1992), p. 34

১৫. Danielle Knafo, *In Her Own Image: Women's Self-representation in Twentieth-century Art* (New Jersey:Fairleigh Dickinson University Press, 2009), p. 24

১৬. Karin M Skawran, *op.cit.*, 2016, P.36

১৭. Elizabeth Prelinger, *op.cit.*, p. 40-42

১৮. খ্রিষ্টীয় দৃশ্যশিল্পের ঐতিহ্য অনুসারে 'পিয়েতা' এমন একটি অভিব্যক্তি যেখানে কুমারীমাতা ম্যারীর কোলের উপর নিহত যিশুর লাশ শায়িত অবস্থায় দেখা যায়। বাইবেলে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। ১৪ শতকের দিকে জার্মানিতে যিশুর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে শোক প্রকাশের এই অভিব্যক্তিটির উদ্ভব ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা উত্তর ইউরোপ জুড়ে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ে 'পিয়েতা' জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। দীর্ঘকাল একটি ফ্রাঙ্কো-জার্মান অভিব্যক্তি হিসেবে

বিবেচিত হলেও ১৪৯৯ সালে রোমের সেইন্ট পিটার ব্যাসেলিকায় স্থাপিত মাইকেলেঞ্জেলোর ‘পিয়েতা’ এই মর্মন্তুদ অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯. Danielle Knafo, *op.cit.*, p. 28

২০. Karin M Skawran, *op.cit.*, 2016, P.36

২১. শিল্পীগোষ্ঠী *লীলা* তাদের ‘নায়ক’ শিরোনামের অ্যালবামের *সোনার কিষান* গানে এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে। যেখানে এদেশের নারীদের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে দুঃখ প্রকাশের চিরায়ত গ্রামীণ রূপটি প্রকাশ পায়।

২২. Gerhart Hauptmann, quoted by Carl Zigrosser, *op.cit.*, Introduction section

২৩. Petra Dragasevic, “Mastering Details: Heads and Hands in Käthe Kollwitz’s Art’’, *Daily Art Magazine***,** Retrieved 4 August, 2022, https://www.dailyartmagazine.com/heads-and-hands-in-kathe-kollwitzs-art/

২৪. Elizabeth Prelinger, *op.cit.*, p. 164

২৫. Karin M Skawran, *op.cit.*, 2016, P.34

২৬. Käthe Kollwitz, quoted by *lbid*

২৭. Carl Zigrosser, *op.cit.*, Introduction section

২৮. Herbert George, *The Elements of Sculpture: A Viewer's Guide* (New York: Phaidon Press, Inc.2014), p. 164

২৯. Maria Paula Nascimento Araújo and Myrian Sepúlveda dos Santos, “History, Memory and Forgetting: Political Implications”, *RCCS Annual Review* [Online], 1 | 2009, Online since 01 September 2009, connection on 21 September 2021. URL: http://journals.openedition.org/rccsar/157; DOI: https://doi.org/10.4000/rccsar.157

৩০. Danielle Knafo, *op.cit.*, p. 31

৩১. Theidon, quoted by Maria Paula Nascimento Araújo and Myrian Sepúlveda dos Santos, *op.cit.*

৩২. Karin M Skawran, *op.cit.*, 2016, P.36

৩৩. বাইবেলে ম্যারী ও এলিজাবেথের সাক্ষাৎকারের এই বিবরণীটি লূকের সুসমাচারে উল্লেখ আছে। যেখানে উভয় ভাবীমাতা পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও তাদের প্রভুর শুকরিয়া আদায় করে (লূক ১:৪১-৫৬)। এই সময়টায় ম্যারী কুমারী অবস্থায় সন্তান ধারণের জন্য সামাজিক নিন্দার মুখে পড়ার শঙ্কায় ছিলেন। তারপরও এই পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় ম্যারী এবং এলিজাবেথ উভয়ের জন্যই একটা প্রশান্তি বয়ে আনে। প্রতি বছর ৩১ মে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা দিনটি যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সাথে পালন করে।

৩৪. Carl Zigrosser, *op.cit.*, Introduction section

৩৫. *lbid*

৩৬. THE ART STORY. (n.d.). *Käthe Kollwitz GERMAN PRINTMAKER AND SCULPTOR,* Retrieved December 03, 2022, from https://www.theartstory.org/artist/kollwitz-kathe/

৩৭. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *ছেলেদের মহাভারত* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০০৭), পৃ. ১৬৮

জমা প্রদানের তারিখ : ২৫.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ৩০.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন**

Abstract

Education is one of the basic needs of human life. Without quality education, mans progress is not possible. Quality education is the fourth guideline of the Sustainable Development Goals. Therefore, this research has been conducted from an Islamic perspective in determining what to do to meet the challenges of quality education. Quantitative method was used in the present study. As part of the qualitative research, document analysis was carried out. A comparative review of Islamic guidelines with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) for achieving quality education followed the descriptive method and analytical method. The objective of this research is to create public awareness by reviewing quality education from an Islamic perspective to achieve sustainable development goals and to determine what to do in consideration of the majority Muslim population. If it is possible to create public awareness in the light of the issues identified in this study and implement the recommendations, World will advance in quality education, and sustainable development goals will be achieved.

চাবিশব্দ : শিক্ষা, উন্নয়ন, সচেতনতা, প্রশিক্ষণ, উপকরণ

ভূমিকা

শিক্ষা হলো মানব মনের অন্তর্নিহিত ভাব বিকশিত করার এক ব্যতিক্রমী উপায়। শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও মূল্যবোধে প্রভাব বিস্তার করে। মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি তাদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকাররূপে রেখে যায় এবং তাদের আদর্শ দ্বারা অনাগত বংশধরদের অনুপ্রাণিত করে। মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমেই জনশক্তিকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। টেকসই উন্নয়নের ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় মানসম্মত শিক্ষার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। তাই মানসম্মত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণায় নির্দেশিত বিষয়াদির আলোক জনসচেতনতা তৈরি ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে মানসম্মত শিক্ষায় এগিয়ে যাবে দেশ, অর্জিত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা।

গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণাটিতে পরিমাণগত পদ্ধতি (Quantitative Method) ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার অংশ হিসেবে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ (Document Analysis) করা হয়েছে।

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো বদ্ধপরিকর। তাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মানসম্মত শিক্ষার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করে জনসচেতনতা তৈরি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীর করণীয় নির্ধারণ এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত।

মানসম্মত শিক্ষা পরিচিতি

মানসম্মত শিক্ষা তথা Quality Education. একে বাংলায় গুণগত শিক্ষা, কার্যকর শিক্ষা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। শিক্ষার আধুনিক ও কার্যকর সম্পূরক নাম হলো মানসম্মত শিক্ষা। এমডিজি তথা সহস্রাব্দিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পরিমাণবাচক (quantity of education) নির্দেশকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সহস্রাব্দিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৮টি সূচকের ৩ ও ৪ নং সূচক ছিলো শিক্ষা সম্পর্কিত। সেগুলো হলো- "৩. সকল ছেলে-মেয়ে প্রাইমারি স্কুলে অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত তাদের পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা। ৪. সম্ভব হলে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিগুলোতে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সকল স্তরে বৈষম্য দূর করা।" জাতিসংঘ সহস্রাব্দিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী ২০১৫-২০৩০ সাল পর্যন্ত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। যার ৪ নং লক্ষ্যমাত্রা হলো মানসম্মত শিক্ষা (quality education)। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সহস্রাব্দিক উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের পার্থক্য হলো পরিমাণবাচক শিক্ষা থেকে মানসম্মত শিক্ষা। কেননা সহস্রাব্দিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষার হারকে উন্নয়নের নির্দেশক করা হলেও টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার মানকে উন্নয়নে নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ মানসম্মত শিক্ষার পরিচয় বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে মানসম্মত শিক্ষার সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ শিক্ষার যথাযথ মানের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, সেগুলোকে ক্ষেত্রবিশেষ একটিকে অপরটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। তদুপরি কয়েকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণপূর্বক মানসম্মত শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো মানসম্মত শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। ইউনেস্কো ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়কে 'জাতিসংঘ শিক্ষা দশক' হিসেবে গণ্য করে গুণগত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপাদান ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে, যা United Nations Decade of Education for Sustainable Development (UN DESD) 2005–2014 নামে পরিচিত। এ সংস্থা গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করেছে। ইউনেস্কো প্রদত্ত তথ্যমতে, শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত বিকাশ একই সঙ্গে ঘটতে পারে; এটিই হলো মানসম্মত শিক্ষা। মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়; কারণ টেকসই উন্নয়ন ধারণার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ও জীবনমানের উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষার প্রয়োজন। ইউনেস্কো Education for Sustainable Development (ESD) তথা টেকসই উন্নয়নের শিক্ষা তথা মানসম্মত শিক্ষার চারটি মূল উপাদান বর্ণনা করেছে, সেগুলো হলো- ১. মৌলিক শিক্ষার প্রসার, ২. বিদ্যমান শিক্ষার সংস্কার, ৪. জনগণের বোঝাপড়া ও সচেতনতা ও ৪. প্রশিক্ষণ।[১]

EFA global monitoring report 2005 এর বর্ণনানুসারে,

Two principles characterize most attempts to define quality in education: the first identifies learners' cognitive development as the major explicit objective of all education systems. Accordingly, the success with which systems achieve this is one indicator of their quality. The second emphasizes education's role in promoting values and attitudes of responsible citizenship and in nurturing creative and emotional development.[2]

(দুটি নীতি শিক্ষার গুণগত মান নির্ধারণের সর্বাধিক প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করে: প্রথমটি সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশকে চিহ্নিত করে। তদানুসারে, শিক্ষাব্যবস্থাগুলো যে সাফল্যের সাথে এটি অর্জন করে তা তাদের গুণমানের একটি সূচক। দ্বিতীয়টি দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে এবং সৃজনশীল ও মানসিক বিকাশে শিক্ষার ভূমিকার ওপর জোর দেয়।)

Dr.HaseenaV.A and Dr.Ajims P.Mohammed এর মতে,

> *Quality in education can be experienced, but cannot be defined. But, instead of philosophically stating, the quality parameters have been prescribed and the institutions of higher education are rated on the basis of their performance related to the quality parameters like examination results, students' employment after graduation, reputation of the institution based on external reports and so on.*[3]

(শিক্ষার মান অনুধাবন করা যেতে পারে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কিন্তু, দার্শনিকভাবে উল্লেখ করার পরিবর্তে, শিক্ষার মানের পরিচায়ক বিষয়গুলো নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরীক্ষার ফলাফল, স্নাতকের পরে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান, বাহ্যিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ইত্যাদির মতো গুণমানের পরিচায়ক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত তাদের কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে হার নির্ধারণ করা হয়েছে।)

সর্বোপরি, মানবসম্মত শিক্ষা বলতে দুটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের যুগপৎ অবস্থানকেই আমরা নির্দেশ করতে চাই। সে দুটি কার্য হলো: প্রথমত, মানুষের মাঝে এমন জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া যা তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশ নিতে সাহায্য করে। এ মতের সমর্থনে সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম বলেন, Education is a social thing is not to formulate a program of education; it is to state a fact.[৪] (শিক্ষা একটি সামাজিক বিষয়, এটি কোনো কাঠামোবদ্ধ শিক্ষার কর্মসূচি নয়; এটি হলো কোনো ঘটনার সত্য অনুসন্ধান) দ্বিতীয়ত, এমন শিক্ষা দেয়া যা ব্যক্তির সামাজিক গতিশীলতার সুযোগ প্রদান করে।[৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে মানসম্মত শিক্ষার কয়েকটি পরিচায়ক নিদর্শন চিহ্নিত করতে পারি। সেগুলো হলো:

১. দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক;
২. শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি;
৩. যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম;
৪. উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ;
৫. মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ;
৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা;
৭. কর্মসংস্থান উপযোগী ব্যবহারিক শিক্ষা;
৮. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা;
৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার সুযোগসম্পন্ন শিক্ষা;
১০. বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা;
১১. মানসম্মত ভৌত অবকাঠামো;
১২. উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি;
১৩. মানসম্মত পাঠাগার ও বিজ্ঞানাগার;
১৪. পর্যাপ্ত কর্মদিবস ও কর্মঘন্টা;
১৫. প্রতিবন্ধী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইসলামি নির্দেশনা

মানসম্মত শিক্ষার ধারণাটি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় গুরুত্বের সাথে আলোচিত। জাতিসংঘ ২০১৫ সালের পর এমডিজি-র স্থলে প্রতিস্থাপিত করে ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী : ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' শিরোনামে নতুন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।[৬] টেকসই উন্নয়নের ১৭টি প্রধানতম লক্ষ্যমাত্রার ৪র্থ লক্ষ্যমাত্রা হলো- মানসম্মত শিক্ষা। এ চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রার অধীন ৭টি বিশেষ লক্ষ্য ও ৩টি সূচক নির্ধারিত। নিম্নে এ লক্ষ্যমাত্রাগুলো ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১ (অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা)

"২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।"[৭]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো:

অবৈতনিক মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা : ইসলাম মানুষের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। তাই শিক্ষা অর্জন ও অন্যকে শিক্ষা প্রদানও ইসলামে ফরজ। সমাজের প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নে ইসলামি রাষ্ট্র অবৈতনিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। প্রধানত ইসলাম প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছে পিতা-মাতার উপর। তদুপরি পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা সংকুলান না হলে এ দায়িত্ব বর্তাবে রাষ্ট্রের উপর। মহানবি (সা.)-এর জীবদ্দশায় মদিনায় মসজিদে নববীতে প্রতিষ্ঠিত সুফ্‌ফা মদিনার কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষা সমাপ্তির পর এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতো এবং তারা বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে গিয়ে দীন ইসলাম ও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সুফ্‌ফায় লেখাপড়া করার জন্য তাদের অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিও প্রেরণ করতেন। তাঁরা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতেন এবং তাদেরকে লেখাপড়া শিখাতেন।[৮] আস-সুফ্‌ফা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই রাসুল (সা.) মদিনায় আরো কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন, নবিজির (সা.) আমলে মদিনায় নয়খানা মসজিদ ছিলো, সেসব মসজিদ একইসাথে শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সুফ্‌ফার সন্নিকটে অপর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো, যার নাম ছিলো দারুল কুররাহ। স্থানীয় পর্যায়ে সকলের শিক্ষার সুবিধা বিবেচনায় মহানবি (সা.) আদেশ করেন, তোমরা স্থানীয়রা মসজিদে যাবে এবং প্রতিবেশীদের নিকট লেখাপড়া শিখবে। তোমাদের ব্যাপকহারে কেন্দ্রীয় মসজিদে আসা অনাবশ্যক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এরূপ বলার কারণ ছিলো- সকলে কেন্দ্রিয় মসজিদে আসলে স্থানীয় পর্যায়ের শিশুরা শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।[৯] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো অবৈতনিকভাবে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার অধিকারে নারী-পুরুষে সমতা : ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষাকে ফরজ ঘোষণা করেছে। কেননা শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নারী-পুরুষ সকলেরই প্রাপ্য। ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরজ।”[১০]

এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা শিক্ষিতা ছিলেন। হাদিস বিদ্যায় সর্বাধিক বর্ণনাকারী ছয়জন সাহাবির মধ্যে হযরত ‘আয়েশা (রা.) ছিলেন অন্যতম। এ ছাড়াও উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা, হযরত হাফসা, আসমা বিনতে আবূ বকর, মায়মুনা, উম্মে হানী (রা.) প্রমুখ মহিলা সাহাবির নাম প্রথম সারিতে এসে যায়। তবে ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো ঘর। তাই পিতা-মাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার আদেশ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।”[১১]

মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমতের কথা শেখানো হয়, তোমরা তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।"[১২]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে জন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। ইসলামে নারীশিক্ষাকে এতই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, অধীনস্ত দাসীদেরকেও শিক্ষা প্রদানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষার অধিকারে নারী-পুরুষে সাম্য প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ রাশিদ রিযা বলেন, "সকল আলিম ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর যেসব বিষয় ফরজ করেছেন এবং যেসব বিষয় তাদের অবহিত করেছেন সে সব বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান।"[১৩] ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্যে নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয় নি, বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রুপ মনে করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা নারীরা কেবল নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবি, তাবে'য়ী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সুতরাং, শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের অধিকার সমান।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-২ (প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে গুণগত শিক্ষার পরিবেশ)

"২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্চার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।"[১৪]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো শৈশব থেকেই মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার শিক্ষা-দীক্ষার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথম কয়েকটি বছর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহানবি (সা.) ঘোষণা করেন, তোমরা তোমাদের শিশুসন্তানদেরকে শিক্ষা দান কর। কেননা, তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের যুগ নয়।[১৫]

শৈশবের শিক্ষা ও মূল্যবোধ মানব জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিক্ষার প্রথম ভিত্তি যদি সুন্দর ও আদর্শভিত্তিক হয় তাহলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে সৎ-সুন্দর ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। শিশুরা কাদামাটির মতো কোমল। এ সময় তাদেরকে কাঙ্খিত ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। কাজেই শিশুসন্তানের শিক্ষা অতীব গুরুত্বের সঙ্গে দিতে হবে। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম উপহার হল তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুগঠিত করা। তাদেরকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে মহানবি (সা.) বলেন, "পিতা তার সন্তানকে যা কিছুই প্রদান করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল সুশিক্ষা।"[১৬]

ইসলাম শিশুর শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান এবং শিক্ষাকে সর্বজনীন করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কোনো শিশু যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে না যায় সে জন্য প্রেরণা ও প্রণোদনা যুগিয়েছে ইসলাম। ইসলামের নবি মুহাম্মদ (সা.) উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে লিপ্ত উভয়ের জন্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। মহানবি (সা.) বলেন, "শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই প্রতিদানের অংশীদার।"[১৭]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৩ (নারী-পুরুষে বৈষম্যহীন মানসম্মত উচ্চশিক্ষা)

"বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।"[১৮]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো:

পুরুষের উচ্চ শিক্ষার অধিকার : ইসলাম জ্ঞানার্জন করাকে ফরজ করেছে। তবে সকল ধরনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ নয়; বরং শরিআতের দিক বিবেচনায় এক এক ধরনের শিক্ষার বিধান এক এক ধরনের। এ সম্পর্কে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী বলেন, ইলম তথা জ্ঞান চার প্রকার। ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া, মুস্তাহাব ও হারাম। যা নর-নারী প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য তাই ফরজে আইন। যেমন ঈমান, নামায, রোযা, হজ প্রভৃতির জ্ঞান। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই প্রত্যেকের জন্য কালেমা ও ঈমান সম্পর্কীয় জরুরি বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। অতঃপর যখনই দ্বীনের যে বিষয়ের আবশ্যক হবে সে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ফরজ। আর যে ইলম সকলের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক শিক্ষা করলেই চলে তাই ফরজে কিফায়া। যেমন: কুরআন ও হাদিসের মধ্য হতে আহকাম বের করতে কুরআন ও হাদিসের ইলম শিক্ষা করা। এছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে সকল বিদ্যার প্রয়োজন তা অর্জন করাও ফরজে কিফায়া। যেমন চিকিৎসাবিদ্যা এবং আবশ্যকীয় শিল্পবিদ্যা। আবার ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে, সময়, সুযোগ ও সুবিধা থাকলে আবশ্যকতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ার পূর্বেই সে বিষয়ক ইলম অর্জন মুস্তাহাব। আর যে বিদ্যার মধ্যে ভাল দিকও নেই, মন্দ দিকও নেই, তা অর্জন করা মুবাহ। আর যে সমস্ত বিদ্যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে, তা অর্জন করা হারাম। যেমন: জাদুবিদ্যা, ভোজবাজি ইত্যাদি।[১৯]

সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, ইসলামি বিধান অনুসারে পুরুষের উচ্চশিক্ষার অধিকার ফরজে কিফায়া বা মুস্তাহাব পর্যায়ভুক্ত।

নারীর উচ্চ শিক্ষার অধিকার : শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভাঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এ জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম

তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোনো অবস্থায়ই সে শরী'আতের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষা লাভে ব্রতী হতে হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারী-পুরুষে উচ্চ শিক্ষার অধিকারে কোনো পার্থক্য করেনি। তবে নারীর শিক্ষা অর্জনে ইসলাম বিশেষ বিধান প্রবর্তন করেছে। তাহলো:

১. ইসলাম কখনো প্রচলিত সহশিক্ষা সমর্থন করে না।

২. উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে নিজ গৃহ থেকে অন্যত্র অবস্থানের ক্ষেত্রে মাহরাম সঙ্গে থাকা আবশ্যক।

৩. নিজ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষে উচ্চশিক্ষার অনুমতি রয়েছে। পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি নেই।

৪. উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা যাবে না।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৪ (কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি)

"চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।"[২০]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে জীবন ও কর্মমুখী করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বত্র হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে উপার্যন করাকে গৌরবজনক মনে করে। ইসলাম নিজ হাতে উপার্জিত খাবারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "উৎকৃষ্ট উপার্জন শ্রমিকের (নিজ হাতের) উপার্জন যদি তা নিয়মতান্ত্রিক ও ভালভাবে করে।"[২১]

পড়াশুনার পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনের প্রতিও লক্ষ রাখতে ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করে। কেননা জীবনাপোকরণ উপার্জন মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। মহানবি (স) বলেন, "হালাল রুজি অন্বেষণ করা ফরজের পরেও একটি ফরজ।"[২২]

শিক্ষার শেষ স্তরে শিক্ষার্থীরা যাতে পেশামূলক কাজ শিখতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে যান্ত্রিক উপায়ে কৃষি ও কারিগরি কাজে ব্যবহৃত প্রাথমিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ পেতে পারে, তার যথোচিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রকৌশল (Engineering), চিকিৎসা (Medical), কৃষি (Agriculture), পশুপালন (Farming) ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। ইসলামও এ ধরনের কাজে উৎসাহিত করে। কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদান করে হাদিসের বাণী, "যে মুসলমান কৃষিকাজ করবে, ফসল ফলাবে, বৃক্ষরোপণ করবে এবং কোনো পাখি, মানুষ কিংবা জন্তু তা হতে কিছু খাবে তা তার পক্ষ হতে দানস্বরূপ গণ্য হবে (এবং এজন্য সে সওয়াব পাবে)।"[২৩]

ইসলাম শিক্ষা লাভ করে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করে। কেননা চাকুরী থেকেও ব্যবসাকে ইসলাম বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। ব্যবসায় হলো এমন একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পণ্য, সেবা অথবা উভয়ের লেনদেন হয়ে থাকে। হাদীসে ব্যবসায়কে রিযিকের ১০ ভাগের ৯ ভাগ বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রিযিক ১০ ভাগে বিভক্ত, তন্মোধ্যে ৯ ভাগই ব্যবসায়ে নিহিত।"[২৪]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৫ (প্রতিবন্ধী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ)

"অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।"[২৫]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো– প্রতিবন্ধী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের শিক্ষার অধিকার। ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রতিবন্ধী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও যেকোনো অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সম অধিকার লাভ করে। ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই সমান। এখানে ইসলামের মৌলনীতির আলোকে কোনো বৈষম্য করা হয় না। কারণ আল্লাহর বাণী,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[২৬]

বিদায় হজ্জের ভাষণেও রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের মধ্যে এই সমতার উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং মানুষে মানুষে বৈষম্যের উৎসে কুঠারাঘাত করে তিনি ঘোষণা করেন, "হে মানব সকল! তোমাদের সবাই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। একজন অনারবের ওপর একজন আরবের, একজন আরবের ওপর অনারবের, কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের, লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের সততা ও আল্লাহ ভীতি ব্যতীত আর কোনো ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[২৭]

সুতরাং ইসলাম মানুষ হিসেবে শিক্ষার অধিকার যেভাবে ফরজ করেছে তেমনিভাবে প্রতিবন্ধি, সংখ্যালঘুসহ সকল মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে আদেশ দিয়েছে।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৬ (সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সক্ষমতা)

"নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।"[২৮]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সক্ষমতা অর্জন। ইসলাম নিরক্ষতা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাসুলে-করীম (সা.)-এর শুভাগমনের প্রকৃত কারণই ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা আলোর রাজ্যে নিয়ে আসা। তিনি যখন 'পড় তোমার প্রভুর নামে' বাক্যটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে উদ্যত হলেন, তখন এর একমাত্র উদ্দেশ্য কুরআন তিলাওয়াতই ছিল না; রবং কুরআনের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) চেয়েছেন, মুসলমান জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হোক। তিনি বলেন যে, একটি সার্বজনীন ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও সকল সমস্যার সার্বিক সমাধান একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মশুদ্ধির বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেন।[২৯] রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমাদের কাছে অনেক সম্প্রদায় আসবে। যখন তোমরা তাদের দেখবে স্বাগত জানিয়ে বলবে, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তোমাদের স্বাগত জানাই।' অতপর তাদের শিক্ষা দেবে।'[৩০]

গণন দক্ষতা অর্জন দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই টেকসই লক্ষ্যমাত্রার বিশেষ একটি লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে এটিকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য দৈনন্দিন চলার পথের প্রধান অনুষঙ্গ। আর ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে হিসাব রক্ষায় গণিতের ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যে গণনার ব্যবহার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "আর তারা তাকে অতি নগণ্য মূল্যে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল এবং তারা তার ব্যাপারে ছিল অনাগ্রহী।"[৩১]

দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে গণনার প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। শরী'আতের মাসআলা বর্ণনায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে গাণিতিক সংখ্যার ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়াও পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। তাই মুসলমানদের উপর অত্যাবশ্যক হলো গণন দক্ষতা অর্জন করা।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৭ (টেকসই জীবনধারার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন)

"অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।"[৩২]

এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয় হলো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করা। এ লক্ষ্যমাত্রার অধীনে ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা লাভের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক। ইসলাম দুনিয়াবি প্রয়োজনে যেকোনো শিক্ষা গ্রহণ, যদি তা হারাম না হয়; তবে সে শিক্ষা অর্জনকে প্রায়োগিকভাবে মুবাহ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, "শরিআতের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, এর সবকিছুই হালাল। কোনো বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম হবে না যতক্ষণ না শরিআত প্রণেতার পক্ষ থেকে হারামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা আসবে।"[৩৩]

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-১ (শিক্ষা সহায়ক সুবিধা ও কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা)

"৪.ক- শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সহায়ক সুবিধা গড়ে তোলা ও উন্নতকরণ এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা।"[৩৪]

এ লক্ষমাত্রায় বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে শিশু, প্রতিবন্ধি ও নারী-পুরুষ বিবেচনায় সংবেনশীল শিক্ষা সহায়ক সুবিধা (শিক্ষা উপকরণ, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ইত্যাদি) গড়ে তোলার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শিশু, প্রতিবন্ধী ও নারী বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা উপকরণ যেমন: শিশুদের জন্য চক, পেন্সিল, রাবার প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পঠন ও শিক্ষণে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণের উল্লেখ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্তমান সময়ের শিক্ষা উপকরণ, কলম, কালি, কাগজ, বোর্ড, বই ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৫]

শ্রবণ প্রতিবন্ধী অথবা শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন, একই পাঠ বারবার বলা অথবা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর কাছে গিয়ে পুণরায় উল্লেখ ইত্যাদির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। তিনি হাতের ইশারায় লোকদের বসাচ্ছিলেন সেই দৃশ্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি লোকদের মধ্য দিয়ে মেয়েদের কাছে এগিয়ে এসে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়েন,

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

"হে নবি, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বায়আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, ... তখন তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ কর। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত-১২) এবং আয়াতটি পড়া শেষ করে বললেন, তোমরা এই প্রতিশ্রুতির উপর অবিচল আছ? মেয়েদের মধ্য থেকে একজন মাত্র জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা অবিচল আছি। সে ছাড়া আর কেউ জবাব দেয়নি।"

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশেষ পাঠ তথা নারীদের সম্পর্কিত আয়াতটি নারীদের শুনানোর জন্য তাদের কাছাকাছি গিয়ে শুনিয়েছেন ; কারণ সামনে ছিলো পুরুষরা আর পিছনে ছিলো নারীরা। রাসুলুল্লাহ (সা.) পুরুষদেরকে বসিয়ে নারীদের কাছাকাছি গিয়ে আয়াতটি শুনিয়েছিলেন।

একইভাবে নারী-পুরুষে বৈষম্য প্রকাশ পায় অথবা প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এমন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। ইসলাম যে কোনোভাবে কাউকে উপহাস করা, হেয় করাকে নিষিদ্ধ করেছে।[৩৬]

মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের উপর বৈষম্য, ইভটিজিং এবং প্রতিবন্ধীদের মন্দ নামে ডাকা। কুরআনের এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম এ ধরনের সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-২ (শিক্ষা বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা)

"৪.খ- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিসহ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্রদ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জন্য প্রদেয় শিক্ষা বৃত্তির সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।"[৩৭]

এ লক্ষ্যমাত্রায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কারিগরি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, প্রকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করার নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামও আমাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষাবৃত্তিদানে উৎসাহ দেয় এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস থেকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত। বর্তমান সময়ে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে খাওয়া খরচ, বাসস্থান খরচ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন খরচ ইত্যাদি দেওয়া হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আহলে সুফফার অধিবাসীরা দীনি শিক্ষায় মগ্ন থাকায় তারা উপার্জন করতে পারতো না এবং তাদের অনেকেরই ছিলো না কোনো বাসস্থান ও পর্যাপ্ত পোশাক-পরিচ্ছেদ। মদিনার আনসার সাহাবিগণ আহলে সুফফার সাহাবি শিক্ষার্থীদের খাবার, পোশাকসহ সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। এছাড়াও মদিনার বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত শিক্ষার্থী সাহাবিদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.) দীনি শিক্ষা শেষে বাড়ি যাওয়ার সময় বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিতেন এবং এদের পরিবারের যারা তখন উপস্থিত থাকতো না তাদের জন্য উপহার দেয়া হতো। যা আধুনিক যুগের শিক্ষাবৃত্তির সাথে মিলে যায়। যেমন: একবার একটি প্রতিনিধিদল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসলো। ফিরে যাওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সকলকে কিছু উপহার দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আর কেউ বাকী নেই তো? তারা বললো, হাঁ, আমাদের শিবিরে একজন কিশোরকে রেখে এসেছি। সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। কিশোরটি এসে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমি এই গোত্রের একজন সদস্য, আপনি তাদেরকে দান করেছেন, আমার প্রয়োজনও পূরণ করুন।"[৩৮]

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-৩ (যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা)

"৪.গ- শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।"[৩৯]

এ লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষক ব্যতীত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা ছিলো। এমনকি মহান আল্লাহ মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) আহলে সুফফার সাহাবিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করতেন। তাঁরা বিভিন্ন গোত্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং ইসলামের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রতিনিধির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে শিক্ষক চেয়ে পাঠাতেন। অপরদিকে তাঁদের মধ্যে বাছাই করা লোকেরা মদিনায় এসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর নিজ কাবিলায় প্রত্যাবর্তন

করে নিজ গোত্রের লোকদের দীনের শিক্ষা দান করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় দীনী প্রশিক্ষণ দানের পর তাদেরকে বললেন, এগুলো মনে রেখ, আর যারা তোমাদের পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকে অবহিত করবে।[৪০]

সুপারিশমালা

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। টেকসই উন্নয়নের জন্যও তাই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। টেকসই উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ক সূচকগুলোর ইতিবাচক অগ্রগতি সাধনে এবং মানসম্মত শিক্ষা সুযোগ নিশ্চিতকরণে মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ঠ দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা রয়েছে। বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধান করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করা হলো–

- শিশুদের মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করা।
- মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। এই ব্যবস্থায় শিশু কিশোরের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ, এই বিষয়টি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে শিশুদের সামনে মহিয়সী নারীগণের অবদান উপস্থাপন করে তাদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা যায়।
- শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নির্দিষ্ট বয়সে সুন্দর ও আদর্শভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রকারভেদ তথা ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া, মুস্তাহাব ও হারাম বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করা যায়। তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্ভব।
- উচ্চা-শিক্ষায় গবেষণা খাতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
- কারিগরি শিক্ষাখাতে অধিক গুরুত্বারোপ করা।
- শিক্ষাকে চাকুরি লাভের উপায় মনে না করে উদ্যোক্তা হবার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার মানসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

উপসংহার

একটি জাতীর সামগ্রিক উন্নতি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপর নির্ভর করে। তাই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষার মূল উপাদানগুলো সম্পর্কে জানা জরুরি। অর্থাৎ মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক ও পরিবেশ এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় না হলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব

হয় না। মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য যেকোনো রাষ্ট্রের শিক্ষা খাতে মোট বাজেটের অন্তত ১৫ শতাংশ রাখা আবশ্যক। সেইসঙ্গে কাঙ্ক্ষিত মান নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে আধুনিক ও যথোপযুক্ত শিক্ষাক্রম, জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে পাঠদান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নবতর জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন এবং উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বমানের গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে দক্ষ শিক্ষক তৈরি, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, সৃজনশীল ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান সামগ্রী ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি, ধারাবাহিক পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থাপনাই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। সর্বোপরি, এ গবেষণাকর্মে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে মানসম্মত শিক্ষায় ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নির্দেশিত শিক্ষা পদ্ধতিরই আধুনিক নাম হলো মানসম্মত শিক্ষা।

তথ্যনির্দেশ

১ Rosalyn McKeown and others, *Education for Sustainable Development Toolkit* (Paris : UNESCO, 2006), p. 14-16

২ UNESCO, *EFA global monitoring report 2005: Education for All, the quality imperative* (Paris: UNESCO, 2005), p. 17

৩ Dr.HaseenaV.A and Dr.Ajims P.Mohammed, ''Aspects of Quality in Education for the Improvement of Educational Scenario'', *Journal of Education and Practice*, ISSN 2222-1735 (Paper), ISSN 2222-288X (Online)m Vol.6, No.4, 2015, p. 100

৪ Durkheim Emile, *Education and Sociology* (New York: Free Press, 1956), P. 3

৫ David F. Labaree, ``Public Goods, Private Goods. The American Struggle Over Educational Goals'' *American Educational Research Journal,* vol-34, 1997, p. 39–81

৬ The General Assembly, *4th plenary meeting 25 September 2015* (New York : United Nations, 2015), p. 1

৭ Editorial Board, *Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development*, The General Assembly, 4th plenary meeting 25 September 2015 (New York : United Nations, 2015) Seventieth session Agenda items 15 and 116, P. 21

৮ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, "হযরত মুহাম্মদ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ২৭ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৮৮ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ৩১৭

৯ সম্পাদনা পরিষদ, *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ২২৮

১০ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং-২২৪

১১ *আল কুরআন*, ৬৬ : ৬

১২ *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩-৪

১৩ ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, "নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ইসলামের ভূমিকা", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, সংখ্যা-৫২, এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ. ৪৮

১৪ Editorial Board, op.cit, P. 21

১৫ এবি রফিক আহমেদ অনূদিত, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৮৭, পৃ. ৫১

১৬ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *আল মুসনাদ* (মিশর : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), হাদীস নং ১৫৪৩৯

১৭ ইমাম ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ২২৮

১৮ Editorial Board, op.cit, P. 21

১৯ মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *মেশকাত শরীফ* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭), খ. ২, পৃ : ৩-৪

২০ Editorial Board, op.cit, P. 21

২১ আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ* (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৮), পৃ. ৬১

২২ আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মূসা আবু বকর বায়হাকি, *আস সুনানে কুবরা* (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩), হাদিস-১১৬৯৫

২৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারি, *আস সহিহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং : ২৩২০

২৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জাফর বিন হাইয়্যান আন আনসারী, *আল আজমাহ* (রিয়াদ : দারুল আসেমাহ, ১৪০৮), খ.৫, পৃ. ১৬৩৭

২৫ Editorial Board, op.cit, P. 21

২৬ *আল কুরআন*, ৪ : ১

২৭ আল্লামা শিবলী নুমানী, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান অনূদিত, *সীরাতুন নবী (সা)* (ঢাকা : প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৭৪), খ.১, পৃ. ১৫৪

২৮ Editorial Board, op.cit, P. 21

২৯ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহিকুল মাখতুম* (কায়রো : দারুল আদইয়ান লিত-তুরাস, ১৯৮৮), পৃ.১৭৯-১৮১

৩০ আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি, *আস সুনান* (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), হাদিস নং : ২৬৫০

৩১ *আল কুরআন*, ১২ : ২০

৩২ Editorial Board, op.cit, P. 21

৩৩ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, মুফতী যোবায়ের হোসাইন রাফীকী অনূদিত, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান* (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৬), পৃ. ২২

৩৪ Editorial Board, op.cit, P. 21

৩৫ মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মু. ফয়জুল হক, "আল কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা উপকরণ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ", *Peaceland Journal*, vol-1, no-1, 2013, Peaceland Trust, Dhaka, পৃ. ১০৯

৩৬ *আল কুরআন*, ৪৯ : ১১

৩৭ Editorial Board, op.cit, P. 21

৩৮ ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মাআদ (মিসর), খ.৩, পৃ. ৬১; উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১), পৃ. ২১৭

৩৯ ibid, P. 22

৪০ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০

জমা প্রদানের তারিখ : ২৮.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ৩০.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

ইসলামের আলোকে বাজারজাতকরণ নীতিমালা

মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল*
মোহাম্মদ ওমর ফারুক**

Abstact

People's livelihood is related to their need for food, clothing and shelter. And people are constantly using different products to meet the demand for food, clothing and shelter. At the same time, money is needed to enjoy all these products. As a result, we are related to each other through the processes of production, distribution and consumption. This trend has continued since the beginning of the world. But before the Industrial Revolution, people used to produce and consume for their own needs, so there was no problem in exchanging the products produced. After the Industrial revolution, the sales of manufactured goods create a problem as modern art techniques and the classification of capitalists, workers and common people became excessive. To solve this problem, warehousing, advertising, creation of buyer value, buyer satisfaction, etc. are discussed scientifically. In this way marketing becomes a scripture. Although this theory, based on capitalist thinking, deals with the concept of morality, it does not guarantee equal opportunities for both buyers and sellers; Rather, in most cases, the buyer as well as the capitalist benefits. Islam, as the proponent of a welfare economy, does not support such one-sided marketing. Islam believes in marketing principles for the benefit of both buyers and sellers. The great books Al-Quran and Hadith have declared business lawful. At the same time, it has formulated policies for production, distribution and consumption of halal products. Islam prohibits all forms of haram and immorality related to marketing. In particular, it has introduced effective and efficient provisions in market management by prohibiting stockpiling, adulteration, underpaying, buying and selling lies, etc.

চাবিশব্দঃ বাজারজাত, ক্রয়-বিক্রয়, মুনাফা, ব্যবসা, পরিবহণ

ভূমিকা

মানুষের জীবনধারণের সাথে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদার সম্পর্ক রয়েছে। আর খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহার করে থাকে। একই সাথে এ সকল পণ্য ভোগ করার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে আমরা একেক জন একেক জনের কাছে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ এ প্রক্রিয়াগুলোর কোনো না কোনটির মাধ্যমে সম্পর্কিত। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে উৎপাদন ও ভোগ করতো ফলে, উৎপাদিত পণ্য বিনিময়ে তেমন কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর পণ্য উৎপাদনে আধুনিক কলা কৌশল এবং পুঁজিপতি, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের শ্রেণিবিভাজন অত্যধিক হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় একটি সমস্যা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্যার সমাধানে গুদামজাত, বিজ্ঞাপন, ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি, ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচিত হয়। এভাবে মার্কেটিং তথা বাজারজাতকরণ একটি শাস্ত্রে

*পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
**সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

রূপ লাভ করে। পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনা ভিত্তিতে প্রসারিত এ তত্ত্বে নৈতিকতার ধারণা সম্পর্কিত থাকলেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেতা তথা পুঁজিপতি সুবিধা লাভ করে। ইসলাম একটি কল্যাণমুখী অর্থনীতির প্রবক্তা হিসেবে এ ধরণের একমুখী বাজারজাতকরণ সমর্থন করে না। ইসলাম ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কল্যাণ বিবেচনায় বাজারজাতকরণ নীতিমালায় বিশ্বাসী। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিসে ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছে। একই সাথে হালাল পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ইসলাম বাজারজাতকরণের সাথে সম্পর্কিত সকল ধরনের অনৈতিকতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিশেষত, মজুদদারী, ভেজাল মিশ্রণ, মাপে কম দেয়া, কেনা-বেচায় মিথ্যাচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে বাজার ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী ও সুষ্ঠু বিধান প্রবর্তন করেছে।

গবেষণা পদ্ধতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সম্পর্ক রয়েছে। এ গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রশ্ন হলো "বাজারজাতকরণে ইসলামি বিধান রয়েছে কী? যদি থেকে থাকে তাহলে সেগুলো কী কী?" এ প্রশ্নের আলোকে কয়েকটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে, সেগুলো হলো-

১. বাজারজাতকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

২. বাজারজাতকরণে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা।

৩. বাজারজাতকরণে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সুপারিশমালা প্রস্তুত।

উপরিউক্ত গবেষণা প্রশ্ন ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে পরিচালিত এ গবেষণায় গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাজারজাতকরণের প্রচলিত নীতিমালা কুরআন, হাদিস ও ফিকহের মুলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে বাজারজাতকরণে ইসলামি নীতিমালা তুলে ধরা সম্ভব হলে বাজার ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনৈতিক কার্যকলাপের পরিমাণ হ্রাস করে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে, যা এ গবেষণার গুরুত্ব বহন করে।

বাজারজাতকরণ ধারণা

বাজারজাতকরণ হচ্ছে একটি সামাজিক ও ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা সংগ্রহ, ক্রয় বা উৎপাদন করে ভোক্তার চাহিদা ও অভাব মূল্যায়নপূর্বক বিনিময়ের মাধ্যমে আর্থিক মুনাফা অর্জন করে। বাজারজাতকরণের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে এর সংজ্ঞায়নেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মার্কেটিং গুরু Philip Kotler তাঁর নিজের লেখা বইয়ে অন্তত পনেরো বার বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছেন।[১] Philip Kotler এবং Gary Armstrong-এর মতে, বাজারজাতকরণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোম্পানিগুলো ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে এবং বিনিময়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে ভ্যালু অর্জনের লক্ষ্যে শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক তৈরি করে।[২] বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Bovee, Houston এবং Thill বলেন, বাজারজাতকরণ হচ্ছে ধারণা, পণ্য ও সেবা উন্নয়ন ও বিনিময় প্রক্রিয়া যা মূল্য নির্ধারণ, প্রসার ও

বণ্টনের নীতিমালা ব্যবহার করে ক্রেতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সন্তুষ্টি বিধান করে।[৩] Fred E. Clark এবং Carrie Patton Clark বলেন, বাজারজাতকরণ সেসব প্রচেষ্টা নিয়ে গঠিত যা পণ্য ও সেবার মালিকানা হস্তান্তর ও তাদের বস্তুগত বণ্টনের যত্নকে প্রভাবিত করে।[৪] American Marketing Association (AMA) বিপণনের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে তা হলো, বিপণন হলো কার্যক্রম, কোম্পানির সেট এবং বিক্রয়ের প্রস্তাব সৃষ্টি, যোগাযোগ, সরবরাহ ও বিনিময়ের প্রক্রিয়া যা ক্রেতা, গ্রাহক, অংশীদার ও বৃহত্তর সমাজের জন্য সুবিধা প্রদান করে।"[৫] অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বাজারজাতকরণের সহজতম সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেন, "বাজারজাতকরণ হচ্ছে লাভের জন্য ক্রেতাকে সন্তুষ্টি দান।"[৬]

ইসলামের আলোকে বাজারজাতকরণ

বাজারজাতকরণ নীতিমালা ইসলামি মু'আমালাতের অর্ন্তভুক্ত। ইসলামি দৃষ্টিকোণে বাজারজাতকরণ বলতে কেবল কোনো দ্রব্য বা সেবা ক্রয়, বিক্রয় ও মুনাফা অর্জনই উদ্দেশ্য নয়; বরং এগুলো আমাদের প্রতিদিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তথা মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে বাজারজাতকরণ নীতিমালা অনুধাবনে মু'আমালাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ জরুরি। আরবী 'মু'আমালাত' শব্দটির অর্থ হলো- লেনদেন। এর ব্যবহারিক অর্থ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোনো ধরনের লেনদেনকেই 'মু'আমালাত' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[৭] তাই ইসলামি দৃষ্টিকোণে বাজারজাতকরণের প্রতিটি পদক্ষেপই ইবাদাত তুল্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।"[৮]

মু'আমালাতের মূল বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমকালের পণ্য লেনদেনের পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের যে কোনো মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রমী ও অনুকরণীয়। তাঁর সুযোগ্য সহচর সাহাবা (রা.) গণ তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ ও নির্দেশনাকে সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি সংরক্ষণের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম লিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাসমূহ লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন।[৯] সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত নীতিমালা অনুসারে গৃহীত পদক্ষেপ প্রচলিত 'মার্কেটিং' নীতিমালায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা, সফলতা ইত্যাদির অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। রাসুল (সা.) একটি বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমূলক বাজারজাতকরণ নীতিমালা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান পুঁজিবাদী[১০] বিশ্বব্যবস্থায় অবাধ বাজারজাতকরণের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক[১১] ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগে বিনিয়োগকারী, গ্রাহক, সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র বিশ্ব একটি অসম ও অব্যবসায়িক বাজারজাতকরণ নীতিমালা অনুসরণ করে চলছে। ফলে প্রচলিত বাজারজাতকরণ নীতিমালা ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণ সমাজ গঠনে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বাজারজাতকরণে ইসলামি নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কারণ ইসলামি নীতিমালা ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বজনীন মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত এবং তা বিশ্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্টায় কার্যকর। ইসলামে শরিয়া দ্বারা

নির্ধারিত হালাল ও হারামের ভিত্তিতে করা হয় এমন সকল ক্রিয়াকলাপ তথা, লেনদেন - উৎপাদন, বিতরণ, আয়-ব্যয়কে ইবাদাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَاذَاۤ اُحِلَّ لَهُمۡ ؕ قُلۡ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বল, 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু।"[১২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِيۡنَةَ اللّٰهِ الَّتِىۡۤ اَخۡرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزۡقِ ؕ قُلۡ هِىَ لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا خَالِصَةً يَّوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ ﴿٣٢﴾ قُلۡ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَالۡاِثۡمَ وَالۡبَغۡىَ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ وَ اَنۡ تُشۡرِكُوۡا بِاللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ سُلۡطٰنًا وَّ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٣٣﴾

"বল, 'কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিয্ক'? বল, 'তা দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের জন্য, বিশেষভাবে কিয়ামত দিবসে'। এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য, যারা জানে। বল, 'আমার রব তো হারাম করেছেন সকল অশ্লীল কাজ– যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।"[১৩]

বাজারজাতকরণে প্রচলিত নীতিমালার সাথে ইসলামি নীতিমালার একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি বাজারজাতকরণের সংজ্ঞায়নে Alom & Haque বলেন, Islamic Marketing can be defined as: Processes and strategies fulfillment through products and services that are halal (tayyibat) by mutual consent and welfare (falah) of both parties that the buyer and seller for the purpose of achieving the material and spiritual welfare in this world and hereafter.[১৪] "ইসলামি বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারে, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া ও কৌশল করা, যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি এবং কল্যাণকর উপায়ে হালাল পণ্য এবং সেবা চাহিদা পূরণ করা, যার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করা।" এ সংজ্ঞা থেকে ইসলামি বাজারজাতকরণের পাঁচটি মৌলিক উপাদান চিহ্নিত হয়- সেগুলো হলো- ১. কৌশল (হিকমাহ), ২. প্রয়োজন, ৩. হালাল (তাইয়্যেবাহ), ৪. পারস্পরিক সম্মতি, ৫ কল্যাণ (ফালাহ)।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে মানুষের প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে হালাল তথা বৈধ পন্থায় বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে ক্রেতা ও বিক্রেতার দুনিয়া ও আখিরাতের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনই হলো ইসলামি বাজারজাতকরণ।

ইসলামের আলোকে বাজারজাতকরণ নীতিমালা

বাজারজাতকরণে আওতা এবং আওতাভুক্ত এসব বিষয়ের নীতিমালা তথা বাজারজাতকরণের কার্যাবলী নিয়ে আধুনিক বিপণন বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। বাজারজাতকরণ কার্যাবলি নিম্নোক্ত সারণী থেকে সহজে অনুধাবন করা যায়-

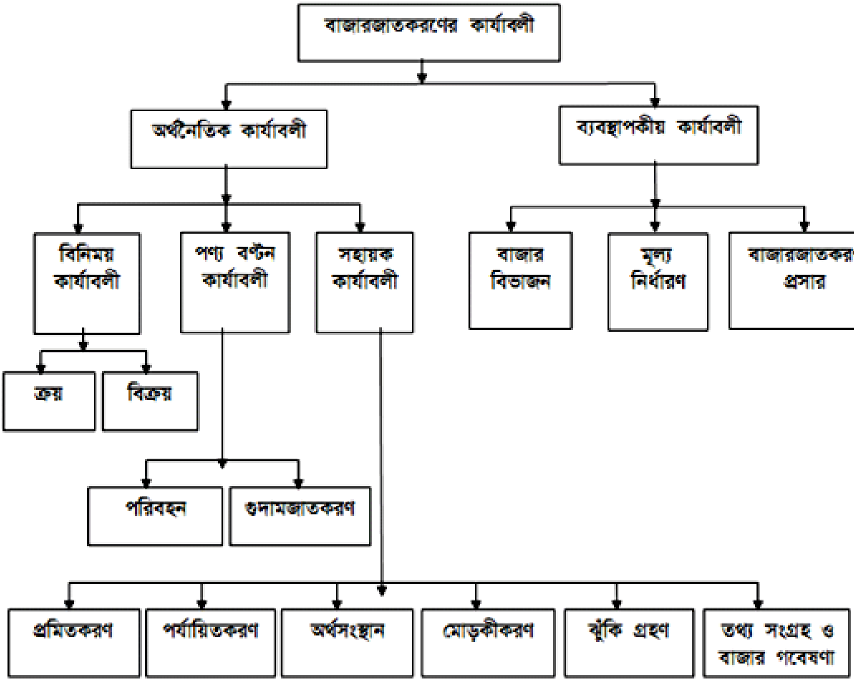

উপরিউক্ত সারণী বিশ্লেষণ করে বাজারজাতকরণের যে সকল কার্যাবলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলো- ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণ, অর্থসংস্থান, মোড়কীকরণ, ঝুঁকি গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ ও বাজার গবেষণা, বাজার বিভাজন, মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ প্রসার। নিম্নে এ সকল বিষয়াদি ইসলামি নীতিমালার আলোকে উপস্থাপন করা হলো-

১. ক্রয়-বিক্রয়

বাজারজাতকরণের প্রধান উপাদান হলো ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয় এ দুয়ের মাধ্যমেই বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন হয়। ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রয়বিক্রয়কে হালাল করেছে আর সুদকে হারাম করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”[১৫]

তবে সকল ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ইসলাম হালাল করেনি। ইসলামি বাজারজাতকরণ নীতিমালার অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা। ইসলামি শরিয়ত ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করেছে। সুতরাং কেবল ইসলাম নির্দেশিত বৈধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন ক্রয়-বিক্রয়ই এখানে আলোচ্য বিষয়। ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি পদ্ধতি হলো-

ক. **বায় মুরাবাহা** (بيع مرابحة) : মুরাবাহা (مرابحة) অর্থ লাভে বিক্রয় করা। মাল ক্রয়ের পর ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যুক্ত করে তা পুনরায় বিক্রয় করে মালের মালিকানা অন্যের নিকট হস্তান্তর করে দেওয়াকে বায় মুরাবাহা বলা হয়। প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে বায় মুরাবাহা বলা হয়।[১৬] বায় মুরাবাহার বৈধতা সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ اَبِي بَحْرٍ , عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ , قَالَ: رَاَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِزَارًا غَلِيظًا , قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَمَنْ اَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ اِيَّاهُ

"আবু বাহার থেকে বর্ণিত, তিনি তাদের এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-এর কাঁধের উপর একটি মোটা চাদর দেখতে পেলাম। তখন আলী (রা.) বললেন, আমি এটা পাঁচ দিরহামে কিনেছি। যে আমাকে এর ক্রয় মূল্যের ওপর এক দিরহাম লাভ দিবে আমি তার কাছে তা বিক্রয় করব।"[১৭]

খ. **বায় মু'আজ্জাল** (بيع مؤجل) : মু'আজ্জাল (مؤجل) অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়, নির্ধারিত সময়ে দাম পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে বিক্রয়। বায় মু'আজ্জাল এর সংজ্ঞায়নে ড. এম. উমর চাপরা বলেন, Bai-muazzal refers to sale against deffered payment either in lumpsum or instalments.[১৮] অর্থাৎ, "ভবিষ্যতের নির্ধারিত কোনো সময়ে, এক সাথে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করাকে বায় মু'আজ্জাল পদ্ধতি বলা হয়।" বায় মুআজ্জাল সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "মহানবী (স) জনৈক ইহুদির কাছ থেকে কিছু খাদ্য বাকিতে ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে একটি লৌহ বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।"[১৯]

গ. বায় সালাম (بيع سلام) **:** সালাম (سلام) অর্থ হস্তান্তর করা, অগ্রিম প্রদান করা ইত্যাদি। বায়-সালামের সংজ্ঞায়নে মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী বলেন, "সালাম এমন একটি ক্রয়-বিক্রয় যার মাধ্যমে বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতের কোনো একটি তারিখে নির্দিষ্ট জিনিস ক্রেতাকে সরবরাহ করবে এবং তার বিনিময়ে পূর্ণ মূল্য বিক্রির সময়ই অগ্রিম নিয়ে নেয়।"[২০] বায় সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে হাদিসের বাণী-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، اِلَى اَجَلٍ مَعْلُومٍ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন সেখানকার অধিবাসিগণ এক বছর ও দুই বছর মেয়াদের জন্য বায় সালাম পদ্ধতিতে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করছিল। মহানবী (সা.) তা দেখে বললেন, "যে অগ্রিম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে চায় সে যেন ওজন ও পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করে, নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করার কথা দিয়ে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে।"[২১]

ঘ. বায় ইসতিসনা (استصناع) : ইসতিসনা (استصناع) শব্দের অর্থ তৈরি করা, প্রস্তুত করা, বানানো ইত্যাদি। আদেশ গ্রহণ করে মাল বানিয়ে বা সংগ্রহ করে বিক্রয় করার নাম 'বায় ইসতিসনা'। এ সংজ্ঞায়নে মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী বলেন, "ইসতিসনা ক্রয়-বিক্রয়ের এক ভিন্ন প্রকার যে প্রকারে পণ্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়। ইসতিসনা অর্থ হচ্ছে কোনো প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান (ম্যানুফ্যাকচারার)-কে ক্রেতার জন্যে নির্দিষ্ট জিনিস তৈরি করে দেয়ার অর্ডার দেয়া। যদি তৈরিকারী (Manufacturer) প্রতিষ্ঠান নিজের পক্ষ হতে কাঁচামাল দিয়ে ক্রেতার জন্য দ্রব্য তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে ইসতিসনা চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করবে; কিন্তু ইসতিসনা সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য হলো- মূল্য উভয়ের সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত করে নিতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের (যা তৈরি করা হবে) প্রয়োজনীয় গুণাবলিও নির্ধারিত করে নিতে হবে।"[২২] ক্রয়-বিক্রয়ের একটি শরীআ-সম্মত পদ্ধতি হলো ইসতিসনা। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি স্বর্ণের আংটি অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন।"[২৩]

সুতরাং, ইসলামি বাজারজাতকরণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে শরীআ সম্মত ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে ব্যবসা সম্পন্ন হতে হবে। একইসাথে ইসলাম নির্ধারিত নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে হবে। নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি হলো-

- ক. **মুলামাসা তথা স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় :** এটি হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে: তুমি যে কাপড়টি স্পর্শ করবে তা তোমাকে দশ টাকাতে দেয়া হবে। এ ধরণের ব্যবসা হারাম; কারণ এতে পণ্যের অস্পষ্টতা ও ধোঁকার ব্যাপার রয়েছে।
- খ. **মুনাবাজা তথা ঢিল মারার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় :** এটি হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলবে: তুমি যে কাপড়টিই আমার প্রতি ছুড়ে মারবে তাই আমি এত টাকা দিয়ে নিতে বাধ্য। এ ব্যবসাও হারাম কারণ, এতেও অস্পষ্টতা ও ধোঁকা রয়েছে।

গ. **হাসাত তথা পাথর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় :** এটি হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা বলবে এই পাথরটি নিক্ষেপ কর, ফলে পাথর যে কাপড়টির উপর নিক্ষিপ্ত হবে তা তোমাকে এত টাকায় দেয়া হবে। এ ব্যবসাও সঠিক নয় কারণ; এতেও অস্পষ্টতা ও ধোঁকা রয়েছে।

ঘ. **নাজাশ তথা মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় :** এটা হচ্ছে ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই দামাদামি করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। এ ব্যবসাও হারাম কারণ; এতে অন্যান্য ক্রেতাদের জন্য ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা রয়েছে।

ঙ. **গেঁয়ো ব্যক্তির পণ্য শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রি :** গেঁয়ো ব্যক্তির নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে বাজারদর অপেক্ষা বেশি দামে পণ্য বিক্রি করা। এ ধরণের বিক্রি সঠিক নয়; কেননা এতে লোকজনের ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে। কিন্তু যদি শহুরে ব্যক্তির নিকট গ্রাম্য ব্যক্তি এসে তার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের আবেদন জানায় তাহলে সে তা করতে পারে।

চ. **পণ্য হাতে বুঝে না পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা :** এটি বৈধ ব্যবসা নয়; কেননা এটা ঝগড়া ও লেনদেন ভঙ্গ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত: বিক্রেতা যখন দেখবে যে ক্রেতা এতে লাভবান হতে যাচ্ছে।

ছ. **ঈনা ব্যবসা :** এটি হলো কারো নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বাকিতে কোন পণ্য বিক্রি করে উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম দামে নগদ মূল্যে তা ক্রয় করা। ফলে এতে এক ব্যবসাতে দুই ব্যবসা একত্র করা হয় যা হারাম; কেননা এ হচ্ছে সুদের পথ প্রদর্শক।[২৪]

জ. **প্রত্যেক হারাম বস্তুর ব্যবসা নিষিদ্ধ :** যেমন: মদ, শূকর, মূর্তি- প্রতিমা। অথবা যা হারামের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় যেমন: বাদ্যযন্ত্র। এসব ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি হারাম।

ঝ. **অজানা ও ধোকার ব্যবসা :** হারাম ব্যবসার মধ্যে একটি ব্যবসা হচ্ছে: “হাবলুল হাবলা” ও “মালা-কীহ” তথা পশুর গর্ভে বিদ্যমান বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়। ঠিক তদ্রূপ “মাযামীন” তথা ষাঁড়ের পিঠে বিদ্যমান বীর্যের ব্যবসা, নর উটের পাল দিয়ে উপার্জন এবং পাল দেওয়ার জন্য নর পশু ভাড়া দেয়া। এমনিভাবে কুকুর, বিড়ালের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন, জ্যোতিষীর কামাই। এমনিভাবে অস্পষ্ট ও ধোঁকার সাহায্যে ব্যবসা। অনুরূপ যে বস্তু ন্যাস্ত করা অসম্ভব যেমন: আকাশে উড়ন্ত পাখি।

ঞ. **পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি :** ফল বা ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি করা হারাম।[২৫]

২. পরিবহণ

পরিবহণ ব্যবস্থা পণ্যের বাজারজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষ পণ্য এক স্থান থেকে ক্রয় করে অন্য স্থানে নিয়ে বিক্রয় করে। এভাবে উৎপাদিত পণ্য জনগণের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়। ইসলামও পণ্য বাজারজাতকরণের স্বার্থে এক স্থান থেকে পণ্য সংগ্রহ করে অন্য স্থানে বিক্রয়কে অনুমোদন করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে নিয়োজিত হবে।[২৬]

এখানে ভ্রমণ অর্থ ব্যবসার কাজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতকে বুঝায়।

৩. গুদামজাতকরণ

বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে গুদামজাতকরণ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের পণ্য সংগ্রহ করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তার নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জমা করে রাখেন, এক সাধারণভাবে গুদামজাতকরণ বলে। সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, সাধারণভাবে সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা জায়েয এবং অধিকাংশের মতে তাতে নির্ধারিত কোনো সময়ের শর্ত নেই। কারো মতে, কারো পরিবার পরিজনসহ এক বছর চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক সঞ্চয় করা মাকরূহ। আর যদি ব্যবসায়ী অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় পণ্য জমা রেখে মানুষকে কষ্ট দেয়, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা বাজারে না ছাড়ে তাহলে তা ইহতিকার বা মজুদদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অবৈধ ও হারাম হবে। মজুদদারী হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদিসে বাণী,

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

"হযরত মা'মার বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অপরাধী ব্যতীত কেউই গুদামজাত করে রাখে না।"[২৭]

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

"গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।"[২৮]

ইসলামি শাস্তি আইনের আওতায় মজুদদারীকে বেত্রাঘাত, আর্থিক জরিমানা বা দেশান্তর করা যাবে। যাতে করে সমাজে কেউ এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস না পায়।[২৯] তবে কারো মজুদ করায় যদি বাজারে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে তবে তার মজুদ করায় কোনো অপরাধ হবে না।[৩০]

৪. নতুন উপযোগ তৈরি : প্রমিতকরণ-পর্যায়িতকরণ

পণ্য বা দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তা ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা বাজারজাতকরণের একটি অন্যতম মাধ্যম। ইসলামও বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে প্রমিতকরণ ও পর্যায়িত করে বিক্রয় করা বৈধ ঘোষণা করেছে। কেননা পণ্য উৎপাদন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈপুণ্য, সম্পদ অথবা নেহায়েত সময়ের অভাবে মানুষের পক্ষে তার প্রয়োজনীয় সব পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়।[৩১] তাই আমরা বাধ্য হয়েই কারো না কারো উৎপাদিত পণ্য ভোগ করি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণে মুনাফা অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো পণ্য উৎপাদন। আর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রি করে মুনাফা নিশ্চিত করা হয়। তাই বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম যেকোনো হালাল পণ্য উৎপাদনে বৈধতা দেয়ার পাশাপাশি হারাম পণ্য উৎপাদনে নিষেধ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

"তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে আর অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করা হয়েছে।"[৩২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"হে মানব সম্প্রদায়, দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৩]

তবে এ পর্যায়ে কোনো ধরনের ভেজাল মিশ্রণ করা বৈধ নয়। একইভাবে প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ পর্যায়ে দোষ-ত্রুটিযুক্ত পণ্য আলাদা করে ভালো পণ্য আলাদা করতে হবে। যাতে করে কেউ ভালো পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে খারাপ পণ্য কিনে প্রতারিত না হয়। এজন্য ইসলামি বাজারজারতকরণ নীতিমালায় যে কোনো ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ না করে গোপন রাখা হারাম। ইসলামি পরিভাষায় একে তাদলীস (التدليس) বলা হয়। একই সাথে ভেজাল মিশ্রণ ইসলামে নিষিদ্ধ। ভেজাল মিশ্রিত পণ্য ব্যবহারে মানুষ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ও ভেজাল মিশ্রণ দ্বারা ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। ইসলাম কারো ক্ষতি করা সমর্থন করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।[৩৪] তাই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভেজাল মিশানো দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে আয়-উপার্জনও ইসলামে হারাম। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যবসায়ী! এ কি ব্যাপার?" ব্যবসায়ী বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজাগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৩৫]

ইসলামি শাস্তি আইনের আওতায় পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীকে বেত্রাঘাত, আর্থিক জরিমানা বা দেশান্তর করা যাবে। যাতে করে সমাজে কেউ এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস না পায়।[৩৬]

৫. অর্থসংস্থান

ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাজারজাতকরণের সাথে অর্থসংস্থানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম অর্থসংস্থানের নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। এগুলো হলো-

ক. আল-ওয়াদিয়াহ (الوادية) পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ : আল-ওয়াদিয়া চুক্তিতে দু'টি পক্ষ থাকে। জমাগ্রহণকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। জমাকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দি'। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক বা ব্যবসায়ী (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারীর (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) ব্যবহারের অনুমতির ভিত্তিতে জমা নেয়। ব্যাংক বা ব্যবসায়ী জমাকারীর সম্মতির ভিত্তিতে সে অর্থ ব্যবহার করে, তবে জমাকারীকে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এ পদ্ধতিতে জমাকারী কোনো প্রকার লাভ বা লোকসানের অংশীদার হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা আল-ওয়াদিয়াহ আমানত গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এ পদ্ধতির অন্যতম দুটি দিক হলো- ১. প্রাপ্ত অর্থ আমানত হিসেবে নয়; বরং ঋণ হিসেবে গণ্য হবে, এবং আমানতকারী চাওয়ামাত্র পাওয়ার অধিকারী হবে। ২. আমানতদার প্রাপ্ত অর্থ নিজ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারবেন। আল-ওয়াদিয়াহ পদ্ধতিতে অর্থসংস্থানের দলিল হিসেবে হাদিসের বাণী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন,

وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ، اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ اِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَاِنِّي اَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ

যুবায়ের (রা.)-এর ঋণ থাকার কারণ এই যে, তার কাছে কেউ যখন কোনো মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুবায়ের (রা.) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার কাছে আমানত হিসেবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) আরো বলেন,

وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ اَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ اَلْفٍ

যুবায়ের (রা.) গাবাস্থিত ভূমিটি ১ লাখ ৭০ হাজার দিনার দ্বারা ক্রয় করেছিলেন, আর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ১৬ লাখের বিনিময়ে তা বিক্রি করেন।"[৩৭]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ওয়াদিয়া আমানত দ্বারা ব্যবসায় করা ও তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুনাফা দ্বারা আমানত পরিশোধ করা যাবে।

খ. মুদারাবা المضاربة **পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ :** এ পদ্ধতিতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দু'টি পক্ষ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন, কিন্তু তিনি ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নেন না। অন্যপক্ষ তার মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার উদ্যোগ নেন। মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থসংস্থানের দলীল হিসেবে হাদিসের বাণী,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَاِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَجَازَهُ

"হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) মুদারাবা পদ্ধতিতে মূলধন বিনিয়োগ করতেন এবং মুদারিবের ওপর নিম্নবর্ণিত শর্তাদি আরোপ করতেন : (ক) মুদারিব তার মালামাল নিয়ে সাগরপথে পরিভ্রমণ করবেন না; (খ) উপত্যকা পাড়ি দেবেন না; (গ) গবাদিপশু কেনাবেচার ব্যবসায় করবেন

না। এসব শর্ত লঙ্ঘন করে কারবার করলে এবং তাতে ক্ষতি হলে মুদারিব সেজন্য দায়ী হবেন। এ শর্তগুলো মহানবী (সা.)-কে পড়ে শোনানো হলে তিনি তাতে অনুমোদন দেন।"[৩৮]

গ. মুশারাকা مشارقة পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ : মুশারাকা অর্থ শরীক বা অংশীদার হওয়া। এ পদ্ধতিতে উভয়পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ মূলধন যোগান দেয়, চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ে নির্ধারিত সময় দেয় এবং চুক্তি অনুসারে লাভ বা লোকসানের অংশ বহন করে। এ সম্পর্কে ড. এম. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, "শিরকাতের অর্থ হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো কারবারে নির্ধারিত পরিমাণে মূলধন নিয়ে সকলে মিলে কারবার এবং লাভ-লোকসানে নির্ধারিত পরিমাণে অংশীদার থাকার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে কারবার করা।"[৩৯] মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থসংস্থানের দলীল হিসেবে হাদিসের বাণী,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: اِنَّ اللهَ يَقُولُ: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নাম করে বললেন, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, দু'জন অংশীদারের (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো ব্যবসায় করলে তাদের) সাথে আমি (আল্লাহ) তৃতীয় জন হয়ে থাকি যতক্ষণ না তাদের একজন তার অপর সাথি (অংশীদার) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত করে। আর যখনই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি।"[৪০]

৬. মোড়কীকরণ

বর্তমান সময়ে মোড়কজাত পণ্যের ব্যবহার অধিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ সঠিক পরিমাপ ও সঠিক পণ্য মান পাওয়ার আশায় খোলা পণ্য কেনার চেয়ে মোড়কজাত পণ্য কিনতে অধিক আগ্রহী হচ্ছে। সাধারণ মানুষের এ চাহিদাকে পুঁজি করে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ওজনে কম দিয়ে পণ্য মোড়কজাত করছে। ইসলাম এ ধরনের অপরাধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

"ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।"[৪১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

"আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"[৪২]

৭. ঝুঁকি গ্রহণ

ব্যবসার একটি অন্যতম দিক হলো মুনাফার অংশ ভোগ করার পাশাপাশি লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করা। কেননা লোকসানের ঝুঁকি থাকায় উৎপাদনে-ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করার পর ব্যবসায়ী দক্ষতার সাথে পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায় করে ফলে কর্মবিমুখতার পরিবর্তে কর্মতৎপরতা তৈরি হয়। ইসলামি বাজারজাতকরণেও ঝুঁকি গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামি শরিয়তে কোনো

অবস্থাতেই কোনো ব্যবসায়িক অংশীদারকে নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা শর্ত করা যাবে না;[৪৩] বরং লাভের জন্য ঝুঁকিবহন নীতি বজায় থাকবে। আর ঝুঁকি বিহীন ব্যবসা হলো সুদ, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ

"রাসুল (সা.) সুদদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।"[৪৪]

৮. তথ্য সংগ্রহ ও বাজার গবেষণা

বাজারজাতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পণ্য, ক্রেতা, লাভ-লোকসনা ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও বাজার গবেষণা করে ব্যবসা শুরু করা। কেননা যথাযথ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ব্যতীত কোনো ব্যবসা শুরু করলে সে ব্যবসায় লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং ইসলামি বাজারজাতকরণের নীতি হলো চিন্তা-গবেষণা করে ব্যবসা শুরু করা। ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিন্তা-গবেষণা করতে উৎসাহ দেয়। এবং বাজার গবেষণায় প্রয়োজনে অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।"[৪৫]

চিন্তা-গবেষণা ও পরিকল্পনা করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন ইউসুফ (আ.) কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۭ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ . قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ . وَ قَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ . يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ . قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ .

"রাজা বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যতি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও।' তারা বললেন, এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর যার স্মরণ হলো সে বললো, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বললো, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারব এবং যাতে তারা

জানতে পারে। ইউসুফ বললেন, তোমরা সাতবছর একাধিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে এর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে; এরপর সাতটি কঠিন বছর, এর সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু তোমরা যা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে একবছর সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।"[৪৬]

৯. বাজার বিভাজন

ইসলাম বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত দালালি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামি পরিভাষায় একে নাজ্‌শ বলা হয়। এটি হলো এমন পদ্ধতি যাতে, দামাদামি করে কোনো পণ্যের প্রকৃত মূল্য বাড়িয়ে দেয়া। যে বা যারা দামাদামি করছে তাদের কেনার উদ্দেশ্য থাকে না; বরং উদ্দেশ্য থাকে প্রকৃত ক্রেতাকে এটা বোঝানো যে, পণ্যটি এতই ভালো ও দামী যে, প্রতিযোগিতামূলকভাবে অন্যরাও এটা কিনতে আগ্রহী। ইসলাম এ ধরনের দালালি নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنَاجَشُوا، .

"আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে দালালি করার উদ্দেশে) দাম বাড়িয়ে বলবে না।"[৪৭]

তবে কোনো ক্রেতা যদি পণ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকায় কারো আশ্রয় নিয়ে পণ্য দামাদামি করে ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের দালালি বৈধ হবে। কেননা এখানে দালাল প্রকৃত ক্রেতারই প্রতিনিধি হিসেবে দামাদামি করে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, দালাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনিময়ের লোভের বশবর্তী হয়ে জনসাধারণের কল্যাণের কথা ভুলে যায়। তবে এটি ব্যতীত সাধারণভাবে দালালি করতে কোনো পাপ নেই। কেননা তা হলো নির্দেশনা, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝখানে থাকা। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অনেক সুবিধা হয়।[৪৮] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

"তোমরা কল্যাণ ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।"[৪৯]

একই সাথে দালাল কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে অন্য বিক্রেতাদের বাজার থেকে সরিয়ে ক্রেতাকে বিশেষ সুবিধা পেতে সহায়তা করাও হারাম। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ اَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِمَّا اَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَاِمَّا اَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا.

"সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) (একবার বাজারে) হাতিব ইবন আবি বালতা (রা.)-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি বাজারে তার কিশমিশ বিক্রয় (বাজার দর হতে সস্তা মূল্যে- মুনাক্কা) করছিলেন। উমর (রা.) তাকে বললেন, হয়তো মূল্য বাড়িয়ে (ন্যায্য মূল্যে) বিক্রয় করুন, নচেৎ আমাদের বাজার হতে পণ্য গুটিয়ে নিন।"[৫০]

১০. মূল্য নির্ধারণ

বাজারজাতকরণের সাথে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামি আইনে মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বোঝায় যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী গোষ্ঠীর যেন ক্রয় করতে কষ্টসাধ্য না হয়। বিক্রেতা তার উৎপাদন খরচের সাথে আনুষাঙ্গিক খরচ যোগ করে লভ্যাংশসহ পণ্য বিক্রয় করে। বর্তমান সমাজে অনেক সময় বিক্রেতা অধিক মুনাফার আশায় নিজ খেয়ালখুশিমতো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চললে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললো : ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন নবী (সা.) বললেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনিই মূল্যবৃদ্ধি করেন, তিনিই সস্তা করেন। রিযকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, তোমাদের কারো রক্ত বা ধন-সম্পদের ব্যাপারে কোনরূপ অন্যায়-অবিচারের দাবি আমার উপর থাকবে না।"[৫১] এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, "উপরোক্ত হাদিসের অর্থ এ নয় যে, সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। জুলুম করে যদি জনসাধারণের উপর এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় তবে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ হবে হারাম। একইসাথে জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার কার্যকর করার জন্যে যদি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যেমন, প্রচলিত দামে বিক্রয় করতে বিক্রেতাকে বাধ্য করা অথবা প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি নেয়া থেকে বাধা দেয়া হয় তবে তা শুধু জায়েয-ই নয়; বরং ওয়াজিবও বটে।[৫২] সর্বোপরি, মুসলিম সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহা) বিবেচনায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

১১. বাজারজাতকরণ প্রসার

বাজারজাতকরণের প্রসার তথা বিক্রি বৃদ্ধি করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাজারজাতকরণের অন্যতম একটি দিক। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাজারজাতকরণ প্রসার করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর উপায় হলো বিজ্ঞাপন দেয়া। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারে পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাকে পণ্যের গুণাগুণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করা হয়। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পণ্য সম্পর্কে ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণে মিথ্যার আশ্রয়, প্রতারণা, বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার ইত্যাদি ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ করা হয়। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালা হলো। প্রথমত, মিথ্যা শপথের আশ্রয় নেবে না। দ্বিতীয়ত, যে বিজ্ঞাপন অন্যান্য ব্যবসায়ী বা উৎপাদকদের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বা সাধারণ জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত মুনাফা আনয়নে সহায়তা করে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। তৃতীয়ত, বিজ্ঞাপনে বিক্রিত দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ, দাম ও গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। চতুর্থত, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজের পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে পাশাপাশি অন্যের দ্রব্যের সমালোচনা করা যাবে না।[৫৩] এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা বেচাকেনায় সত্য কথা বলে এবং জিনিসের দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে তাহলে বেচাকেনায় বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলেও জিনিসের দোষ গোপন করে তাহলে বেচাকেনায় বরকত বা কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়।"[৫৪]

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন,

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

"কসম খাওয়ায় মালের কাটতি অধিক হয়, কিন্তু তা বরকত দূর করে দেয়।"[৫৫]

সবশেষে, ইসলামি পর্দা প্রথা লংঘন করে বিজ্ঞাপনে নারীর অযাচিত ব্যবহারসহ ইসলামি শরীআ নিষিদ্ধ সকল কাজ থেকে বিরত থাকা ও অত্যাবশ্যক।

১২. পর্যটন শিল্পের বাজারজাতকরণে সতর্কতা

বর্তমান সময়ে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক বাজারজাতকরণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যটকদের কাছে দর্শনীয় স্থান বাজারজাত করা হয়। আমাদের দেশেও বিনিয়োগ বোর্ড, পর্যটন কর্পোরেশন, টুরিজম বোর্ড, বেজপা, বিসিক ইত্যাদি সংগঠন বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও পর্যটনের স্থানগুলো বাজারজাতকরণের চেষ্টা করছে।[৫৬] পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ করে মহান আল্লাহর সৃষ্টির বৈচিত্র দেখে তার শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি দেখে পরকালীন শাস্তির প্রতি চিন্তাশীল হতে ইসলাম অনুপ্রাণিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ

"বল, 'তোমরা জমিনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ' কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন।"[৫৭]

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

"তোমরা জমিনে বিচরণ কর, এবং দেখো কিভাবে আমি মিথ্যাবাদীদের শাস্তি দিয়েছি।"[৫৮]

ইসলামি দৃষ্টিকোণে ভূমির মালিকানা মহান আল্লাহর, মহান আল্লাহ মানুষকে তা ব্যবহারের জন্য ভোগাধিকার দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ.

"আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।"[৫৯]

তাই মানুষ তার নিজস্ব ভোগাধিকারভুক্ত সম্পত্তিতে থাকা পর্যটন স্থানের বাজারজাতকরণ করতে পারবে এবং এ ভূমি থেকে মুনাফা লাভ করতে পারবে। তবে এ মুনাফা তার বিনিময় মূল্য নয়; বরং তার ভোগাধিকারভুক্ত সম্পত্তির ইজারালব্ধ অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। হানাফী আলেমদের

নিকট ইজারার পণ্য হলো মুনাফা ও উপকার। ক্ষেত্রভেদে উপকারিতা ভিন্ন হয়ে থাকে।[৬০] মালেকী ও শাফেয়ী আলেমদের মতে, ইজারার পণ্য হয়তো মূল জিনিসের উপকাররিতা কিংবা দায়িত্বে আবশ্যক উপকারিতা।[৬১] এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ভূমি ইজারা দিয়ে মুনাফা লাভ করা যাবে। তবে শরীআ বিরোধী পর্যটন বা আনন্দ-বিনোদন করা যাবে না। তাই পর্যটন শিল্পের বাজারজাতকরণে অত্যন্ত সতর্ক নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

বাজারজাতকরণের ইসলামি নীতিমালায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ। ইসলাম পণ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইসলাম একজন ভোক্তার নিম্নোক্ত অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে- ১. পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত বিস্তারিত এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়ার অধিকার, ২. সঠিক পরিমাপ পাওয়ার অধিকার, ৩. ভেজালমুক্ত পণ্য পাওয়ার অধিকার, ৪. ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয়ের অধিকার, ৫. খিয়ার তথা পণ্যের দোষ-ত্রুটি থাকলে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের অধিকার।

সুপারিশমালা: ইসলাম বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ বিবেচনা করে বিধান প্রবর্তন করেছে। বাজারজাতকরণে ইসলামি নীতিমালা অনুসরণে প্রচলিত বাজারজাতকরণ নীতিমালার সাথে নিম্নোক্ত বিষয়ে সমন্বয় সাধন করা জরুরী–

- পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার হালাল পণ্য উৎপাদন।
- পণ্য গুদামজাত করা যাবে, তবে মজুদ করা যাবে না।
- বাজারমূল্য ও জনসাধারণের সাধ্য বিবেচনায় প্রয়োজনে সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেবে।
- পণ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি শাস্তি আইনের আলোকে কঠোর আইন প্রণয়ন।
- বাজার মূল্যায়নে সরকারী আইন-শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি।
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া।
- সেবা পণ্যের ক্ষেত্রে মানবসেবা বিবেচনায় আনা।
- পণ্য উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় সুদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা।
- পণ্যের বিজ্ঞাপনে ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ।
- ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা।
- ব্যবসায়িক যাকাত পরিশোধ করে ব্যবসাকে পুতঃপবিত্র রাখা।
- বাজারজাতকরণে ইসলামি নীতি ও নির্দেশনা তুলে ধরে জনসচেতনতা তৈরি।

উপসংহার

জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জন প্রয়োজন আর মহান আল্লাহ ইবাদতের পরপরই উপার্জন করতে আদেশ দিয়েছেন। মানুষ যে সকল মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তন্মধ্যে ব্যবসা অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সমাজ শোষণের হাতিয়ার সুদের

প্রচলন রয়েছে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুষম শোষণহীন অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রতীক 'মুনাফা' গ্রহণকে হালাল করা হয়েছে আর হারাম করা হয়েছে শোষণের হাতিয়ার সুদকে। ব্যবসায় উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় এ তিনটি পরিভাষায় সম্পর্কিত। এ তিনটি উপাদানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার নাম ব্যবসা, যা থেকে মুনাফা অর্জিত হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জনের অন্যতম দিক হলো মুনাফা। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিময়ের ফলে শ্রম, বুদ্ধি ও মুলধনের বিনিয়োগে অর্জিত অর্থই মুনাফা। ইসলামি দৃষ্টিকোণে উদ্যোক্তা ও মুনাফার সম্পর্ক রয়েছে, তবে উদ্যোক্তাই সকল মুনাফার অধিকারী নয়, বরং উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সমাজের গরিব-দুঃখী সকলেই এই মুনাফার অধিকারী। তাই উৎপাদনকারী তথা উদ্যোক্তা তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করবেন– এটাই ইসলামের দাবি। এর ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ এর সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিক, মালিক সর্বোপরি, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক উপকৃত হবে। আর এ এটিই ইসলামি অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"এবং আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী পরম সত্যতাসহ সৃষ্টি করেছেন, আর উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিটি প্রাণী যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল যেনো তাকে দেওয়া যায়। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।"[৬২]

ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের দু'রকম জীবনেই সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। দুনিয়ার বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রতিটি হালাল কাজে পুরো ক্ষমতা নিয়ে অংশগ্রহণের তাগিদ দিয়েছে। বিশেষ করে ব্যবসায় বাণিজ্যে মুনাফা অর্জনকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে সম্মান করতে বলেছে। পৃথিবীর সুখ-সুবিধা লাভ ও ভোগের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড লালসা আর স্বাভাবিক ঝোঁকের কথা ইসলাম এড়িয়ে যায়নি। এ কারণে ইসলাম সকল ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অনুসরণের তাগিদ দিয়েছে, হালাল পথ অবলম্বন করে কাজ করতে বলেছে। তাগিদ দিয়েছে ব্যবসায় বাণিজ্যে পূর্ণ সততা অবলম্বনের জন্য। বোঝাতে চেয়েছে, ব্যবসায় বাণিজ্যে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনই কোনো মুসলিম ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। নিষিদ্ধ করেছে নিজের পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করতে, ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করতে, মাপে কম দিতে এবং পণ্যে ভেজাল মেশাতে। সর্বোপরি ইসলামে নৈতিক আদর্শ বাস্তাবায়নের মাধ্যমে ইসলাম-নির্দেশিত বাজারজাতকরণ নীতিমালা অনুসরণ করে মুনাফা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ড. মীজানুর রহমান, *বাজারজাতকরণ দর্শন ও প্রযুক্তির অব্যবসায়িক প্রয়োগ* (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৬), পৃ. প্রসঙ্গ কথা।

২. Marketing is the process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return. [Philip Kotler & Gary Armstrong, *Principles of Marketing* (UK : Pearson Education International, 2010), 13th edn, P. 5]

৩. Marketing is the process of developing and exchanging ideas, goods and services that satisfy customer and organizational needs, using the principles of pricing, promotion and distribution. [Courtland L. Bovee. Michael J. Houston & John V. Thill, *Marketing* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1995), 2nd edn, P. 5]

৪. Marketing consists of those efforts which affect transfers in the ownership of goods and services and care for their physical distribution. [Fred E. Clark & Carrie Patton Clark, *Principles of Marketing* (New York : The Macmillan Company, 1947), 3rd edn, P. 1]

৫. Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. [Yudi Fernando and others, *New Marketing Definition: A Future Agenda For Low Cost Carrier Airlines in Indonesia* (Indonesia : Business Strategy Series, 2012), Vol-13(1), p. 31 – 40.]

৬. ড. মীজানুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৭. মুহাম্মদ হারোয়ান সুক্রি বিন মুহাম্মদ হোসাইন ও মুহাম্মদ হাওয়ারী বিন মুহাম্মদ হোসাইন, *শরিআহ্'র ধারণা এবং ইসলামী অর্থায়নে এর প্রয়োগ কৌশল*, মাহমুদ জামাল অনূদিত (ঢাকা : সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলোপমেন্ট, ২০১৭), পৃ. ৪৬

৮. *আল-কুরআন*, ৫১ : ৫৬

৯. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদিস লিখার ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পরবর্তীতে বিশেষ করে হিজরতের পর ৬২২ খৃ. কুরআন ও হাদিসের পারস্পরিক পার্থক্যবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে একদিকে যেমন হাদিস লিখার সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়, অন্যদিকে নরী (সা.) এর নির্দেশ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ "ইলমে হাদিসকে লিপিবদ্ধ করে রাখ।" [ইবন আব্দিল বার, *জামি'উ-বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী* (সউদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৮/১৪১৯), খ. ১, পৃ. ৭২]-এর আলোকেও অনেক হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়।

১০. পুঁজিবাদ হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পুঁজি বা মূলধনকে ব্যবহার করে অধিকতর আয় ও সম্পদ অর্জনে সক্ষম হয়। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল এই প্রক্রিয়াটিকে পরিচালনা করার ব্যবস্থা। [শেখ মাহমুদ আহমদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, গুলশান মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ১]

১১. সমাজের সাধারণ লোকের স্বার্থে উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের সকল উপায় সামাজিক মালিকানায় আনয়ন করে সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এর উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় সেটাই হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। [শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *অর্থনীতি: পুঁজিবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা : গ্রন্থমেলা, ১৯৯৬), পৃ. ২৭]

১২. *আল-কুরআন*, ৫: ৪

১৩. *আল-কুরআন*, ৭ : ৩২-৩৩

১৪. Md. Mahabub Alom & Md. Shariful Haque, *Marketing: An Islamic Perspective* World Journal of Social Sciences, Vol. 1. No. 3. July 2011, P. 75

১৫. *আল-কুরআন*, ২ : ২৭৫

১৬. ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, মে ২০০৫), পৃ. ৮৬

১৭. আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মূসা আবু বকর বায়হাকী, *আস সুনানে কুবরা* (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), হাদিস নং : ১০৭৯৪

১৮. ড. এম উমর চাপরা, *টুওয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম* (ইউ.কে : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫), পৃ.১৬৯

১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, আস সহীহ (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদীস নং : ২০৯৬

২০. শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯

২১. ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-২২৪০

২২. শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯

২৩. ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৬৬৫১

২৪. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী, *কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকাহ*, আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল অনূদিত (রিয়াদ : ইসলাম হাউস বাংলাদেশ, ২০১৯), খ. ২, পৃ. ২৫৭

২৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

২৬. *আল-কুরআন*, ৭৩ : ২০৷

২৭. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী, *আস সহীহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), হাদিস নং : ১৬০৫

২৮. ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ২১৫৩

২৯. মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল, *আল-ফারুক ওমর* (মিসর : মাকতাবা নাহদা, তা.বি), খ. ২, পৃ. ২৬৮

৩০. আল মুদাওয়ানা, খ. ৪, পৃ. ২৯১; উদ্ধৃত, সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ : ইসলামি ফিক্হ বিশ্বকোষ-৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯

৩১. ড. মীজানুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৩২. *আল-কুরআন*, ৭ : ১৫৭
৩৩. *আল-কুরআন*, ২ : ১৬৮
৩৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, আস সুনান (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং : ২৩৪১
৩৫. ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ১০২
৩৬. মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল, *আল-ফারুক ওমর* (মিসর : মাকতাবা নাহদা, তা.বি), খ. ২, পৃ. ২৬৮
৩৭. ইমাম বুখারি, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ৩১২৯
৩৮. ইমাম বায়হাকী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১১৯
৩৯. ড. এম. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *শরী'আতের দৃষ্টিতে অংশীদারি কারবার*, মোঃ কারামত আলী নিযামী অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৩), পৃ. ৯
৪০. আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং- ৩৩৮৩
৪১. *আল-কুরআন*, ৮৩ : ১-৩
৪২. *আল-কুরআন*, ২৬ : ১৮৩
৪৩. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *পার্টনারশিপ অ্যান্ড প্রফিট শেয়ারিং ইন ইসলামিক ল'* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ২২
৪৪. ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ৭৫৯৭
৪৫. *আল-কুরআন*, ১৬ : ৪৩
৪৬. *আল-কুরআন*, ১২ : ৪৩-৪৯
৪৭. ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ১৪১৩
৪৮. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, মুফতী যোবায়ের হোসাইন রাফীকী অনূদিত (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৬), পৃ. ২৯০-২৯১
৪৯. *আল-কুরআন*, ৫ : ২
৫০. ইমাম মালেক বিন আনাস বিন আমের মাদানী, *আল মুয়াত্তা* (বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, তাবি), হাদিস নং : ২৩৯৯
৫১. ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ৩৪৫৩
৫২. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭
৫৩. এম এ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), পৃ. ১০৯-১১০
৫৪. ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ২০৮২
৫৫. ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ৩৩০২
৫৬. অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
৫৭. *আল-কুরআন*, ২৯ : ২০
৫৮. *আল-কুরআন*, ৬ : ১১
৫৯. *আল-কুরআন*, ৪৫ : ১৩
৬০. ইমাম আলাউদ্দিন আবূবকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারাঈ* (বৈরুত : ১৯৮৯), খ. ১৪, পৃ. ১৭৮
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫
৬২. *আল-কুরআন*, ৪৫ : ২২

জমা প্রদানের তারিখ : ১৬.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৮.১২.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট

মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন*

Abstract

Man is greatest creation of Allah. Residence is the fundamental rights of human being, comfort and address of dignity. But there are some people who do not have a specific place to live. They lead inhuman lives in footpaths, Park, Railway Station, Launch Ghat, and Bus Terminals etc. There are millions of homeless people in Dhaka city, the capital of Bangladesh. Research and effective action on their statistics, development and rehabilitation is essential. In order to fulfill this need, in the light of Islam the religion of humanity "Instructions of Islam to improve and rehabilitate the livelihoods of the homeless people: perspectives Kamalapur and Sadarghat" titled Research article has been taken up. The Article seeks to find ways to improve and rehabilitate the homeless by deeply monitoring the lives of the homeless, interviewing the homeless through the Accidental Sampling Method and analyzing Islamic guidelines for the development and rehabilitation of the destitute. Kamalapur Sadarghat in Dhaka, the capital city of Bangladesh, have been identified as the study sites. Because most of the homeless people spend the night in these two places.

চাবিশব্দ: ভাসমান, ইসলাম, উন্নয়ন, পুনর্বাসন, স্বনির্ভর

১. ভূমিকা:

মানুষ মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের এ সম্মান রাব্বুল আলামীনই তাকে দান করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী, কীট, প্রতঙ্গ, পশু, পাখি , মৎস, সরীসৃপ এমনকি উদ্ভিজ্জ্য শ্রেণির যাদের প্রাণ আছে সকলের জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রাণী মানুষ। মহান আল্লাহ মানুষকে উপার্জন করে জীবিকা গ্রহণের বিধান প্রদান করেছেন। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সুষম বন্টনের দায়িত্ব প্রদান করেছেন মানুষকে। শয়তানের প্ররোচনায়, প্রবৃত্তির তাড়নায়, ভোগের লিপ্সা ও কামনায় মানুষ বিভিন্ন সময় এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। জীবিকার অসম বন্টনের দায়ে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে অন্য দিকে কিছু মানুষ জীবন কাটাচ্ছে কষ্টে-সৃষ্টে। এমনকি একদল মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে জীবন কাটাচ্ছে স্টেশনে, যাত্রী ছাউনিতে। সাধারণভাবে যাদেরকে বলা হচ্ছে ছিন্নমূল বা ভাসমান মানুষ। জীবন যাপনের তাগিদে, বেঁচে থাকার আশায় ছিন্নমূল বা ভাসমান মানুষেরা শহরমুখী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরেও এ ধরনের ভাসমান জনগোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। রাজধানী শহর ঢাকার সাথে নদীপথে যোগাযোগের মূলকেন্দ্র সদরঘাট এবং রেলপথে যোগাযোগের একমাত্র কেন্দ্র, কমলাপুর রেল স্টেশনে ভাসমান জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক বিচরণ।

ইসলাম মানবিক ধর্ম, মানবিকতার ধর্ম, মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন এর মূল লক্ষ্য। এ কারণে আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনা শিখিয়েছেন, "হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।”[১] মহানবী (সা:) নির্দেশ দিয়েছেন, “যারা দুনিয়ার অধিবাসীদের উপর দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।”[২] তিনি বলেছেন, “সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার। আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে, যে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন।”[৩] মহান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা:) এর শিক্ষার অনিবার্য অংশ এবং ইসলামের মানবিক দর্শনের মূলীভূত চেতনার অন্যতম বহি:প্রকাশ হতে পারে ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ইসলামের সুমহান নির্দেশনা সমূহের প্রায়োগিক পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণায়। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, অদ্যাবধি এ জাতীয় কোনো প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এ কারণে ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা বিষয়ে গবেষণা হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ আবশ্যকতা পূরণের লক্ষ্যে “ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পূনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট” শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের কমলাপুর ও সদরঘাট ভাসমান লোকদের রাত্রিবাসের অন্যতম কেন্দ্র, এত বেশি ভাসমান মানুষ আর কোথাও থাকে না। এ কারণে বিষয়টির প্রায়োগিত ক্ষেত্র হিসেবে কমলাপুর ও সদরঘাটকে সমীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সদরঘাট ও কমলাপুরকে গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে গবেষণার যে লক্ষ্য ও ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে তার আলোকে পরবর্তীতে তা সমগ্র দেশের ভাসমান জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মডেল হিসেবে গৃহিত হতে পারে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন প্রবন্ধটি একটি নতুন ধারা সংযোজন করবে তেমনি ভাসমান বা ছিন্নমূল মানুষদের পূনর্বাসন সংক্রান্ত গবেষণার শূন্যতা বহুলাংশে পূর্ণ করবে। গবেষণায় লব্দ জ্ঞান ও কৌশল যথার্থভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে উন্নত বাংলাদেশের ধারণাটিও বাস্তব রূপ লাভ করবে।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা:

বাংলাদেশের ভাসমান জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা ও ধারা দীর্ঘদিনের। নদীভাঙ্গন ও বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার মানুষ যেমন আশ্রয় ও খাবারের খোঁজে শহরে এসে ভাসমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তেমনি বেকারত্ব ও কর্মবিমুখতাও অনেককে এ কাতারে শামিল করেছে। ভাসমান জনগোষ্ঠীর দুঃসহ জীবন ও মানবেতর অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে নানা ফিচার প্রকাশিত হয়েছে। খ্যাতিমান চিত্র শিল্পী রফিকুন্নবী ওরফে রনবী “টোকাই” নামে কার্টুন চরিত্র তৈরি করেছেন। বিভিন্ন এনজিও ভাসমান লোকদের জীবন যাত্রাকে সহনীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন সময়ের গৃহিত প্রকল্পের প্রস্তাবনা ও প্রতিবেদন এবং এনজিও ও বেসরকারী সংস্থার প্রবন্ধ প্রস্তাবনা ও প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে এগুলো ভাসমান লোকদেও বিশেষ কোনো সমস্যা যেমন , স্বাস্থ্য , শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আবর্তিত হলেও পুনর্বাসন নিয়ে সামগ্রিক কর্ম তেমন নেই।

আলমগীর (২০১৫) ”[৪] দেখিয়েছেন, ভাসমান জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৪% ভাগ ঢাকা শহরে বসবাস করছে। নির্দিষ্ট জমি ব্যতিত পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সরকারকে তাদের জন্য জমির বরাদ্ধ দিতে হবে। তাদের ভিটে মাটি থাকলে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে। যার মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন সম্ভব হবে। জাফর (২০১৬) ”[৫] অনুরূপ দেখিয়েছেন, ভাসমান জনগোষ্ঠীর নাগরিক চাহিদা পূরণের জন্য সেফহোম ও আশ্রয় প্রবন্ধ সরকারকে চালু করতে হবে। তিনি ভাসমান জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন ছাড়া ঢাকা শহরের অপরাধ ঠেকানো সম্ভব নয়। এবং একটি নিরাপদ শহর গড়নের জন্য তিনি ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

আমার কাছে মনে হয়েছে, সরকারীভাবেও ভাসমান লোকদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্যোগগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার অভাব ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব প্রতিবন্ধকতার কারণে ভাসমান ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সম্পন্ন হয়নি। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে ভাসমান জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ইসলামের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই আমাদের কাঙ্খিত ফল অর্জিত হতে পারে। তাই ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের কি কি নির্দেশনা রয়েছে এবং বাংলাদেশের মত দেশে সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব সে সম্পর্কিত গবেষণামূলক কোনো প্রবন্ধ, গ্রন্থ, প্রস্তাবনা, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন প্রত্যক্ষ করা যায়নি। তাই আমাদের কাছে মনে হয়েছে "ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" প্রবন্ধটি একটি স্বকীয়, স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ নতুন বিষয় হিসেবে প্রবন্ধভুক্ত হয়েছে। যা দেশের ভাসমান জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মডেল হিসেবে গৃহিত হবে।

৩. গবেষণার মৌলিকতা ও পরিসর:

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক প্রবন্ধটি পুরোপুরি মৌলিক একটি প্রবন্ধ। কেননা, ইসলামের নির্দেশনার আলোকে কীভাবে ভাসমান লোকদেরকে স্থায়ী আবাসে পুনর্বাসিত করা যায় সে সম্পর্কিত সমন্বিত বা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ গৃহিত হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের পরিধিভুক্ত বিষয় হলো ভাসমান জনগোষ্ঠী ও ইসলামের নির্দেশনা এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ। এ কারণে গবেষণার পরিধিভুক্ত হওয়ায় কেসস্টাডি, সমীক্ষা এবং গবেষণার অন্যান্য প্রযোজ্য পদ্ধতিতে ইসলামের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কীভাবে এ সকল ভাসমান লোকদের অবস্থার উন্নতি ও পুনর্বাসন করা হবে, সে সম্পর্কে প্রায়োগিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপনের সময় সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত আবদ্ধ প্রশ্নের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত সুপারিশমালা সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবিত "ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক প্রবন্ধটির লক্ষ্য হলো ইসলামের পুনর্বাসন নীতির আলোকে বাংলাদেশের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের উপায় উদ্ভাবন করা। এ প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

ক) ইসলামের প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা, কারণ ইসলামের প্রাথমিক ধারণা ব্যতিত ভাসমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা সমূহের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে প্রদান করা সম্ভব নয়।

খ) ইসলামের কল্যাণকামিতার নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করা ও অবহিত করা, যাতে সেগুলোর আলোকে মানুষের কল্যাণ সাধনের আদর্শ গ্রহণ সম্ভব হয়।

গ) ইসলামের মানবকল্যাণ নীতি ও দর্শনের প্রায়োগিক গুরুত্বের ব্যাখ্যা করে কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করা।

ঘ) বাংলাদেশের মত মুসলিম প্রধান দেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে ইসলামের সামাজিক নীতি ও দর্শন প্রয়োগের আবশ্যকতা প্রমাণ করা।

ঙ) ভাসমান জনগোষ্ঠীর পরিচয়, ভাসমান হওয়ার কারন ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা ব্যাখ্যা করা।

চ) ভাসমান জনগোষ্ঠীর দূরাবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও নীতিমালাসমূহ কীভাবে কার্যকর করা যায় সে পথ উদ্ভাবন করা এবং প্রয়োগের পদ্ধতি নির্দেশ করা।

ছ) কমলাপুর ও সদরঘাটকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে অত্র এলাকার ভাসমান লোকদের পুনর্বাসনের জন্য ইসলামের পুনর্বাসন নীতি প্রয়োগ করা এবং গবেষণা অঞ্চলের লোকদের ক্ষেত্রে ইসলামের কল্যাণকামিতার নীতি সফল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত পদ্ধতি সারাদেশের ভাসমান ও অসহায় লোকদের কল্যাণে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

৫. কেস স্টাডি

"আমার সব জায়গা জমি নদী নিয়ে গেছে। গ্রামের সরকারি জায়গায় কয়েক বছর ছিলাম। নেতারা সেখান থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে। পরে ঢাকায় চইলা আইছি। এখন বউডা লইয়া রাস্তার পাশে ফুটপাতে থাকি। দিনের বেলা কাগজ টোকাই, রাত হলে পলিথিন দিয়ে খুপরি ঘর করে থাকি। সকাল হলেই রাতের তৈরি খুপরি ঘরটি নিজেই ভেঙ্গে ফেলি।"[৬] এ গল্প পটুয়াখালী থেকে আসা রফিজল হকের। বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে তার বসবাস, নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই পঞ্চাশোর্ধ এই বৃদ্ধের। তিনি জানান, আগে গ্রামে নিজের জায়গা জমিতেই চাষবাস করতেন। সংসার জীবনে কোনো সন্তানাদি নেই।

৬. গবেষণা পদ্ধতি

৬.১ গবেষণার ধরন ও নকশা

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ ও নিয়মসিদ্ধ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ:

ক) ঐতিহাসিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং বিচারমূলক পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে সমীক্ষা অঞ্চলের ইতিহাস, আবহাওয়া, জলবায়ু, জনমিতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি জরিপ, আদমশুমারি, সমীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে গবেষণা প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে।

খ) আনুষাঙ্গিক গ্রন্থাবলী, গবেষণা জার্নাল ইত্যাদি পাঠ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি: কমলাপুর ও সদরঘাট বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ স্টেশন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ এ স্থান দুটিকে উপজীব্য করে অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা

প্রবন্ধটি সম্পন্ন করার জন্য সমীক্ষা অঞ্চল দুটোর উপর পরিচালিত ফিল্ডওয়ার্ক, অঞ্চল দুটো সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, জার্নাল, থিসিস, আর্টিকেল ইত্যাদি থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এবং ইসলামের নির্দেশসমূহ নির্দিষ্টকরণ এবং সেগুলো প্রয়োগ করে কীভাবে তাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব সে সম্পর্কে জানার জন্যও একই পদ্ধতিতে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে গবেষণা প্রবন্ধটিতে একক কোনো গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। বরং প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গ) **কেস স্টাডি:** সমীক্ষা অঞ্চলের লোকদের জীবন যাত্রার মান জানার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কেস স্টাডি করা হয়েছে। এতে ভাসমান জনগোষ্ঠীর পূর্ববর্তী জীবনের খন্ড চিত্র এবং বর্তমান পরিণতির কারণ উন্মোচিত হয়েছে। যার ভিত্তিতে ভাসমান জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমূহের প্রকৃতি অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে।

৬.২ গবেষণার স্থান

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক প্রবন্ধটির জন্য বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের সদরঘাট ও কমলাপুর রেলস্টেশনকে সমীক্ষা অঞ্চল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

৬.৩ নমুনা ও নমুনায়ন কৌশল

গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার দাতা নির্বাচনে পুরোপুরি দৈবচয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য প্রথম ব্যক্তি থেকে নির্ধারিত সংখ্যক সাক্ষাৎকার দাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেককে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ, পোষাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি কোনো বিষয়কেই প্রাধান্য দেয়া হয়নি। নমুনায়নের ক্ষেত্রে দৈবচয়নই ছিল মূলভিত্তি।

৬.৪ তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক প্রবন্ধটির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সরেজমিন পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সামাজিক জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। গবেবষক, গবেষণা সহকারি এবং তথ্য সংগ্রহকারীরা সরেজমিনে সমীক্ষা অঞ্চলে গিয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে সমীক্ষা অঞ্চলে বসবাসকারী ১০০ জন লোককে নির্বাচন করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬৮ জন নারী ও ৩২ জন পুরুষ। অত:পর আবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সমীক্ষা অঞ্চলের ভাসমান জনগোষ্ঠীর মতামত নেয়া হয়েছে এবং প্রশ্নপত্রে দেয়া বিকল্প উত্তরসমূহের বাইরে তাদের কোনো বক্তব্য থাকলে তাও শোনা হয়েছে।

৬.৫ তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে সারণি তৈরি ও তা শতকরা হারে প্রকাশের বোধগম্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। অহেতুক বাহুল্য তৈরি করা ও গবেষণা ফলাফলকে জটিল ও দুর্বোধ্য করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরন করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক) অপক্ক তথ্য-উপাত্ত বিন্যাস;
খ) সংকেতায়ন;
গ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষনের মাধ্যমে মর্মার্থ অনুসন্ধান;
ঘ) মর্মার্থের ব্যাখ্যা প্রদান;
ঙ) উপসংহার বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

৭. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

৭.১ সমীক্ষা অঞ্চল পরিচিতি

ক. সদরঘাট

সদরঘাট বাংলাদেশের আদি শহর ঢাকার একটি নদীবন্দর; যাকে ঘিরে ঊনিশ শতকে একটি ব্যবসায়িক জনপদ গড়ে ওঠে। এই নদীবন্দরটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। একবিংশ শতকের শুরুতেও এটির গুরুত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে। এর সন্নিহিত এলাকা পুরনো ঢাকা নামে প্রসিদ্ধ। এর অতি নিকটে রয়েছে পুস্তক প্রকাশনার ঘাঁটি বাংলাবাজার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বলধা গার্ডেন এবং আহসান মঞ্জিল, বিভিন্ন নদী পরিবাহিত পণ্য, বিশেষ করে মাছ ও ফলের সুবিশাল সব আড়ত। সারাদেশ, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকা শহরের নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকেন্দ্র এই সদরঘাট। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে সর্বমোট ৪৫টি রুটে নৌযান চলাচল করে। এই নদীবন্দর থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের এলাকাগুলো যেমন, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠী, মাদারীপুর, চাঁদপুর, খুলনা, হাতিয়া, বাগেরহাট প্রভৃতি গন্তব্যে লঞ্চ ও স্টীমার ছেড়ে যায় এবং উক্ত অঞ্চল থেকে যাত্রী বহন করে নিয়ে আসে। সদরঘাটে জীবিকার প্রয়োজনে সারা দেশ থেকে আগত নিম্ন আয়ের অসংখ্য শ্রমজীবি মানুষের ভীড় দেখা যায়। এদের অধিকাংশের রাত কাটানোর জন্য কোনো আবাসিক ব্যবস্থা নেই তাই তারা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে রাত কাটায়। তাছাড়া সদরঘাট অঞ্চলে এমন ভাসমান মানুষের সংখ্যা ও অনেক বেশী যাদের কোনো স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা নেই অথবা তাদের ঘরবাড়ি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এমনকি অনেক মানুষ রয়েছে, যারা ভাসমান পরিবেশ জন্মগ্রহণ করে বেড়ে উঠেছে, তাদের কখনো কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। “দৈনিক আমাদের সময়” পত্রিকায় “ ভাসমান মানুষ যাবে কোথায়” শীর্ষক সংবাদে বলা হয় “মনোয়ারা খাতুনের মতোই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে অনেক ভাসমান মানুষ রয়েছে। ফুটপাত, বাসটার্মিনাল, লঞ্চটার্মিনাল কিংবা রেলস্টেশনেই কেটে যায় তাদের জীবন। ঘরহীন এসব মানুষের অনেকেরই থাকার জায়গাা না থাকায় তারা রাত কাটাতে বেছে নেয় এসব স্থান। আবার অনেকের ঘর থাকলেও জীবিকার প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণেও খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়।”[৭] তাই “ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট” শীর্ষক গবেষণাটির স্থান হিসেবে সদরঘাটকে নির্বাচন করা হয়েছে।

খ. কমলাপুর

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন (আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে পরিচিত) বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে স্টেশন। এটি ঢাকার মতিঝিলের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে স্টেশন এবং ঢাকার সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার মধ্যে

যোগাযোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল। এর স্টেশন ভবন ঢাকার অন্যতম অত্যাধুনিক ভবন যার নকশা করেছেন মার্কিন স্থপতি রবার্ট বাউগি। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে দৈনিক ৫০টি ট্রেন বাংলাদেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যায়। দিন রাত সবসময় এখানে মানুষের যাতায়াত থাকে। যাত্রীদের সেবাদানের জন্য কমলাপুর স্টেশনে শতাধিক বিভাগ এবং বিভিন্ন বিভাগে বহুসংখ্যক কর্মককর্তা/কর্মচারী রয়েছে। এরপরও নানা সমস্যায় জর্জরিত কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। যাত্রী বেড়েছে বহুগুণ। কমলাপুর স্টেশনের প্লাটফর্ম এর দৈর্ঘ্য ৯১৮.৪ মিটার। রেল লাইনের উপর রয়েছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেল ওভারব্রিজ। স্টেশনের বিস্তৃত প্লাটফর্ম, সর্ববৃহৎ ওভারব্রিজ ও সংলগ্ন অঞ্চলে অসংখ্য ছিন্নমূল ভাসমান মানুষের যাতায়াত ও বসবাস রয়েছে। রাত গভীর হতে থাকলে ছিন্নমূল ভাসমান মানুষেরা এখানে সেখানে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করে। নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী, ভবঘুরে, মানসিক বিকারগ্রস্ত ও বিভিন্ন প্রকার ভাসমান মানুষ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে মানবেতর জীবনযাপন করে।

সমীক্ষা অঞ্চলের ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়

ঢাকার ব্যস্ততম এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংযোগ ও যোগাযোগ কেন্দ্র কমলাপুর ও সদরঘাট অঞ্চলে মসজিদ রয়েছে। কোনো মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা বা সিনাগগ নেই। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। তারা বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে অঞ্চল দুটোর ভাসমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আগ্রহ প্রকট নয় এবং সেখানকার ধর্মীয় উপাসনালয়ে তাদের যাতায়াত চোখে পড়ে না।

৭.২ সমীক্ষা বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও ফলাফল

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য পালাক্রমে সদরঘাট ও কমলাপুর গমন করা হয়। গবেষকের সাথে একজন গবেষণা সহকারি এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ৫ জন শিক্ষার্থীর একটি টিম এ কাজে অংশগ্রহণ করে। তথ্য সংগ্রহকারী দল দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৬৮ জন নারী ৩২ জন পুরুষ সর্বমোট ১০০ জন লোকের সাক্ষাৎকার চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকার দাতা নারী-পুরুষের মতামতের ভিত্তিতে সমীক্ষা অঞ্চলের ভাসমান মানুষদের জীবন যাত্রার উন্নয়ন এবং ছিন্নমূল অবস্থা থেকে উত্তোরণ ঘটিয়ে কীভাবে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসন করা সম্ভব সে বিষয়ক সমীক্ষার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, ফলাফল এবং করণীয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭.২.১ শিক্ষাগত যোগ্যতা সমীক্ষা

সদরঘাট ও কমলাপুর অঞ্চলের ভাসমান মানুষদের মধ্যে পরিচালিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সমীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ

সারণি-১: শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক সমীক্ষা

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	হার(%)
ক	নিরক্ষর	৭৩%
খ	১০- ৫ম শ্রেণি	২৭%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

সমীক্ষা অঞ্চলের ভাসমান জনগোষ্ঠীর ২৭% নিজেদেরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন দাবী করলেও বাস্তবে দেখা গিয়েছে তাদের কেউই প্রশ্নপত্রের কোনো প্রশ্ন বা বিকল্প সঠিকভাবে পড়তে পারেনি। ফলে গবেষকের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে যে, তারা প্রায় শতভাগই বর্তমানে নিরক্ষর।

৭.২.২ পেশা সমীক্ষা

সদরঘাট ও কমলাপুরের ভাসমান জনগোষ্ঠী স্বভাবত বেকার হলেও জীবন ধারণের জন্য তারা কোনো না কোনো পেশা গ্রহণ করে তাদের পেশাগত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ

সারণি-২: পেশা সমীক্ষা

ক্রমিক	পেশা	হার (%)
ক	টোকাই	৩৩%
খ	ভিক্ষুক	৩৬%
গ	দিনমজুর	৩১%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

সমীক্ষা অঞ্চলের ভাসমান মানুষদের পেশা হিসেবে যদিও তিন ধরনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত তারা দিন শেষে ভিক্ষুক এবং কোনো না কোনোভাবে তারা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত।

৭.২.৩ ভাসমান জীবন যাপনের কারণ সমীক্ষা

কমলাপুর ও সদরঘাট অঞ্চলের ভাসমান মানুষদের কাছে তাদের ভাসমান জীবন যাপনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা যে উত্তর প্রদান করে তা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৩: ভাসমান জীবন যাপনের কারণ

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার(%)
ক	ভাল লাগে	১%
খ	ভাগ্য খারাপ	২০%
গ	ঘর-বাড়ি নেই	১১%
ঘ	বাধ্য হয়ে	৬৮%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

৭৯% সাক্ষাৎকার দাতা ভাসমান জীবনযাপন করে বাধ্য হয়ে। আর ২০% মানুষ তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করলেও গবেষকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মূলত শতভাগ ভাসমান মানুষ বাধ্য হয়েই এভাবে জীবন যাপন করছে।

৭.২.৪ ভাসমান হওয়ার পূর্বের স্থায়ী আবাস সংক্রান্ত তথ্য

ভাসমান মানুষদের পূর্বের আবাস সম্পর্কে জানার জন্য তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ভাসমান হওয়ার আগে তাদের স্থায়ী আবাস কোথায় ছিলো বা তাদের বাড়ি কোথায় ছিলো?

সারণি -৪: ভাসমান পূর্বকালের বাড়ি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার(%)
ক	ঠিকানা বলতে পেরেছে	২৫%
খ	জানি না	৫%
গ	কোনো দিনও বাড়ি ছিল না	৭০%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

২৫% সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষ তাদের ঠিকানা বলতে পেরেছে। তাদের অধিকাংশ নদী ভাঙ্গনের শিকার ৭০% সাক্ষাৎকারদাতা কখনো নিজেদের বাড়ি দেখেনি।

৭.২.৫ সংসার জীবন সমীক্ষা

ভাসমান মানুষ সংসার করেন, তা বাহ্যত মনে হয় না। কারণ তাদের নিজেদের যেখানে আশ্রয় নেই, সেখানে তারা কীভাবে সংসার করবেন? এ সম্পর্কে ভাসমান সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত নিম্নরূপ

সারণি-৫: সংসার জীবনের তথ্য

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার (%)
ক	সংসার নেই, সংসার করিনা	৩৫%
খ	প্লাটফরমে/ পল্টুনে	৫১%
গ	রাস্তায়	৭%
ঘ	ঠিক নেই যখন যেখানে সুযোগ হয়	৭%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

মোট দাগে হিসাব করলে ৩৫% ভাসমান মানুষ সংসার করেন না, তাদের সংসার নেই আর ৬৫% ভাসমান মানুষ সংসার করেন। সর্বোপরি ভাসমান মানুষদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

৭.২.৬ স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সমীক্ষা

সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষের অধিকাংশই কোনো না কোনো রোগে ভুগছেন। নানা ধরনের চর্মরোগের কারণে অনেকেরই দেহে বাহ্যিক ক্ষত বা ঘা রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিতে সুবিধার জন্য তারা সে ক্ষত সারানোর ব্যবস্থা করেন না বরং যত্ন করে লালন করেন। কেউ কেউ সুস্থ হতে চান, তবে সে জন্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল সাপোর্ট পান না বলে সুস্থ হতে পারেন না। সর্দি-কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি অসুখগুলোতে তারা প্রায়ই ভোগেন।

সারণি -৬: স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার(%)
ক	সরকারি হাসপাতালে যাই	২৩%
খ	শুয়ে থাকি	৪৭%
গ	ঝাড়-ফুঁক করি	১৭%
ঘ	কিছুই করার থাকে না	১৩%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

অসুস্থ হলে সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষের মাত্র ২৩% সরকারি হাসপাতালে যান। বাকী ৭৭% মানুষ কোনো চিকিৎসা নেন না বা পান না। স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি নিয়ে সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষেরা খুব বেশি যে ভাববেন, সে সুযোগও থাকে না। কারণ তাদের প্রথম বিবেচনা খাবার সংগ্রহ করা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রতিদিনের তিনবেলা খাবার সংগ্রহ করতে না পেরে দু'বেলা এবং কখনো কখনো একবেলাও খাবার গ্রহন করে থাকেন।

৭.২.৭ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাহায্য প্রাপ্তির সমীক্ষা

কমলাপুর ও সদরঘাট অঞ্চলে সরকারি-বেসরকারি মানবিক ব্যক্তিবর্গের যাতায়াত রয়েছে, তাদের ভাসমান মানুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন।

সারণি-৭: সরকারি-বেসরকারি সাহায্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার(%)
ক	মাঝে মধ্যে পাই	৪৭%
খ	কখনো পাই না	৪৮%
গ	সব সময় পাই	০০%
ঘ	যে সাহায্য পাই তা আমাদের কোনো কাজে লাগেনা	৫%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষদের ৪৭% জানিয়েছেন, সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে তারা মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য পেয়ে থাকেন। সাহায্য গুলো হলো, পোষাক, খাবার সামান্য পরিমাণ নগদ অর্থ ইত্যাদি যা তাদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে কোনো কাজে আসে না। ৪৮% সাক্ষাৎকারদাতা জানিয়েছে যে, তারা কোনো ধরনের সাহায্য পান না।

৭.২.৮ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দুঃখ-দুর্দশা, অপমান ও অসম্মানের জীবনযাপনকারী সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান জনগোষ্ঠী আশাহীন এবং পরিকল্পনাহীন।

সারণি-৮: ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার(%)
ক	কিছু টাকা জমাতে পারলে এলাকায় চলে যাবো	১৮%
খ	কিছু টাকা পেলে রিকশা কিনবো বা ফেরি করবো	২৩%
গ	আল্লাহ যা করে তাতেই খুশি	২৮%
ঘ	কোনো পরিকল্পনা নেই	৩১%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষের ৪১% এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কিন্তু ৫৯% ভাসমান মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। এটা তাদের হতাশা ও অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ।

৭.২.৯ সমাজ ও সরকারের কাছে প্রত্যাশা

ভাসমান মানুষেরা সমাজের বিত্তবান মানুষ এবং বিদ্যমান সরকারের কছে আবেদন করেছেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য। তাদেরকে এ দুর্বিসহ পশুসুলভ জীবন থেকে মানবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য।

সারণি-৯: সমাজ ও সরকারের কাছে আবেদন

ক্রমিক	বিকল্প উত্তর	হার(%)
ক	ঘর করে দিন	৪৪%
খ	রিক্সা বা ফেরি জিনিসপত্র কিনে দিন	৩৩%
গ	বিনাসুদে ঋণ দিন	১৬%
ঘ	কোনো আবেদন নেই। আমাদের আবেদন কে শুনবে?	৭%

তথ্য উৎস: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য, জানুয়ারি ২৬-৩১, ২০২০

৯৩% সাক্ষাৎকারদাতা ভাসমান মানুষ তাদেরকে সাহায্যের আবেদন করেছেন। তাদের ৪৪% চেয়েছেন আশ্রয় তথা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার উপায়।

৮. ভাসমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার এক অনন্য সাধারণ ব্যবস্থাপনা। কুরআনুল কারিম ও হাদীসে অসহায়দের সহায়তা দেয়ার, দুঃস্থদের সাহায্য করার ওপর যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন ইবাদত যেমন সালাত, সাওম বা হজ্বের চেয়েও বেশি তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ সা. সার্বিক কল্যাণ কামনাকেই প্রকৃত দ্বীন বলে অভিহিত করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الدِّينُ النَّصِيحَةُ " قُلْنَا لِمَنْ قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " .

“তামীম আদ-দারী রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন: কল্যাণ কামনাই দ্বীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন : আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসুলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।”[৮] ইসলাম তার অনুসারীদের প্রতি সকল সৃষ্টির কল্যাণ কামনা ও কল্যাণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব অর্পন করেছে। মানবতা ও মানবকল্যাণের ধর্ম ইসলামের মধ্যেই রয়েছে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার চূড়ান্ত উপায় ও সমাধান। ভাসমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়ন করা গেলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। তাই ভাসমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

ইসলাম সব ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাকে অভিনন্দিত করেছে। এতে দুঃস্থের সাহায্য করার প্রতি যেমন তাগিদ দিয়েছে তেমনি নিজে যাতে দুঃস্থ হয়ে না পড়ে তারও নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا-

"দান করার ক্ষেত্রে তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সঙ্গে আবদ্ধ করে রেখো না (দান করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকে না) এবং তোমার হাত পুরোপুরি খুলে দিও না (সবকিছু দান করে দিও না) । তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।"[৯] (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৯)

খ) যাকাত ভিত্তিক কল্যাণ

ইসলাম প্রতিজন বিত্তশালী মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রতি বছর যাকাত আদায় করা ফরজ করেছে। যাকাতলব্ধ অর্থ কী কী খাতে ব্যয় করা হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়ে ইসলাম দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের স্থায়ী কল্যাণ সাধনের পথ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

انما الصدقات للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله- والله عليم حكيم

"নিশ্চয়ই যাকাত নিঃস্বদের জন্য, অভাবগ্রস্তদের জন্য, যাকাত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য এবং নিঃস্ব পথচারীর জন্য এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।"[১০] (সূরা আত-তওবা : ৬০)

গ) প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি

গরিব- দুঃখীর কল্যাণে অর্থ ব্যয়কে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ খাতে যারা ঐচ্ছিক ভাবে অর্থ দান করবে, তাদের জন্য অগনিত পুরস্কারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

"যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের ধন-সম্পদ ব্যয়কারীদের উদাহরণ হলো একটি শস্যবীজ - যা থেকে সাতটি শীষ উৎপাদিত হয় আর প্রতিটি শীষে উৎপন্ন হয় একশত করে শস্য দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ হলেন মহাপ্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।"[১১] (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬১)

ঘ) কল্যাণ নিশ্চিত করা

দুঃস্থ-অসহায়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষ মূলত নিজেরই কল্যাণ নিশ্চিত করে। কেননা সে অন্যের সেবা ও সহযোগতিার মাধ্যমে বিপুল পূণ্য লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে পরম শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون

"মুমিনগণ! যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমরা নিজেদের কল্যাণেই ব্যয় কর। কেননা তোমরা তো তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করে থাকে। কাজেই যে ধন-সম্পদ তোমরা

ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দান করা হবে এবং তোমাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।”[১২] (সূরা আল-বাকারাহ: ২৭২)

ঙ) ইসলামি ভ্রাতৃত্বের দাবি

ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলিমের সঙ্গে অপর মুসলিমের ভ্রাতৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কের দাবিই হলো, একজন সক্ষম ভাই একজন অক্ষম অসহায় ভাইকে সাহায্য করবে। তার বিপদ-দুঃখকে নিজের বিপদ মনে করবে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন:

عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- مرفوعاً: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, “ তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহ সদৃশ দেখতে পাবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে, তখন তার পুরো দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।”[১৩] (সহীহ মুসলিম)

চ) প্রকৃত অভাবীকে দান করা

যারা ভিক্ষা করে বা প্রকাশ্যে সাহায্য চায়, অনেক ক্ষেত্রে তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। অনেক সময় দেখা যায় এসব পেশাদার ভিক্ষুক বা প্রার্থীকে সাহায্য করতে গিয়ে প্রকৃত অভাবী এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন লোককে সাহায্য করা হয় না। অথচ সেসব লোক বাস্তবিকই অভাবী কিন্তু আত্মসম্মানবোধের কারণে কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারেন না, তাদেরই সাহায্য প্রয়োজন বেশি। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় লোকদের খুঁজে বের করে তাদেরকে সাহায্য করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِيۡنَ اُحۡصِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ضَرۡبًا فِى الۡاَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ الۡجَاهِلُ اَغۡنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعۡرِفُهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ ۚ لَا يَسۡـَٔلُوۡنَ النَّاسَ اِلۡحَافًا ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيۡمٌ

“ তোমাদের এই দানের হকদার হলো ফকীরগণ, যারা ফী সাবীলিল্লাহ এমনভাবে কাজ করে যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারে না। আবার (আত্মমর্যাদার) জন্য ভিক্ষা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তাদের লক্ষণ দেখলেই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। কাকুতি-মিনতি করে তারা মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে না। কল্যাণের পথে যে ব্যয় তোমরা কর সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সবকিছু জানেন।”[১৪] (সূরা আল-বাকারা :২৭৩)

ছ) সকলের সুখ নিশ্চিত করা

অসহায়-দুঃস্থ লোকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যদের সুখ-সুবিধা দেখা এবং তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়াকে ইসলাম সবসময়ই অত্যন্ত পূণ্যের কাজ বলে অভিহিত করেছে। মানুষের খেদমত হয় এবং খেদমতে কাজে লাগে; এমন যেকোন উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ " .

"হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন: যখন কোনো একজন মুসলিম একটি গাছ লাগায় বা ফসল উৎপাদন করে এবং পরে তা থেকে যদি কোনো মানুষ কিংবা কোনো পশু বা পাখি আহার করে তবে তা ব্যক্তির জন্য সাদকা হয়ে যায়।"[১৫]

জ) স্বনির্ভরতা আন্দোলন

ইসলাম অসহায় ও দুঃস্থদের সেবা করার কথা যেমন বলেছে, সাথে সাথে এটাও বলেছে সেবা গ্রহণ করা কোনো ভালো কথা নয়। বরং সেবা করতে পারাটাই ভালো, ভিক্ষা গ্রহণ কোনো অভিনন্দনযোগ্য কাজ নয়। বরং ভিক্ষা দেয়ার সক্ষমতা অর্জনই প্রশংসনীয়। কাজেই মুমিনগণ অসহায় ও দুঃস্থ থাকবেন না বরং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ "

হযরত হাকিম বিন হাজ্জাম (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। আর যারা তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন তাদের থেকে দান আরম্ভ কর। সম্পদের প্রাচুর্য থেকে যে দান করা হয় তা হচ্ছে উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে কিছু চাওয়া থেকে নিস্কৃতি চায়, আল্লাহ তাকে নিস্কৃতি দেন। আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন।"[১৬] (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ঝ) সর্বজনীন কল্যাণ

মুমিনদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। মনের গহীনে কোনোক্রমেই অন্য ভাইয়ের জন্য মন্দ কামনা লুকিয়ে রাখবে না। রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন :

وَعَن عِياضِ بن حِمارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَهلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُو سُلطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذي قُرْبَى ومُسْلِمٍ وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ

"হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "তিন ধরনের লোক জান্নাতি। এমন শাসক যে ন্যায় বিচারক, দানশীল, এবং সৎকাজের যোগ্যতা সম্পন্ন। এমন ব্যক্তি যে দয়ালু, নিকট ও দূরের লোকদের প্রতি কোমল প্রাণ এবং এমন লোক যে সচ্চরিত্রের অধিকারী। পারিবারিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে।"[১৭] (সহীহ মুসলিম)

৯. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

"ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক গবেষণা পরিচালনার অনেকগুলো অন্তরায় ছিল, বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। অনেকগুলো আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি, কিছু কিছু সমস্যা মেনে নিয়েই গবেষণা পরিচালনা করতে হয়েছে। নিম্নে অন্তরায় ও সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করা হলো, যেন পরবর্তী পর্যায়ের

গবেষকগণ এ জাতীয় গবেষণার ব্যাপারে আগে থেকেই সতর্ক হতে পারেন ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহন করতে সক্ষম হন।

ক) কমলাপুর ও সদরঘাটের ভাসমান মানুষেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে। অনেকে এখানে বংশপরম্পরায় রয়েছে তাদের ভাষাগত ভিন্নতা ও দুর্বোধ্যতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাথে সার্থকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

খ) ভাসমান মানুষেরা প্রকৃতার্থেই ভাসমান। নির্দিষ্ট ঠিকানায় বসবাস না করার কারণে তাদেরকে সঠিকভাবে বা উপযুক্ত সময়ে পাওয়া কঠিন ছিলো।

গ) সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে একটি বিষয় ছিল অত্যন্ত প্রবল। তারা নিজেরা কী করে বা তাদের নিজেদের কার্যক্রম কী সেটা তারা অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হতে পারে সেটা ভেবে বিকল্প উত্তর দিয়েছে।

ঘ) "ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক প্রকল্পটি একটি ব্যাপক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ গ্রহণের সময় মনে হয়েছিল, এটি তেমন ব্যয় সাপেক্ষ কাজ হবে না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পদে পদে প্রতীয়মান হয়েছে যে, অন্তত ১০-১২ গুণ বেশি বরাদ্দ থাকলে আমরা যেভাবে কাজটি করতে চেয়েছিলাম, সেভাবে করা সম্ভব ছিল। বরাদ্দগত অপ্রতুলতার কারণে যথাযথ সময় ও অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নি। ভাসমান মানুষদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে সময় নিয়ে কথা বলা গেলে হয়তো আরও অনাবিষ্কৃত বিষয়সমূহ আবিষ্কার করা সম্ভব হতো। তাদের অবস্থার উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতো। এ সকল প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায় অতিক্রম করে শেষবধি যথাবিধি একটি সফল ও কার্যকর গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যা এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্তরায় ও সীমাবদ্ধতাগুলো না থাকলে বা সেগুলো অতিক্রম করার মতো উপযুক্ত অর্থ ও সময় বরাদ্দ করা সম্ভব হলে এটি নিঃসন্দেহে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণায় পরিণত হতে পারতো।

১০. সুপারিশমালা

ক) বিচ্ছিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা না করে নির্ধারিত পরিকল্পনার আলোকে ভাসমান লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এ জন্য যাকাত ফান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) ভাসমান লোকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা গেলে তারা সুস্থ হবে এবং অনেকেই কাজ করতে পারবে। তাই তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

গ) ভাসমান লোকদের খাবারের অভাব দূর করার জন্য বিত্তবান ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে নিয়োজিত করা। বাংলাদেশে অসংখ্য লিল্লাহ বোর্ডিং রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ বিনামূল্যে খাবার পেয়ে থাকে। ধর্মভীরু লোকদের মধ্যে যদি এ চেতনা জাগ্রত করা যায়, ধর্মপরিচয় যাই হোক, অসহায় মানুষকে খাওয়ানো খুবই পূণ্যের কাজ, তাহলে তারা এদেরকেও খাওয়াতে উদ্যোগী হবে।

ঘ) সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এদেরকে এভাবে রেখে দেয়া এদের জন্য এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এরা নানা রকম অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকসেবন করার জন্য ছিনতাই

ও চুরি করে। স্টেশন ও পল্টুনের পরিবেশ নষ্ট করে। কাজেই পরিবেশের স্বার্থে, সুন্দর জীবনের স্বার্থে এদের জীবনকেও ন্যূনতম চাহিদা পূরণের উপযোগী করা সরকার এবং মানবিক সংস্থাসমূহের অনিবার্য দায়িত্ব।

১১. উপসংহার

বস্তুত "ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে ইসলামের নির্দেশনা : প্রেক্ষাপট কমলাপুর ও সদরঘাট" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটি একটি মডেল প্রবন্ধ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের সকল ভাসমানদের অবস্থা এক ও অভিন্ন। এ হিসেবে অঞ্চলগুলোতে আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পের সুপারিশমালাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ সার্থকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হলে অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান ভাসমান মানুষের সমস্যা দূর হবে, যার ফলে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশের মনজিলে মাকসুদে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এটি করা না গেলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এ সকল ভাসমান মানুষ, জীবন থেকে যারা কখনোই কোনো কিছু অর্জন করতে সমর্থ হননি।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১ সম্পাদনা পর্ষদ, আল কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২২তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, সূরা : আল-বাকারাহ, আয়াত : ২০১

২ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র.), তিরমিযী শরীফ (প্রথম খন্ড), মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৩, চতুর্থ সংস্করণ, হাদিস নং-১৯৩০

৩ মাওলানা আহমদ মায়মূন কর্তৃক অনূদিত মিশকাতুল মাসাবীহ, ইসলামিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, হাদিস নং-৪৯৯৯

৪ ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, বাংলাদেশের বস্তি ও ভাসমান লোকগোষ্ঠী, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ জুলাই, ২০১৫

৫ মোহাম্মদ জাফর, ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠী, (২০১৬), কথা প্রকাশ, বাংলাবাজার ঢাকা

৬ গবেষক কর্তৃক ওসমানী উদ্যান, ঢাকা থেকে সংগৃহিত তথ্য, জানুয়ারী ২৭, ২০২০

৭ "দৈনিক আমাদের সময়", ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৩ মে ২০২০

৮ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), মুসলিম শরীফ (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০০৭, চতুর্থ সংস্করণ, হাদিস নং-১০২

৯ সূরা বনী ইসরাঈল: ২৯

১০ সূরা আত-তওবা : ৬০

১১ সূরা আল-বাকারাহ: ২৬১

১২ সূরা আল-বাকারাহ: ২৭২

১৩ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), মুসলিম শরীফ (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০০৭, চতুর্থ সংস্করণ, হাদিস নং-৬৩৫০

১৪ সম্পাদনা পর্ষদ, আল কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২২তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, সূরা বাকারা :২৭৩

১৫ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), মুসলিম শরীফ (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০০৭, চতুর্থ সংস্করণ, হাদিস নং-৩৮২৯

১৬ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র.), বুখারী শরীফ, (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১৬, ত্রয়োদশ সংস্করণ, হাদিস নং-১৩৪৪

১৭ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), মুসলিম শরীফ (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০০৭, চতুর্থ সংস্করণ, হাদিস নং-৭৩৮৬

জমা প্রদানের তারিখ : ২৮.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ১৯.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

ব্রিটিশ ভারতে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা: একটি পর্যালোচনা

মোঃ কামাল হোসেন*

Abstract:

Due to the defeat of the Nawab of Bengal to the English East India Company at Palassy, there emerged a very critical situation in the socio-economic, political, religious and cultural life of the Indian people in such a critical political situation, the political activities of Obaidullah Sindi against the British imperialism became conspicuous. He wanted to free India from the British occupiers. For his purpose, he went to Mahmudul Hasan, the headteacher of Deobandh madrasa and got inspired from his revolutionary zeal. During the four years he spent there, Sindhi got involved in the politics while leading the 'Jamiatul Ansar'.Under the leadership of Mahmudul Hasan, he formed a pseudo army named 'Zunudullah' to fight with the British. Under his leadership, this army began to attack the British both externally and internally. Delhi was the headquarters of this force. To gain international support against the British, some missions were sent to France, China, Burma, and America. Sindi visited Kabul in 1915 to seek the support of the Afgan Government. However, he left Afghanistan and went to the Turkey during the World War I. Spending some threes years in Turkey, he went to Makka in 1926 and was devoted to deep meditation till 1939. However, he returned to India in 1939 and worked for the Indian Congress. Beside, he established a political party called Jamuna Nordama Sindhsagar Party. In addition to this, he also opened a cooperative society named jamiat a Juddamul Hikmat and continued to serve the country.

চাবিশব্দ: উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেওবন্দ মাদরাসা, জমিয়তুল আনসার, জুনুদুল্লহ

ভূমিকা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার নবাব সরকারের পতনে বঙ্গ ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বঙ্গ ভারতের মানুষ এ অভূতপূর্ব অবস্থার জন্য কোনোক্রমেই প্রস্তুত ছিল না। এরূপ পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়। ব্রিটিশ রণনীতি ও রণকৌশলের কাছে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের তথা মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ শোষণ নির্যাতনের পরিমান বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের এ ক্রান্তিকালে রাজনীতির অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর উপনিবেশিক পরিমণ্ডলে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্বে ব্রিটিশ প্রশাসন নীতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতার যে উন্মেষ ঘটে, তা পরিস্থিতির তাগিদে কয়েক দশকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াসী একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে আলাদা দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চূড়ান্তরূপ লাভ করে। এমনি ঘটনাবহুল পটভূমিতেই উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও তাঁর ধর্মাশ্রিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ঘটে। সিন্ধীর

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কার্যকর ছিল তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনা। সত্যানুসন্ধানী ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকের তাড়নায় শিখ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মাতৃভূমি পাঞ্জাব ত্যাগ করে আমৃত্যু সিন্ধুর অধিবাসী হয়ে সিন্ধী নামে অভিহিত হন। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য অমুসলিম মুসলমান হলেও ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সিন্ধীর ন্যায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এমন দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব তৎকালীন ভারতবর্ষে নেই বললে অত্যুক্তি হবেনা। তাঁর রাজনৈতিক তথা ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা এবং জ্ঞান সাধনা চারটি দেশে (ভারত,আফগানিস্তান, তুরস্ক এবং সৌদিআরব) সংঘটিত হয়েছে। কাল বিভাজনে চারটি পর্বে তিনি চারটি পর্যায়ে কাজ করেছেন। কিন্তু ভারতে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হলেও কালের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান, তুরস্ক এবং সৌদিআরবে তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সাম্যক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মূলত তাই আলোচ্য প্রবন্ধটি ব্রিটিশ ভারতে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস।

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার সিয়ালকোট জেলার (পাকিস্তান-পাঞ্জাব) মিঞাওয়ালী গ্রামে এক শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সিন্ধীর শিখনাম বুটা সিং (Butta Singh)।[১] তাঁর জন্মের চার মাস পূর্বেই পিতা রাম সিং মৃত্যুবরণ করেন। সিন্ধীর মাতামহের প্রেরণায় তাঁর পিতা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে শিখ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জন্মের দু'বছর পর দাদা যশ্পত রায়ের মৃত্যু হলে সিন্ধীর মাতা তাকে নিয়ে পিত্রালয় ডেরাগাজীখানে চলে যান। মাতামহের মৃত্যুর পর সিন্ধী ডেরাগাজীখান জেলার জামপুরে মামাদের নিকট চলে যান।[২]

সিন্ধী ছয় বছর বয়সে জামপুরে উর্দু মডেল স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। অসাধারণ শিক্ষানুরাগী সিন্ধীর ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন করার প্রতি ছিল কৌতূহল ও বিপুল আগ্রহ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেরাগাজীখান সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের সন্নিহিত পাঞ্জাবের একটি জেলা। এ অঞ্চলে বহু খ্যতিমান সুফী দরবেশের আবির্ভাব ঘটেছে। পীর ফকিরের প্রতি ভীষণ অনুরক্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিত-মুর্খ সকলেই সুফী সাধকদের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য খুবই অনুপ্রাণিত ছিল। শিখদের গুরু নানক ছিলেন একজন সাধু দরবেশ। আর এ পরিবেশেই শিখ বংশীয় উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর শৈশবের দশ-বারো বছর কেটে যায়।[৩] বার বছর বয়সে সিন্ধী নিজ স্কুলের এক আর্য-সমাজপন্থী বালকের নিকট থেকে পন্ডিত মৌলবী উবায়দুল্লাহ্ রচিত 'তুহ্ফাতুল হিন্দ' ধার নিয়ে বার বার পাঠ করার ফলে তাঁর মনে ইসলামের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এ স্কুলের কিছু বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রচিত 'তাক্বিয়াতুল্ ঈমান' নিয়ে পাঠ করেন । এরপর তিনি মৌলবী মুহাম্মদ লখনৌব রচিত 'আহ্ওয়ালুল আখিরাত'ও পাঠ করেন। এতে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।[৪]

'আহ্ওয়ালুল আখিরাত' ও 'তুহ্ফাতুল হিন্দ' গ্রন্থদ্বয়ের যে অধ্যায়ে নওমুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সিন্ধী তা বার বার অধ্যয়ন করেন। এ দুটো গ্রন্থ অধ্যয়নই তকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। সৃষ্টিকর্তার একত্বে বিশ্বাস, অহিংসা, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র। ইসলামের সাথে শিখ ধর্মের এ সাদৃশ্যের ফলে মুসলমান সমাজের সাথে শিখদের ভাব বিনিময় ও মেলামেশার সহজ সুযোগ ছিল। তিনি মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এসব ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে তাঁর মন ইসলামের প্রতি

আকৃষ্ট হয়। ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণেই একদিন তিনি ধর্ম, সমাজ, জাতি, স্বজন, সব বন্ধন ছিন্ন করে পালিয়ে গিয়ে ১৫ বছর বয়সে ১৫ আগস্ট ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর এক মুসলিম ধর্ম সাধকের হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৫] অতঃপর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধুকে নিজ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং নিজের নামের সাথে সিন্ধী লিখতে থাকেন। এরপর তিনি ভাওয়ালপুরে প্রাথমিক আরবি কিতাবসমূহ এবং দীনপুর কোটলা রহমশাহে 'কাফিয়া' পড়েন। পরবর্তী সময়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য দেওবন্দ গমন করেন। এখানেই সিন্ধী তাঁর রাজনৈতিক গুরু হযরত মাওলানা শায়খুলহিন্দ মাহমুদুল হাসান-এর সাক্ষাত পান।[৬]

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধী দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট 'কুত-বী', আরবি ব্যাকরণ গ্রন্থ 'শরহে জামী' পড়েন। শায়খুলহিন্দ মাহমুদুল হাসান-এর নিকট তিনি 'জামে তিরামিযী' অধ্যয়ন করেন। শায়খুলহিন্দ তখন দেওবন্দের প্রধান পরিচালক ও ওস্তাদ। তিনি নওমুসলিম যুবক উবায়দুল্লাহ্‌র মধ্যে প্রতিভা, দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক মানসিকতার পরিচয় খুঁজে পান।[৭] জিহাদের আলোচনা প্রসংগে সিন্ধী মাওলানা মাহমুদের নিকট তাঁর জিহাদ বাহিনী গঠনের কথা উল্লেখ করলে শায়খুলহিন্দ তা সমর্থন করেন; সেটা অব্যাহত রাখা এবং সংশোধনমূলক কিছুটা পরামর্শও প্রদান করেন। এভাবেই মাহমুদের সাথে সিন্ধীর শিক্ষাদানমূলক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৮]

ছোটবেলায় নিজ পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্যদের নিকট পাঞ্জাব বিপ্লব (শিখ-ব্রিটিশ যুদ্ধ ১৮৪৬ ও ১৮৪৯)-এর বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে সিন্ধীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তদুপরি ইসমাঈল শহীদের জিহাদমুখর জীবনী পড়ে এবং শিক্ষক আবদুল করীম দেওবন্দীর নিকট দিল্লির পতনের (১৮৫৭) ইতিহাস জেনে তাঁর রাজনৈতিক অনুভূতি আরো শাণিত হয়ে উঠে। তিনি ইসমাঈল শহীদের জিহাদসংক্রান্ত কিছুটা লেখার মর্মানুসারে নিজের রাজনৈতিক বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তাঁর ঐ জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমিকে ব্রিটিশের দখল থেকে মুক্ত করা। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, "মাওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির মূলে কার্যকর ছিল তাঁর উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা।"[৯] তিনি যখন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তাঁর মুর্শিদের খলীফা আবুল হাসান তাজমাহমুদের নিকট ইমরোটে (শুক্কুর) শিক্ষাদানরত ছিলেন, তখন চারজন মুজাহিদের একটি দলগঠন করেছিলেন। যে দলটি ইসমাঈল শহীদের যুদ্ধাদর্শে গঠন করা হয়েছিল।

দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে সিন্ধী ওস্তাদ মাহমুদুল হাসানের সাহচার্যে এসে তাঁর বিপ্লবের কর্মসূচিতে প্রভাবান্বিত হন। শায়খুলহিন্দ সিন্ধীর নিকট দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। সিন্ধী শায়খুলহিন্দের নিকট দীক্ষা নিলেন, দুনিয়ার মসনদ, মর্যাদা ও রাজত্ব জিহাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চার বছর (১৯০৯-১৯১৩) দেওবন্দে 'জমীঅতুল-আনসার'-এ দায়িত্বে থাকাকালে সিন্ধী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী ও সংগ্রামী রাজনীতি আরম্ভ করেছিলেন বিধায় তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে মাদ্‌রাসা থেকে বিতাড়িত হন। 'জামীয়াতুল আনসার' ছিল প্রকারান্তরে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এতে তিনি সেক্রেটারি হিসেবে পরোক্ষভাবে রাজনীতিই করেছিলেন। 'জমীঅতুল আনসার'-এর সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য ছিল, মাহমুদুল হাসান পরিকল্পিত ব্রিটিশ উৎখাতের অভিযান পরিচালনার জন্য একটি ছদ্মবেশী বাহিনী গড়ে তোলা।[১০]

নভেম্বর ১৯১৩ সিন্ধী দিল্লির ফতেহপুর মসজিদে 'মাদ্রাসাতুল নাযারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া' সংক্ষেপে 'নাযারাতুল মা'আরিফ' প্রতিষ্ঠা করেন। সি. আই. ডি-এর বর্ণনা মতে, উবায়দুল্লাহু দারুল উলূম দেওবন্দকে নিজেদের মিশনারীসমূহের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বানাতে সক্ষম না হওয়ায় দিল্লিতে একটি ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১১] উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'কলীদে কুরআন' এবং 'তা'লীমে কুরআন' নামক দু'টি পুস্তক প্রকাশ করেন। গ্রন্থদ্বয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারত উপমহাদেশকে উদ্ধারকল্পে মুসলিম সম্প্রদায়কে দলমত নির্বিশেষে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয় এ কারণে ইংরেজ রাজশক্তি সিন্ধীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত কিতাব দু'টি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রকাশনাও বন্ধ করে দেয়।

সিন্ধীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুত করার জন্য শায়খুলহিন্দ যেভাবে দেওবন্দে তাঁর দলের লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি দিল্লির যুবশক্তির সাথেও সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি একবার দিল্লি গমন করে ডা. মুখতার আহমদ আনসারী'র (১৮৮০- ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) সাথে সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর ডা. আনসারী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮ খ্রিঃ) ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবেই ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিক ও রাজনীতির সাথে সিন্ধীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯১২ সালে মুসলিম বিশ্বে নতুন একটি বিপদ আপতিত হয়। ধূর্ত ব্রিটিশ এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকানের রাজ্যসমূহকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর জার্মানী ও ইটালী জেনারেল ফ্রঙ্কর মাধ্যমে স্পেনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যা করতে চেয়েছিল তা তারা বলকানীদের মাধ্যমে তুরস্কের বিরুদ্ধে করার প্রয়াসী হয়। তদুপরি ব্রিটিশ সরকার ১৯১৩ সালে কানপুরের মিছলি বাজারের একটি রাস্তা করতে গিয়ে একটি মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়। মুসলমানগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করলে ইংরেজদের গুলিতে অনেক মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন।

উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় সংঘটিত হওয়ায় ভারতের মুসলমানগণ একই প্লাটফর্মে সমবেত হন। দেশকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার প্রবল স্পৃহা তাদের মনে জেগে উঠে। দিল্লিতে 'নিযারাতুল মা'আরিফ' স্থাপন করে ভারতের যুবকদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হাকীম আজমল খান, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, মাওলানা শওকত আলী, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা যাফর আলী খান, মওলানা আবুল কালাম আযাদ এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সি. আই. ডি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'নিযারাতুল মা'আরিফ' তাদের গোপন পরামর্শগৃহ ছিল এবং এ প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণ লোকে রাজনৈতিক ক্লাব বলে আখ্যায়িত করত।[১২] এ শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর গোপন আস্তানা।

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী (১৮৯২-১৮৯৩) শিক্ষা সমাপনান্তে পুনরায় সিন্ধুতে ফিরে যান। সিন্ধুতে পৌঁছে তিনি স্বৈরাচারী ইংরেজদের হাত থেকে ভারত উপমহাদেশকে রক্ষাকল্পে রাজনৈতিক আন্দোলনকে জোরদার করার মানসে সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ মজবুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাই তিনি আমরুট শহুরে 'দারুল ইরশাদ' নামক একটি প্রেস স্থাপন করে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাছাড়াও 'হিদায়াতুল্ ইখওয়ান' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এরপর তিনি মাওলানা রাশেদুল্লাহ্র সহযোগিতায় গোঠপীরঝাণ্ডায় 'দারুর্-রাশাদ' নামক একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

১৯০৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে মাহমুদুল হাসান সিন্ধীকে সিন্ধু থেকে দেওবন্দে ডেকে নেন এবং 'জমীঅতুল আনসার'-এর প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কাজ করার নির্দেশ দেন। 'জমীঅতুল আন্সার'-এর অন্যতম একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রদে নিয়ে মুজাহিদদের একটি দল গঠন করা এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। জমীঅতের আসল উদেশ্যকে গোপন রেখে ১৯১০ সালে দেওবন্দ 'দাস্তারবন্দী'র জলসা' অনুষ্ঠিত হয়। এর সর্বপ্রথম অধিবেশন ১৯১১ সালে এপ্রিলের ১৫-১৭ তারিখে মুরাদাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। শায়খুলহিন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ব্যবস্থাপনায় 'জমীঅতুল আনসার' এর দ্বিতীয় কনফারেন্স ১৬ -১৮ এপ্রিল ১৯১২ সালে তিন দিন ব্যাপী মীরাঠে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। 'জমীঅতুল আনসার'-এর দু'টি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইংরেজ সরকার 'জমীঅতুল আনসার'-এর কার্যবিধির উপর বিশেষ নজর দেয় এবং শায়খুলহিন্দের আয়ের উপর ট্যাক্স আরোপ করে।[১৩]

দারুল উলূম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যবস্তু ছিল -এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রবিষয়ক ও রাজনীতি মুক্ত থেকে শুধু এখানে বিদ্যাচর্চার একক ব্যবস্থা থাকবে। সিন্ধীর তত্ত্বাবধানে 'জমীঅতুল আনসার'-এর অগ্নিবৎ কার্যাবলি দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষ দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিভেদ ও অনৈক্যের কারণদর্শিয়ে সিন্ধীকে দারুল উলূম থেকে সরিয়ে দেয়। ফলে সিন্ধী দারুল উলূমের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের সাথে সম্পর্কচ্যুত হলেও শায়খুলহিন্দের সাথে তাঁর সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় নিবিড় থাকে।[১৪] সিন্ধী শায়খুলহিন্দের সাথে গোপনে মিলিত হয়ে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করতেন। সিন্ধীকে দারুল উলূম থেকে সরিয়ে দিলে তিনি 'জমীঅতুল-আনসার'-এর সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং দিল্লিতে অবস্থা করতে আরম্ভ করেন।

সিন্ধীর সাথে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুরও একটি রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। ইটালীতে নেহেরুর সহিত তাঁর দেখা হলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (United Republics of India) একটা পরিকল্পনা উপস্থাপন করে যুক্তি দেখান যে ইহা দ্বারাই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। যদিও নেহেরু এ মতামতকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

মুঈন শাকির মওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক দর্শন ও ইসলাম সমর্থিত তাঁর মৌলিক সমাজচিন্তা ব্যাখ্যা করে বলেন, "It was Ubaidullah Sindhi (1872-1944), trained by Mahmudul Hassan, who enolved a political philosophy which, on the one hand was influenced by the revolutionary traditions of Wahabies, on the other, by the 'Indo-Islamic,' joint programmee of Mahmudul Hassan ... Sindhi's theory of nationalism was different from that of the congress and the reactionary Ulema.

A real federation would provide a true solutions of the Indian problem .... After Shah Waliulla" and Sir Syed, he made a sincere attempt to interpret Islam in accordance with the requirements of the age. He visualized the possible ... He supported the establishment of a democratic socialist state and

society. ... His concept of religion, nationalism and nationalities and Islamic communism is an original contribution to Muslim political ideas in India.)"[১৫]

১৮৫৭'র স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয়রা ব্যর্থ হলে ইংরেজগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজদের ধারণা- আন্দোলনের মূল হোতা ছিল মুসলমান। তাই তারা মুসলমানদের নির্যাতন, অত্যাচার ও হত্যা করে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুরাও তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাইনি। এ সময়ে ভারতীয়দের অন্তরে ইংরেজ ভীতির সঞ্চার হলে তারা ভারতীয়দের মনোবল বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে এদেশীয় তোষামোদকারীদেরকে খান সাহেব, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, স্যার, শামসুল উলামা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করতে থাকে।

পক্ষান্তরে, ইংরেজ বিদ্বেষী স্বাধীনতাকামী মর্দে মুজাহিদও বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূক ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁদের প্রেরণা দমে যায়নি। ১৮৭৬ সালে বাংলায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও এর দু'বছর পর দেওবন্দে 'সামরাতুত্ তরবিয়ত' এবং ছ'বছর পর মাদ্রাজে 'মহাজনসভা' ইত্যাদি দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দলের বহিরাবরণ ছিল জনকল্যাণমূলক।[১৬] মূলত এদের কার্যক্রম ছিল রাজনৈতিক।

দূরদর্শী বিচক্ষণ কতিপয় ইংরেজ বুঝতে পারল যে, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল কল্যাণমূলক কাজ করার আবরনে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। এ বাহ্যিক জনকল্যাণমূলক দলসমূহকে বিনষ্ট করতে হবে। তাই তারা ভারতবাসীর সকলের জন্য একটি দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন এ. ও. হিউমকে একটি দল গঠনে পরামর্শ দেন এবং ১৮৮৫ সালে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে G. K. Gokhale বলেন, "The all Indian National Congress was, of course, the brain child of an English Man. No Indian."[১৭]

মুসলমানগণ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইংরেজগণ মুসলমানদেরকে এ কথা বলে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন কলা-কৌশলকে প্রয়োগ করে হিন্দু ও মুসলিম দু'টি পৃথক জাতিতে পরিণত করে। ফলে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ব্রিটিশের সৃষ্ট 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এবং তৎকর্তৃক হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে গঠিত 'মুসলিম লীগ' ও 'হিন্দু মহাসভা' প্রত্যেক দলই নিজ নিজ দাবি আদায়ে তৎপর। অপরদিকে বিপ্লবী দলসমূহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বক্রীয়ভাবে বিপ্লবাত্মক কার্যসিদ্ধিতে উদগ্রীব। এ সময়ে শায়খুলহিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারত ব্রিটশ কবলমুক্ত করতে চেয়েছেন। তার পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি এবং বহিরাক্রমণের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা। সে উদ্দেশ্যে তিনি একটি কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কূটনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে যে দু'জন সহকর্মীকে নির্বাচিত করেছিলেন তাঁরা হলেন– তার বিশ্বস্ত অনুগত শাগরেদ্ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ও মাওলানা মোঃ মিয়াঁ মনসুর আনসারী।

শায়খুলহিন্দ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয় স্বাধীন এলাকাসমূহের অবস্থান নিরূপণ, যোগাযোগের রাস্তা আবিষ্কার ও সামরিক ছাউনি নির্মাণের দায়িত্ব দেন। সিন্ধী দীর্ঘ ৭ বছর পরিশ্রম করে শায়খ মুহাম্মদ ইবাহিমের সহযোগিতায় সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

উপমহাদেশে ব্রিটিশের উপর বহিরাক্রমণের সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহের পরিকল্পনা ছিল। মাওলানা হোসাইন আহমদ মদনী এর জন্য একটি হেডকোয়ার্টার ও আটটি বিদ্রোহ কেন্দ্রের উল্লেখ করেন।

দিল্লি ছিল বিদ্রোহী দলের হেডকোয়ার্টার। এ হেডকোয়ার্টারের নেতৃবৃন্দ ছিলেন শায়খুলহিন্দ মাহ্মুদুল হাসান, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মহাত্মা গান্ধী, ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী, পন্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। তাঁদের নির্দেশক্রমে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ভারতীয় বিপ্লবী দল বিপ্লব পরিচালনা করতেন। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কেন্দ্রসমূহ ছিল- রান্দের, পানিপথ, লাহোর, দীনপুর, আমরোট, করাচি, আতমানযয়ী, তুরঙ্গযয়ী।[১৮]

ভারতে স্বাধীনতা সফল করার লক্ষে সিন্ধী ১৯০৫-১৯১৪ সালের মধ্যে জাপান, চীন, বার্মা, ফ্রান্স ও আমেরিকার সরকার ও সর্বসাধারণের জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিশেষ মিশন প্রেরণ করা হয়।

মাওলানা মকবুলুর রহমান এবং শওকত আলীর সমন্বয়ে আট সদস্যের একটি মিশন চীন প্রেরণ করা হয়। তথায় মিশনটি একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা সেখানকার মুসলমান এবং সর্বসাধারণকে ভারতের স্বাধীনতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে জনমত গঠনে বিপুল সফলতা অর্জন করে।[১৯] তারা সেখানে মাসিক 'আল য়্যাকীন' নামক একটি পত্রিকা চীন ও উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এখানে কাজ করার পর কেন্দ্রীয় নির্দেশে তারা বার্মাতে চলে যায়।

প্রফেসর বরকতুল্লাহ্র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি মিশন জাপানে প্রেরণ করা হয়। তিনি জাপানের টোকিওর একটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। 'ইসলামিক ফ্রেটারনিটি, (Islamic Fraternity) নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন এবং এ নামেই একটি দৈনিক পত্রিকা জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় চালু করেন। এ সময়ে ফ্রান্স মিশনে একজন পারদর্শী উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে মিশনের একজন সদস্যসহ বরকতুল্লাহ্ ফ্রান্সে গমন করেন। অপর তিন জনের উপর জাপানি মিশনের কাজ অর্পিত হয়।

চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি মিশন ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। মিশনটি চার বছর কাজ করার পর মাওলানা বরকতুল্লাহ্র ন্যায় বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে বরকতউল্লাহ্ একজন সদস্যসহ টোকিও থেকে প্যারিসে চলে আসেন। এ মিশন 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা সেখানে 'ইনকিলাব' পত্রিকা প্রকাশ করে।

হরদয়ালের নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন আমেরিকাতে প্রেরণ করা হয়। এ মিশন এখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। এরপর প্রফেসর বরকতুল্লাহ্ এবং চৌধুরী রহমত আলীও ফ্রান্স

থেকে আমেরিকা চলে আসেন। আমেরিকার মিশন 'গদর পার্টি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করে। ওয়াশিংটনে আগমনের পর 'গদর' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় বিপ্লবী দলের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য যথারীতি প্রচারিত হতে থাকে।

আলোচ্য গবেষণার শিরোনামের সাথে আফগানিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবে উবায়দুল্লা সিন্ধীর কর্যক্রম আলোচনার বিষয় না হলেও ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সাম্যক ধারণার দাবি রাখে। কেননা সিন্ধী শেষ জীবনে পাঁচ বছর ভারতে বিশেষ রাজনৈতিক কার্যক্র্রম চালিয়েছেন। তাই আফগানিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবে সিন্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ড ধারাবাহিক ভাবে কিছুটা তুলে ধরা হলো-

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রত্যেক রাজনীতিক এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়। এ সময় উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী শায়খুলহিন্দ মাহমূদুল হাসানের নির্দেশে আব্দুল্লাহ, ফাতেহা, মোহাম্মদ আলী-এ তিন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে বিনা পাসপোর্টে কাবুলের পথে যাত্রা করেন এবং ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানে পৌঁছান। তিনি কাবুলে ইতোপূর্বে আগত অনেক স্বাধীনতাকামি ভারতীয়দের সাথে দেখা করনে। বিপ্লবী দলের নেতৃবর্গ ইয়াগীস্তানের জনগণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পান। এরই আলোকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মিশনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আফগান সরকারের বিপ্লবী দলের চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে শাইখুলহিন্দ সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণ করেন।[২০]

ভারতীয় বিপ্লবী দলের আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠন, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রের হেডকোয়ার্টার ছিল কাবুল। এ হেড কোয়ার্টারের তত্তাবধানে চারটি শাখা ছিল: মদিনা মুনাওয়ারা, কন্স্টান্টিনোপ্ল, বার্লিন এবং ইস্তাম্বুল।[২১]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর আফগানিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আফগান সরকার থেকে নৈতিক সমর্থন ও সামরিক সাহায্য আদায় করা। তাই সিন্ধী ১৯১৫ সালে কাবুলে পৌঁছে ইব্রাহিমের সহায়তায় আফগান সেনাপতি মুহাম্মদ নাদির খান ও সরদার মাহমুদ খান তরযী এবং প্রধান কাযী আব্দুর রায্যাকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সিন্ধী তাদের সহায়তায় আফগান সরকারকে তার পরিকল্পনার বিষয়ে সম্মত করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং আফগান সরকার প্রধানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেন।[২২] আফগান বাদশাহ আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান-এর পুত্র মু'য়িনুস্ সুলতানাত সর্দার ইনায়াত উল্লাহ খান, নায়িবুস্ সুলতানাত সর্দার নসরুল্লাহ্ খান (আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের ভাই) ও আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে সাত আট পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে তাঁদেরকে অবগত করেন।[২৩]

আফগানিস্তানের আমিরের সাথে সাক্ষাতের পর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারত-তুর্কী জার্মান মিশনের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সিন্ধী মিশনের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন।[২৪] সিন্ধী উক্ত মিশনকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের পর সেখানে অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা

বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবী কাউন্সিলের এক অধিবেশন ১৯১৫ সালে ২৯ অক্টোবর আফগান বিচারপতি আব্দুর রায্যাক খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশনে অস্থায়ী ভারত সরকার[২৫] গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৬] এরপর সিন্ধী আফগান আমীরের সামনে যুক্তিযুক্ত কর্মসূচি পেশ করেন এবং ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার জন্য আবেদন জানান। সিন্ধী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের পরামর্শক্রমে কাবুলস্থ 'অস্থায়ী ভারত সরকার' আমীর নসরুল্লাহ্ খানের অনুমতি নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে বিদেশে তিনটি মিশন রাশিয়া, জাপান ও তুরস্কে প্রেরণ করেন।

সিন্ধী আফগানিস্তানে অবস্থান করেই সুযোগ মতো ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিলেন। মুজাহিদ ছাত্ররাও তুরস্কে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। সিন্ধী তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদের সবাইকে নিয়ে এবং ইতোমধ্যে কাবুলে আগত শায়খুল হিন্দের উল্লেখযোগ্য দুজন সহযোদ্ধা- মাওলানা মনসুর আলী ও মাওলানা সাইফুর রহমান এবং মুজাহিদীন দলের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ বশীরের পরামর্শক্রমে সিন্ধী কাবুলে অবস্থানকালে জুনূদুল্লাহ নামক একটি মুক্তিফৌজ গঠন করেন।[২৭]

আফগানিস্তানে বিপ্লবী দলের কার্যক্রমের সফলতা-ব্যর্থতাসমূহর সকল সংবাদ মাহমূদুল হাসানকে জানানোর জন্য সিন্ধী তিনটি রেশমী কাপড়ে বয়ন করে পাঠিয়ে দেন। সংবাদ আদান-প্রদান এবং পত্র বহন করে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল নওমুসলিম শায়খ আবদুল হকের[২৮] উপর। ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে সমস্ত পরিকল্পনা আব্দুল হক ফাঁস করে দিলে ব্রিটিশ সরকার সিন্ধীর উপর নির্যাতন চালায়। তবে আফগান সরকার সিন্ধীর পক্ষে থাকার করণে ব্রিটিশ সরকার সিন্ধীকে নজর বন্ধ করে রাখে।[২৯] সিন্ধী আমান উল্লাহ্ খানের শাসনামলে প্রায় চার বছর কাবুলে অবস্থান করে অস্থায়ী ভারত সরকারের জন্য যেমনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, তেমনি কাবুল সরকারের হিতসাধনে প্রয়াসী হন। এরপর আমান উল্লাহ খানের আমলে সিন্ধী অস্থায়ী ভারত সরকারের বিকল্পরূপে 'অলইন্ডিয়া কংগ্রেস'এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।

শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে ১৯২২ সালে সেই অস্থায়ী ভারত সরকার বন্ধ করে দিতে হলো। কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন করার যে বাসনা তাঁর মনে প্রজ্বলিত ছিল, তা কখনো নির্বাপিত হয় নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোট সাত বছর সাত দিন কাবুলে থাকার পর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হন এবং ১৯২২ সালের ২২ অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন।[৩০]

রাশিয়ায় সাত মাস অবস্থান করার পর সিন্ধী তাঁর সাথী মাওলানা যুফার হাসানসহ ১৯২৩ সালে আংকারায় পৌঁছেন। ফলে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাঁদের এ সফর সম্প র্জানতে পারেনি। সেখানে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কামাল পাশা (১৮৮১-১৯২৬ সাল) তুরস্কে অবস্থান করে কামাল পাশার আধুনিক তুরস্ক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ পর্যবেক্ষণ করেন। সিন্ধী ঐ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদে প্রভাবান্বিত হন এবং ভারতে ন্যাশনাল স্টেট গঠনের চিন্তা করেন। ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারত সরকারের জন্য ১৯২৪ সালে ইস্তাম্বুল থেকে উর্দুতে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কর্মসূচি:

১। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সরকার গঠন।

২। ভারতে মুসলমান, অন্যান্য সংখ্যালঘু ও ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষিত করা।

৩। ভারতে, শ্রমিক শ্রেণি তথা কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য থাকবে এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা; জমিদারি ও পুঁজিবাদকে দেশ থেকে উৎখাত করা।

৪। সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন করা।[৩১]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারতীয় বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইটালীর পথ ধরে মক্কায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। হেযাযে প্রবেশ করে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। মক্কায় দীর্ঘ বার বছর অবস্থান করে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩২]

৭ মার্চ ১৯৩৯ সালে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী সিন্ধীয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির হজ্ব যাত্রীবাহী 'আল মদিনা' নামক জাহাজে করে করাচি পৌঁছালে তাঁর প্রতি বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুসলিম লীগ, ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং জমিঅতুল উলামা-এর সাংবাদিকবৃন্দ জাহাজঘাটে সমবেত হন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাহ্ বখশ এবং রাজস্বমন্ত্রী এলাহী বখ্‌শও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্টিমার থেকে অবতরণ করার পর সামরিক পদ্ধতিতে সিন্ধীর প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। ব্রিটিশ ভারত সরকারের সংগে আলাপ-আলোচনা করে দেশে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানায়।

করাচিতে অবতরণের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সিন্ধীকে নিজ নিজ দলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালে তা নিয়ে তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হন। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, "কংগ্রেস আমার স্বর্গ, আমি কখনো এর বাইরে যাব না। বিশেষ পর্যালোচনা সহকারে এবং সুদৃঢ় মতামত নিয়েই আমি বহু বছর আগে কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত হই। ঐ সময় আমি কাবুলে একটি কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করি। অদ্যবধি আমি কংগ্রেসের একজন দীন সেবকরূপে এর বাণী প্রচারকল্পে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছি।[৩৩]"

পরিশেষে তিনি বলেন, "আমি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। কোন গোঁড়ামিতে আমি বিচলিত হব না। কিছু গ্রহণ করার পূর্বে সে সম্বন্ধে আমি পুরোপুরি অবহিত হতে চাই। কংগ্রেসেও যদি দেখতে পাই যে তাঁদের কার্যের সাথে আমার মতের অমিল রয়েছে, তখন আমি আমার নিজস্ব দল গঠন করবো। তথাপি আমি কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত থাকবো। কারণ এর আদর্শ হলো ভারতের মুক্তি।" মোট কথা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী করাচি বন্দরে অবতরণ করার পর সেখান থেকেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন। দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছরের প্রবাস জীবনে তাঁকে যে সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে, সেসব কথা বলার জন্য ব্যাকুল হন।[৩৪]

১০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কংগ্রেসের অধীনে 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ পার্টির সদর দফতর করেন সিন্ধুতে। এ পার্টির প্রচার ও প্রসার না ঘটায় এটি অনেকটা কাগজে-কলমেই ছিল। ইহা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। করাচি, লাহোর ও দিল্লিকে এ পার্টির তিনটি আঞ্চলিক উপ-দফতর রাখা হয়। এ পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচি বর্ণনা করে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর 'দারুর-বাশার সিন্দসাগর ' থেকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি 'যমুনা নর্মদা পার্টি' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেন, গংগা-যমুনা হলো সিন্ধু সভ্যতার উৎস, আর সিন্ধু হলো মুসলিম

সভ্যতার সুতিকাগার। যদি উক্ত দুই অঞ্চলের লোকদেরকে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে জটিল সমস্যাসমূহের সুরাহা করা যাবে।

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি'র অধীনে গোঠপীরঝাণ্ডার (হায়দারাবাদ) 'দারুর রাশাদ' মাদ্রাসায় এবং ২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে করাচীর মাজহারুল উলূম মাদ্রাসায় আলিমদের নিয়ে 'জমিয়ত-এ-খুদদামুল হিকমত' নামক একটি দর্শন সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী দর্শনের সেবা ও হেফাজত করা এবং মুসলিমদের পারস্পরিক অনৈক্য দূর করাই ছিল এ সমিতির মূল লক্ষ্য। শাহ ওয়ালীউল্লাহকে সমস্ত উলূম-এ শরীআহ্ তথা কুরআন হাদিস দর্শন ও রাজনীতির ইমাম মেনে তাঁর রচনাসমূহকে মূল ভাষায় শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান করা ছিল 'জমীঅত-এ-খুদদামল হিকমত'-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমত'-এর মূল উদ্দেশ্য। 'বায়তুল হিকমত'-এর নীতিমালার মধ্যে কুরআন এবং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন শিক্ষা দেয়া হবে এবং এর গ্রন্থাগারে এমন সব গ্রন্থ সংগ্রহ করা হবে যাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সাথে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনরে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা সহজতর হয়।[৩৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) চলাকালীন উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । তখন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটশ সরকারকে সাহায্য করার কথা বলেন। তাঁর কাবুল গমন এবং ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের পূর্বেকার নীতি সম্পর্কে মতামত হল, তখন ধর্মীয় কর্তব্যের প্রয়োজনেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন এবং সে যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছিলেন। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি বদলে যাওয়াতে ব্রিটশদের সাথে মুসলমানদের কোন ধর্মযুদ্ধ নেই। তাঁর মতে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে অহিংসানীতি অনুসরণ করে যতখানি উন্নতি করা সম্ভব হবে তা অন্য কোনভাবে সম্ভব হবে না।

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খান (১৮৯২-১৯৪২) ও গান্ধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলে সিন্ধী উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কেননা তিনি ধারণা করতেন অহিংসনীতি অবলম্বন করলেই স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা যাবে। তবে সিকান্দার হায়াত খানকে ঐ অধিবেশনে সিন্ধী স্মরণ করিয়ে দেন যে কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়া বিনা শর্তে ব্রিটিশদের সহায়তা করলেই স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাবে না। সিন্ধী মনে করেন, যুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করা উচিৎ। যুদ্ধশেষে 'হোমরুল' (স্বায়ত্তশাসন) না পাওয়া গেলে একজনের স্থলে দশজনকে যবেহ দেয়া যাবে।

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে (১৮৮৯-১৯৬৪) ভবিষ্যত বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি রেখে আপাতত কিছুটা পিছু হটতে এবং ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করবেন বলে উল্লেখ করেন। সিন্ধী মনে করেন গান্ধীর ১৯৩০ সালের ডাকা অসহযোগ আন্দোলন ১৯৪০ সালের অসহযোগ আন্দোলন এক হতে পারে না। কেননা যুদ্ধের সময়টি হলো নাজুক সময়। তাই থাট্টা কংগ্রেসের অধিবেশনে মন্তব্য করেন, "গান্ধীর সাথে তাঁর দেখা হলে ১৯৩০ সাল ও ১৯৪০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পার্থক্য তুলে ধরবেন।"[৩৬]

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ সাধন ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ মুক্ত করার জন্য ব্যয় করেন। অবিরাম পরিশ্রম করার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং করাচিতে অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। কিন্তু অসুখ দিন দিন বেড়েই চলে। এ সময় তাঁর

কন্যা ও দৌহিত্রদের অনুরোধে তিনি ভাওয়ালপুর স্টেটের দ্বীনপুরে চলে যান এবং জীবনের শেষ দিনগুলো জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লি ও ভওয়ালপুরের দ্বীনপুরে কাটান। অবশেষে সেখানে ব্রিটশ বিরোধী মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। এ মহান নেতার মরদেহ রহীম ইয়ারখান জেলার (পাঞ্জাব) খানপুরে সমাহিত করা হয়। উবায়দুল্লাহ্ ইন্তেকালের পর Star of India পত্রিকায় বলা হয়, "An aquisition to Islam from the Virile Shik Community, he rendered his people services they can never forget. A follower of the school of India of the late Shah Waliullah preached and no less practiced - Islam which was dynamic. ... And upright man is God's noblest creation. Such was Moulana Obaidullah Sindhi."[৩৭]

উপসংহার

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী নানা বাধা, বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাকে নিজের বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে মোকাবেলা করতেন। তাই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাবুল থেকে রাশিয়া এবং রাশিয়া ত্যাগ করে তুরস্কে আশ্রয় নেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে বারো বছর জ্ঞান সাধনা করেন। তাঁর সংগ্রামী জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতে অবস্থানকালে তিনি একজন নিবেদিত শিক্ষক ও গবেষক, মাহমুদুল হাসানের একনিষ্ঠ কর্মী এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সংগঠক, কাবুলে গিয়ে হন সফল কূটনীতিক, অস্থায়ী ভারত সরকারের স্বদেশমন্ত্রী এবং জুনূদুল্লার অধিনায়ক; রাশিয়ায় গিয়ে হন সমাজবাদের ভক্ত; তুরস্কে গিয়ে হন কামাল পাশার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও সংস্কার আন্দোলনের শ্রোতা ও পর্যালোচক; মক্কায় গিয়ে হন জ্ঞানসাধক, গবেষক ও শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষক; অতঃপর দেশে ফিরে একজন সফল বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুটা ব্রিটিশ তোষণনীতি গ্রহণ করলেও ভারতবর্ষের প্রতি যত প্রকার অবিচার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেগুলো দূর করার জন্যই 'যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' গঠন করে সিন্ধী তাঁর আন্দোলনকে চলমান রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য অমৃত সংগ্রাম করে অনেক খানি এগিয়ে নিয়ে গেলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে সংগ্রমী পুরুষ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে। সংবাদ আদান-প্রদানের অসতর্কতা, আবদুল হকের আত্মবিশ্বাসের অভাব, তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি, সর্বোপরি দেশের প্রতি রব নেওয়াজ খানের বিশ্বাসঘাতকতার নতুন কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হন। ফলে ব্রিটিশ ভারত সরকার বিপ্লব দমনে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং আন্দোলনটি ব্যর্থ করে দিলেও ভারতীয় জনমনে ব্রিটিশ-বিরোধী এক নতুন মাত্রা যোগ হয়; যা ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এভাবে বিভিন্ন জাতি সমস্যায় বিপর্যস্ত ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে সিন্ধীর চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শীতাই প্রমাণ করে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ Ray, Santimoy, *Freedom Movement and Indian Muslims*, Peoples Publishing House, New Delli, January-1979, p.109.

২ আব্দুর রশিদ আরশাদ, *বীস বড়ে মুসলমান* (লাহোর: ১৯৯৯), পৃ. ৪০৪।

৩ মুহম্মদ সারওয়ার, *খুদবাত-এ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী* (লাহোর: সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৪৪), পৃ. ৫৮

৪ মো. কামালহোসেন, *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর ভূমিকা* (অপ্রকাশিত এম. ফিল. থিসিস, ঢা.বি. ২০০৯), পৃ. ৩৯-৪০

৫ ড. নূর-উদ-দীন আহমদ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা* (অনু) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬২), পৃ. ৩

৬ মাওলানা মুজিবুর রহমান, *মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রোজনামচা* (সংকলন ও অনুবাদ) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২

৭ ড. মুহাম্মদ আরশাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৫

৮ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ২০

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১১ Silken Letters Conspiracy Case and Who is Who, C.I.D Report, (ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড) ফৌজদারি মোকাদ্দমা, ভারতের বড় লাট বনাম উবায়দুল্লাহ্ ও অন্যান্য, ১২১ নং ধারা, মোকদ্দমার আরজীর ১৭ নং বর্ণনা

১২ পূর্বোক্ত

১৩ *মো. কামাল হোসেন*, পূর্বোক্ত, *পৃ. ৪৯-৫২*

১৪ পূর্বোক্ত, *পৃ. ৫৩*

১৫ Moin Shakir, *Khilaphat to Partition,* (Delhi: 1983), pp. 43, 45 & 46

১৬ *মো. কামাল হোসেন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩

১৭ F.C. Andrews, *The Rise and Growth of the Congress in India* (London: Gweorge Allen and Unwin, 1938), p. 121

১৮ মাওলানা আবদুর রহমান, *তাহরীকে পরশমী রুমাল* (লাহোর: ১৯৬০), পৃ. ১৫৯-১৬০

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭-১৪১

২০ *মো. কামাল হোসেন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬৫

২১ মাওলানা আবদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

২২ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল* (লাহোর: সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫৫), পৃ. ৩৮

২৩ মো. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

২৪ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

২৫ ইতিহাসে ইহা 'অস্থায়ী ভারত সরকার' নামে খ্যাত। আফগান সরকার 'অস্থায়ী ভারত সরকার'-এর অফিসের জন্য কয়েকটি সরকারি বাসভবন প্রদান করেন। ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর 'অস্থায়ী ভারত সরকার'-এর ঘোষণা দেয়া হয়। এ 'অস্থায়ী ভারত সরকার'-এ ভারতের উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার অধিবাসী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব গৃহীত। উক্ত অন্তর্বতকালীন সরকারের জার্মান মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কাবুল আগত অধ্যাপক বরকতউল্লাহ্ ভূপালীকে প্রধানমন্ত্রী এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিন্ধী

হলফনামা সামান্য সংশোধন করে ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গণ করেন। বিস্তারিত দেখুন Hossain, A.H.M. Mustaba, *Shaikhul Hind Mawlana Mahmud Hasan: His Contributions to Education and Politics*; The Dhaka University Studies, 'A' December, 1984.

২৬ *Ibid.*

২৭ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

২৮ আবদুল হক আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর কাবুল গমনের উদ্দেশ্য ছিল, কাপড়ের ব্যবসা এবং তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু ও ব্রিটিশ অনুচর 'রব নেওয়াজ'-এর দুই ছেলে শাহনাওয়ায খান ও আল্লাহ্ নাওয়ায খান-এর খবরাখবর জানা। ঐ দুই ছেলে ও মুজাহিদ ছাত্রদের দলভূক্ত হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছে ছিলেন এবং 'জুনূদুল্লাহ'-এর সদস্য হয়ে কাজ করেছিলেন। আবদুল হকের ব্যবসার কাপড়ের মধ্যে রেশমী রুমালগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। আবদুল হক তখন রব নেওয়াযের জেরার মুখে ভীত হয়ে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর দেয়া রেশমী কাপড়ের চিঠিগুলো ভাওয়ালপুরের মৌলবী গোলাম মুহাম্মদদের নিকট থেকে নিয়ে এসে রব নেওয়াযকে দেন। বিস্তারিত দেখুন Silken Letters Conspiracy Case and Who is Who, C. I. D. Report, পূর্বোক্ত

২৯ *Ibid.*

৩০ মুহম্মদ সারওয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৮

৩১ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৩২ মো. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫-১৩২

৩৩ Rowlatt Sedition Committee Report, Chapter-XIV, 1918, pp. 124-125.

৩৪ *Ibid.*

৩৫ মুহম্মদ সারওয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩, ১৮৬-১৮৮

৩৬ মো. কামাল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৭

৩৭ *Star of India*, August 25, 1944.

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ৩১.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, সেবা ও পরিচর্যা: ইসলামি নির্দেশনা

মোঃ নজরুল ইসলাম*
ফারজানা আক্তার ডালিয়া**

Abstract

People don't deliberately disable. Anyone has to be accepted disability due to accident or by birth. Whatever the cause, only the victims can feel the sufferings. Disability is viewed negatively by society. A family with a disabled person is also looked over differently by the society. This article is primarily hinted on People's negative attitudes towards disability and their isolation from different aspects. Lack of various social barriers, economic inadequacies and scarcity of inventory medical equipment's are forcing them to lead miserable lives. Islam has declared the equal rights of all human beings as a complete code of life. Following these guidelines, Islam gives highest importance to serving the weak and sick people. At the same time, Islam guarantees all-round support to the people with special needs and helpless people. It is necessary to adopt modern medical knowledge, equipment's and technologies to bring back a disabled to normal life. Islam has also given instructions not to accept any type of superstitions and malpractice of treatment. This article focuses on Islamic practice to overcome these problems. This article is also highlighted on Islamic (Quran, Sunnah and Fiqh) guidelines to ensure the services and care of people with disabilities and special needs. The primary data of this article were collected from secondary sources. Library and historical research methods have been used to organize the data of the article. Descriptive and content research methods have been followed in framing the article.

চাবিশব্দ: অটিজম, প্রতিপালন, কুসংস্কার, সচেতনতা, অঙ্গদান

ভুমিকা :

মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানও চিকিৎসা তাদের মধ্যে অন্যতম। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে সেবা ও পরিচর্যা। যেকোনও অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসার পাশাপাশি যথাযথ সেবা ও পরিচর্যা করা হলে একদিকে যেমন আরোগ্য লাভ করে অপরদিকে মানসিক সান্ত্বনা পায়। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যথাযথ চিকিৎসা, সেবা ও পরিচর্যার অভাবে প্রতিবন্ধীদের ভোগান্তি আরও বেড়ে থাকে। মানবজীবনে কেউ তার প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাশা করে না তারপরও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মানুষের জীবনে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ জন্মগতভাবে কিংবা কেউ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে থাকে। সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা কিংবা অজ্ঞতার জন্য প্রতিবন্ধীদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। জীবনকে সহজ করার আধুনিক শিক্ষা ও পদ্ধতি গ্রহণে অনিচ্ছাও তাদেরকে ভুগিয়ে থাকে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা, যথাযথ সেবা, পরিচর্যা ও প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা তাদের কষ্ট লাঘব করতে পারেন। সমাজের সাথে খাপ খেয়ে

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
** উপ-পরিচালক, ভিটিসি (ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার), বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ

নেওয়ার জন্য মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনা দরকার। একইসাথে যথাযথ সেবা ও পরিচর্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। ইসলাম অসুস্থদের সেবা ও পরিচর্যার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, সেবা ও পরিচর্যা বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের সেবা, চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে কিভাবে স্বাভাবিক ও মর্যাদাবান করা যায় সে বিষয়ে ইসলামের বিভিন্ন কার্যক্রম, মহতী উদ্যোগ ও বক্তব্য বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইসলাম প্রদত্ত এসব নির্দেশনা ও ব্যবস্থাসমূহ সবাই মেনে চললে প্রতিবন্ধীরা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে থাকবে না; বরং নিজের জন্য যেমন কিছু করতে পারবে তেমনি পরিবার ও সমাজের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions)

অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের বিভিন্নমুখী সমস্যা বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা নিয়ে তাদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করে থাকে। এসকল সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সমস্যা হচ্ছে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা, বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক বিষাদ, চিকিৎসায় অবহেলা, প্রযুক্তিগত অপ্রতুলতা এবং যথাযথ সেবা ও পরিচর্যার অভাব। অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের সমস্যা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ইসলামি জ্ঞানুসন্ধানকে বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য। একইসাথে ইলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা নিরসনে কিরূপ পথ্য দেওয়া হতো সে বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণার একটি অংশ। বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সমস্যার সমাধানে আমরা কতটুকু যত্নবান। তাদের চিকিৎসার জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় নাকি কুসংস্কারে নিমজ্জিত থেকে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে প্রতিবন্ধীদেরকে মুক্ত করতে ইসলামের কী ধরনের নির্দেশনা বিদ্যমান? প্রতিবন্ধীদের রোগনিরাময়ে কিভাবে সেবা করতে হবে? অটিস্টিক শিশুদের প্রতিপালন কিরূপ হবে? পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? প্রতিবন্ধিত্ব নিরসনে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা কী? প্রতিবন্ধিত্বের প্রশমনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা কী? এ সকল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ, হাদিস ও ফিকহি মতবাদ অনুসন্ধান করা বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা (Qualititative Research) পদ্ধতি নির্ভর। এখানে যেহেতু অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেহেতু সমসাময়িক সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের সমস্যাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মে গুণগত গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন ধরনের সহায়তা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রবন্ধের তথ্য বিন্যাসে লাইব্রেরী গবেষণা পদ্ধতি (Library Research Method), ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Method) ও দার্শনিক গবেষণা পদ্ধতিকে (Philosophical Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণে বর্ণনামূলক পদ্ধতির (Descriptive Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস অনুসন্ধানে বিষয়বস্তু

বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Content Analysis Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান প্রবন্ধের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে গিয়ে দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Source) হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও দৈনন্দিন পত্রিকার তথ্য-উপাত্তের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংগৃহিত তথ্য ও উপাত্ত যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে বস্তুনিষ্ঠ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Research)

সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। পূর্ণতা ও অপূর্ণতার ভেদাভেদ না থাকলে কেউ হয়তো অপূর্ণতার কষ্ট উপলব্দি করতে পারতো না। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোনও প্রতিবন্ধী যেন সমস্যাগ্রস্ত না হয়ে থাকে। সেবাযত্ন, পরিচর্যা কিংবা প্রতিপালনে কোনোরূপ অজ্ঞতা ও কুসংস্কার না থাকে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি সবাই সমান মর্যাদাসম্পন্ন। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত সমস্যার আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।

- সমসাময়িক সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত সমস্যা উপস্থাপন;
- বাংলাদেশে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার বাস্তবচিত্র উপস্থাপন;
- ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান;
- ইসলামে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা;
- প্রতিবন্ধিত্ব নিরসনে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রতিস্থাপনে ইসলামি শরীআ'র নির্দেশনা; এবং
- প্রতিবন্ধিত্ব প্রশমনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে নিয়ে ইসলামের দিঙ্‌নির্দেশনা।

প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা (Définition of Disability)

প্রতিবন্ধী বলতে শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে অসুস্থতাকে বোঝায়। এ অবস্থার ফলে ব্যক্তি বা শিশু প্রাত্যহিক কার্য-কলাপে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধ অর্থ বাধা ও অন্তরায়। প্রতিবন্ধকতা অর্থ বাধাদান বা কোনো কাজে প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবন্ধী অর্থ বাধাযুক্ত, বাধাজনক কিংবা দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত।[১] প্রতিবন্ধীর ইংরেজি প্রতিশব্দ Disable. Disable-এর অর্থ করতে গিয়ে Dictionary-তে বলা হয়েছে অক্ষম।[২] Disability-এর অর্থ করতে গিয়ে Law Dictionary-তে বলা হয়েছে, অপারগতা, অসামর্থ্য ও অক্ষমতা।[৩] Disability-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language*-এ বলা হয়েছে, Disability means, "a being physically or mentally disabled"; এবং disabled means, "to incapacitate physically or mentally".[৪]

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী সনদের Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)-এর মতে, প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও

কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে।[৫] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই. এল. ও) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা হল, "একজন প্রতিবন্ধী হচ্ছেন তিনি, যার স্বীকৃত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা কমে যায়।"[৬] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত গেজেটে প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।[৭] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা এবং ভঙ্গুরতাকে প্রতিবন্ধিতার একটি ছায়া প্রতিশব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধিতা হল ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত (যেমন- সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম এবং হীনমন্যতা) এবং পরিবেশগত (নেতিবাচক মনোভাব, পরিবহনে এবং ভবনগুলোতে ওঠার সুযোগের অপ্রাপ্যতা এবং একইসাথে সামাজিক সহযোগিতারও যথেষ্ট অভাব) কারণগুলির সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার নেতিবাচক আদান-প্রদান।[৮]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, মানুষের যেকোনো প্রকার বৈকল্যকেই প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা, মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর কোনো অংশের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেহের সক্ষমতা এবং কার্যকারিতা কোনো না কোনোভাবে হ্রাস পায়। এ সমস্যা হতে পারে জন্ম পূর্ববর্তী কিংবা জন্মের সময় কিংবা জন্মের পরে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীর বহুমুখী প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার বাস্তবচিত্র (Picture of Treatment of Disabled in Bangladesh)

শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে যারা যথাযথ কাজের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তাদেরকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ রয়েছে যারা কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী।[৯] এ সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়ছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এর সংখ্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকেই কেবলমাত্র প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার দরুণ সাধারণ মানুষ ও দায়িত্বশীলদের ধারণা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা খুবই কম। প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা নির্ধারণে সরকারের সাম্প্রতিক জরিপে মাত্র মোট জনসংখ্যার ১.৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী বলে দাবি করা হয়।[১০] প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞাগত ধারণার বিষয়টি স্পষ্ট হলে সাধারণ মানুষের সকল চিন্তা-চেতনা পাল্টে যাবে। প্রতিবন্ধিতার আধুনিক, যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করলে ডায়াবেটিকস আক্রান্তরাও প্রতিবন্ধীর আওতায় পড়ে।[১১] কেননা ডায়াবেটিকস আক্রান্তদের শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গ ধীরে ধীরে অচল হতে থাকে। পাশ্চাত্যে ও উন্নত দেশগুলোতে সাম্প্রতিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে মদ্যপানে আসক্ত কিংবা আক্রান্তদেরকেও প্রতিবন্ধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।[১২] অপরদিকে বাংলাদেশে মদ্যপানে আসক্তদের অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাস্তবঅর্থে যারা মাদকাসক্ত তারা অনেক চেষ্টা করেও আসক্ত অবস্থা থেকে ফিরে আসতে পারে না। অর্থাৎ তাদের নির্দিষ্ট অর্গানের প্রতি তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ

নাই। এজন্যই পাশ্চাত্য সমাজ তাদেরকে প্রতিবন্ধীর আওতায় বিবেচনা করে থাকে। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবে নীল চোখধারীদের শারীরিক ত্রুটি বলে ধরা হতো।[১৩] মানবজীবনে কেউ তার প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাশা করে না তারপরও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তার জীবনে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। দুর্ঘটনা, সুচিকিৎসার অভাব, অপুষ্টিজনিত সমস্যা, মাতৃগর্ভে যথাযথ যত্নের অভাব, গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া, প্রসবকালীন সমস্যা, জন্মের সময় শিশুর কম ওজন, শিশু ও শিশুর মায়ের ভিটামিনের অভাব দেখা দেওয়া, উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ, মানসিক চাপ, বংশগত কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা পারস্পরিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধিতার মত অস্বাভাবিক ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে থাকে। যুদ্ধকালীন শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাবেও মানুষ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে যেসকল প্রতিবন্ধী দেখা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, বাকপ্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা, মুগুর পা, পোলিও, রিকেট, কাটা ঠোঁট বা ঠোঁট কাটা, কাটা তালু বা তালু কাটা, ভাষাগত অথবা ভাষা আয়ত্তে অপারগতাজনিত প্রতিবন্ধিতাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হয়। সমাজের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে হয়তো এরা প্রতিবন্ধী নয়। তাদের প্রতি বিভিন্ন রকমের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে তাদেরকে সমান অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া দরকার। চিকিৎসায় তাদের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা করা হয়ে থাকে। আবার এমন অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছ যার প্রতিষেধক রয়েছে কিন্তু অবহেলার জন্য প্রতিবন্ধকতার মাত্রা বেড়ে যায়। এ রকম বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন।[১৪] যার প্রকৃষ্ট কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো-বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সমজাতীয় প্রতিবন্ধীরা স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পায় না।[১৫] দেশের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থায় চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কোনো পাঠ্যক্রম নেই। সরকারি বা সেবরকারি মেডিকেলগুলোতে চিকিৎসকদের কাছ থেকে কোনো চিকিৎসা পান না প্রতিবন্ধীরা। হাসপাতালগুলোতে আছে নানান প্রতিকূলতা। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ্যাকশন এইডের "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষাঃ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা" শীর্ষক এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।[১৬] বর্তমান সমাজে অনেক প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসার অবহেলার কারণে আরও বেশি প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হতে হয়।[১৭] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় আক্রান্তের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ সংখ্যা ১২ থেকে ১৮ শতাংশের বেশি নয়। ডায়াবেটিস আক্রান্ত মায়ের নিজের জীবনের ঝুঁকি বেশি। তিনি প্রতিবন্ধী শিশুরও জন্ম দিতে পারেন।[১৮] কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদেরকে চিকিৎসা করানো হলেও 'যাদুর মত নিরাময়' হবে এই প্রত্যাশা করে থাকেন অভিভাবকরা।[১৯] অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসার চেয়ে পরিচর্যাই মুখ্য বলে মনে করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক-নিউরো-ডিসঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইনপা) দায়িত্বশীলরা।[২০]

২৪ বছর বয়সী বিশু নামে এক বোবা ছেলে দীর্ঘ সাত মাস যাবৎ সোনাতলা উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া গ্রামের নিদানু কবিরাজের বাড়িতে থাকলেও তার কোনও আপনজনের খোজ পাওয়া যায়নি বলে খবরে প্রকাশ।[২১] অপরদিকে রাজধানীর দক্ষিণখান এলাকায় শ্রবণ ও বাক

প্রতিবন্ধী একটি শিশুকে পাওয়া গিয়েছে। তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুটির বয়স ৭/৮ বছর এবং তার নাম মাহি।[২২] অন্য এক সংবাদে প্রকাশ প্রায় দুই বছর আগে পাওয়া শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ১৫ বছরের কিশোরী তাছলিমা তার অভিভাবকের কাছে ফিরে যেতে চায়। বর্তমানে মেয়েটি টঙ্গীস্থ শেখ রাসেল ঝুকিপূর্ণ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিরাপদ হেফাযতে আছে।[২৩] অপরদিকে ২৫ বছর বয়সী সাকিম নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধী যুবক ঢাকা থেকে নিঁখোজ হয়। তার গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের কাদিকোলা গ্রাম।[২৪] প্রতিবন্ধীদের দুঃখ, কষ্ট, অবহেলা, সেবা ও পরিচর্যার করুণ চিত্র সম্বলিত বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন প্রতিনিয়ত দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে দেখা যায়। এসকল সমস্যা সমাধানে উদ্যোগও রয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের মা-বাবাদের সচেতনতা ও বাসায় অটিস্টিক শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।[২৫] এসকল প্রচার-প্রচারণা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ পর্যায় পৌছানো কঠিন হয়ে যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা (Treatment of Disabled in the early period of Islam)

মানবতার জয়গান রচনা করেছে ইসলাম। অসহায়, দুর্বল ও বিত্তহীনদের পাশে থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা ইসলামের অন্যতম আদর্শ। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীরা সমাজে অসহায় ও দুর্বল। তারা সমাজে অবহেলিত ও পিছিয়ে পরা শ্রেণী। তাদের পাশে দাড়ানো ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞায়ন, প্রকারভেদ কিংবা ধারণাগত তথ্য ও উপাত্ত কম ছিল কিন্তু তাদের চিকিৎসা, সেবা, শুশ্রুষা ও পরিচর্যা নিয়ে কোনো কমতি ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করিম (সা.) এর নির্দেশনা, কার্যক্রম ও ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য এক সুশৃঙ্খল চিকিৎসা ও সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যা বর্তমান সময়ের জন্যও উত্তম পন্থা ও আদর্শ ব্যবস্থা হতে পারে।

চিকিৎসা করানো কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করাকে ইসলাম গুরুত্বের সাথে দেখেছে। রোগীর সেবা করার ফযীলত সম্পর্কে ইসলামের সরাসরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হাদিসে এসেছে, কোনো মুসলিম তার কোনো রুগ্ন মুসলিম ভাইকে সেবা শুশ্রূষা করতে গেলে সে ততক্ষণ যেনো জান্নাতের ফলসমূহের বাগানে অবস্থান করে।[২৬] নবী করীম (সা.) এর নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বদরের যুদ্ধের সময়ে নবী করীম (সা.) হযরত উসমান (রা.) কে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন শুধু তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য। এ প্রসঙ্গে হাদিসের বাণী হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “বদর যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.) এর অনুপস্থিতির কারণ হল তাঁর স্ত্রী মহানবীর কন্যা রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অথবা শহীদ ব্যক্তির যে প্রতিদান তোমারও সে প্রতিদান।”[২৭] মহানবী (সা.) এর যুগে মুসলিম নারীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সেবা ও শুশ্রূষা করতেন।[২৮] অন্য এক হাদিসে পাওয়া যায়, প্রিয় নবী (সা.) আশরাফ-আতরাফ[২৯], ধনী-নির্ধন, আযাদ-গোলাম নির্বিশেষে সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। কারোর অসুস্থতার সংবাদ পেলে নিঃসঙ্কোচে তার শুশ্রূষার জন্য যেতেন। এমন কি একবার তাঁর জনৈক ইয়াহুদী খাদেম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তিনি সেই ইয়াহুদীর শুশ্রূষা করেন। প্রিয় নবী (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেনি অথচ তার অসুস্থতাকালে তিনি শুশ্রূষার জন্য

গিয়েছিলেন।[৩০] রাসূলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করে দেওয়া, মেহমানদের মেহমানদারী করা ও সত্য পথের পথিকদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা।[৩১] রাসূল নিজে রোগীর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে ও অনাবিল দরুদসহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের হলেও তাকে চিকিৎসা প্রদানের উদাহরণ রাসূলের জীবনীতেও পাওয়া যায়।[৩২]

পারস্পরিক সেবা ও শুশ্রূষা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে এই ব্যবস্থা চালুর মধ্যে দিয়ে ইসলামের পতাকা আজ বিশ্বব্যাপী ছড়ানো সম্ভব হয়েছে। ইমাম গায্যালী (র.) তাঁর 'এহইয়াউ উলূমুদদীন' গ্রন্থে হযরত 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "জনৈক সাহাবির নিকট একটি দুম্বার মাথা উপহার হিসেবে প্রেরিত হলে তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তির অভাব আমার চেয়ে অনেক বেশি। এই বলে তিনি দুম্বার মাথাটি উক্ত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উক্ত ব্যক্তিকে দুম্বার মাথাটি দেওয়া হলে তিনিও বললেন, আমার চেয়ে অমুকের অভাব বেশি এবং তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছে উপহারটি পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে সাত ব্যক্তির হাত ঘুরে উপহারটি পুনরায় প্রথম ব্যক্তির নিকট ফিরে এল।"[৩৩] এ ঘটনা থেকে অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের প্রতি ইসলামের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্দি করা যায়।

রাসূলের প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হতে। পরবর্তীতে
খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রতিবন্ধীসহ সকল রোগীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত গুরুত্ব সহকারে।[৩৪] প্রতিবন্ধীদের কল্যানার্থে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) যে কাজ করে গেছেন তা অবিস্মরনীয়। প্রতিবন্ধী ছেলে মসজিদে পৌঁছাতে না পারার বিষয়ে অভিযোগ করলে মসজিদের নিকটে অন্ধকে বাসস্থান দিয়েছিলেন।[৩৫]

ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, আল ওয়ালিদ ৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন এবং তাদের ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৬] মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাজী ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে প্রথম মনোরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন যা পৃথিবীতে প্রথম মনোরোগের চিকিৎসা কেন্দ্র। তাঁর মতে, মনোরোগ মানুষের মানসিক বিশৃংখলারই একটি অংশ। সম্মোহন মনঃসমীক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা রোগনিরাময় বিদ্যার প্রবর্তন করেন।[৩৭] উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ (র.) যাকাতের নির্ধারিত অংশ থেকে স্থায়ী প্রতিবন্ধী, সাময়িক প্রতিবন্ধী, অসহায় দরিদ্র, বিপন্ন, দেউলিয়াগ্রস্ত ও অর্থ ফুরিয়ে যাওয়া মুসাফিরদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৮] মিশরে ৮৭৩ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে আহমদ ইবনে তুলুন কর্তৃক ইসলামিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে মানসিক রোগীদের জন্য ইসলামি আদলে চিকিৎসা করা হতো।[৩৯] ইসলামের বিভিন্ন জিহাদের সময়ও লক্ষ্য করা গেছে যেসব যোদ্ধা তাদের হাত পা, চোখ বা বিভিন্নধরনের অঙ্গ হারিয়েছেন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪০] হযরত উমর ইবনু আব্দিল আযীয সারা রাত কাঁদতেন আর বলতেন, "আমি তো এই উম্মতের সাদা কালো সকলের জিম্মাদার নিযুক্ত হয়েছি, যমীনের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বঞ্চিত মানুষ, যুলুম ও অসহায় পথিক, নিঃস্ব ভিখারী, অভাবী ও দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ, যুলুম ও নির্যাতনের শিকার বন্দী এবং

অবহেলিত মানুষের কথা আমার মনে পড়ে। আমার ধারণা আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এদের পক্ষ হয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেন। তাই আমার ভয় হচ্ছে। কারণ, আল্লাহ্র সামনে কোনো জোর খাটবে না, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে কোনো যুক্তি দিয়েই আমি আশ্বস্ত করতে পারব না। এ কারণে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে, আজ আমি নিজের সম্পর্কে বড়ই শংকিত।"[৪১] মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আবু জায়েদ আল বলখী ৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে "Masalih al-Abdan wa al-Anfus (Sustenance for Body and Soul)" নামক গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক বিষয় পরিপূর্ণভাবে জড়িত বিষয়ে ধারণা দেন। একইসাথে তিনি চিকিৎসকদের সমালোচনা করেন এই বলে যে, চিকিৎসকরা কেবলমাত্র শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা করতে অভ্যস্ত তারা মানসিক চিকিৎসার বিষয়ে গুরুত্ব দেন না।[৪২] উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ৮৮হিজরী বা ৭০৭ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের জন্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তিনিই প্রথম বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি প্রতিবন্ধীদের দেখাশুনা করার জন্য একজন কেয়ারটেকার নিযুক্ত করেছিলেন।[৪৩]

মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকার তত্ত্ব ও নির্দেশনা (Theory and Guidance for Being Mentally Healthy & Sound)

মানসিক অসুস্থ্যতার মূল বিষয় হচ্ছে মানুষের মন অস্থির ও নিয়ন্ত্রণহীন। মানুষের মধ্যে গোমড়াহী বৃদ্ধি পেলে মনে তার প্রভাব পড়ে থাকে। হাদিসে এসেছে,নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জেনে রাখো! দেহের মধ্যে এক খন্ড মাংসপিন্ড আছে যখন তা সুস্থ্ থাকে তখন সারা দেহও সুস্থ্ থাকে। যখন তা নষ্ট হয় তখন সারা দেহই নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে কলব বা অন্তর।[৪৪]

চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (Arrange Treatment)

একজন সুস্থ্ ব্যক্তির ন্যায় একজন অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধীর চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সময়মতো চিকিৎসা নিলে শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুরা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, সময়মতো শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি করলে ওই সকল শিশুরা কানে শুনতে পারে, কথা বলতে পারে এমনকি তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।[৪৫] ইসলাম অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেছে। একজন স্বাভাবিক মানুষের মত প্রতিবন্ধী আল্লাহ্র নিয়ামত এবং তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পিতা-মাতার নিকট আমানত। প্রতিবন্ধীত্ব থেকে মুক্তি কিংবা প্রতিবন্ধকতাজনিত কষ্ট প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রাপ্তি তাদের অধিকার। তাদের চিকিৎসা প্রদান করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব। প্রতিবন্ধী বলে সন্তানের চিকিৎসা না করিয়ে তাকে মৃত্যু বা আরো প্রতিবন্ধীত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া একটি মানবতাবিরোধী কাজ।[৪৬] হাদিস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক রোগেরই কোনো না কোনো ঔষধ আছে, কাজেই রোগ অনুযায়ী ঔষধ দেওয়া হলে আল্লাহ্র হুকুমে তার আরোগ্য ঘটে।"[৪৭] এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, এখানে রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। অসুস্থতায় চিকিৎসা গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাত। সহীহ হাদিস দ্বারা জানা যায়, যারা

অসুস্থ তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) নিকট প্রায়ই আগমন করতো এবং তিনি তাদের আরোগ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিতেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের আরোগ্যের জন্য দোয়া করতেন। হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জামানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেয়ে ক্ষতস্থানে তার রক্ত জমাবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনূ আনবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে আনলে উভয়েই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কে ভালো জানে? এ কথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে? বর্ণনাকারী যায়িদ ইবেন আসলাম (রা.) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেছেন, যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।"[৪৮]

সেবা ও শুশ্রূষা করা (Proper Serving and Nursing)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও মানবতার আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের সকল মানুষই সমান ও পরস্পর ভাই ভাই। আপদে-বিপদে একে অন্যের সহায়ক। সেবামূলক কাজের উপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষের কল্যাণ সাধন ইসলামের প্রধান কাম্য। এতে রয়েছে মানবজীবনের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় নীতি ও যে কোনো সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় ও উপকরণ। ইসলামে অন্যান্য নীতির ন্যায় স্বাস্থ্য নীতির কথা বলা হয়েছে। মহানবী (সা.) সুস্থ শরীর ও অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছেন এবং সাথে সাথে স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।[৪৯]

শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য যারা প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেবা করা ইসলামি আদব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ মানুষের সেবা করবে এটা মুসলমান হিসেবে ঈমানী দায়িত্ব। আল-কুরআনে ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।[৫০] প্রতিবন্ধীরা দৈহিকভাবে দুর্বল হওয়ায় সেবা ও সাহায্য-সহযোগিতা পাবার ক্ষেত্রে তারা সবলদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। এরূপ প্রত্যেক ভাল কর্ম সদকার সমতুল্য।[৫১]

প্রতিবন্ধী মানুষকে অসুস্থ মানুষের সাথে তুলনা করা হয়। তারা স্বাভাবিক মানুষের মত চলতে ও অন্যান্য কাজ করতে পারে না। তাই তাদেরকে বিশেষভাবে সেবা করতে হবে। সেবা সম্পর্কে হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "একজন মু'মিনের ওপর অন্য মু'মিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যখন সে অসুস্থ হবে তার সেবা করবে। সে মারা গেলে তার জানাযা ও দাফনে উপস্থিত থাকবে। দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দেবে। হাঁচি দিলে তার জবাব দেবে। আর তার অনুপস্থিতি ও উপস্থিতিতে কল্যণ কামনা করবে।"[৫২] রোগী কিংবা প্রতিবন্ধী অসহায় মানুষকে সেবা করার ব্যাপারে হাদিসে আরও এসেছে, আবূ মূসা (আশয়ারী রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে আহার দান কর এবং রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।"[৫৩]

এই ঘটনা থেকে কেবল সাধারণ মানুষ নয় বরং বাকশক্তিহীন জীব-জন্তু থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াপরবশ হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে রাসূলের জীবদ্দশায়। হাদিসে এ ধরনের আরও অনেক বর্ণনা এসেছে।[৫৪] সমাজে প্রতিবন্ধীদেরকে সেবা করাতো দুরের কথা তাদের মানুষ

হিসেবে সেবা না করে তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলে গালি দেয়া হয়ে থাকে। এই মন-মানসিকতা স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করার নির্দেশনা দেয় ইসলাম।

যথাযথ সেবা ও পরিচর্যা করা (Privde Proper Service and Maintenance)

বস্তুত মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনে একে অপরের মুখাপেক্ষী। পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। যখন কোনো মানুষ অসুস্থ হয় তখন স্বভাবত অন্যদের তাকে সেবা শুশ্রূষা করার প্রয়োজন হয়। সমাজের অসুস্থদের যদি অন্যরা চিকিৎসা না করে তবে তাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সেবায়, দুঃখ-কষ্টে সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। এভাবে জীবন হয়ে উঠে অর্থপূর্ণ। প্রতিবন্ধীদের সেবায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং চিকিৎসা সেবা দিয়ে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কর্তব্য। সর্বোপরি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাধ্যমত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

কুসংস্কারমুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করা (Ensuring Prejudice free Treatment)

কুসংস্কার বাংলাদেশের সমাজে এক অভিশাপ। কুসংস্কারের ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে কুসংস্কারের বলি হয়ে থাকেন অনেকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে কুসংস্কারের কিছু চিত্র উপস্থাপন করা হলো। মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে কবিরাজের ভুল চিকিৎসায় প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে কবিরাজ পানি ও তেল পড়া, ঝাড় ফুক এবং তাবিজ দিয়ে চিকিৎসা করে। পরে চিকিৎসার নামে কিশোরকে বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করে এতে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে মৃত্যুবরণ করে।[৫৫] আলৌকিক শক্তির প্রত্যাশায় সূর্যগ্রহণের দিন মা-বাবা তার প্রতিবন্ধী সন্তানদেরকে গোবরের মধ্যে গলা পর্যন্ত পুঁতে রেখেছিলেন ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে।[৫৬] ইসলাম একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোনো কুসংস্কারের স্থান নেই। অনেকেই অনেক কুসংস্কারের ধারণ ও বাহন করে থাকে কিন্তু ইসলামের প্রকৃত চিত্র ভিন্ন। প্রকৃত ইসলামের চিত্র গবেষণা করলে কুসংস্কারের কোনো নমুনা পাওয়া যাবে না। হাদিসের সুমহান বাণী, মানবতার দূত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সংক্রামক, প্যাঁচা কিংবা শুন্যে কোনো কুলক্ষণ নেই।[৫৭]

ভুল চিকিৎসার বিষয়ে সচেতন থাকা (Be Aware Mistreatment)

গ্রামীন পর্যায়ে অধিকাংশ অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীরা ভুল চিকিৎসার স্বীকার হয়ে থাকে। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। গ্রামীন কবিরাজ কিংবা ওঝা দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে থাকে। এসকল গ্রামীন ওঝা ও কবিরাজরা ভুল চিকিৎসা করে সমস্যাকে আরও জটিলতর করে থাকে। ইসলাম সকল মানুষের কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশাকে আমলে নিয়ে তা যথাযথভাবে দেখার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইসলামের মর্মবাণী হলো, “যে কেউ এই দুনিয়ার কোনো মানুষের কষ্ট লাঘব করবে মহাবিচারের দিন আল্লাহ্ তার একটি কষ্ট লাঘব করে দিবেন।”[৫৮]

অটিজম সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা দূরীকরণ (Dispelling Misconceptions about Autism)

অটিজম নিয়ে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারা বুঝতেই পারেনা যে অটিজম কী এবং কেন? শিশু একদিনে অটিজমে আক্রান্ত হয় না ধীরে ধীরে শিশু এ সমস্যায় ধাবিত হয়ে থাকে। অটিজম আক্রান্ত শিশুকে প্রথমে ভালভাবে তত্ত্বাবধান করলে কিংবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে

নিলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। গ্রামে কিংবা শহরে শিশুর অভিভাবকরা অটিজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত হয়েও তারা এটাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যায়। যে কারণে শিশুর সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এক সময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে শিশু অটিজম ও প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। ইসলাম শিশু প্রতিপালনের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। তাইতো সন্তানকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোকে আবশ্যক করেছে।[৫৯] শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান মায়ের দুধেই আছে। মায়ের দুধে অ্যান্টিবডি থাকে, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।[৬০] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. শাহীন আখতার বলেন, অটিজম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। যেমন-অটিজম হলো মানসিক অসুস্থতা, অটিজম কেবলমাত্র ছেলে শিশুদেরই হয়, অটিজমে আক্রান্তরা অপয়া, অটিজমে আক্রান্তরা বুদ্ধিগতভাবে অক্ষম কিংবা টিকা দেওয়ার কারণে অটিজম হয়।[৬১] ইসলাম মানুষকে ভ্রান্ত ধারণা করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছে। সকল প্রকার অপবাদ, অপপ্রচার ও অনুমানকে বাদ দিয়ে সুধারণা পোষণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক।"[৬২]

কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন (Transplanting of Artificial Organs)

প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন স্তর উন্নতমানের চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য হওয়া সম্ভব। এমন অনেক রোগ রয়েছে যা পরবর্তীতে প্রতিবন্ধীত্ব সৃষ্টি করে। অনেক অস্থায়ী প্রতিবন্ধিতা চিকিৎসার অভাবে স্থায়ী প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি করে। অনেক প্রতিবন্ধিতা আছে যেগুলো আধুনিক অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দূর করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে থাকা কানে কম শোনা রোগের চিকিৎসা করলে তা দূর করা সম্ভব। অপরদিকে হেয়ার এইড যন্ত্র ব্যবহার করেও তাদের শ্রবণশক্তিকে বাড়ানো যায়। পোলিও রোগের যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে তা পরবর্তী সময়ে পঙ্গুত্ব সৃষ্টি করে।[৬৩] আবার দেখা যায় যে, আধুনিককালে কৃত্রিম পা সংযোজনের মাধ্যমে পঙ্গু ব্যক্তিকে চলার শক্তি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংজোযনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীত্বের সাময়িক সমাধান করা যায়। সে কারণে প্রত্যেক প্রতিবন্ধীরই অধিকার রয়েছে যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা দূর করার। কোনো একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও যেন চিকিৎসার অভাবে আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মানব কল্যানের জন্য উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে ইসলামি ফিকহবিদগণ বিষয়ে ইতিবাচক মত দিয়েছেন।[৬৪]

প্রতিবন্ধিত্ব নিরসনে টিকাদানে উৎসাহিতকরণ (Inspiring Vaccination for Eliminating Disability)

টিকা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনবদ্য উপহার। অনেক ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধ করে টিকা মানবজাতিকে সুরক্ষা দেয়। শিশুর জন্মের পর থেকে নির্দিষ্ট টিকাগুলো দিয়ে দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে টিকা শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বয়সভেদে বিভিন্ন প্রকার টিকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে হাম, রুবেলা, পোলিও, পেন্ডা, বিসিজি, ওপিভি, আইপিভি, এমআর, হেপাটাইসিসের টিকাগুলো নিয়মিত দিতে হবে। তাছাড়া ডিফথোরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, নিউমোকক্কাল জনিত নিউমোনিয়া, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি জনিত রোগ নিরাময়েও শিশুকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে। এসব রোগের কারণে শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে।

আবার অনেক সময় এসব রোগের কবলে পড়ে শিশু অটিজম ও প্রতিবন্ধিতারও শিকার হয়ে থাকে।[৬৫] শিশুর রোগপ্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়মিত টিকা দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবিদরা ইতিবাচক মত দিয়েছেন।[৬৬]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে উৎসাহীকরণ (Inspiration Organs Donation)

প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধীত্ব দূরীকরণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংজোযন বিজ্ঞানের যুগে একটি বড় সাফল্য। অন্যের অঙ্গ নিয়ে কিংবা নিজের অন্য কোনও স্থান থেকে সমন্বয় করে বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধীত্ব দূরীকরণ করা সম্ভব। বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, কাটা ঠোঁট বা ঠোঁট কাটা এবং কাটা তালু বা তালু কাটা এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাইতো একের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের মাধ্যমে অন্যের প্রতিবন্ধীত্ব দূরীকরণে সবাইকে উৎসাহিত করেছে ইসলাম।[৬৭]

গবেষণার ফলাফল (Result of the Research)

প্রতিবন্ধীদের সমস্যা আজ বিশ্বব্যাপী। তাদের অধিকার বিষয়ে অনেকেই সচেতন। এতসংখ্যক মানুষকে এড়িয়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলাম সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান সময়ের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হয়ে উঠবে না কখনোই। ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই মানবতাবাদী ধর্ম। ইসলামের সকল সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা গবেষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে বিশ্ববাসীর জন্য গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিভিন্ন পর্যালোচনা রয়েছে যা মানবজীবনে অনুসরণীয়। সেগুলো হলো-

- ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান;
- ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হওয়া;
- ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ে নির্দেশনা;
- প্রতিবন্ধিতার আধুনিক সংজ্ঞায়ন বিশ্লেষণে সকল পর্যায়ের অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের ইসলামি বিধিবিধান মোতাবেক চিকিৎসা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নির্দেশনা;
- প্রতিবন্ধিত্ব নিরসনে কৃত্রিম অংঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রতিস্থাপনের ইসলামি শরীআ'র নির্দেশনা; এবং
- প্রতিবন্ধিত্ব নিরসনে অংঙ্গ-প্রতঙ্গ দানের মাধ্যমে কীভাবে ভাল হওয়া যায় সে বিষয়ে ইসলামের দিক-নির্দেশনা।

উপসংহার ও সুপারিশমালা (Conclusion and Recommendations)

প্রতিবন্ধী মানেই অক্ষম নয়। প্রতিবন্ধী হলো শরীরের একটি বিশেষ অবস্থা যার জন্য তাকে বিশেষভাবে চলতে কিংবা প্রকাশ করতে হয়। প্রতিবন্ধীদের অবহেলা করার চিরায়ত সেই ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে সবাইকে। অটিস্টিক শিশু থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসা কিংবা কুসংস্কারকে বন্ধ করতে হবে। উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীর প্রতিবন্ধকতা স্বাভাবিক হতে পারে সে বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা দরকার। শিশু মাতৃগর্ভে আসার সাথে সাথেই মাতা-পিতাকে সচেতন হতে হবে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে। জৈবিক

মেলামেশা সম্পর্কে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। যার মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তান ভূমিষ্ট হতে পারে। একইসাথে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের মত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মানবসেবায় কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক এ সকল চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও অপ্রতুল হলেও সাধারণের জন্য কীভাবে সহজলভ্য করা যায় সে বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। ইসলাম মানবতার ধর্ম। অমানবিক কোনও কাজকে সমর্থন করে না ইসলাম। কেউ যদি কোনো অমানবিক কাজ করে থাকে তবে তা তার ব্যক্তি স্বার্থে করে থাকে। ইসলামের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। অটিস্টিক শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক চিকিৎসা ও সেবার ব্যাপারে ইসলাম সদা জাগ্রত। কোনও কুসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে তার প্রতিবন্ধিত্ব দূর করতে সচেষ্ট হবে সবাই– এটাই ইসলামের নির্দেশনা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সঙ্ক.), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫), পৃ. ৪৪৪

২. Bernard S. Cayne (Ed.), *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language* (New York: Lexicon, 1987), p. 269

৩. Gazi Shamsur Rahman, *Law Dictionary,* (Dhaka: Khoshroz Kitab Mahal, 2003), p. 95

৪. Bernard S. Cayne (Ed.), Ibid, p. 269

৫. দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.), *প্রতিবন্ধিতা কি ও কেন? (Primary Handbook on Disability)*, (ঢাকা: সীড ট্রাস্ট, ২০১২), পৃ. ৩

৬. ডা. সজল দেওয়ান, "সমতা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ, অগ্রগতির মূল্যায়ন ও নতুন উদ্যোগের আহ্বান", *প্রতিবন্ধি ও উন্নয়ন*, সেলিম রেজা হাসান ও এম. এম. শামছুল আজম (সম্পা.), (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০২), পৃ. ৭১

৭. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৮৭৭৬

৮. "Disability defines as an umbrella term for impairments, activity limitations, and participation restrictions. Disability refers to the negative aspects of the interaction between individuals with a health condition (such as cerebral palsy, Down syndrome, depression) and personal and environmental factors (such as negative attitudes, inaccessible transportation and public buildings, and limited social supports)." Cf. *Summary of World Report on Disability,* p. 7

৯. *Summary of World Report on Disability,* World Health Organization Publications (Joined produced by WHO & The World Bank), Geneva, Switzerland, Published at 2011, p. 7

১০. Govt. Bulletin, General Economic's Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, *National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh,* July 2015, p. 20

১১. Julia Kelly, "Diabetes and Me: Learning disabilities and diabetes", *Journal of Diabetes Nursing,* Vol. 15, No. 8, 2011, p. 308

১২. Chai R. Feldblum, *The Americans with Disabilities Act Definition of Disability,* The Labor Lawyer, Published by American Bar Association, Vol. 7, No. 1 (Winter 1991), p. 23

১৩. Kristina L. Richardson, *Different and Disability in the Medieval Islamic World: Blighted Bodies* (Scotland: Edinburg University Press: 2012), p.36

১৪. ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মর্যাদা; জাতিসংঘ সনদ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা* (ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০২০), পৃ. ৯৫

১৫. (ম্যাথিই (হেজী) স্মিথ, "আত্ম-নির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন" *'আমার কথা আমি বলব'; বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেল্ফএডভোকেসীঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, দিলারা সাত্তার মিতু (সম্পা.) (ঢাকা: সীড, সেপ্টেম্বর ২০১৩), পৃ. ৫৫

১৬. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ২৩ নভেম্বর ২০১৫ইং

১৭. মাহ্‌বুব কবীর, *একীভূত সমাজের পানে: মানসিক অসুস্থ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রগতি সহায়তায় একগুচ্ছ হাতিয়ার*, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ১৮

১৮. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ২৩ নভেম্বর ২০১৫ইং, পৃ. ৯

১৯. Nirafat Anam, Ph.D. et al., *Situation Analysis and Need Assessment on Street Children with Disabilities in Dhaka City,* Dhaka: Centre for Services and Information on Disability (CSID), 1999, p. 11

২০. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ২০ নভেম্বর ২০১৫ইং

২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১৪ জুলাই ২০১৫, পৃ. ১৩

২২. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৪

২৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ১৬ নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৭

২৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ৬ মার্চ ২০১৫, পৃ. ৫

২৫. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ৯

২৬. عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ». ইমাম মুসলিম (র.), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররী ওয়াসসিলা ওয়াল আদাব, বাবু ফাযলি ইয়াদাতিল মারিযন, হাদিস নং-২৫৬৮, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৭৩৭

২৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَه ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ফারজিল খুমুসি, বাবু ইযা বাআ'ছাল ইমামু রসূলান ফী হাজাতিন..., হাদিস নং-৩১৩০ (কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০), পৃ. ৩৭৮

২৮. عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, বাবু রদ্দিন নিসাঈ ওয়াল জারহা ওয়াল কাতলা, হাদিস নং-২৮৮৩ (কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০), পৃ. ৩৪৯

২৯. আশরাফ শব্দের অর্থ হল অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ও ভালো এবং আতরাফ শব্দের অর্থ হলো নিম্নমান, মন্দ ও অনভিজাত।

৩০. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল মারদা, বাবু ইয়াদাতিল মুশরিক, হাদিস নং-৫৬৫৭, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৯৫

এ প্রসঙ্গে হাদিসে আরও এসেছে, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাধারণ একজন গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন, অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন এবং গাধার পিঠেও আরোহণ করতেন। (হাফিয আবূ শায়খ ইস্‌ফাহানী (র.), *আখলাকুন্ নবী (সা.)*, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ও অন্যান্য (অনু.) (ঢাকা: ইফাবা, ২০১৪), পৃ. ৯৬

৩১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ

ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, (সম্পা.) (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩) পরিচ্ছেদ-২১৫৪, হাদিস নং-৩৬২৫, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৪৩০

৩২. Muhammad Salim Khan, *Islamic Medicine* (UK: Routledge Kegan Paul, 1986), p. 10

৩৩. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رأس شاة فقال : إن أخي فلانا و عياله أحوج إلى هذا مناقال : فبعث إليه فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول *আল মুসতাদরাক আলা সহীহাইন লিল হাকিম*, খ. ৩য়, হাদিস নং-৩৭৯৯, পৃ. ৩৬১

৩৪. মুফতী মুতীউর রহমান, "রোগীর সেবায় মহানবী (সা.)" *স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম*, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার (সম্পা.), ঢাকা: ইফাবা, ২০১৩, পৃ. ২৩; ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১৩), পৃ. ৪৫

৩৫. Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud & Norbayah Shahminan, "Islam and cultural conceptualization of disability" *International Journal of Adolescence and Youth*, Vol-17, No-4, December 2012, pp. 206

৩৬. Michael W. Dols, "*The Leper in Medieval Islamic Society*" Speculum (Published by The University of Chicago Press on behalf of the Medieval Academy of America), Vol-58, No-4 (October 1983), pp. 899 (Norman A. Stillman, "*Charity and Social Services in Medieval Islam*" Societas: 5/2, 1975, 105-15)

৩৭. Walaa M. Sabry & Adarsh Vohra, "Role of Islam in the management of Psychiatric Disorders" Indian Journal of Psychiatry, January 2013, Vol-55 (Supplement-2), pp.206 (Murad I, Gordon H. "Psychiatryand the Palestinian Population" Psychiatric Bulletin. 2002, Vol-26, pp. 28-30)

৩৮. Dr. Ali Muhammad as-Sallabi, (Translated by Safina Naser), *The Rightly-Guided Caliph & Great Reviver UMAR BIN `ABD AL-`AZIZ; Indicators of Renewal & Guided Reformation on the Prophetic Path*, Darussalam Publishers: New York, No Date, p. 388

৩৯. Michael Dols, "*Insanity in Byzantine and Islamic Medicine"*, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on Byzantine Medicine, USA: Trustees for Harvard University (1984), p. 135

৪০. عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ রুবাই বিনতে মুআউয (রা.) বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে পানি পান করাতাম এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম। (ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, বাবু মুতাওয়াতিন নিসাইল জারহা ফীল গাযবী, হাদিস নং-২৮৮৩, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৩৪৯)

৪১. আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ৫০০

৪২. Nurdeen Deuraseh, Mansor Abu Talib, “Mental Health in Islamic Medical Tradition” *The International Medical Journal,* Malaysia, Vol-4, No-2, December 2005, pp. 76(Al-Balkhi, Masalih al Abadan wa al-Anfus (Hand-written manuscript no. 3741, Istanbul: Ayasofya Library), 273. The Arabic Word ishtibak, that al-Balkhi used in his book, Masalih al-Abdan wa al-Anfus, literally, means interweaving or entangling. It is psychosomatic interaction between the soul and the body and therefore, it indicates that al-Balkhi really understands the phenomena)

৪৩. Aljazoli, A. “Islam position on Disability” Morocco: ISESCO, 2004,

৪৪. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, ১ম খ., কিতাবুল ঈমান, বাবু মানিস তাবরাআ লিদীনিহি, ঢাকা: মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি., পৃ. ১৩, হাদিস ন. ৫২; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ২য় খ., কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারা'আ, বাবু আখযিল হালালি ওয়া তারকিশ শুবাহাত, ঢাকা: মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা. বি., পৃ. ২৮, হাদিস ন. ১৫৯৯

৪৫. https://www.dhakatimes24.com/2021/05/11/213853, Visited on 4 july, 2021

৪৬. Diane Nelson Bryen & Juan Bornman (Eds.), “Stop Violence against People with Disabilities: An International Resource”, South Africa: *Pretaria University Law Press,* 2014, p. 21

৪৭. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل ইমাম মুসলিম (র.), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু লিকুল্লী দা'ইন দাওয়াউন..., হাদিস নং-২২০৪, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৪২

৪৮. ড. মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন, *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ২০১৩), পৃ. ২৮

৪৯. Muhammad Salim Khan, *Islamic Medicine* (UK: Routledge Kegan Paul, 1986), p. 10

৫০. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ “মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (আল-কুরআন, ৯ : ৭১)

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا -() وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

رَبَّيَانِي صَغِيرًا () رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا () وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।" (আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৬)

কুরআন মাজীদে আরও বলা হয়েছে, وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"এবং বল, 'তোমরা কর্ম করতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও করবে এবং অচিরেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট অতঃপর তিনি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।" (আল-কুরআন, ৯ : ১০৫)

৫১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু কুল্লু মা'রুফিন সাদাকাহ, হাদিস নং- ৬০২১, (কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০), পৃ. ৭২৯

৫২. للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشتمه إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد ইমাম তিরমিযী (র.), *সুনান আত তিরমিযি*, কিতাবুল আদাব, বাবু মা' জাআ ফী তাশমিতিল আতিসি, খ. ৪র্থ, হাদিস নং- ২৭৩৭, (কায়রো: দারুল হাদিস, ২০১০), পৃ. ৫০০

৫৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, (সম্পা.), ঢাকা: ইফাবা, ২০১২, পরিচ্ছেদ-১৯১২, হাদিস নং-২৮৩২, খ. ৫ম, পৃ. ২৫৭

৫৪. হাদিসে আরও এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ–

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা যদি ইতর প্রাণীকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দাও তাহলে তার জন্য ঐ প্রাণীর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।" তিনি একদা বলেছিলেন, "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলছিল এমন অবস্থায় সে খুব পিপাসার্ত হল। তারপর সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে সেখানে নেমে পানি পান করল। তারপর সে যখন বের হল এবং একটি পিপাসার্ত কুকুর দেখতে পেল যে কিনা পিপাসার কাতরে মাটি চাটছিল। তারপর লোকটি বলল একটু আগে পিপাসার কারণে আমার যে অবস্থা হয়েছিল এই কুকুরটিরও একই অবস্থায় উপনীত। তারপর সে কূপে নামল ও মোজায় করে পানি নিয়ে আসল এবং কুকুরটিকে পান করাল। এই ঘটনার জন্য সে শুকরিয়া আদায় করল এবং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল চতুস্পদ জন্তুর ক্ষেত্রেও কি আমরা প্রতিদান পাব? তিনি উত্তর দিলেন, প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রেই প্রতিদান রয়েছে। (ইমাম বুখারী (র.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু

রহমাতিন নাসি ওয়াল বাহাইমি, হাদিস নং-৬০০৯, (কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০), পৃ. ৭২৮)

অপর বর্ণনায় রয়েছে,

عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض নাফে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, "আর এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে অনাহারে মারার কারণে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের হুকুম দিয়েছেন।" (ইমাম মুসলিম (র.), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, বাবু তাহরিমে কতলিল হিররতি, হাদিস নং-২২৪২, কায়রো: দারু ইবন হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৫৪)

অপর এক ঘটনা থেকে জানা যায়, একদা হযরত 'উমর (রা.) দেখলেন যে, এক ব্যক্তি একটি দুম্বাকে পা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে কসাইখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তোমার কি হল? জন্তুটিকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছ তো ওর প্রতি দয়া কর, একটু ভালভাবে নিয়ে যাও।

৫৫. ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, দৈনিক কালের কণ্ঠ

৫৬. চ্যানেল আই অনলাইন, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯

৫৭. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ » ইমাম মুসলিম (র.), *সহীহ মুসলিম*, বাবু লা'আদওয়া ওলা তিয়ারাতা ওলা ছাফারা ওলা হামা, হাদিস নং-২২২০, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৬৪৭

৫৮ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ইমাম মুসলিম (র.), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয জিকরী ওয়াদ দোআই ওয়াত তাওবাতি ওয়াল ইস্তিগফারি, বাবু ফাজলিল ইস্তিমায়ী আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি ওয়া আলাজ জিকরী, হাদিস নং-২৬৯৯, কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০, পৃ. ৭৭০

৫৯. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করিতে চায় তার জন্য জননীগণ

তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে।" সূরা আল-বাকারা, ২৩৩

৬০. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, "ইসলামে শিশু অধিকার", ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, তা.বি, পৃ. ১৭

৬১. "অটিজম: ভ্রান্ত ধারণা এবং বাস্তবতা" ০২ এপ্রিল ২০২০, দৈনিক সমকাল

৬২. إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, (বৈরূত: দারু তাওকিন নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), হাদিস ন. ৫১৪৩

৬৩. Polio Eradication & Endgame Strategies Plan 2013-2018, France: WHO & UNICEF Publications, 2013, p. 76

৬৪. Shahid Athar, "A Gift of Life: An Islamic Perspective in Organ Donation and Transplanation" Journal of Transplantation Techonologies & Research, Volume 5, Issue 1, 2015, p. 2

৬৫. Sir John Wilson, "Vaccines Versus Disability" World Health Organization, 1987, p. 15; R. C. Tervo & B. Taylor, "Vaccinations and the Physically handicapped child" Canadian Medical Association Journal, Volume-127, October 1982, p. 475

৬৬. Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, "Vaccination in the Context of Al-Maqasid Al-Shariah (Objectives of Divine Law) and Islamic Medical Jurisprudence" Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter), Vol. 3, No. 9, April 2014, p. 46

৬৭. Tazul Islam (Writer), "Organ Donation in Islam: A Search for a Border Quranic Perspective" Jan A. Ali (edited), *Organ Transplanation in Islam: perspectives and challenges*, Australia: MDPI, 2022, p. 23

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২০.১২.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা

মোঃ নুরুল আমিন*

Abstract

Khilafat is the basic framework of Islamic state system. It represents the administration in accordance with divine law. *Khilafat* system was initiated in Islam with the installation of Abu Bakar (Rh) as the first *Khalifa*. From his time to the death of *Khalifa* Ali (Rh.) (632-661), thirty years of rule, is known as *Khilafat-e-Raseda*. It had a very brief existence, but left a significant global impact. Every *Khalifa* of *Khilafat-e-Raseda*, was chosen by the populace according to the Arab tribal norms. It was followed by the Ummayads, Abbasids, Fatimids, and Ottomans. Turkish Leader Mustafa Kamal Pasa terminated the system in 1924. *Khilafat* is currently being tried to revive through certain initiatives. This chapter aims to provide a concise analysis of the *Khilafat* system's emergence, development, and electoral process.

চাবিশব্দ: মুসলিম শিশু রাষ্ট্র, মুহাজির, আনসার, নির্বাচন, মসজিদে নববি ও বায়'আত

ভূমিকা:

ইসলামি রাষ্ট্র কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গণতান্ত্রিকতাকরণ। ইসলামের বিকাশ এবং এর রাজনৈতিক চরিত্রায়ণ ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত বিষয়াবলির একটি। ধর্মীয় দর্শনের আদলে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সূচনা মানব ইতিহাসে বিরল। ইসলামি রাষ্ট্র দর্শন পবিত্র আল কোরআন ও রাসুল (সা.) এর কর্মের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। রাসুল (সা.) কোনো উত্তরাধিকার রেখে না যাওয়ায় তার অবর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কারা থাকবে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামে খিলাফতের উদ্ভব ঘটে। নির্বাচনের ধারণার উদ্ভব প্রাচীন গ্রিসে। এথেন্সের নগর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এর যাত্রা। আর প্রতিনিধি নির্বাচন এর অন্যতম অলংকরণ। যদিও পদ্ধতিগত বিকাশের মাধ্যমে বর্তমান সময়ের নির্বাচন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। গ্রীক Democracy এর বুৎপত্তিগতভাবে জনগণের শাসন ক্ষমতাকে বোঝায়, অর্থ্যাৎ যেখানে শাসন ক্ষমতা ও শাসক নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে। আধুনিককালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন ব্যবস্থার পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক ধারণার আলোকে তা গণতান্ত্রিকতা পরিপূর্ণ ছিলনা। বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল রাসুল (সা.) এর উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগীদের হাতে। প্রাথমিক খেলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা রাসুল (সা.) এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উত্তরসূরির ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি অবস্থান তৈরি করে নেন, যারা আদর্শগতভাবে জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত ছিলেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নেতৃত্বে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এক অসাধারণ কীর্তি এবং ইসলামে নবুওয়াতের অব্যাবহিত পরে তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবি আবু বকর (রা.) এর খলিফা নিযুক্তির মাধ্যমে ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় পর থেকে মুসলিম জাহানে খিলাফত আল মিন হাযিহিন নবুওয়াতের সূচনা

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

হয়। তাঁর খিলাফত আমল থেকে হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত আমল (৬৩২–৬৬১ খ্রি.) পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছরের শাসনকাল মুসলিম জাহানে যাঁরা রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদেরকে 'খুলাফা-ই-রাশিদুন' বলে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'। ইসলামে নবুওয়াতের পর এই খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন ও পবিত্র দায়িত্বের পদ। 'খুলাফায়ে রাশেদিনের' শাসন দীর্ঘস্থায়ী না থাকলেও বিশ্বের ইতিহাসে তা সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফাদের নির্বাচন পদ্ধতি, খিলাফতের ক্রমবিকাশ ও খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী ছিল, বর্তমান প্রবন্ধটিতে সে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের সময় নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন। এ বিষয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- খিলাফত তন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ;
- খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফাদের নির্বাচন পদ্ধতি;
- খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনতাকে উদ্দেশ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্য ও নীতি নির্ধারণী সমন্বিত ভাষণের তাৎপর্য পর্যালোচনা করা;
- মজলিসে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার স্বরূপ নির্ণয় করা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি পর্যালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। এই গবেষণায় খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বিশ্বের ইতিহাসে যে সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র নির্বাচন পদ্ধতির কারণে, তার সম্যক কৌশল ও রূপরেখার বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসের উপর নির্ভর করে এ প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বিভিন্ন গবেষকদের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ, জার্নাল ও বিশ্বকোষসমূহ। এই উৎসগুলো ব্যবহার করে বর্তমান প্রবন্ধে খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতির একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

খিলাফতের সংজ্ঞা

খিলাফত শব্দটিকে আভিধানিক ও পারিভাষিক দুই অর্থে ব্যবহার করা যায়। নিম্নে খিলাফতের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

খিলাফতের আভিধানিক অর্থ

খিলাফত শব্দটি আরবি শব্দ খুলফুন মূলধাতু থেকে উৎসারিত। এর বহুবচন 'খুলাফা'।[১] এর আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, অন্য কারো অপসৃত হওয়ার পর তার স্থানে উপবেশন করা বা উত্তরাধিকার, কারো অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।[২] মূলত খিলাফত হলো মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার

প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিই খলিফা। ইসলামি পরিভাষায় সর্বোচ্চ এ নির্বাহীর প্রতিনিধিত্ব বা উত্তরাধিকারীই হলো খিলাফত। খিলাফত শরিয়তের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের সমন্বয় ঘটিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়।[৩]

খিলাফতের পারিভাষিক অর্থ

খিলাফতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বিশিষ্ট সাহাবি আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন,

إن الإمارة ما ئتمر فيها وإن الملك ما غلب عليه بالسيف-

"খিলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে শূরা বা পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। আর তরবারির জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহি বা রাজতন্ত্র।"[৪]

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রশীদ রিযার মতে–

الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد ، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا-

"খিলাফত, ইমামাতুল উজমা ও ইমারাতুল মু'মিনিন এই তিনের মর্মার্থ এক। খিলাফত ইসলামি রাষ্ট্রের এমন একটি নেতৃত্বমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করে।"[৫]

ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেন, "ইসলামি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নামও খেলাফত এবং তার নেতৃত্বকে খলিফা বলা হয়। কাজেই পারিভাষিক অর্থে খেলাফত হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাম যা মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়ে এবং প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অন্য কথায়, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকে পারিভাষিক অর্থে খেলাফত বলা হয় আর খেলাফতের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে বলা হয় খলিফা।"[৬]

এককথায় 'Khilafat was a political institution based on religion'. আর যিনি এ পদে স্থলাভিষিক্ত হন বা প্রতিনিধিত্ব করেন তাকে খলিফা বলা হয়। ইসলাম পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় খিলাফতই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন পদ।

খিলাফতের ক্রমবিবর্তন

উল্লিখিত খিলাফতের পারিভাষিক সংজ্ঞার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওফাতের পর মহানবি (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রে খিলাফত নামক ব্যবস্থার সূচনা হয়। মহানবি (স.) মদিনাতে একটি জাতি গঠন করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত জাতি পরিচালনার জন্য কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। রাসুল (স.) অনুপস্থিতিতে তাঁর অধিকাংশ বিচক্ষণ সহচর রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য একজনকে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন।[৭] খলিফার পদ বংশ পরম্পরায় না হওয়ায় রাসুল (স.) তিরোধানের পর (৮ই জুন, ৬৩২ খ্রি.) সাহাবিরা মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতি, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য নিজেরা কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন যদিও প্রত্যেক সদস্যই জানতেন, ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। মুসলিম জাতির নেতা

নির্বাচন নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় রাসুল (স.)-এর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে এমন একজনকে পছন্দ করার সিদ্ধান্ত নেন যিনি নবগঠিত মুসলিম শিশু রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম। এভাবেই খিলাফত তন্ত্রের উদ্ভব হয় যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কয়েকটি স্তরায়ণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন : খোলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.), উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ও আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রভৃতি। ১২৫৮ সালে আব্বাসীয় খিলাফত শেষ হলে তিন বৎসর মুসলিম বিশ্বে খলিফা ছিল না। ১২৬১ সালে মিশরে মামলুকরা খলিফা/খিলাফতের পুন:জীবন করায় রাজনৈতিক স্বার্থে। ১৫১৭ সালে ওসমানীয়রা মিশর থেকে খলিফাকে নিয়ে যায় তবে খলিফার কাছ থেকে খিলাফত (খলিফার মর্যাদা) নেয়নি। ওসমানীয়রা সুলতান উপাধি ব্যবহার করতো । খলিফা বংশপরম্পরায় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ওসমানীয় সুলতানের অধীনে ছিল। খিলাফততন্ত্র ১৯২৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও আলোচ্য প্রবন্ধে খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ও খিলাফতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নবি ও রাসুলের আগমন ঘটবে না এবং তিনি সর্বশেষ নবি ও রাসুল। মুসলিম বিশ্ব সাময়িক সময়ের জন্য তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। তিনি সুযোগ্য কয়েকজন মুসলিম নেতা রেখে গেলেও কাউকে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে যান নি। আরবের প্রথানুযায়ী গোত্রীয় নেতা বা শাইখ নির্বাচিত হতো সার্বজনীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। যিনি বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাশীল, বয়স্ক এবং সবদিকে মর্যাদার অধিকারী, সর্বজনগ্রহণীয় এমন ব্যক্তিকেই আরবের গোত্রগুলো তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করতো।[৮] ফলে আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী মুসলিম নেতারা রাসুল (স.) এর মৃত্যুর পর নিজেদের মধ্যে থেকে ইমাম বা নেতা (নেতৃত্ব) নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচিত করতে মনস্থির করেন এবং মহানবি (স.) কে দাফন ও জানাযার নেতৃত্ব কে দিবে এ প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। এ সময়ে মুসলমানদের প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়- মুহাজির ও আনসার। মদিনার আনসারগণ সাকিফা বানু-সা'য়িদা নামক বৈঠকখানায় খলিফা নির্বাচন করার জন্য সমবেত হয়ে খলিফা নির্বাচন করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। প্রথমে আনসার নেতা খায্‌রাজ প্রধান সা'দ ইব্‌নে উবাদা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হযরত মুহাম্মদ (স.) কে আশ্রয় দান, মুহাজিরগণকে প্রতিপালন, ইসলামের রক্ষা তথা দ্বীন সেবায় আমরাই সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছি বিধায় রাসুল (স.) প্রতিনিধিত্বের আমরাই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কতিপয় আনসার এ বক্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে খায্‌রাজ প্রধান সা'দ ইব্‌নে উবাদা (রা.)-এর নাম খলিফা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করলেন। সমাবেশ থেকে এক আওয়াজ এলো– যদি মুহাজিরগণ আমাদের এ প্রস্তাবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করেন তাহলে কি হবে? তখন প্রস্তাব হলো যে দুই দল থেকে দুইজন নেতা নির্বাচিত করা হোক। আনসারদের কেউ কেউ বলল, দুই দল থেকে দুইজন নেতা নির্বাচন সম্ভব নয়। নেতা একজনই হতে হবে। এইভাবে আলোচনা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করলো আর আনসারদের এই সমাবেশের কথা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সহ

মুহাজিরদের সহযোগে সেখানে উপস্থিত হলেন।[৯] হযরত আবু বকর (রা.) ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আনসারদের কথায় সায় দিয়ে বললেন যে, তোমাদের সকল দাবি ও কথা সত্য। দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তোমাদের অবদান অনেক তবে বক্তৃতায় তিনি মুহাজিরদের দ্বীনি ত্যাগের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরাইশরা যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য সে কথা ব্যক্ত করলেন। কারণ যিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনি শুধু মদিনার শাসকই হবেন না বরং তিনি হবেন সমগ্র আরব দেশের শাসক। আর এ মুহূর্তে আরব দেশের নেতৃত্বের জন্য একমাত্র কুরাইশগণই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। তখন আনসারদের খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে দুই দল থেকে দুইজন নেতা নির্বাচিত করা হোক।[১০] হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ করে বললেন এ সম্ভব নয়। মানুষ আনুগত্য করবে একজন নেতার। দুইজন নেতা হলে দলাদলি ও কোন্দল সৃষ্টি হবে। কাজেই মাত্র একজন নেতাকেই নির্বাচিত করতে হবে। আর আরবগণ কুরাইশ বংশের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রাধান্য স্বীকার করবে না।[১১] অতঃপর হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ (রা.) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আপনারা মুহাজিরদেরকে আশ্রয় প্রদান করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। এখন নেতৃত্ব নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাঁর দুর্বলতার ব্যবস্থা করবেন না। এ কথা শুনে খাযরাজ গোত্রেরই অপর ব্যক্তি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.) দাঁড়ালেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমরা পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য ইসলামের সেবায় অংশগ্রহণ করিনি। আমরা আল্লাহ্ ও রাসুল (স.) এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের সেবায় অংশগ্রহণ করেছি। আর নেতৃত্বের জন্য কোনো সন্দেহ নেই কুরাইশরা অধিক উপযুক্ত। এ নেতৃত্বের জন্য আমাদের বিবাদ করা উচিত নয়। আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাদের বিরোধিতা করবেন না।[১২] সাকিফা বানু-সায়িদা বৈঠকখানায় আনসার ও মুহাজিরদের আলাপ-আলোচনার পর সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবাইদা এবং সা'দ ইবনে উবাদা এর নাম খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল।[১৩] কিন্তু বৈঠকের মাধ্যমে সর্বশেষ আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলিফা হবে। আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুরাইশদের থেকে খলিফা নির্বাচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিধাবিভক্তির আশংকায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে বললেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ এর মধ্যে থেকে যেন আনসার ও মুহাজিরগণ একজনকে পরবর্তী খলিফা তথা উত্তরাধিকারী বানিয়ে নেয়। কিন্তু তারা উভয়ে এ কথার সাথে একমত পোষণ করেন নি। তারা উভয়ে বললো, আপনি হাত বাড়িয়ে দেন, আমরাই প্রথমে বায়'আত করি। হযরত আবু বকর (রা.) হাত না বাড়ালে হযরত উমর (রা.) আবু বকর (রা.) হস্ত ধারণপূর্বক চুম্বন করলেন এবং তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করলেন। তাঁর দেখাদেখি অগ্রে পশ্চাতে সেখানে উপস্থিত মুহাজির ও আনসারগণ কোনো প্রকার চাপ-প্রভাব ও প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্টচিত্তে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।[১৪]

হযরত ওমর (রা.) প্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে প্রথম বায়'আত গ্রহণ করলে পরবর্তীতে একে একে উপস্থিত লোকজন বায়'আত গ্রহণ করেন। এ বায়'আতকে ফুতজান হিসাবে অথবা বাইয়াত আল খাস হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[১৫] পরবর্তী দিন মসজিদে নববিতে সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করা হলো। তখন মদিনা মসজিদে উপস্থিত সমবেত সকল মুসল্লি এ

বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সমবেত জনতা তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করে নিলো। এটা ছিল বায়'আতে আম।[১৬] বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন হলে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং জনতাকে উদ্দেশ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নীতি-নির্ধারক মূলনীতি সমন্বিত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন।[১৭] তার এ ভাষণটিকে খিলাফতের খুতবা বা খিলাফতের ভাষণ বলে অভিহিত করা হয়। হামদ ও ছানার পর তিনি বললেন–

> হে লোকসকল, আমি আপনাদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আমি যদি কোনো শুভ কাজ করি তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর কোনো ভুল করলে আপনারা আমাকে শুধরে দিবেন। দেখুন, সততাই আমানতদারি, আর মিথ্যাচার খিয়ানত। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ আমি তাকে তার প্রাপ্য আদায় করে না দিই। আল্লাহ চাহেন তো আপনাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবল, সে আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ আমি তার নিকট থেকে অন্যদের প্রাপ্য আদায় করে না দিই। ইনশাআল্লাহ! দেখুন, যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর রাহে জেহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাপাচার বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ তাদের মধ্যে বালা মুসিবত বিস্তৃত করে দেন। দেখুন, আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করব, আপনারা আমার আনুগত্য করবেন এবং যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যচরণ করব, তখন আপনারাও আমার আনুগত্য মুক্ত হয়ে যাবেন।[১৮]

এ খুতবা ছিল একটি বিধিবদ্ধ আইন। হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের পদে আসীন হওয়ার পরও নেতৃস্থানীয় কিছু সাহাবি[১৯] তাঁর নির্বাচনকে কিছুদিন মেনে নেননি। হযরত আলী (রা.) প্রায় ছয় মাস পর তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করেন। হযরত আলী (রা.) আনুগত্যের শপথ করিলে বনু আব্দুল মান্নাফ গোত্রের তার সমর্থকরা বিশেষত আবু সুফিয়ান, খাযরায গোত্রের প্রধান সাদ বিন উবাইদা এবং তাদের আরও কিছু অনুসারী এ নির্বাচনকে মেনে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সকল ঘটনাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ গুলো হচ্ছে–

১. মুসলিম বিশ্বের এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রয়োজনে আবু বকর (রা.) কে সাহাবিরা খলিফা হিসাবে নির্বাচন করে।

২. হযরত আবু বকর (রা.) নির্বাচনকে মদিনার অধিকাংশ মানুষই মেনে নিয়েছিলেন।

৩. মাত্র একজন ব্যক্তিই হযরত আবু বকর (রা.)-কে খিলাফতে নির্বাচিত করেন। অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন এবং খলিফার আনুগত্য মেনে নেন।

৪. হযরত আবু বকর (রা.) মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় মুসলিম জাহানের শাসন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ লাভ করে। তথাপি তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না।

৫. রাজধানীর বাইরের জনসাধারণের নীরব সমর্থন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (আহ্ল আল রাই) ছিল হযরত আবু বকরের খলিফা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

হযরত উমর (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)

হযরত আবু বকর (রা.) যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি উম্মতকে ক্রমোন্নতির প্রাথমিক যুগে মত পার্থক্যের বিবাদ থেকে রক্ষার জন্য খিলাফতের বিষয়টিকে নিজ জীবনের শেষ মুহূর্তে মীমাংসা করে নেওয়া সমীচীন বলে মনে করেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খিলাফতকালীন যাবতীয় ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি কাজে হযরত উমর (রা.) কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পর খলিফা হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হযরত উমর (রা.) ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহ নেই। অতঃপর তিনি নিজের এ প্রস্তাবটি প্রবীণ ও বিশ্বস্ত সাহাবিদের নিকট পেশ করলেন।[২০] অধিকাংশ সাহাবিই তাঁর এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেউ কেউ বললেন, এমনিতে হযরত উমর উত্তম ব্যক্তি। তবে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর প্রকৃতির।[২১] আত তাবারী বলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে আলাপ করেছিলেন। তারা উভয়েই হযরত উমর (রা.)-এর মনোনয়নকে স্বাগত জানিয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হযরত উমর ব্যতীত খলিফা হওয়ার অন্য কোনো যোগ্যতম ব্যক্তি নেই। অপরদিকে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্রের রুঢ় দিকসমূহের উল্লেখ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দুজনকে এই ব্যাপারগুলো গোপন রাখার পরামর্শ দেন।[২২] এর জবাবে আবু বকর বলেন যে, যখন তার উপর খিলাফতের বোঝা এসে পড়বে তখন এ কঠোরতা আপনাআপনি চলে যাবে। ঐতিহাসিক বিবরণী প্রমাণ করে যে, হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরাধিকার মনোনয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, যা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান করেছিল। সেগুলো হলো : হযরত উমরের প্রশাসনিক দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্ব প্রতিভা। শেষ পর্যন্ত সকল প্রবীণ সাহাবি হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রস্তাবে একমত হয়ে হযরত উমর (রা.) এর খলিফা হওয়াতে রাজি হয়ে গেলে কাতিব-এর দায়িত্ব পালনকারী হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর মনোনয়নপত্র বা উইল লিখতে বলেন।[২৩] এর ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

> পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে, এ শপথনামা মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর খলিফা আবু বকর (রা.) এর পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি। অতঃপর (এ কথা বলার পর তিনি মূর্ছা গেলেন। এভাবে কিছুক্ষণ কাটলো।) হযরত উসমান (রা.) অতঃপর কথাটি লিখলেন। আবু বকর (রা.) জ্ঞান ফিরার পর আবার বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য উমরকে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম। তোমাদের জন্য সে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর হবে বলে মনে করি। তারঃপর আবু বকর (রা.) আবার মূর্ছা গেলেন এবং জ্ঞান ফিরার পর তিনি বললেন, যা লিখেছ, তা পাঠ করে শুনাও। তাকে পাঠ করে শুনানো হলে তিনি তাকবির ধ্বনি দিলেন এবং তিনি হযরত উসমান (রা.) কে বললেন, আল্লাহ তোমাকে ইসলাম এবং মুসলিমদের ব্যাপারে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুক। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত শপথনামাকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন।[২৪]

অতঃপর মসজিদে নববিতে সমবেত জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করেন : “আমি যাকে আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, তোমরা কি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম! নিজের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আমি আমার কোনো পুত্র, ভাই বা আত্মীয়স্বজনকে এ পদে নিয়োগ

করিনি বরং এ পদে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি উমর ইবনুল খাত্তাবকে, যার সাথে আমার কোনো ধরনের আত্মীয়তার বা আর্থিক সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমার বিশ্বাস-তোমরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।"[২৫] তখন উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন, "আমরা তাঁর আদেশ-নির্দেশ শুনবো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবো।[২৬]

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরদিন হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববির মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলিফা হিসেবে জনতার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করলেন। অতঃপর মুসলিম জনসাধারণ প্রথম খলিফার সুপারিশ ও নিজেদের নিরপেক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.)-এর হাত ধরে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করে। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সকল ঘটনাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এ গুলো হচ্ছে :

১. হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলিফা নির্বাচনের সময় সঙ্কট উপলব্ধি করে খলিফা মনোনয়ন দিয়ে যান যা রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য প্রশাসনিক সঙ্কট থেকে রক্ষা করে।

২. হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল।

৩. এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের (আহল আল রায়) কোনো সমর্থন নেওয়া হয়নি।

৪. মুসলিম জনসাধারণ প্রথম খলিফার সুপারিশের ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করে। তবে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পুত্র বা তাঁর কোনো আত্মীয়কে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দেননি।[২৭]

হযরত উসমান (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)

হযরত উসমান (রা.)-এর নির্বাচন তাঁর দুই পূর্বসূরীর নির্বাচনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। স্বাভাবিকভাবে হযরত উমর (রা.)-এর জীবনাবসান হলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তা অনুমান করা কঠিন হলে এটা সুনিশ্চিত যে তিনি যুগোপযোগী ও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা হযরত উমর ফারুক (রা.) ২৩ হিজরি সনে জীবনের শেষ হজ্জ পালন করার সময় মিনায় অবস্থানকালে এক ব্যক্তি বললো উমর (রা.) মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো। কারণ, আবু বকর (রা.)-এর বায়'আতও তো হঠাৎই হয়েছিলো।[২৮] হযরত উমর (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে মদিনায় ফিরে জুম'আর খুৎবায় জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য ভাষণ প্রদান করলেন। জুম'আর খুৎবায় তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচন সম্পর্কে ইতিপূর্বে শোনা কথার পুনরুক্তি করে নিম্নোক্ত এ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তখন সাকিফায়ে বনী সায়েদায় কেন হযরত আবু বকর (রা.) হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করলেন। খলিফা উমর (রা.) বলেন, তখন যদি হযরত আবু বকর (রা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ না করতাম তাহলে খিলাফত নির্বাচন নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়ে উভয় দল স্ব-স্ব দল থেকে নেতা নির্বাচিত করতো। হযরত উমর (রা.) উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এ রকম সিদ্ধান্ত নিলেও পদক্ষেপটি সফল হলেও তা ভবিষ্যতের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নয়। একে কখনোই উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। হযরত উমর (রা) বললেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতো উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন

কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বায়'আত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বায়'আত করা হবে উভয়েই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।[২৯] ইবনু হাজার বলেন, এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে, খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করা যাবে না। কেননা আবু বকর (রা.)-এর মতো সর্বগুণাবলি সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব পাওয়া সর্বযুগে সম্ভব নয়।[৩০] হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হজ্জের সময় কোনো এক ব্যক্তির মন্তব্যের ব্যাপারে যে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তাতে এটি প্রমাণিত হয় যে, যদি স্বাভাবিকভাবে তাঁর জীবনাবসান হতো তাহলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে এমন সুনিশ্চিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যাতে খিলাফত রাষ্ট্রে কোনো প্রকার বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ লক্ষ করা যেত না বরং ইসলামের বিস্তৃতির সহায়ক হতো। হযরত উমর (রা.)-কে যখন আবু লুলু আহত করলো ও চিকিৎসকগণ যখন তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজনীতা বোধ করেন।

মারাত্মকভাবে আহত খলিফা জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মুসলিম জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে খলিফা নির্বাচনের এ দায়িত্ব কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী, শ্রেষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য, জনপ্রিয় ও জান্নাতী হবার সুসংবাদপ্রাপ্ত ছয় জন প্রথম শ্রেণির সাহাবির উপর ন্যস্ত করে যান।[৩১] খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন এবং আমার পরিবার থেকে খলিফা হওয়ার জন্য আর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন নেই।[৩২] এই পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছিলেন হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলী বিন আবু তালিব হাশমী, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ তাইমী, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম আসাদী, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরী এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)।[৩৩] এ ছয় জনের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যে কেউ নির্বাচিত হলে তা সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণীয় হবে মনে করেই হযরত উমর (রা.) এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর তিনি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে ডেকে বললেন, আমার দাফন সম্পন্ন হলে এ ছয় ব্যক্তিকে একস্থানে একত্রিত করবে এবং বলবে যে, নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে যেন আমির নির্বাচন করে নেয়। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত উমর ফারুক (রা.) কয়েকটি নিয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন-

ক. খলিফা নির্বাচন করার জন্য তিনদিন তিন রাতের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন।[৩৪]

খ. যদি সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত না হয়, তাহলে যাঁর প্রতি অধিকাংশের রায় থাকবে, তিনি খলিফা বা আমির নির্বাচিত হবেন।

গ. স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর খলিফা হওয়ার কোনো অধিকার নেই। তাঁকে উক্ত শূরার সাথে যুক্ত করেন শুধুমাত্র রায় দেওয়ার জন্য, খিলাফত গ্রহণের জন্য নয়। 'যদি তিন তিন সমভাগ হয়ে যায়, সে অবস্থায় আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর রায় চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৩৫]

হযরত উমর (রা.) ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে তাঁর পরবর্তী খলিফা মনোনীত হওয়ার পথ সহজ করে গিয়েছিলেন বটে, তথাপিও উক্ত কার্যটি সহজে নিষ্পন্ন হয় নি।

কারণ তাঁর মৃত্যুর পর পরামর্শ মোতাবেক মিকদাদ এ পরামর্শ দল কে মিসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়িতে একত্রিত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম নির্বাচক-মণ্ডলী। নির্বাচক-মণ্ডলীর উপর নির্দেশ ছিল এই যে, তাঁরা যেন পরস্পর আলোচনা করে তাঁদের মধ্যে হতেই একজন খলিফা নিযুক্ত করে নেন। মনোনীত ছয়জন সাহাবি পরস্পর নিজেদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। কতিপয় সাহাবার অনুরোধক্রমে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী অপর তিনজনের পক্ষে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। তখন হযরত যুবাইর স্বীয় নেতৃত্বকে হযরত আলীর উপরে, হযরত তালহা হযরত উসমানের উপরে এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের উপরে ন্যস্ত করলেন। এক্ষণে বিষয়টি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) এই তিনজনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। পরবর্তীতে হযরত আবদুর রহমানও তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন এবং পরিষদ তাঁর উপর একজন যোগ্য খলিফা নির্বাচনের ভার ন্যস্ত করেন।[৩৬] হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরীকে এই কমিটির আহ্বায়ক এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরকে উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়।[৩৭] হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরী নিজেকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে হযরত আলী ও হযরত উসমান (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে থেকে যিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবেন, আমরা খিলাফতের দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত করবো। আল্লাহ তার উপরে সাক্ষী থাকবেন। এতে কেউ কোনো জবাব দিলেন না। দুজনেই খলিফা হতে ইচ্ছুক। তখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) বললেন, আপনারা কি নেতৃত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে চান? অথচ খলিফা হওয়ার নির্বাচন থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। এখন আপনারা যদি নেতৃত্ব নির্বাচনের ভার আমার উপর অর্পণ করেন তাহলে আমি আপনাদের মধ্যে থেকে জনগণের মতামত নিয়ে উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করবো। তখন তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ (এতে আমরা রাজি)।[৩৮] এর ফলে নেতৃত্ব দু'জনের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। খলিফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আবদুর রহমান পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। অতএব উভয়ের মধ্যে সকল দিক বিবেচনায় কে শ্রেষ্ঠতর, কে খলিফা হবার জন্য অধিক বেশি যোগ্য ও কোনো পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচন করা উচিত–ইহা স্থির করতে আবদুর রহমান (রা.) বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।[৩৯]

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ যুহরী (রা.) খলিফা নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তিনদিন তিন রাতের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সেনাধ্যক্ষ, নেতৃস্থানীয় সাহাবা, আঞ্চলিক শাসকবৃন্দ, মুকিম, মুসাফির, হজ্জে আগত লোকজন, দূরাগত ব্যবসায়ী, পর্যটকসহ সর্বস্তরের জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেন যে, কে খলিফা হওয়ার জন্য যোগ্য। পর্দার অন্তরালের নারীদের মতামতও তিনি গ্রহণ করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে।[৪০] শুধুমাত্র বনু হাশিমের লোকগণ হযরত আলী (রা.) এবং বনু উমাইয়ার লোকগণ হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এছাড়া অবশিষ্ট সকলের রায় ছিল এই যে, হযরত উসমান (রা.) কে খলিফা করা হোক। চূড়ান্তভাবে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.) কে ডাকেন এবং তাঁকে পূর্ববর্তী দুই খলিফা সম্পর্কে এবং কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আলী কোরআন এবং হাদিসের উপর অবিচল আস্থা প্রকাশ করেন এবং খলিফাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। অপরদিকে হযরত উসমানকে জিজ্ঞাসিত করা হলে তিনি কোরআন, হাদিস এবং পূর্ববর্তী খলিফাদের উপর অবিচল আস্থা প্রকাশ করেন।[৪১]

তিনদিন পর ফজরের নামাজের সময় যখন আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) মসজিদে নববিতে এলেন খলিফার নাম ঘোষণা করার জন্য, তার পূর্বে তিনি দু'জনের নিকট থেকে আলাদাভাবে জানতে চান যে, এ পদ যদি আপনার হাসিল না হয়, তাহলে আপনারা এ পদের জন্য কাকে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং যোগ্য বলে মনে করবেন ? হযরত আলী (রা.) বললেন, উসমান (রা.) কে। আর হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) নাম বললেন।[৪২] তাছাড়া তিনি তাদের নিকট থেকে এ ওয়াদাও নেন যে, যার হাতেই বায়'আত করা হবে, তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাত-এর উপর আমল করবেন এবং তিনি যার হাতেই বায়'আত করবেন, অন্যজন তার আনুগত্য করবেন।[৪৩] তখন হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ সকলের সামনে ঘোষণা করেন যে, অধিকাংশ মানুষই হযরত উসমান (রা.) কে খলিফা হিসেবে দেখতে চায় এবং তিনি নিজে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। এর সাথে কমিটির সকল সদস্য হযরত উসমানকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়।[৪৪] এরপর উপস্থিত মদিনাবাসী, মুহাজির, আনছার ও জনগণ দলে দলে বায়'আত করতে থাকেন। খলিফা হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) আছরের জামায়াতে ইমামতি করেন। অতঃপর জনসমক্ষে প্রথম ভাষণ দেন।[৪৫] বায়'আতের পর হযরত উসমান (রা.) প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তা হলো ঃ

> আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল করিমে (স.) এর উপর দুরুদ পাঠ করার পর জনগণকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, শোন, নিশ্চয়ই তোমরা দুর্গের মাঝে বসবাস করছ এবং নিজেদের জীবনের বাকী অংশে বসবাস করছ। তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে আসছো। সাবধান! এ পৃথিবী ধোকা ও প্রতারনার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত করতে না পারে। ইতোপূর্বে যারা চলে গেছে, তাদের দেখে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। অতঃপর তোমরা তোমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখো, উদাসীন হয়ো না। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। সেই লোকজনেরা কোথায়, যারা পৃথিবীকে আবাদ করেছিল। বহুকাল যাবত এ পৃথিবী থেকে উপকৃত হয়েছিল। পরিশেষে পৃথিবী কী তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য যা রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো এবং আখেরাতকে অন্বেষণ করো।[৪৬]

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে তৃতীয় খলিফার নির্বাচন কয়েকটি বিশেষ দিকের উন্মোচন করে এবং আমরা এ সকল ঘটনাবলির বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. ক্ষমতাসীন ২য় খলিফা মৃত্যুর পূর্বে ৬ জন নেতৃস্থানীয় ও জান্নাতের সংবাদপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সাহাবির সমন্বয়ে একটি নির্বাচনি বোর্ড গঠন করেন। এ নির্বাচনি বোর্ড তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে নির্বাচনের কর্ম সম্পাদন করবে।

খ. যিনি খলিফা নির্বাচিত হবেন তাঁর হাতে সকলে বায়'আত গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) ছয় সদস্যের নির্বাচনি বোর্ড গঠন করেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। নির্বাচনি বোর্ড গঠন করার সময় মদিনার বাইরের গোত্রসমূহের সাথে কোনো আলোচনা করার সুযোগ পাননি।

গ. খলিফা ওমর (রা.) ইচ্ছা করলে নিজের ছেলেকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে একনায়কতন্ত্র চালু করতে পারতেন। কিন্তু নিজের ছেলে যোগ্য হওয়ার পরও তিনি নিজের ছেলেকে খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেন।

ঘ. নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বোধে সকল পর্যায়ের ইসলামি নাগরিকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

হযরত আলী (রা.) এর খলিফা নির্বাচন (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের মাঝে ফাটলের সৃষ্টি হয়। মদিনায় বসবাসরত মুসলমানরা বানু হাশিম ও বানু উমাইয়া– এ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। J. Wellhausen- এর ভাষায় "The Janus-gate of civil war was opended and never again closed."[৪৭] Joseph Hell- এর বর্ণনাতেও এর সমর্থন মেলে। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলমানদের মাঝে অবিশ্বাস দানা বাঁধে এবং ইসলামি রাজনীতিতে কপটাচরণ প্রবেশ করে যার প্রত্যক্ষ নজির দেখা যায় সিফফিন ও কারবালার যুদ্ধে। সেইজন্য হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডকে ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক, শোচনীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা বলা হয়। সে সময় মদিনার পরিবেশ বিশৃঙ্খল ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূলত মিসর, কুফা ও বসরার বিদ্রোহীগণের কারণেই মদিনায় অশান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, তৃতীয় খলিফার হত্যাকাণ্ডের পর দুষ্কৃতিকারীরা সম্পূর্ণরূপে মদিনার দখল নিয়ে নেয়। প্রায় ৫ দিন পর্যন্ত মদিনায় কোনো খলিফাই ছিল না।[৪৮] এ সময় দুষ্কৃতিকারীরা নিজেরাই একজন খলিফা নির্বাচন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মিসরের অধিবাসীরা হযরত আলীর নিকট আসে এবং তাঁকে খলিফা হওয়ার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বসরার কয়েকটি দল হযরত তালহার নিকট এবং কুফার কয়েকটি দল হযরত যুবাইর নিকট একই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তাঁরা উভয়ে এই বিশৃঙ্খলপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আমিরুল মুমিনিন হইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। যখন উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি খলিফা হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তখন দুষ্কৃতিকারীরা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে খলিফা হওয়ার আমন্ত্রণ জানান, তিনিও তা প্রত্যাখান করেন। সর্বশেষ তারা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের নিকট গমন করেছিলেন কিন্তু তিনিও খলিফা হতে অস্বীকৃতি জানান।[৪৯] বিশৃঙ্খলসৃষ্টিকারীরা বুঝতে পারে যে, খলিফাবিহীন অবস্থায় ব্যাপক হাঙ্গামার সৃষ্টি হতে পারে। অনন্যোপায় হয়ে এ রকম সংকটময় মুহূর্তে তারা হযরত আলী (রা.)-কে খলিফা করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ “খলিফা নির্বাচন করার ইখতিয়ার হলো শুরা সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কর্তব্য। খলিফা নির্বাচন করার কোনো ক্ষমতা তোমাদের নেই। তারা যাকে খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দান করবেন তিনিই খলিফা হবেন। আমরা বৈঠকে বসবো এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।”[৫০] হযরত আলী (রা.) দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেও তিনি বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলাপ করেন। তাদের পরামর্শ ও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের অনুরোধে খলিফার দায়িত্ব নিতে রাজি হন।[৫১] হযরত উসমান (রা.) নিহত হওয়ার সপ্তম দিনে জুম'আ দিবসে হযরত আলীর সমর্থকসহ অনেকে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করতে আসেন।[৫২] বিদ্রোহীগণের নেতা মালিক বিন আশতার সর্বপ্রথম বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর

হযরত তালহা (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.) তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এমন লোক খুব অল্পই ছিল যারা বায়'আত গ্রহণ করেন নাই। আনসারদের মাঝে কতিপয় লোক এবং বনু উমাইয়া বংশের কতিপয় লোক বায়'আত গ্রহণ না করে শামের দিকে পালিয়ে গেল এবং বায়'আত এড়িয়ে গেল। একজন মদিনাবাসী অতি সন্তর্পণে খলিফা-পত্নী নায়নার কর্তিত অঙ্গুলি ও খলিফার রক্তরঞ্জিত জামা দামিস্কে নিয়ে মুয়াবিয়ার হাতে সমর্পণ করলে মুয়াবিয়া এ দুটো বস্তু দামেস্কে জামে মসজিদে সর্বসাধারণের সামনে প্রদর্শিত করলে ষাট হাজার উসমান (রা.) সমর্থকের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল এবং গোটা মসজিদ 'প্রতিশোধ' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। এক সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার সময় মুসলমানরা কেন আন্দোলন ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বিরোধিতা করছে অথচ আবু বকর ও উমরের সময় এরূপ করে নি। জবাবে আলী (রা.) বললেন, এটা এজন্য যে, আবুবকর ও উমর আমার মতো লোকদের উপরে খলিফা ছিলেন। পক্ষান্তরে আমি খলিফা হয়েছি তোমার মতো লোকদের উপরে। ইবনু খালদুন বলেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর সময়কার মানুষের মধ্যে দ্বীনী দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেন।[৫৩] এ রকম পরিস্থিতিতে নানা ঘাত সংঘাতে তিনি খিলাফতের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন এবং বায়'আতের পর (২৩ জুন, ৬৫৬ খ্রি.) হযরত আলী (রা.) এক সারগর্ভ খুতবা দান করলেন। এতে তিনি মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর খুতবার কতিপয় বাক্য নিম্নরূপ :

> আল্লাহ তা'আলা হারামভূমিকে সম্মানিত করেছেন। মুসলমানদের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুসলমান সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। শুধুমাত্র তখন ব্যতীত যখন কোনো শরিয়াত নির্ধারিত দণ্ড সাব্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দাদের সাথে আচরণের বেলায় আল্লাহকে ভয় করবে। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে মাটি ও পশুর সাথে আচরণের বিষয়েও প্রশ্ন করা হবে (মানুষের কথা তো উল্লেখ করা হয়েছেই)। আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর বিধানসমূহ থেকে মুখ ফিরাবে না, সৎকাজ করবে।[৫৪]

খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একেক খলিফা একেক রীতি-নীতি ও প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত ধারাগুলো উপস্থাপন করা যায়। যথা :

ক. খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল কতকটা প্রাক-ইসলামি যুগের গোত্রীয় শেখ নির্বাচনের অনুরূপ এবং কতকটা গণতান্ত্রিক।

খ. হযরত আবু বকর (রা.) সাকিফা বানু সাঈদায় মাত্র একজন ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত হলে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন এবং খলিফার আনুগত্য মেনে নেন।

গ. হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্বস্ত কয়েকজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সাথে উমর (রা.)-এর খিলাফত বিষয়ক আলোচনা করলেও তা মূলত প্রথম খলিফার সুপারিশের ভিত্তিতেই হয়েছিল।

ঘ. হযরত উসমান (রা.)-এর নির্বাচন ক্ষমতাসীন খলিফা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি প্যানেল অব ক্যান্ডিডেট ঠিক করে দেন, যাতে উল্লেখযোগ্য অনেক সাহাবা এবং সাধারণ জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সব সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচক এক বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারলেও নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সকল পর্যায়ের মুসলিম নাগরিকের পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

ঙ. হযরত আলী (রা.) বহিরাগত (মিসর, কুফা ও বসরার দুষ্কৃতিকারী) ও মদিনার একদল জনগোষ্ঠী দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন যেখানে কোনো ভোট কিংবা অধিকাংশ জনগণের মতামত নেওয়া হয় নি। অবশ্য হযরত আলী (রা.) বিশৃঙ্খল পূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে ও শুরার সদস্য ও বদরী সাহাবিদের সম্মতিতে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

চ. খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে বিশাল সাম্রাজ্যজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে কোনো আলোচনা ব্যতিরেকে এ নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। তবে কোনো পক্ষপাতমূলক নির্বাচন করা হতো না। মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল স্থানের মানুষের মতামত নেওয়ার সুযোগ ছিল না।

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খোলাফায়ে রাশেদিনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী ছিল তা আলোচনা করা না হলে খিলাফতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অজানা থেকে যাবে। সেজন্য খোলাফায়ে রাশেদিনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

* খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে খলিফাগণ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁদের কাজকর্ম ও চাল-চলনে রাসুল (স.)-এর দৃষ্টান্ত ও কুরআনের শিক্ষা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাসুল (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্র খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে পূর্ণতা লাভ করে।

* খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং ইজমার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। এ সময় খলিফারাও নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম) সমান মনে করা হতো। প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে শূরা বা উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

* রাসুল (স.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে খলিফাগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাসুল (স.)-এর নিকট থেকে দ্বিবিধ ক্ষমতা লাভ করতেন। একটি আধ্যাত্মিক, অপরটি জাগতিক।

* সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল খিলাফতে রাশেদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জনসাধারণ খলিফা হতে আরম্ভ করে সকল কর্মচারীর ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে পারতো।

উপসংহার :

খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত বিষয়। গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকে তৎকালীন আরবের ঐতিহ্য ও প্রথার অন্যতম মিশ্রন ছিল খলিফাদের নির্বাচন। গ্রীক নগর রাষ্ট্র এসে যে গণতন্ত্র বিস্তার লাভ করেছিল তার সাথে এর আদর্শিক সামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়। রাষ্ট্র চিন্তাবিদেরা খোলাফায়ে রাশেদিনদের নির্বাচনকে প্রথাগত না বললেও এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে একেবারে অগণতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করেননি। রাসুল (সা.) যে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন তার ভিত্তি ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আরবীয় প্রচলিত গণতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর দাঁড়িয়ে। পরবর্তীতে তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে আমরা সে মূল্যবোধকে ধারণ করতে দেখি। আরব ঐতিহ্য, গোষ্ঠী চেতনা ও নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রশ্ন এখানে জড়িত। হযরত আবু বকর (রা.) এর ক্ষমতায় আরোহন বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী কাঠামোর আদলে না হলেও আরব ঐতিহ্যের সংজ্ঞায় তা গণতান্ত্রিক সরকারের স্বীকৃতির দাবিদার। প্রতিষ্ঠিত রাষ্টের স্থিতিশীলতার প্রশ্নে উপস্থিত জনতার আনুগত্য লাভের দ্বারা প্রতিনিধি বাছাই ছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম উদাহরণ। হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়। ওমর (রা.) এর নির্বাচনে মসজিদে নববীতে উপস্থিত জনতা যারা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি নির্বাচনে রায় প্রদান করে, উসমান (রা.) এর ক্ষেত্রেও মজলিসে শুরার সদস্যদের মতামত প্রদান করতে দেখা যায়, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থণে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত আলীর (রা.) ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আন্দোলনরত বিদ্রোহীদের হাতে খলিফা নিহত হলে পরিস্থিতির বিবেচনায় রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্রোহীদের সমর্থণ ও মনোনয়নের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতায় বসেন। পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিনিধিরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। উল্লেখিত খলিফাদের কেউ তার উত্তরাধিকারীদের কখনো মনোনীত করেননি। সাহাবিদের মধ্যে যে যোগ্য তাকেই মনোনীত করা হয়েছে যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মদিনার উপস্থিত জনগোষ্ঠী, সাহাবিদের সমর্থন, ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরন এবং আরবের প্রচলিত গণতান্ত্রিক রীতি নীতি অণুকরন করেই ৪ জন খলিফা স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন যা সময়ের প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১ Hans Wehr, (Ed. J M. Cowan) A Dictionary of Modern written Arabic, Third Edition (New York: SLS, 1976), p. 257

২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৪৪৯; *আল-কাওসার*, (আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান), ৩য় সং, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৫; মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খণ্ড-১ (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ১২৩৫

৩ Gail Minault, *The Khelafat Movement, Religions Symbolism and Political Mobilization in India* (New Delhi, 1982), p. 2

৪ মুহাম্মদ ইবনে সায়াদ ইবনে মুনী, *কিতাবুত তবাকাত আল-কাবীর*, খণ্ড-৪ (কায়রো: মাকতাবাতুল খামজী, ২০০১), পৃ. ১০৬

৫ সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রিযা, *আল খিলাফত* (কায়রো: আল জাহরা লিল ইলামিল আরবী, তা.বি.), পৃ. ১৬

৬ ড. আহমদ আবদুল কাদের, *আধুনিক যুগে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, তা.বি.), পৃ. ১৯

৭ S. Khuda Bakhsh, *Politics in Isla* (New Delhi: Kitab Bhavan, 2003), p. 9

৮ Sir Thomas W. Arnold, *The Caliphat,* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1965), p. 20; Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* (New Delhi: Kitab Bhawan, 1977), p. 21; Abul Hasan Ali al-Nadvi, *Al-Murtadh,* (Lucknow: 1989), pp. 131-133; S. Khuda Bakhsh, *Ibid,* pp. 9-10

৯ কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, অনু. মাওলানা লিয়াকত আলী, *খেলাফতে রাশেদা* (ঢাকাঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৬), পৃ. ২৯

১০ Maulana Muhammad Ali, *Early Caliphate* (Lahore: Ahmadiyya Anjuman-i-Isha'at-i-Islam, 1947), pp. 15-16; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১১ Jalaluddin A's Suyuti, *History of the Caliphs,* Tr. Major H.S. Jarrett (New Delhi: Kitab Bhavan, 2010), p. 85; শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৫৯

১২ কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১৩ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, খণ্ড- ০৩ (মিসরঃ দারুল মা'রিফ, ১৯৬৭), পৃ. ২০২-২০৬; ইবনুল আছির, আল কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড- ২য় (আম্মানঃ *বায়তুল আফকার আদ্ দাওলিয়্যাহ*, তা. বি.), পৃ. ৩৩০

১৪ Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 86; Joseph Hell, *The Arab Civilization,* Tr. S. Khuda Bakhsh (Idarah-I Adabiyat-I Delli, Delhi, 1980), p. 34; A. H. Qasmi, *Islamic Governments* (Delhi: Isha Books, 2008), p. 88

১৫ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ০৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-২০২

১৬ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ০৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০; Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 87; A. H. Qasmi, *op.cit,* p. 88; Al-Haj Mahomed Ullah, *The Administration of Justice in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), p. x

১৭ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৩৮

১৮ Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* pp. 87-88; Sayed Athar Hussain, *The Glorius Caliphate* (Lucknow: Academy of Islamic Research and Publication, 1974), p. 19; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১৯ যে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচনকে কিছুদিনের জন্য মেনে নেননি তাঁরা হলেন হযরত আলী (রা.) ও বনু আব্দুল মানাফ গোত্রের তার সমর্থকরা, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবু সুফিয়ান, হযরত খালিদ বিন সা'দ, খাযরায গোত্রের প্রধান সা'দ বিন উবাইদা এবং তাদের আরও কিছু অনুসারী। Dr. Ghulam Nabi, *Khilafat In Theory and Practice* (New Delhi: Adam Publishers & Distributors,), p. 49

২০ Von Kremer, *op.cit,* pp. 16-17

২১ Asghar Ali, *The Islamic State* (New Delhi: Vikas Publishing House pvt. Ltd., 1980), p. 43

২২ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮

২৩ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

২৪ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড, ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

২৫ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮; আহমদ ইবনে আবি ইয়াকুব ইবনে জাফর, *তারীখুল ইয়াকুবী*, খণ্ড-২ (মাতবাআতুল গারী, নাজফ, ১৩৫৮ হি.), পৃ. ১১৫

২৬ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮; William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall* (Beirut: Khayats, 1963), p. 84

২৭ Asghar Ali, *op.cit,* p. 43

২৮ তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে. সাকিফায়ে বনী সায়েদার মজলিসে হযরত উমর (রা.) হঠাৎ দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁর হাতে বায়'আত করেছেন। তাঁকে খলিফা করার ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোন পরামর্শ করেন নি।

২৯ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *বুখারী শরীফ*, হাদিস নং- ৬৩৭০, ১০ম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭)

৩০ আল ইমামুল আল হাফেজ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খণ্ড-১২, ৩য় সংস্করন, (কায়রো: আল মাকতাবাতু তাওফিকিয়্যাহ, ২০১২), পৃ. ১৯৫

৩১ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ৪ পূর্বোক্ত, পৃ. 227-228; Amir Hasan Siddiqi, *Islamic State,* (Karachi, 1961), p. 26; Justice Hamoodur Rahman, *Islamic Concept of State* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2005), p. 14; Sir Thomas W. Arnold, *op.ci,t* p. 21

৩২ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড- ৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮; ইবনুল আছির, খণ্ড- ৩য়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

৩৩ Von Kremer, *op.cit,* p. 19, S. Khuda Bakhsh, *op.cit,* p. 11

৩৪ Justice Hamoodur Rahman, *op.cit,* p. 14; A. H. Qasmi, *op.cit,* p. 89; Dr. Mohammad Muslehuddin, *Islam and its Political System* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1999), p. 67

৩৫ আবদুর রহমান আবদুল খালেক, *আশ-শূরা ফী যিল্লি নিযা-মিল হুকমিল ইসলামী* (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ১১৪; Von Kremer, *op.cit,* p. 19

৩৬ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড- ৭ (কাতার: ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শূয়ূন আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০১৫), পৃ. ২৮০-২৮১

৩৭ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

৩৮ ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ), হাদিস নং- ৬৭১৪, দশম খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৭৪-৪৭৫

৩৯ মুহম্মদ আহ্সানউল্লাহ, (অনু.মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার সিদ্দিকী), *খিলাফতের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৫৮

৪০ ইবনুল আছির, খণ্ড- ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড. ০৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১; Maulana Muhammad Ali, *op.cit,* p. 204

৪১ Dr. Ghulam Nabi, *op.cit,* pp. 51-52; S. Khuda Bukhsh, *A History of the Islamic People* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1983), p. 67

৪২ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩

৪৩ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

৪৪ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২; কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩

৪৫ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩

৪৬ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৩-২৮৪

৪৭ J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall* (Beirut: Khayats, 1927), pp. 50-51

৪৮ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৪৯ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

৫০ Jalaluddin A's Suyuti, *op.cit,* p. 211

[৫১] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারী, খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪ ; ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৯), পৃ. ১৫৫০

[৫২] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসির, খণ্ড. ০৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০

[৫৩] Ibn Khaldun, Tr. Franz Rosenthal, *The Muqaddimah*,Vol. I (London: Routledge & Kegan Paul, 1967), p. 433

[৫৪] কাযী জয়নুল আবেদীন মিরাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ১৬.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে অলঙ্করণ শৈলীর বিশ্লেষণ

মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস*

Abstract

Stone carving has added an important chapter to the decoration of Muslim architecture in Medieval Bengal. Stone carving style like terracotta plaques was also popular in the decoration of the building during this period. The Kusumba Mosque is one of the richest stone ornamental buildings in Bengal in the middle Ages. With the indigenous influence, various styles have been added to the decoration of this mosque which has made it aesthetic and alluring. Wrapped in stone, the building is of great importance as the last example of Bengal in the middle Ages. In this article, various aspects of the ornamental style of stone carving of the mosque will be presented.

চাবিশব্দ: কুসুম্বা মসজিদ, প্রস্তরের ব্যবহার, খোদাই শৈলী, অলঙ্করণ শৈলী

ভূমিকা

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে রাজশক্তি হিসেবে বাংলায় মুসলমানদের বসতি স্থাপন শুরু হয়। মুসলিম সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে বখতিয়ার খলজী মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহ্ স্থাপন করেন।[১] বাংলার পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ এ স্থাপত্য নির্মাণ অব্যাহত রাখেন। নির্মিত ইমারতের মধ্যে মসজিদই প্রধান। মূলত মসজিদ বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তি এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে।[২] মুসলমানগণ মসজিদ স্থাপত্য অলঙ্করণে প্রস্তর খোদাই, পোড়ামাটির ফলক, টাইলস, চিত্রকলা, মোজাইক এবং ইটের চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস ব্যবহার করেছিল। বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণে প্রস্তর খোদাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যদিও বাংলায় উৎস হিসাবে প্রস্তরের উপস্থিতি দেখা যায় না। মধ্যযুগে বাংলায় প্রস্তর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ইমারতের মধ্যে কুসুম্বা মসজিদ অন্যতম। আলোচ্য মসজিদের মিহরাবে, গাত্রালঙ্করণে, দরজা-জানালায়, স্তম্ভে, ভিত নির্মাণে, বুরুজে, কার্নিশে এবং শিলালিপিতে প্রস্তর শৈলীর ব্যবহার দেখা যায়। আহমদ হাসান দানী যথার্থই বলেছেন- “A new development in the Muslim period is seen in the decoration of the mihrab stone and carving of the door frames and lintels, where we notice various types of floral representations.”[৩] প্রবন্ধে কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটে ওঠা বিভিন্ন অলঙ্করণ শৈলীর বিশ্লেষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

অবস্থান ও নির্মাণকাল

বর্তমান নওগাঁ জেলার মান্দা থানার অন্তর্গত কুসুম্বা গ্রামে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের পশ্চিম পাশে একটি বৃহৎ দিঘির পশ্চিম পাড়ে কুসুম্বা মসজিদটি (চিত্র: ১) অবস্থিত।[৪] কুসুম্বা গ্রামের নামানুসারে মসজিদটি কুসুম্বা মসজিদ[৫] নামে পরিচিত। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট J. S.

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

Carstairs প্রথম মসজিদটির শিলালিপি আবিষ্কার করেন। তাঁর লিখিত বিবরণী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল ওয়ালী একটি প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন।[৬] শিলালিপি হতে জানা যায়, সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ) জনৈক সুলাইমান ৯৬৬ হিজরি অর্থাৎ ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।[৭] শিলালিপিতে মসজিদের নির্মাতা সুলাইমানের নাম উল্লেখ থাকলেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি সম্ভবত একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। দিঘি, মসজিদ এবং আশে-পাশের অবস্থা দর্শনে মনে হয় সুলতানি আমলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল হিসাবে কুসুম্বা গড়ে উঠেছিল এবং সুলাইমান এই গুরুত্বপূর্ণ জনপদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে 'বানা কারদা-ই সোলাইমান দাম আদিলুহু' (সোলাইমানের ন্যায় বিচার টিকে থাকুক) যা থেকে ধারণা করা যায় তিনি একজন প্রশাসক বা বিচারক ছিলেন। রাজশাহীর কুমারপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে সুলাইমান কর্তৃক ৯৬৬ হিজরি অর্থাৎ ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে অপর একটি মসজিদ নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৮]

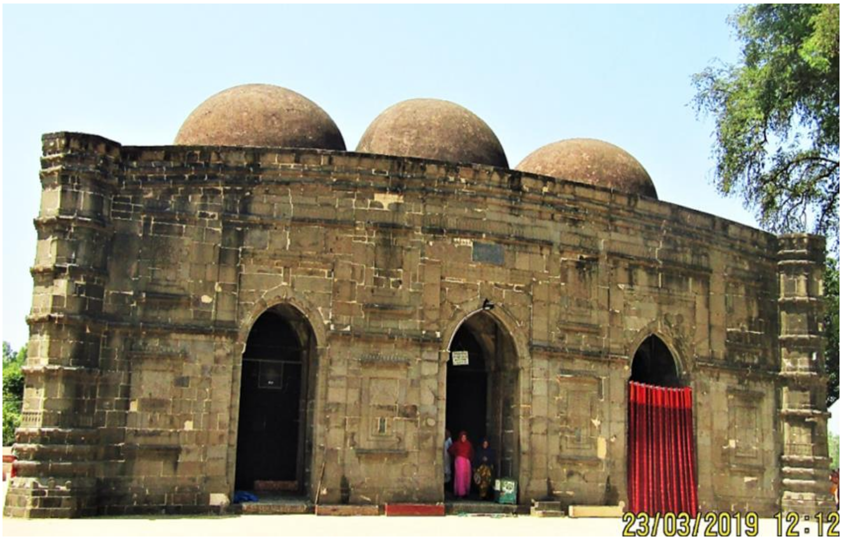

চিত্র ১: কুসুম্বা মসজিদ, মান্দা, নওগাঁ।

মসজিদের বিবরণ

প্রাচীর ঘেরা উঁচু চত্বরের পশ্চিম দিকে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদ চত্বরে প্রবেশের জন্য প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। ইট ও প্রস্তরে নির্মিত মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট এবং প্রস্থ ৪২ ফুট এবং ৬ ফুট পুরু দেয়াল বিশিষ্ট ইমারতটির অভ্যন্তরীণ পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট (চিত্র: ২)।[৯] ইটের তৈরি ইমারতের বাইরের দেয়ালের সম্পূর্ণ অংশ, ভিতরের দেয়ালের পেন্ডেন্টিভের খিলান পর্যন্ত, মেঝে, স্তম্ভ, ভিত্তিমঞ্চ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ব্যবহৃত জালি নকশা প্রস্তরে নির্মিত। আহমদ হাসান দানী এই নির্মাণ রীতিকে ইট-পাথরের সমন্বয়ে স্থাপত্য কৌশল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই

জাতীয় ইট-পাথরের সমন্বয়ে স্থাপত্য কৌশল তুর্কিস্থানে প্রচলিত ছিল এবং তাদের শিল্পিদের দ্বারা বাংলার স্থাপত্যে এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।[১০]

মসজিদটি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত হিসাবে চিহ্নিত। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মসজিদের তিনটি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে এবং অন্যান্য অংশের ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্তী সময়ে মসজিদের সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং গম্বুজ তিনটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে খাঁজকাটা খিলানযুক্ত সম আকৃতির তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও একই আকৃতির দু'টি করে প্রবেশপথ আছে যা প্রস্তরের জাফরি/জালি দ্বারা বন্ধ আছে। অবশ্য পারভীন হাসান উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথের কথা উল্লেখ করেছেন।[১১] বাস্তব পর্যবেক্ষণে দু'টি করে জানালার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রবেশপথ ও মাঝখানের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে দু'টি একই আকৃতির প্রস্তর কারুকার্য সমৃদ্ধ মিহরাব পরিলক্ষিত হয় এবং উত্তর-পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর নয়টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর একটি দ্বিতল মঞ্চ তথা 'জেনেনা গ্যালারী' দেখা যায়।[১২] দ্বিতল মঞ্চটি তথাকথিত 'জেনেনা গ্যালারী'[১৩] হিসাবে খ্যাত। উঁচু মঞ্চে উঠার জন্য পূর্বদিকে দশ ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি সংযুক্ত আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে পশ্চিম দেয়ালে প্রস্তর কারুকার্য সমৃদ্ধ একটি মিহরাব চোখে পড়ে। ছোট সোনা মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদে এর পূর্বে উঁচু মঞ্চ এবং মিহরাব দেখা যায়। তবে উল্লেখিত মসজিদ দু'টির গ্যালারী কুসুম্বা মসজিদের গ্যালারী থেকে নির্মাণ রীতিগত দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ছোট সোনা মসজিদ ও দরসবাড়ি মসজিদের গ্যালারীতে প্রবেশের জন্য মসজিদের উত্তর দেয়ালের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে সিঁড়িপথ নির্মিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কুসুম্বা মসজিদে ভিতর থেকে সরাসরি সিঁড়ি সংযুক্ত আছে। বারো বাজারের পীর পুকুর মসজিদে ইট নির্মিত অনুরূপ সিঁড়ি সংযুক্ত গ্যালারী পরিলক্ষিত হয়।

মসজিদের অভ্যন্তরে দু'টি প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ দ্বারা নামাজ কক্ষকে তিনটি 'আইল' ও দুইটি 'বে' তে বিভক্ত করে ছয়টি একই আকৃতির ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে। ছয়টি ইউনিটের উপর ছয়টি অর্ধ গোলাকৃতির গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের চার কোণে চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আবৃত এবং কার্নিশ বরাবর বুরুজগুলি উত্থিত। বুরুজে ব্যবহৃত দড়ি সদৃশ স্ফীত ব্যান্ড নকশা মসজিদের সমগ্র দেয়ালে ও কার্নিশের নিচে পরিলক্ষিত হয়। দেয়ালের বিভাজিত অংশ ছাঁচে ঢালা প্রস্তরের অলঙ্কৃত আয়তাকার প্যানেল দ্বারা আবৃত। ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় কুসুম্বা মসজিদের কার্নিশ তিনটি স্তরে বিভক্ত এবং প্রস্তরে নির্মিত। সুলতানি আমলে নির্মিত অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এ মসজিদের কার্নিশও বক্রভাবে নির্মিত। ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য উত্তর ও দক্ষিণে ছাদের কিনারায় সম দূরত্বে পাথরের নল ব্যবহার করা হয়েছে।

অলঙ্করণ শৈলী বিশ্লেষণ

মুসলমাদের আগমনে মধ্যযুগে বাংলায় নির্মিত প্রস্তর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ইমারতের মধ্যে কুসুম্বা মসজিদ অন্যতম। প্রাক মুসলিম পর্বের প্রস্তর অলঙ্করণ শৈলীতে মুসলমানগণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল এই মসজিদের প্রস্তর অলঙ্করণে মোটিফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে শিল্পিগণ নান্দনিক শৈলী উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। বাঘা মসজিদের[১৪] অলঙ্কৃত পোড়ামাটির ফলকের সাথে কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাই শৈলীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দেশজ প্রভাবের সাথে এই মসজিদের অলঙ্করণে বৈচিত্র্যময় শৈলী যুক্ত হয়ে নান্দনিক ও মোহনীয় করে

তুলেছে। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব, কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ দিকের মিহরাব ও বাদশা-কা-তখত তথা দ্বিতল কক্ষের মিহরাবে সংযুক্ত কলামে শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৩)।[১৫] অলঙ্করণের ক্ষেত্রে কলামের কাণ্ডে শিকল নকশা ঠিক থাকলেও ঘণ্টা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। পদ্ম পাঁপড়ির নকশা দ্বারা ঘণ্টা সদৃশ অংশ অলঙ্কৃত। মিহরাব তিনটির কলামে একই শৈলী দেখা গেলেও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী শিকলে ঝুলন্ত অংশকে ঝাড়বাতির অনুকৃতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

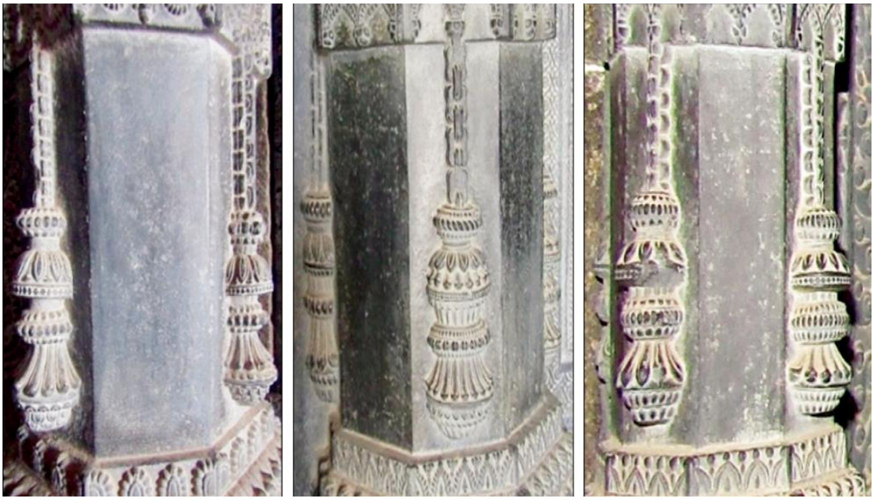

চিত্র ৩: শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

মসজিদের মিহরাব তিনটির অবতল অংশের মধ্যাংশে খোদাইকৃত প্রস্তর প্যানেলের অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তিত শৈলী পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৪)।[১৭] অলঙ্কৃত প্রস্তর ফলকে খোদাইকৃত নকশার বিষয়বস্তু একই হলেও শৈলী বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে। ঘণ্টা আকৃতির নকশার মধ্যবর্তী অংশ ফুল, গহনা, ফুলদানি ও লতা-পাতায় অলঙ্কৃত। অলঙ্করণ শৈলীতে পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও এর উৎস হিসাবে শিকল ঘণ্টা নকশা কারিগরদের উৎসাহ প্রদান করেছিল। মসজিদের দ্বিতল কক্ষে ব্যবহৃত স্তম্ভের উপরের অংশের প্রস্তর ফ্রেম এবং বাইরের দেয়াল গাত্রে ব্যবহৃত প্রস্তর ফলকেও শিকল ঘণ্টা আকৃতির অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৫)।

চিত্র ৪: শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৫: শিকল ঘণ্টার অনুকরণে খোদাই শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

মসজিদের কিবলা দেয়ালের মিহরাবসমূহ, বাদশা-কা-তখত তথা দ্বিতল কক্ষের মিহরাব, দেয়ালের প্যানেল, জানালা ও দরজার প্রস্তর খোদাইয়ে লতাগুল্ম ও তরু লতা-পাতার বৈচিত্র্যময় শৈলী ফুটে উঠেছে।[১৮] কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পাশের মিহরাবের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতা নকশার প্রাচুর্য দেখা যায়। মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের প্রস্তরসমূহে দু'টি ভাগ লক্ষণীয়; যার একটি কিছুটা উদ্গত এবং অপরটি কিছুটা অন্তর্গত। উদ্গত ফ্রেমটি পাঁচটি প্রস্তর খণ্ডে পত্র-পল্লবে পাড় নকশায় সজ্জিত। পাড় নকশার ভিতরের দিকে শস্য দানা নকশার সারি প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শস্য দানা দেখতে ধান সদৃশ অনুকৃতির ন্যায়। ধান সদৃশ শস্য দানা সারির পর আরেকটি ডায়মন্ড আকৃতির সারি দেখা যায়। দুই পাশের উদ্গত উলম্ব প্যানেলের নিম্নাংশ হতে একটি করে লতানো আঙুর গাছ উত্থিত (চিত্র: ৬)।[১৯] লতা দু'টি অনুভূমিক ফ্রেমের মাঝামাঝি লতা-পাতা ও পুষ্প নকশায় একত্রিত হয়েছে (চিত্র: ৭)।

চিত্র ৬: লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৭: লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

আয়তাকার মিহরাবের অন্তর্গত প্রতিটি ফ্রেম একুশ খণ্ড প্রস্তরে গঠিত। প্রস্তর খণ্ডের এগারটি বর্গাকার প্যানেলে ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্করণ ও দশটি আয়তাকার প্যানেলে একই অলঙ্করণ খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্গাকার প্যানেলের মাঝে পুষ্প, লতা-পাতা এবং চতুর্দিকে ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতিক নকশায় লতা-পাতার শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে দৃশ্যমান (চিত্রঃ ৮)। কেন্দ্রীয় মিহরাব এবং দ্বিতল কক্ষের মিহরাবের অন্তর্গত বর্গাকার প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে একই প্রকৃতির শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাব এবং এর দক্ষিণ পাশের মিহরাবে অন্তর্গত ফ্রেমের বর্গাকার প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার শৈলীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তবে দ্বিতল কক্ষের বর্গাকার এগারটি প্যানেলের চতুর্দিকে সুরা মসজিদের আয়তাকার ফ্রেমের বর্ডারে ব্যবহৃত পাতা/তারা ফুলের ন্যায় নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে লক্ষ করা যায় (চিত্রঃ ৯)।

চিত্র ৮: লতা-পাতা ও পুষ্পের শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৯: লতা-পাতা ও পুষ্পের শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

মসজিদের তিনটি মিহরাবে অন্তর্গত আয়তাকার ফ্রেমে ত্রিশটি আয়তাকার প্যানেলে লতা-পাতা, পুষ্প, কুঁড়ি শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে সৌন্দর্যবর্ধন করেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণের মিহরাবের আয়তাকার প্যানেলের এক পার্শ্বে সর্পিল জড়ানো লতা শস্য দানা ও পাতার শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ১০)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অন্তর্গত আয়তাকার প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতা ও পুষ্পের শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ১১)। দ্বিতল কক্ষের মিহরাবের অন্তর্গত আয়তাকার প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতা ও পুষ্পের শৈলী দ্বারা অলঙ্কৃত (চিত্রঃ ১২)। প্যানেলের এক দিকে জ্যামিতিক পাড় নকশা দেখা যায়।

চিত্র ১০, ১১, ১২: লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের মিহরাবে সংযুক্ত ছয়টি প্রস্তর খোদাইকৃত কলামের মধ্যাংশ ব্যান্ড নকশা দ্বারা দু'টি ভাগে বিভক্ত। কলামের মধ্যাংশের নিচের দিকের কাণ্ডের প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণ কিছুটা বৈচিত্র্যময়। কলামের এই অংশের খাঁজে দুই প্রকৃতির শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি খাঁজে পদ্ম পাঁপড়ির ন্যায় উদ্‌গত কাঠামো যার উপরে ফুলদানি নকশা শোভা পেয়েছে (চিত্র: ১৩)। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী এই কাঠামোটিকে খেলবার ব্যাটরূপে উপস্থাপিত হয়েছে বলে ধারণা করেছেন।[২০] এ. কে. এম. ইয়াকুব আলীর ধারণার সাথে একমত পোষণ করে বর্তমান ক্রিকেট খেলার ব্যাট সদৃশ হিসাবে নকশাটিকে মনে করা যায়। তবে নকশাটিকে শুধু খেলবার ব্যাট না ভেবে কুম্ভকারের মাটির জিনিসপত্র তৈরি ও ছাপ প্রদানের ব্যাট হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই ব্যাট সদৃশ মোটিফ বাঘা মসজিদে পোড়া মাটির ফলকে পূর্বেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (চিত্র: ১৪)।

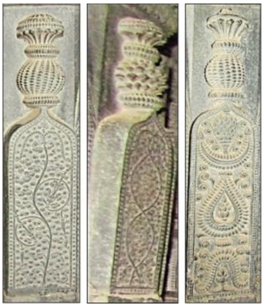

চিত্র ১৩: লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ১৪: লতা-পাতার শৈলী, বাঘা মসজিদ।

মিহরাবে সংযুক্ত কলামের অপর খাঁজের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার শৈলী দেখা যায়।[২১] দুই চালা বিশিষ্ট ঘরের ছাউনির শীর্ষ দু'টির মিলনস্থলের *মটকা* নকশার সদৃশ কাঠামোতে লতা-পাতার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ১৫)। *মটকা* সদৃশ মোটিফের উপরের দিকে নৌকার মাথার ন্যায় শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতাসহ দৃশ্যমান। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী মোটিফটিকে কুলঙ্গি আকৃতির পুষ্প-পাত্র সদৃশ বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] এরূপ শৈলী বাঘা মসজিদের মিহরাবের কলামে পোড়ামাটির ফলকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (চিত্র: ১৬)।

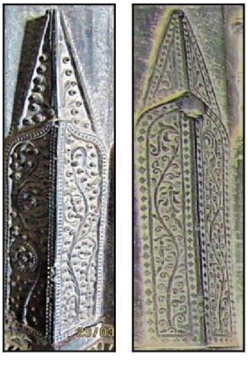

চিত্র ১৫: লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ১৬: লতা-পাতার শৈলী, বাঘা মসজিদ।

আয়তাকার প্যানেলে সংযুক্ত কলামের উপর মিহরাব খিলান অবস্থিত। কেন্দ্রীয় মিহরাব ও এর পার্শ্বস্থ মিহরাব এবং দ্বিতল কক্ষের মিহরাব খিলানের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার শৈলী পরিলক্ষিত হয় (চিত্রঃ ১৭)। মিহরাবের আয়তাকার উদ্‌গত ফ্রেমের অলঙ্করণে জ্যামিতিক লতা ও ফুলের নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ১৮)।

চিত্র ১৭: আয়তাকার ফ্রেমের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ১৮: কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলান অংশে লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

মিহরাবের অবতল অংশের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার শৈলী পরিলক্ষিত হয়। মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশের পাঁচটি আয়তাকার প্যানেলে লতা-পাতা ও গুল্ম জাতীয় লতার আধিক্য দেখা যায় (চিত্রঃ ১৯)। প্যানেলের চতুর্দিকে পাতা নকশার সারি এবং জ্যামিতিক নকশায় জড়ানো লতা, পুষ্প শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে বিদ্যমান। মিহরাবের অবতল অংশের উপরাংশ তিন খণ্ড প্রস্তরে অর্ধ গম্বুজ আকৃতিতে নির্মিত। অর্ধ গম্বুজের মধ্যবর্তী প্রস্তর খোদাইয়ে একটি লতানো গাছ পাতা, ফুল ও শস্য দানাসহ উপরের দিকে উত্থিত অবস্থায় দেখা যায় (চিত্রঃ ২০)। মূলত কুসুম্বা মসজিদের মিহরাবের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার শৈলীর চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

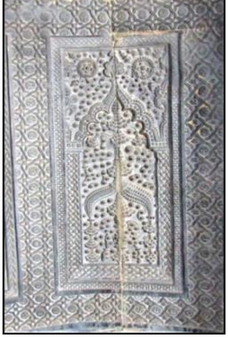

চিত্র ১৯: প্যানেলে লতা-পাতার শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ২০: লতা-পাতা, ফুল, ফলসহ গাছ, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা মূলত পুষ্প নকশার উপস্থাপনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্তরে মোড়ানো এ মসজিদের ভিতরের দেয়ালের প্রস্তর খোদাই, 'বাদশা-কা-তখত' তথা দ্বিতল কক্ষের প্রস্তর খোদাই এবং বাইরের দেয়ালের প্রস্তর স্ল্যাব ও প্যানেলে পুষ্প শৈলীর বৈচিত্র্যময় অলঙ্করণ ফুটে উঠেছে।[২৩] কেন্দ্রীয় মিহরাবের উদ্‌গত ফ্রেমের আয়তাকার ফ্রেমের নিম্ন এবং দুই পাশে জ্যামিতিক নকশায় তিন সারি পুষ্প শৈলী পরিলক্ষিত হয়। তিনটি পুষ্প সারির দুই পাশে তারার ন্যায় কাঠামোয় ছয় পাঁপড়িযুক্ত এবং মাঝখানে ক্ষুদ্র ফুলের নকশা দেখা যায় (চিত্রঃ ২১)। উদ্‌গত ফ্রেমের মধ্যবর্তী স্থান হতে সর্পিল লতা নিম্ন হতে উপরের দিকে লতা-পাতা, ফুল, কুঁড়িসহ উদ্‌গত উপরের প্যানেলে একত্রিত হয়েছে (চিত্রঃ ১৭)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উদ্‌গত ফ্রেমের পুষ্প শৈলীর ন্যায় দ্বিতল কক্ষের মিহরাবের উদ্‌গত ফ্রেমের সাদৃশ্য রয়েছে। এ মিহরাবের প্রস্তর খোদাইয়ে সর্পিল লতায় গম বা যবের থোকার ন্যায় শৈলী ও পুষ্প নকশা দেখা যায় (চিত্রঃ ২২)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের উদ্‌গত ফ্রেমের অলঙ্করণে নিম্ন ও দুই পাশে ছয় পাঁপড়িযুক্ত ও চার পাঁপড়িযুক্ত পুষ্পের সারি নকশা দ্বারা আবদ্ধ (চিত্রঃ ২৩)। এ মিহরাবের উদ্‌গত প্যানেলের মধ্যবর্তী স্থান হতে সর্পিল লতা নিম্ন হতে উপরের দিকে ফুল, কুঁড়িসহ উদ্‌গত উপরের ফ্রেমে একত্রিত হয়েছে (চিত্রঃ ৬)। সর্পিল লতার উভয় পাশে গোলাপ ফুলের ন্যায় শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে দৃশ্যমান। প্রতিটি পুষ্প বৃত্তাকার কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। মিহরাবের আয়তাকার অন্তর্গত ফ্রেমের প্রতিটি বর্গাকার প্যানেলে বৃত্তাকার কাঠামোর মধ্যে পুষ্প শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৮, ৯)। তিনটি মিহরাবে অন্তর্গত আয়তাকার ফ্রেমে ত্রিশটি আয়তাকার প্যানেলের পুষ্প শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে সৌন্দর্যবর্ধন করেছে (চিত্রঃ ১৩)। আয়তাকার প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে পুষ্প নকশার বিন্যাসে একটি বৃত্ত এক আল্লাহ, পাঁচটি পাঁপড়ি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি (কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত) এবং আটটি পাঁপড়ি জান্নাতের সঙ্গে তুলনা করে শিল্পীর ধর্মীয় দর্শনের প্রতি অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

চিত্র ২১: পুষ্প নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ২৩: পুষ্প নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

মিহরাবে সংযুক্ত প্রতিটি কলামের নিম্নাংশ, মধ্যাংশ এবং উপরাংশের প্রস্তর খোদাইয়ে পুষ্প শৈলীর ব্যবহার দেখা যায়। মিহরাবে সংযুক্ত কলামের নিম্নাংশে পাঁচ সারি বিশিষ্ট দানা নকশার মধ্যবর্তী সারিতে চারটি করে গুটিকার পর একটি করে পুষ্প নকশা শোভা পেয়েছে (চিত্রঃ ২৪)। কলামের মধ্যাংশ ব্যান্ড নকশা দ্বারা দু'টি ভাগে বিভক্ত এবং নিম্ন ভাগে প্রতি খাঁজে পুষ্প নকশার সমাবেশ লক্ষণীয়। মিহরাবে সংযুক্ত কলামের উপর খিলানের ত্রিকোণাকার অংশে গোলাপ ফুলের শৈলীর অলঙ্করণ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর (চিত্রঃ ১৮)।[২৪] কেন্দ্রীয় মিহরাব ব্যতীত অপর দু'টি মিহরাবে খিলানের উপরের ত্রিকোণাকার অংশের উভয় পাশে একটি করে বৃহৎ পদ্ম ফুলের নকশা লক্ষণীয় (চিত্রঃ ২৫)। পদ্ম ফুলের পাঁপড়িসমূহ সর্প ফণার ন্যায় এবং অত্যন্ত সুগঠিত বলে মনে হয়।

চিত্র ২৫: পুষ্প নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

পুষ্প নকশার সমারোহ মিহরাবের অবতল অংশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মিহরাব তিনটির অবতল অংশের প্রস্তর খোদাইয়ে পুষ্প শৈলীর অলঙ্করণে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও রীতি কৌশল একই। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশ পাঁচটি আয়তাকার প্যানেলে পুষ্প নকশায় শোভিত (চিত্রঃ ৪) এবং প্রতিটি প্যানেলের চতুর্দিক জ্যামিতিক নকশায় পুষ্প সারি নকশাতে আবদ্ধ। জ্যামিতিক নকশার মাঝে পূর্ণাঙ্গ পুষ্প এবং পুষ্পের উভয় দিকে জড়ানো লতা চার পাঁপড়িযুক্ত পুষ্পের ন্যায় এবং এর পাশে অর্ধ পুষ্পের শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ২৬)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের অবতল অংশের নিম্নাংশ ও মধ্যাংশের প্রস্তর খোদাইয়ে পুষ্প শৈলীর নকশা পরিলক্ষিত হয়। এ মিহরাবের অবতল অংশের প্রতিটি প্যানেলের চতুর্দিক পুষ্প সারি নকশাতে আবদ্ধ (চিত্রঃ ২৭)। দ্বিতল কক্ষের মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশ তিনটি বর্গাকার প্যানেল নকশায় পুষ্প শৈলীর অলঙ্করণে নির্মিত। প্রতিটি প্যানেলের চতুর্দিকে প্যাঁচানো লতা নকশার মাঝে ও উভয় পাশে ক্ষুদ্র পুষ্প শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটে উঠেছে (চিত্রঃ ২৮)। বর্গাকার প্যানেলে বৃহৎ পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে অলঙ্কৃত (চিত্রঃ ২৯)।

চিত্র ২৬, ২৭, ২৮: পুষ্প শৈলীর নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের নান্দনিকতা বৃদ্ধির মানসে শিল্পিগণ আয়তাকার উলম্ব ফ্রেমের দুই পার্শ্ব ও অনুভূমিক ফ্রেমের উপরে নির্দিষ্ট দূরত্বে মসজিদের গাত্র আচ্ছাদনে ব্যবহৃত প্রস্তর স্ল্যাবে একটি করে মোট ষোলটি বৃহৎ পদ্ম ফুলের নকশা ফুটিয়ে তুলেছে। উলম্ব আয়তাকার ফ্রেমের প্রতি পাশে পাঁচটি পদ্ম ও সমান্তরাল আয়তাকার ফ্রেমের উপরে ছয়টি পদ্ম (তিন-দুই-এক) তিন সারিতে সন্নিবেশিত (চিত্রঃ ৩০)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের উপরে কেন্দ্রীয় মিহরাবের ন্যায় ছয়টি পদ্ম ও দ্বিতল কক্ষের মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের উপরে একটি পদ্ম ফুলের নকশা দেখা যায়। দ্বিতল কক্ষে ব্যবহৃত স্তম্ভের উপরের অংশ, খিলান আকৃতির কাঠামোতে ও সর্দলের প্রস্তর খোদাইয়ে পুষ্প শৈলীর অলঙ্করণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৩১)। বাইরের দেয়ালের অলঙ্করণে প্রস্তর প্যানেলের খোদাইয়ে ও জালি নকশাতে পুষ্প শৈলী পরিলক্ষিত হয়। কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে পুষ্প শৈলীর এ প্রয়োগ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।

চিত্র ৩০: পুষ্প নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে ফলমূল ও শস্যদানা মোটিফের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কলামের কাণ্ডের প্রতি খাঁজে লতায় শস্য জাতীয় ফসলের ন্যায় (যেমন- যব, গম, কাউন) নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ১৩, ১৫)। কলামের শিরোভাগে আঙ্গুর থোকার সদৃশ সারি ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান (চিত্রঃ ৩২)। আঙ্গুর থোকা সদৃশ নকশার উপরে আতা/শরীফা ফল সদৃশ শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে পরিদৃষ্ট হয় (চিত্রঃ ৩৩)।

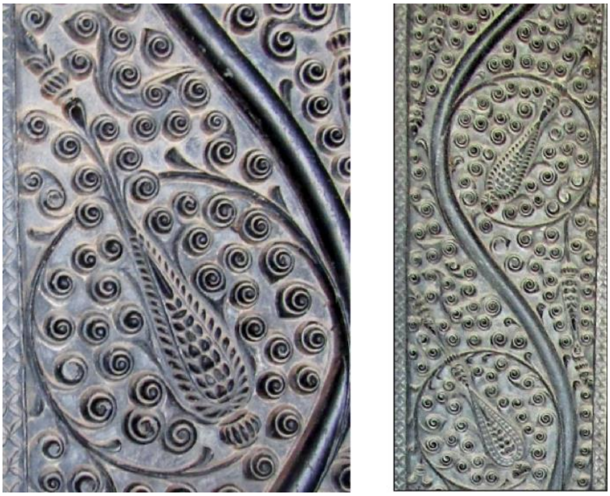

চিত্র ৩৪: যব বা গমের শীষ সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের মিহরাব তিনটির আয়তাকার ফ্রেমে শস্যদানা ও ফলমূলের ন্যায় শৈলী খোদাইকৃত প্রস্তরে দৃশ্যমান। উদ্‌গত উলম্ব ফ্রেমে যব বা গমের শীষ সদৃশ শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৩৪)। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী মিহরাবের আয়তাকার স্তম্ভ স্বরূপ প্রস্তরের এ মোটিফকে ধানের শীষের বৃন্ত হিসাবে অনুমান করেছেন।[২৫] মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের উপর দিকে আনারস ফল সদৃশ শৈলীর সমান্তরাল সারি প্রত্যক্ষ করা যায় (চিত্রঃ ৩৫)। আনারস সদৃশ ফলটি ভুট্টা দানার ন্যায় সারি নকশা দ্বারা সজ্জিত। মিহরাব কলামের কাণ্ডের একটি খাঁজে ব্যাট আকৃতির ন্যায় শৈলীতে আনারস সদৃশ ফলের নকশা দেখা যায় (চিত্রঃ ৩৬)।

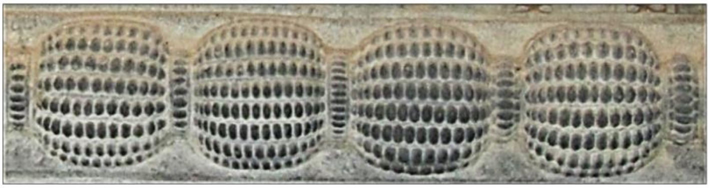

চিত্র ৩৫: আনারস সদৃশ ফলের নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৩৬: ফল নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের অবতল মিহরাব তিনটির উপরাংশের নিচের দিকে ভুট্টা থোকা বা আঙ্গুর থোকার ন্যায় নকশার সমান্তরাল সারির চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস লক্ষ করা যায় (চিত্রঃ ৩৭, ৩৮)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে আয়তাকার পাঁচটি প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে দু'টি করে ভুট্টা থোকার নকশা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৪)। কুসুম্বা মসজিদের জানালার উপরে বন্ধ খিলানের মধ্যে পদ্ম ফুলের শৈলীর চতুর্দিকে আঙ্গুর থোকা অথবা ভুট্টা থোকার ন্যায় নকশাটি মনোমুগ্ধকর ও ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা বলে ধারণা করা যায় (চিত্রঃ ৩৯)।

চিত্র ৪০: খিলান নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

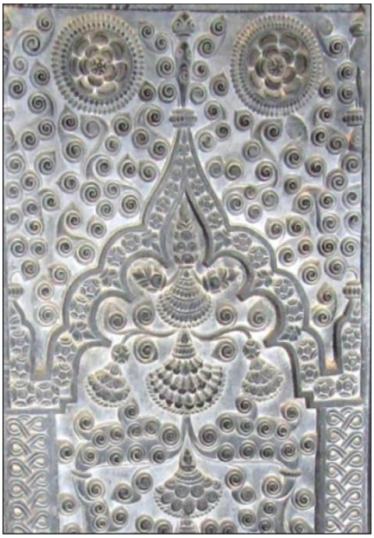

চিত্র ৪১: খিলান নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

প্রস্তর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের মিহরাবের প্রস্তরে, দ্বিতল কক্ষের প্রস্তরে, দেয়ালের প্যানেল অলঙ্করণে ও প্রবেশপথের খিলানের প্রস্তর খোদাইয়ে খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়।[২৬] মিহরাবে সংযুক্ত কলামের নিম্নাংশে ও মধ্যাংশে খিলান নকশা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের উদ্‌গত আয়তাকার ফ্রেমের ডান দিকের নিম্নাংশে খিলানের শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে পরিদৃষ্ট হয় (চিত্রঃ ৪০)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতলাংশের নিম্নভাগের উপরাংশে খিলান নকশা সদৃশ সমান্তরাল সারি বিদ্যমান। অবতল মিহরাবের প্রতিটি প্যানেলেই বহু খাঁজ (Multifoil) বিশিষ্ট খিলান নকশাতে অলঙ্কৃত (চিত্রঃ ৪১)। মসজিদের দ্বিতল কক্ষের নিম্নভাগ ও উপরিভাগের প্যানেল খিলান নকশায় শোভিত। কক্ষের স্তম্ভের শিরোভাগের প্যানেলে খিলানের ক্ষুদ্রাকৃতির শৈলী পরিলক্ষিত হয় (চিত্রঃ ৪২)। মসজিদের বাইরের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের মোট বিশটি (আট, ছয়, ছয়) প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে খিলান নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৪৩)। বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশাকৃত প্যানেলসমূহ দু'টি সারিতে বিন্যস্ত।

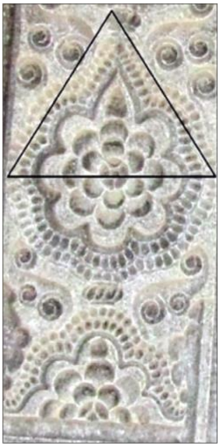

চিত্র ৪২: খিলান নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৪৩: খিলান নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে কলসের ন্যায় মোটিফের নকশা পরিলক্ষিত হয়। মিহরাবে সংযুক্ত কলামের কাণ্ডে ও শিরোভাগে অলঙ্কৃত কলস সদৃশ শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৪৪)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবে ও দ্বিতল কক্ষের মিহরাবে আয়তাকার অন্তর্গত ফ্রেমের আয়তাকার প্যানেলে ভুট্টা/ডালিমের দানা নকশায় অলঙ্কৃত কলস সদৃশ শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে লক্ষণীয় (চিত্রঃ ৪৫)। মিহরাব খিলানের শীর্ষে অলঙ্কৃত কলস সদৃশ নকশা দেখা যায় (চিত্রঃ ৪৬)।

চিত্র ৪৪, ৪৫, ৪৬: কলস সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলানের উপরিভাগের প্রতি খাঁজে একটি করে কলস সদৃশ শৈলী বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় মিহরাবে সংযুক্ত কলামের শিরোভাগে কলস সদৃশ মোটিফের নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে পরিলক্ষিত হয়। মিহরাব খিলানের উপরের প্রস্তরে কলস সদৃশ শৈলীর সমান্তরাল একটি সারি প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের অবতল অংশের

মধ্যভাগের প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে কলস সদৃশ নকশা বিদ্যমান। মসজিদের প্রবেশপথের খিলানের ত্রিকোণাকার অংশে এ মোটিফের ব্যবহার দেখা যায়।

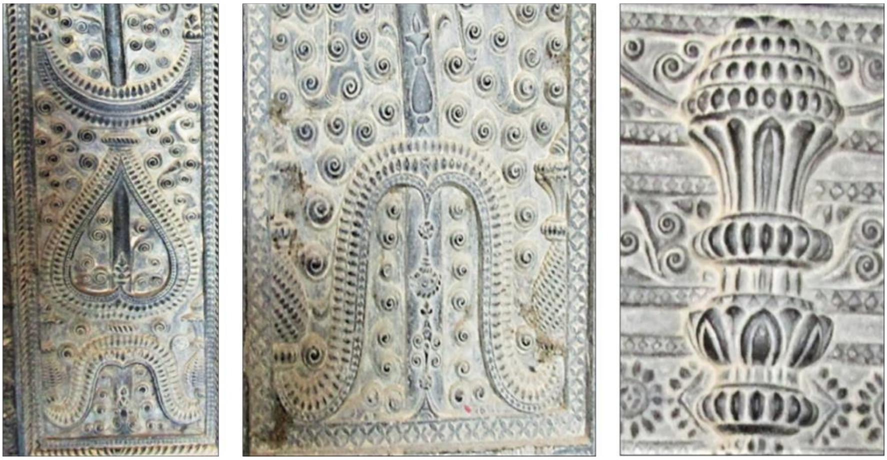

চিত্র ৪৭: ফুলদানি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের আয়তাকার অন্তর্গত ফ্রেমের আয়তাকার প্যানেলে ফুলদানির ন্যায় নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৪৭)। মিহরাবে সংযুক্ত কলামে ফুলদানি সদৃশ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কলামের কাণ্ডের প্রতি খাঁজে অলঙ্কৃত পুষ্পপাত্র নকশা দেখা যায়। কুসুম্বা মসজিদে তিনটি মিহরাবে সংযুক্ত কলামের শিরোভাগে তিন ধরণের ফুলদানি নকশা প্রস্তর খোদাইয়ে কিছুটা বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে (চিত্র: ৪৮)।

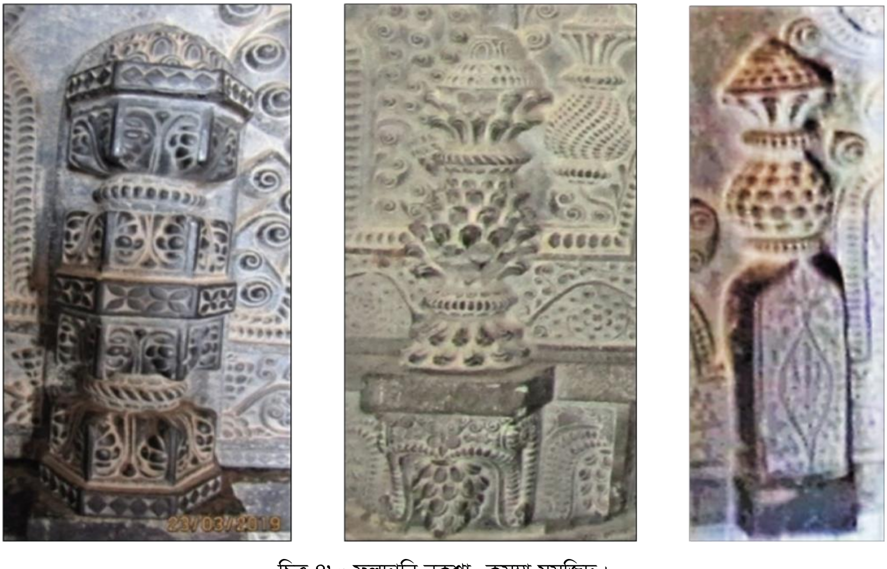

চিত্র ৪৮: ফুলদানি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদে মিহরাব কলামের উপরে খিলান নকশার শীর্ষে ফুলদানি নকশা শোভাবর্ধন করে আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলানের দুই দিকের ত্রিকোণাকার (Spandrel) অংশের সমগ্র অংশ জুড়ে আনারস ফলের সদৃশ পুষ্পদানি নকশাতে অলঙ্কৃত। খাঁজ খিলানের প্রতিটি খাঁজ হতে এবং দুই পার্শ্ব হতে প্রবাহিত লতায় ফুলদানি শৈলী পরিদৃষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলানের শীর্ষে ফুলদানি নকশার উভয় পাশে তেরটি করে ফুলদানি শোভা পেয়েছে (চিত্রঃ ৪৯)। এর উপরের অংশে এক সারি পুষ্প শৈলীর সাথে ফুলদানি নকশা লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাব ও দ্বিতল কক্ষের মিহরাবে খিলানের উপর দিকে সমান্তরাল দু'টি প্রস্তরে এক সারি ফুলদানি শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্রঃ ৫০)। মিহরাব তিনটির আয়তাকার ফ্রেমের উপর দিকে আনারস সদৃশ নকশার দুই পাশে একটি করে ফুলদানির ন্যায় শৈলী পরিলক্ষিত হয়।

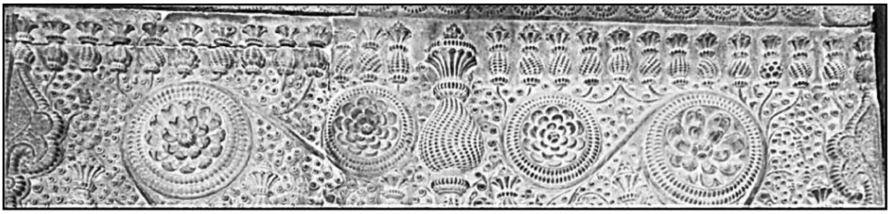

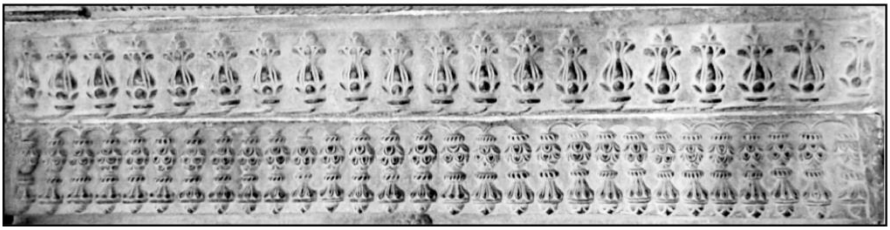

চিত্র ৪৯, ৫০: ফুলদানি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের অবতল অংশের প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে ফুলদানি নকশা দেখা যায়। দেয়াল অলঙ্করণে ব্যবহৃত প্রস্তর প্যানেলও ফুলদানি নকশায় সজ্জিত। কুসুম্বা মসজিদের প্রবেশপথের খিলানের শীর্ষ ও দুই পাশের ত্রিকোণাকার (Spandrel) অংশে অলঙ্কৃত খাঁজ খিলানের উপরিভাগের প্রতি খাঁজ হতে একটি করে ফুলদানি সদৃশ নকশা লক্ষণীয়। খিলানের ত্রিকোণাকার (Spandrel) অংশের উলম্ব দুই পার্শ্ব হতেও ফুলদানি সদৃশ শৈলী দৃশ্যমান।

চিত্র-৫১, ৫২: কলামের নিম্নভাগের গুটিকা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

প্রস্তর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ কুসুম্বা মসজিদের কিবলা দেয়ালের মিহরাব তিনটিতে গুটিকা শৈলীর নান্দনিক সমাবেশ দেখা যায়। মিহরাবে সংযুক্ত কলামের নিম্ন হতে শিরোভাগ পর্যন্ত এ মোটিফের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনটি মিহরাবের ছয়টি কলামের নিম্নাংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে গুটিকা শৈলীর মোটিফ। কলামের নিম্নভাগের নিম্নাংশ খিলান আকৃতির কাঠামোর পাড়ে গুটিকা শৈলীর অলঙ্করণ দ্বারা সজ্জিত (চিত্র: ৫১)। নিম্নভাগের মধ্যাংশে ব্যান্ড আকৃতির নকশাতে গুটিকা দানার শৈলী পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় ও এর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবে পাঁচটি উদ্‌গত সারি এবং দ্বিতল কক্ষের মিহরাবে তিনটি সারির সমন্বয়ে ব্যান্ড নকশা গঠিত (চিত্র: ৫২)। মধ্যসারির গুটিকা আকৃতিতে বড় এবং সমাবেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কলামের নিম্নভাগের গুটিকা শৈলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মিহরাবের অবতল অংশের নিম্নভাগে এ মোটিফের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মিহরাবে সংযুক্ত কলামের মধ্যভাগ পাঁচ সারি গুটিকা নকশা দ্বারা দু'টি ভাগে বিভক্ত। মধ্যভাগের গুটিকা নকশার বিন্যাস ও অলঙ্করণ অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত (চিত্র: ৫৩)। নিম্নাংশে ব্যাট আকৃতির ন্যায় কাঠামোয় ও এর শিরোভাগে ফুলদানি সদৃশ নকশার অলঙ্করণে গুটিকা শৈলীর ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র: ১৩)। উপরাংশে গুটিকা নকশায় সজ্জিত গহনা হতে শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশাতে তিনটি করে গুটিকা সারির দু'টি ব্যান্ড নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৩)।

চিত্র ৫৩: গুটিকা শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের মিহরাব কলামের উপরাংশেও গুটিকা দানা নকশার অলঙ্করণ প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৫৪)। উপরাংশের গুটিকা সারির বিন্যাস নিম্নের ন্যায় হলেও পার্থক্য লক্ষণীয়। মধ্যসারির গুটিকার বিন্যাসে দেখা যায় তিনটি গুটিকা দানার পর একটি বৃত্তাকার কাঠামো ক্রমান্বয়ে সজ্জিত। এরূপ শৈলী কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের কলামে প্রত্যক্ষ করা যায়। উপরাংশের দু'টি ব্যান্ড আকৃতির গুটিকা শৈলীর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

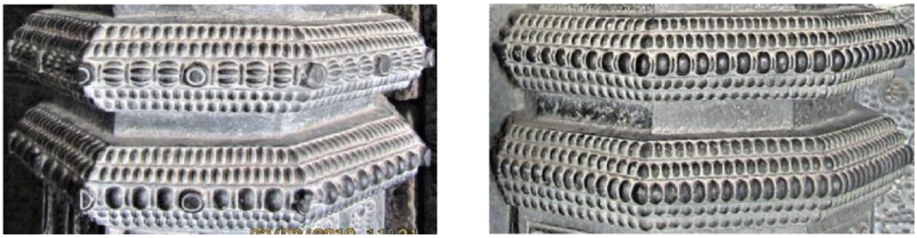

চিত্র ৫৪: গুটিকা শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

তিনটি মিহরাবে সংযুক্ত কলামের শীর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ফুলদানি সদৃশ নকশায় গুটিকা মোটিফের অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয় (চিত্র: ৪৮)। ফুলদানি সদৃশ শৈলীর নিম্নভাগে ঝুলন্ত আতা/শরীফা সদৃশ ফলের দুই দিকে গুটিকা শৈলীর নকশা দেখা যায়। মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে গুটিকা শৈলীর সমাবেশ অত্যন্ত নান্দনিক বলে মনে হয় (চিত্র: ৫৫)।

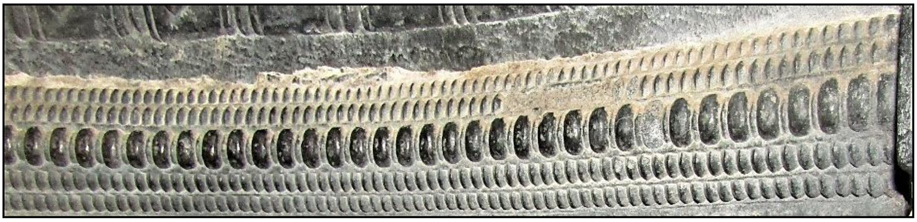

চিত্র ৫৫: গুটিকা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

খিলানের উপরিভাগের ত্রিকোণাকার অংশের অলঙ্করণে ব্যবহৃত পুষ্প শৈলীতেও গুটিকা নকশার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে অলঙ্কৃত সকল ফুলদানি সদৃশ শৈলীতে গুটিকা মোটিফের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিটি পুষ্পের অলঙ্করণে গুটিকা শৈলীর ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পুষ্পের চতুর্দিকে গুটিকা শৈলীর এক/দুই/তিনটি সারি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৫৬)।

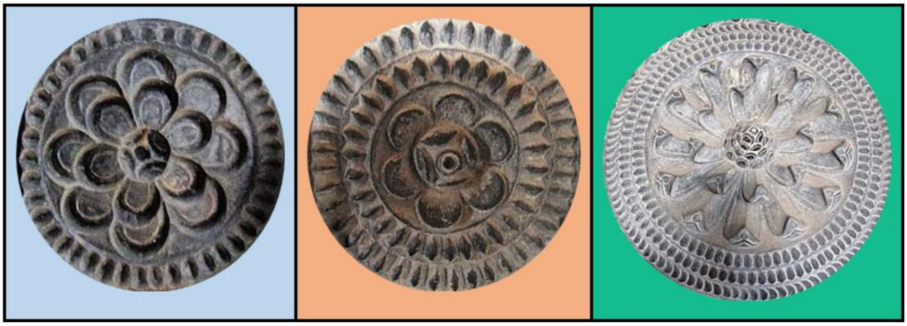

চিত্র ৫৬: গুটিকা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের অবতল অংশের মধ্যভাগের প্যানেলের অলঙ্করণেও গুটিকা মোটিফের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের অবতল অংশের প্যানেল অলঙ্করণে গুটিকা শৈলীর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। চাঁদোয়া আকৃতির কাঠামো, বাল্ব সদৃশ নকশা, ফুলদানি আকৃতির কাঠামো, গহনার ন্যায় নকশা ও তসবিহ্‌র ন্যায় নকশাতে গুটিকা শৈলীর অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয় (চিত্রঃ ৫৭)। গুটিকা দানার জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায় মিহরাব কলামের পাশে আয়তাকার প্রস্তর ফ্রেমের অলঙ্করণে। কুসুম্বা মসজিদে বল আকৃতির গুটিকা শৈলীর প্রয়োগ বাইরের দেয়ালের অলঙ্করণে ব্যবহৃত প্যানেল নকশাতে দৃশ্যমান (চিত্রঃ ৫৮)। মূলত কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর অলঙ্করণে গুটিকা মোটিফের ব্যবহার আলঙ্কারিক চমক সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

চিত্র ৫৭: গুটিকা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৫৮: গুটিকা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর অলঙ্করণে পদ্ম পাঁপড়ি শৈলীর পরিমিত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মিহরাবে সংযুক্ত কলামের নিম্নভাগে পদ্ম পাঁপড়ি সদৃশ নকশার অলঙ্করণ খোদিত আছে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মিহরাবের অবতল অংশের নিম্নভাগে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এ শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবে সংযুক্ত কলামের কাণ্ডে পাঁচ সারি ব্যান্ড নকশার নিম্ন ও উপর সারিতে পদ্ম পাঁপড়ি নকশা বিদ্যমান (চিত্রঃ ৫৩)। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যভাগের প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে পদ্ম পাঁপড়ি শৈলীর অলঙ্করণ দেখা যায়। পাঁচটি প্যানেলের উপরাংশ এ মোটিফ দ্বারা অলঙ্কৃত (চিত্রঃ ৫৯)। কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর অলঙ্করণে ফুলদানি সদৃশ মোটিফের আধিক্য দেখা যায় এবং এই শৈলীর অলঙ্করণে সর্প ফণার ন্যায় পদ্ম পাঁপড়ি নকশা ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্রঃ ৪৭, ৪৮)। মিহরাবের অবতল অংশে স্থাপিত কলামের কাণ্ডে শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ শৈলীর অলঙ্করণে পদ্ম পাঁপড়ি নকশার নান্দনিক বিন্যাস লক্ষণীয় (চিত্রঃ ৬০)।

চিত্র ৫৯: পদ্ম পাঁপড়ি শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৬০: পদ্ম পাঁপড়ি শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে লতা-পাতার নকশাতে প্রাণী সদৃশ মোটিফের ব্যবহার কল্পনা করা যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের বাম পাশের উলম্ব আয়তাকার ফ্রেমের প্রস্তর খোদাইয়ে কুমিরের মুখের ন্যায় নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্রঃ ৬১)। কুসুম্বা মসজিদের এ শৈলীটি শিল্পী এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যেন কুমিরের একটি খোলা মুখ দন্ত ও চক্ষুসহ বিদ্যমান। চক্ষু ও দন্ত সদৃশ শৈলীর উপস্থিতি কুমিরের মুখ সদৃশ নকশার দাবিকে জোরালো করেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবে খিলানের ত্রিকোণাকার অংশে লতা-পাতা নকশার অলঙ্করণ তাৎক্ষণিক দেখাতে হেঁটে চলা প্রাণীর সদৃশ ভাবা যায় (চিত্রঃ ৬২)।

চিত্র ৬১: কুমিরের মুখ সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৬২: প্রাণী সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে শামুকের সদৃশ শৈলীর চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস অলঙ্করণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান দান করেছে (চিত্রঃ ৬৩)। নদী বিধৌত বাংলায় শামুকের আধিক্য লক্ষণীয়। শিল্পী তার শৈল্পিক মেধাকে কাজে লাগিয়ে লতা-পাতার নকশাতে শামুক সদৃশ শৈলী ফুটিয়ে তুলেছে বলে ধারণা করা যায়। শামুক সদৃশ নকশাটি বাংলার প্রকৃতিতে প্রাপ্ত লতা-পাতা অথবা আঙ্গুর শাখার আদলে অলঙ্কৃত। কুসুম্বা মসজিদে শামুক সদৃশ শৈলীর অলঙ্করণ বেশি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র-৬৩: শামুক সদৃশ শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের জানালার প্রস্তর খোদাইয়ে জালি নকশার অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-পূর্ব কোণের জানালা এবং দক্ষিণ দেয়ালের জানালা দু'টির অলঙ্করণ শৈলী ও সংস্থাপিত জালি নকশার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত জানালার আয়তাকার কাঠামোটি দু'টি ক্ষুদ্র জানালার আকৃতিতে বিভক্ত। নিম্নের জানালাটি মূল মসজিদে ও উপরের জানালাটি দ্বিতল কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশের নিমিত্তে নির্মিত। নিম্নের জানালার জালি নকশা দু'টি ভাগে বিভক্ত। জালি নকশার নিম্নভাগ আয়তাকার প্রস্তরে ছোট সোনা মসজিদের জালি নকশার আদলে অলঙ্কৃত (চিত্র:৬৪)। আয়তাকার জালি নকশাটির উপরে সর্দল সংযোজন করা হয়েছে এবং খিলানের ভিতরের অংশে অপর জালি নকশাটি স্থাপন করা হয়েছে। জালি নকশাটি খিলানের নিম্নে অবস্থিত হওয়ায় তা বন্ধ খিলানের ন্যায় মনে হয়। বর্গাকার কাঠামোতে অষ্টভুজাকার ফোকরের সমন্বয়ে এ অংশের জালি নকশা অলঙ্কৃত (চিত্র: ৬৫)। নিম্নের জানালার জালি নকশার ন্যায় দ্বিতল কক্ষের জালি নকশাটির অলঙ্করণ করা হয়েছে (চিত্র: ৬৬)। বারটি বর্গাকার অংশে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি বর্গের মাঝে অষ্টভুজাকার ফোকর বিদ্যমান। আট পাঁপড়িযুক্ত পুষ্পের শৈলীতে জালি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূলত বর্গক্ষেত্রের সাথে বৃত্ত সংযোজন করে জালি নকশাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

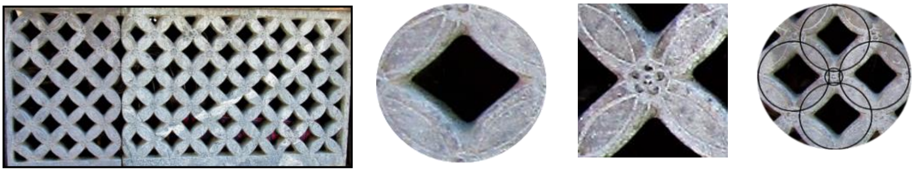

চিত্র-৬৪: জালি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

মসজিদের অপর তিনটি জানালার জালি নকশাও জ্যামিতিক শৈলীতে অলঙ্কৃত (চিত্র: ৬৭)।[২৭] জ্যামিতিক শৈলীর উন্নত ধারার পরিস্ফুটনের পাশাপাশি শিল্পীর দক্ষতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ মসজিদের জালি নকশার অলঙ্করণে। প্রস্তর খোদাইয়ে জালি নকশার শৈল্পিক বিকাশ শিল্পকলার ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছে।

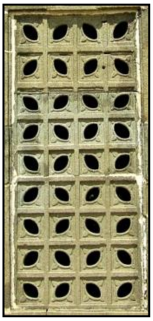
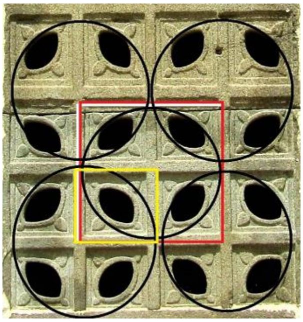

চিত্র-৬৭: জালি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

মধ্যযুগে বাংলার প্রস্তর খোদাইয়ে অলঙ্করণ সমৃদ্ধ কুসুম্বা মসজিদে গহনা নকশার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।[২৮] মিহরাবে সংযুক্ত কলামের গাত্র অলঙ্করণে কণ্ঠহার ও কানের দুলের শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৬৮)। প্রাক মুসলিম আমলে কলামের গাত্রের অলঙ্করণে এরূপ শৈলীর ব্যবহার দেখা যায়।

চিত্র ৬৮: গহনা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

মূলত কলামের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যভাগের প্যানেল নকশার উপরে গহনা সদৃশ শৈলীর সমান্তরাল সারি পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৬৯)। মিহরাবের মধ্যভাগের প্যানেলের প্রস্তর খোদাইয়ে গহনা সদৃশ শৈলীর অলঙ্করণ দেখা যায়। ঝিনুক সদৃশ কানের দুল নকশার দু'টি সমান্তরাল সারি কেন্দ্রীয় মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের অনুভূমিক প্যানেলের নিম্ন ও উপরের প্রস্তরে লক্ষ করা যায় (চিত্র: ৭০, ৭১)। অলঙ্করণ কৌশল একই হলেও উভয় শৈলীর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কুসুম্বা মসজিদের বাইরের দেয়ালের অলঙ্করণেও গহনা মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। দেয়াল অলঙ্করণে ব্যবহৃত প্যানেলে গহনা সদৃশ নকশা বিশেষ করে ঝিনুকের ন্যায় কানের দুল সদৃশ শৈলী দেখা যায়। প্যানেল নকশার নিম্নে গুটিকা দানা শৈলীতে অলঙ্কৃত গহনা নকশার একটি সমান্তরাল সারি প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৭২)। মূলত গহনা নকশার অলঙ্করণ এ মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে বেশি পরিদৃষ্ট হয়েছে।

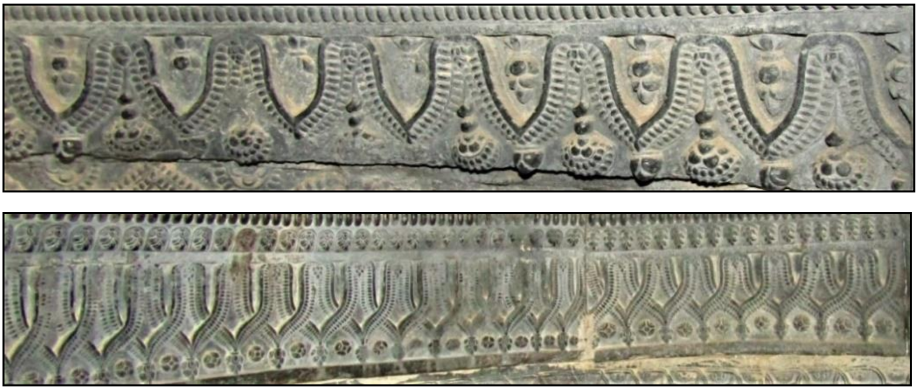

চিত্র ৬৯: গহনা সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কুসুম্বা মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের পার্শ্ববর্তী মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যভাগের পাঁচটি প্যানেলের চতুর্দিক বরফি/ডায়মন্ড সদৃশ শৈলীর অলঙ্করণ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একটি প্যানেল হতে অপরটির মধ্যবর্তী অংশও এ শৈলী দ্বারা অলঙ্কৃত (চিত্র: ২৩, ২৭)। মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের প্রস্তর খোদাইয়ে বরফি/ডায়মন্ড সদৃশ শৈলীর অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিহরাবের উদ্‌গত আয়তাকার ফ্রেমের পাড়ে অবতল অংশের ন্যায় এ মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৭৩)।

চিত্র ৭৩: বরফি/ডায়মন্ড সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

ইট পাথরে নির্মিত মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণে খোপ নকশা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইমারতের বহির্দেয়ালে প্রস্তরের ব্যবহার কুসুম্বা মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। কুসুম্বা মসজিদের পশ্চিম দেয়াল ব্যতীত অপর তিন দেয়াল অলঙ্করণে খোপ/প্যানেল নকশার ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র: ১)। দেয়াল অলঙ্করণে খোপ/প্যানেল নকশার দু'টি সারি বিদ্যমান। কুসুম্বা মসজিদের জানালার জালি নকশাতেও খোপ আকৃতির নকশা পরিদৃষ্ট হয়। মোগল আমলে খোপ/প্যানেল নকশা পলেস্তরা দ্বারা আবৃত দেয়াল গাত্রের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়েছে। কুসুম্বা মসজিদে প্রস্তর আবৃত দেয়াল ও বুরুজে বাঁশের গিঁটের ন্যায় গিঁটযুক্ত উদ্‌গত ব্যান্ড নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৭৪)। নকশি কাঁথার হাশিয়া, সর্পিল লতা-পাতা, বুনো ফুল, ফলমূল পাড় নকশার অলঙ্করণে এ মসজিদের প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলায় সুলতানি ও মোগল শাসনের যুগসন্ধিক্ষণে নির্মিত প্রস্তরে মোড়ানো কুসুম্বা মসজিদে প্রস্তর খোদাই শৈলীর শেষ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কুসুম্বা মসজিদে ব্যবহৃত পাথরের অলঙ্করণ নান্দনিক এবং নয়নাভিরাম। মধ্যযুগে বাংলার উন্নত শিল্পকলার পরিচয় ফুটে উঠেছে এ মসজিদের প্রস্তর খোদাই শৈলীতে। বাংলার দেশজ শৈলীর সাথে আগত শাসকগণের বহন করে আনা রীতি-কৌশল ও শৈলী প্রকরণ সংমিশ্রিত হয়ে প্রাক-মুসলিম ও মুসলিম আমলের টেরাকোটা ও প্রস্তর খোদাই শৈলীর আদলে শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা, লতা-পাতা-পুষ্প শৈলী, খিলান নকশা, গুটিকা নকশা, ফল-শস্যদানার ন্যায় নকশা, জ্যামিতিক নকশা, গিঁট-খোপ নকশা প্রভৃতি প্রস্তর খোদাইয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলায় মুসলিম ইমারতে প্রস্তর অলঙ্করণে পূর্ণতা ও সমাপ্তি কুসুম্বা মসজিদে ঘটেছে যা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

আলোকচিত্র

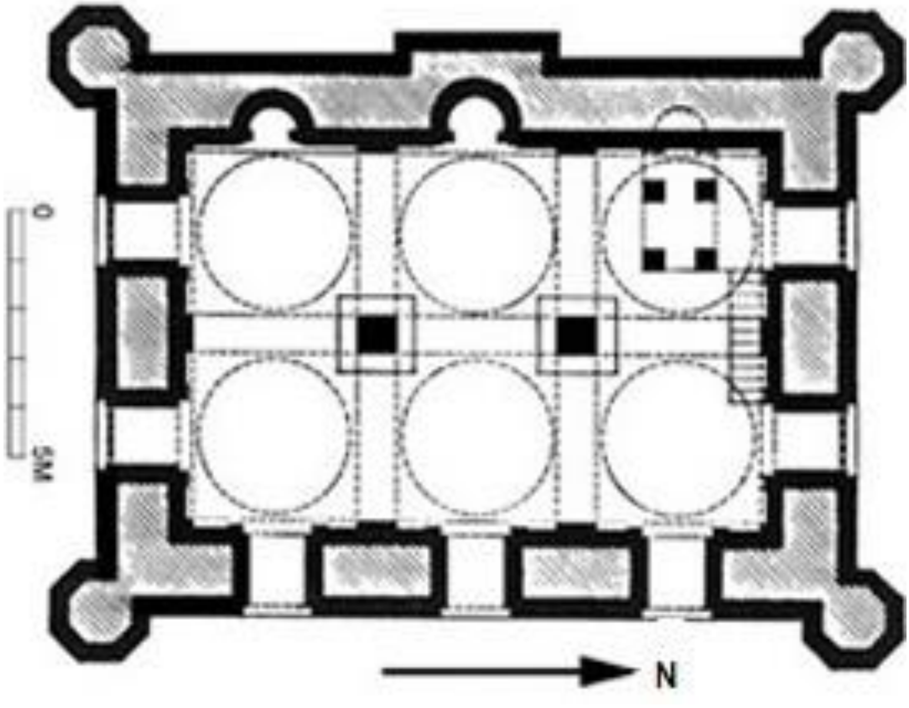

চিত্র ২: ভূমি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ, উৎস: বাংলাপিডিয়া।

চিত্র ২২: লতা-পাতা ও পুষ্প শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ২৪: পুষ্প ও গুটিকা নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

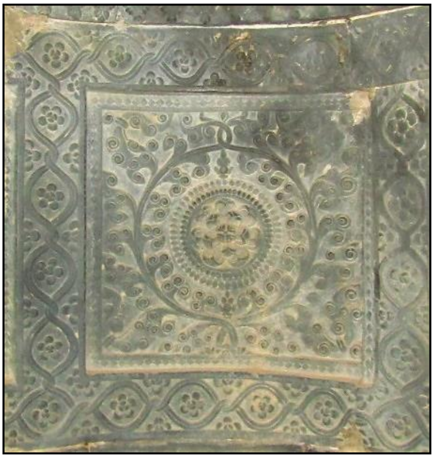

চিত্র ২৯: পুষ্প নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৩১: পুষ্প নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৩২: আঙ্গুর থোকার সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৩৩: আতা/শরীফা ফল সদৃশ শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৩৭, ৩৮: আঙ্গুর থোকা/ভুট্টা থোকার সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৩৯: আঙ্গুর থোকা/ভুট্টা থোকার সদৃশ শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৬৫: জালি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৬৬: জালি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৭০: গহনা সদৃশ নকশা, কেন্দ্রীয় মিহরাব, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৭১: গহনা সদৃশ নকশা, কেন্দ্রীয় মিহরাবের পার্শ্ববর্তী মিহরাব, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৭২: গহনা সদৃশ নকশা, বাইরের দেয়াল, কুসুম্বা মসজিদ।

চিত্র ৭৪: গিঁট সদৃশ নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*: সুলতানী আমল (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ৭০।

২ মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, ১৯৯৬), পৃ. ১।

৩ A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 19.

৪ বাস্তব পর্যবেক্ষণ করে অবস্থান নির্ণয়।

৫ বিস্তারিত দেখুন, A. H. Dani, *Op. Cit.,* pp. 163-164; Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh* (Dhaka: University Press Limited, 1984), pp. 162-163; আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২৯৮-৩০০; সুলতান আহমদ, *ভারতের মুসলিম স্থাপত্য* (ঢাকা: সূত্রাপুর, ২০০৩), পৃ. ১৪১-১৪২; এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-২ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ১১৭-১১৮; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৩ (ঢাকা: এএসবি, ২০১১, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৩৪-১৪৫।

৬ Abdul Wali, *JASB*, Calcutta, Vol. LXXIII, 1904, pp. 108-117.

৭ মসজিদের শিলালিপিটি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট J. S. Carstairs প্রধান প্রবেশ পথের উপরে দেখতে পান। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর রাজশাহীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু জগেশ্বর বিশ্বাস শিলালিপিটি প্রধান প্রবেশপথের নিচে পড়ে থাকতে দেখেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় একজন শিলালিপিটি তার বাড়িতে নিয়ে যান। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে Abdul Wali শিলালিপির পাঠ উপস্থাপন করেন। লিপিটির দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৮ ইঞ্চি। আরবি ভাষায় তোঘরা রীতিতে দুই লাইনের শিলালিপিটি বর্তমানে প্রধান প্রবেশপথের উপরে স্থাপনরত অবস্থায় দেখা যায়। উৎকীর্ণ লিপি এবং অনুবাদ দেখুন Shamsud-din Ahmed, *Inscriptions of Bengal*, vol. IV (Rajshahi: VRM, 1960), pp. 243-244; Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscription of Bengal* (Dhaka: ASB, 1992), pp. 393-394. শিলালিপির বাংলা অনুবাদ হলো 'প্রথম লাইন: মহানবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে মসজিদ নির্মাণ করেন আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় লাইন: এই মসজিদটি সম্মানিত সুলতান গিয়াস আল-দীন আবুল মুজাফফার বাহাদুর শাহ সুলতান বিন মুহাম্মদ শাহ গাজীর শাসনামল, আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্য ও সালতানাত স্থায়ী করুন, তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করুন এবং তাঁর সেনাবাহিনী ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় করুন, ৯৬৬ হিজরি অর্থাৎ ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলাইমান নির্মাণ করেন, তাঁর সুবিচার দীর্ঘায়িত হোক।'

৮ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ।

৯ A. H. Dani, *Op. Cit.,* p. 163.

১০ Behcet Unsal, *Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman times 1071-1923* (London: Alec Tiranti, 1959), p. 83.

১১ পারভীন হাসান, 'কুসুম্বা মসজিদ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, খণ্ড-৩, ২য় সংস্করণ ২০১১, পৃ. ১৩৪।

১২ A. H. Dani, *Op. Cit.*, p. 164.

১৩ উঁচু মঞ্চকে রাজকীয় গ্যালারী বা তথাকথিত জেনানা গ্যালারী হিসাবে পণ্ডিতগণ যে মত প্রদান করেন কুসুম্বা মসজিদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কেন্দ্র থেকে কুসুম্বা মসজিদের অবস্থান বিবেচনা করলে রাজকীয় গ্যালারীর পক্ষে মত প্রদান করা যায় না। তবে স্থানীয় প্রশাসকের বিচারালয় হিসাবে উঁচু প্লাটফর্মকে বিবেচনা করা যায়। কেননা স্থানীয় প্রশাসক কাজী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতেন। প্রশাসকের বিচারালয় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্মিত অপর কোনো স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধানও পাওয়া যায় না।

১৪ রাজশাহী জেলা শহর হতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঘাতে একটি সুবৃহৎ দিঘির পশ্চিম পাশে বাঘা মসজিদটি অবস্থিত। প্রাচীর বেষ্টিত একটি উঁচু ঢিবির পশ্চিম পাশে মসজিদটির অবস্থান। বর্তমানে মসজিদটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে সংরক্ষিত একটি ইমারত হিসাবে চিহ্নিত। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মসজিদের ছাদ ও গম্বুজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটির ছাদ ও গম্বুজটি পুনর্নির্মাণ করেছে। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের আমলে ৯৩০ হিজরি অর্থাৎ ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়। উৎকীর্ণ লিপি এবং অনুবাদ দেখুন S. Ahmed, *IB*, pp. 212-214; Abdul Karim, *CAPIB*, pp. 333-335; Abdul Karim, *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Rajshahi University, Vol. XIII, 1990, p. 35.

১৫ A. H. Dani, *Op. Cit.*, p. 164.

১৬ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, “বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ (তের-ষোল শতক)” *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা ১*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ২৯৩।

১৭ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

১৮ A. H. Dani, *Op. Cit.*, p. 164.

১৯ *Ibid.*

২০ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৩।

২১ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

২২ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৩।

২৩ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

২৪ A. H. Dani, *Op. Cit.*, p. 164.

২৫ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৩।

২৬ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

২৭ A. H. Dani, *Op. Cit.*, p. 164.

২৮ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

জমা প্রদানের তারিখ : ২৫.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৩.১০.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে রাজনৈতিক অভিক্ষেপ: প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন

শামসুজ্জামান মিলকী*

Abstruct:

Mahasweta Devi is a prominent fiction writer in post-partition Bengali literature. Politics and History– basic of her literature. The Naxal movement has come up extensively in her literature according to her political affiliation. She felt morally compelled to record its dreams and betrayals. An overall scenario of the Naxalbari movement has emerged in her story. She criticized the state's offence in suppressing the the Naxal movement in her story. In this article we want to discuss Naxal movement and its effect in Mahasweta Devi's selected short story.

চাবিশব্দ: নকশালবাড়ি, কৃষক-বিদ্রোহ, চারু মজুমদার, দলিলিকরণ, রাজনীতি

১.১ বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমী নন্দনসৃজক কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬–২০১৬)। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা আর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লেখনি ধারণকারী এই কথাকারের মৌলপ্রবণতা 'নিম্নবর্গের বিকল্প প্রতিবেদন-নির্মাণ'। অনন্য জীবনসংগ্রামী, সত্য-ন্যায়ের প্রশ্নে আপোসহীন এই সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আর সাহিত্যে রূপায়িত জীবনকে একসূত্রে গেঁথেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের সাঁওতাল, শবর, মুণ্ডা, লোধ, ওঁরাও জাতিগোষ্ঠীর জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন ঘনিষ্টভাবে। সময় ও সমাজ সচেতন এই কথাশিল্পীর সাহিত্যে এই জনসমষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত শপথ উচ্চারিত হয়েছে। 'সময়ের দলিলিকরণে'র দায় থেকে সাহিত্যে তিনি তুলে ধরেছেন উপনিবেশ ও উপনিবেশ-পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। ব্যক্তিগত রাজনীতি-সচেতনতার জন্যই রাজনীতি তাঁর সাহিত্যে এসেছে– সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাদী আন্দোলন তাঁর গল্প-উপন্যাসের আধেয় হয়েছে বারবার। কোনো বিশেষ মতাদর্শিক দলীয় রাজনীতিতে তিনি আস্থাশীল ছিলেন না, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে ছিলো নিরন্ন-ভুখা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা গণমুক্তির সংগ্রাম। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষত, নকশালবাড়ি আন্দোলন ও এর প্রভাব অন্বেষণের প্রয়াস পাবো।

১.২ কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম অবিভক্ত ভারতবর্ষে– ঢাকায়, তাঁর মামাবাড়িতে। ঔপনিবেশিক ভারতে এক সাংস্কৃতিক-পারিবারিক পরিমণ্ডলে মহাশ্বেতার বেড়ে ওঠা। কৈশোরে শান্তিনিকেতনে (১৯৩৫–১৯৩৮) বসবাসের অভিজ্ঞতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) এঁর কাছে পাঠগ্রহণ– তাঁকে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে এক উদার পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছে। তাঁর লেখালেখিতে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন অনেক বেশি। এ-প্রসঙ্গ নিজেই বলেন, 'আমি নিবিড়ভাবে জেনেই লিখি। কল্পনার ওপর ভর করে আমার কোনো লেখা হয় না। আমি যা করি তা জীবনের বাস্তব চরিত্রদের নিয়েই, ওদের গল্পই রক্ত-মাংসের মতো আমার লেখায় স্থান পায়।'[১] সেজন্য

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা, বাংলাদেশ

মহাশ্বেতার সাহিত্যভুবন নির্মিত হয়েছে অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর ভর করে। তাঁর সমবেদনা, তাঁর কল্পনা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি যে খুব বড়ো মাপের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পিতা মণীষ ঘটক (১৯০২–১৯৭৯) 'কল্লোল যুগে'র প্রথিতযশা সাহিত্যিক; পিতৃব্য ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫–১৯৭৬) চলচ্চিত্রজগতে পরিচালক হিসেবে সুপরিচিত; প্রথম স্বামী বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫–১৯৭৮) গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, একমাত্র পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮–২০১৪) স্বনামখ্যাত কথাসাহিত্যিক। খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত *রংমশাল* পত্রিকায় 'ছেলেবেলা' শিরোনামে গদ্যরচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যিক জীবনের যাত্রারম্ভ। *রংমশাল*-এর পর *সচিত্র ভারত*, *মৌচাক* পত্রিকায় বেশ কিছুদিন লেখেন 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে। ১৯৫৬ সালে *ঝাঁসির রাণী* মহাশ্বেতার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

২.১ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঐতিহাসিকভাবে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। প্রথমত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ, দ্বিতীয়ত ক্যাম্ব্রিজপন্থী দৃষ্টিকোণ, তৃতীয়ত মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ এবং চতুর্থত নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিকোণ। এই চতুর্বিধ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে সম্পদের উপর অধিকারের সূত্র থেকে, কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের জন্য নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রেক্ষিত মনে রাখলে নকশাল আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। যদিও মার্কস তাঁর বিশ্লেষণ শ্রমিকশ্রেণিকে নিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন, তবুও এই ধারণায় কৃষক সম্প্রদায়ের পরিস্থিতিও ব্যাখ্যা করা যায়। মূলত, এই সম্প্রসারিত ধারণা থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর জন্ম। সিপিআই-এর মধ্যে একটি অংশ সোভিয়েত সমর্থক এবং অন্য একটি অংশ চীনের সমর্থক হয়ে ওঠে। ভারত-চীন যুদ্ধের পর ১৯৬৪ সালে সিপিআই দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে– সিপিআই (এম) এবং সিপিআই (এম-এল)। ১৯৬৭ সালে সিপিআই (এম)-এ কিছুটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারা মনে করে, বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি সাধিত হবে– বিপ্লব কখনো বিপ্লবী পার্টি ছাড়া সফল হতে পারে না। অবশেষে ১৯৬৭ সালের ২২ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবীপন্থীদের নতুনধারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠিত হয়। নবগঠিত এই কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) এর নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার (১৯১৯–১৯৭২), কানু সান্যাল (১৯৩২–২০১০), জঙ্গল সাঁওতাল (১৯২৫–১৯৮৮) প্রমুখ। এই ধারার অন্যতম পুরোধা চারু মজুমদার তাঁর Eight Document (৮টি নথি)-এ পার্টির আদর্শগত অবস্থান ও কর্মপন্থা ঘোষণা করেন। এদের বিশ্বাস ছিলো 'শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ' করা সম্ভব। দলের কর্মপন্থায় বলা হয়, ভারতের জনগণের চার ধরনের শত্রু রয়েছে, এদের খতম বা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে মাও সেতুং (১৮৯৩–১৯৭৬) নির্দেশিত পথে সমাজ-রাষ্ট্র গড়বে। এই চার শত্রু হলো: ১. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ২. সোভিয়েত সংশোধনবাদ, ৩. জমিদারশ্রেণি এবং ৪. মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি। এদের ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিবিভক্তি বিলীন করে দিয়ে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়বে। ১৯৬৯ সালের ২৪ মে তরাই উপত্যকার অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়িতে সশস্ত্র কৃষকরা পুলিশকে গ্রামে প্রবেশে বাধা দেয়, অনিবার্য সংঘর্ষে পুলিশ ইন্সপেক্টর ওয়ার্দি নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনার প্রতিশোধস্বরূপ ২৫ মে পুলিশের নির্বিচার গুলিতে নকশালবাড়ি এলাকায় ১১জন নারী-শিশু মৃত্যুবরণ করে। সেদিন থেকে 'নকশালবাড়ি' শুধু স্থানের নাম নয়, 'নকশাল' একটি রাজনৈতিক মতবাদে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে শ্রীকাকুলাম, মুসাহারি, বিহার, লখিমপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের নানা জায়গায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষকপর্যায়ের এই আন্দোলনের চিন্তাকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করা যায়,

> নকশালবাড়ি শুধু একটি এলাকার নাম নয়, একটি রাজনীতির প্রতীক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই নাম একটি রাজনীতির সমার্থক হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, [...] নকশালবাড়ি সংগ্রামের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই ধারার– অর্থাৎ, বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী ধারার মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস।[২]

এই রাজনৈতিক মতবাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। বিপ্লব সফল করতে সামরিক প্রস্তুতির ঘাটতি এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কার্যকারিতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ধারণার সীমাবদ্ধতার কারণে নকশাল আন্দোলন গভীর দ্যোতনা সঞ্চারী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হয়েও দ্রুতই নির্বাপিত হয়ে যায়। আদর্শ বাস্তবায়নে কৃষক-সম্পৃক্তির পরিবর্তে তৈরি হয় বিচ্ছিন্নতা, শুরু থেকেই বুর্জোয়াদের দুর্বল হিসেবে ভাবার কারণে আন্দোলন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। নকশালবাড়ি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর পুলিশি-নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় ক্যাডার-ক্ষমতাসীন পার্টির দৌরাত্ম্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন নিপীড়নের শিকার হয়। এর ফলে সাংস্কৃতিক জগতেও একটি বিকল্প প্রতিরোধবোধের জন্ম হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য যথার্থ বলে মনে করি:

> পশ্চিমবাংলায় রোমান্টিক বিপ্লব-স্বপ্ন দ্বারা স্পৃষ্ট বিদগ্ধ নাগরিক তরুণেরা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তখন; নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের প্রভাব দ্রুত অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পরিণতি যা-ই হোক, বাঙালির মননের পক্ষে এই ঘটনা জলবিভাজন রেখা হিসেবে কার্যকরী; [...] ধীরে ধীরে এই অনুভব-পুঞ্জ বিকল্প-নন্দন, বিকল্প বাস্তব, বিকল্প প্রতিবেদনের উৎস হয়ে উঠল।[৩]

মহাশ্বেতা দেবী নিজেও এই প্রসঙ্গে বলেন:

> নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, তাকে বহু নমে আখ্যাত করা হয়েছে এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিলা কিভাবে করা হয়েছে তা জানেন। ঘটনাটি অতিবাম বিচ্যুতি, কেতাবী ও অত্যুৎসাহী তরুণদের ফ্রাসট্রেশন, অন্যান্য শক্তি ও সংস্থার প্রসাদপুষ্ট ব্যাপার যাই বলা হোক না কেন, কিছু সত্য থেকে যাচ্ছে।[৪]

আপাত ব্যর্থ মনে হলেও 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' নকশালবাড়ি আন্দোলন তৈরি করেছিলো সুদূরপ্রসারী প্রভাব। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাছে শোষকের মুখোশ খুলে দিয়েছিলো, মধ্যবিত্ত-জীবনে এনেছিলো স্বপ্ন-চাঞ্চল্য, দিনের পর দিন নিপীড়িত হওয়ার চেয়ে শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলো, দীক্ষা দিয়েছিলো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর। বিশেষত, ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটলেও ভারতের বৃহত্তর গ্রামসমাজ যে সামন্ততন্ত্রের নিগড়ে বন্দী এবং শহুরে মানসিকতায় গ্রামসমাজ যে উদাসীনতায় নিমজ্জিত— এই পরিস্থিতিতে আলোকসম্পাত ঘটেছিলো।

২.২ রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাধিকার-চেতনার। স্বাধিকার অর্জনের যাত্রায় নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে অধিকারকামী ভারতবাসীকে— সংগঠিত হয়েছে লড়াই-সংগ্রাম বা কোনো বিদ্রোহ। সাহিত্যে রাজনীতির ব্যবহার বা ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জির রূপায়ণ সাধারণ অনুষঙ্গ। কেননা শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে, রাজনীতিকে উপেক্ষা করলে জীবনকেই উপেক্ষা করা হয়। সাহিত্যের রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা বা সাহিত্যে রাজনীতি সরাসরি না-হলেও 'খিড়কির দরজা দিয়ে' আন্দোলনভিত্তিক রাজনীতিও সাহিত্যে ঢুকে পড়ে। এক্ষেত্রে শিল্পীর রাজনৈতিক বোধ-বিশ্বাস বা আদর্শিক অবস্থানের প্রতিফলনও ঘটে। মানুষ জন্মগতভাবেই রাজনৈতিক, সেজন্য কথাসাহিত্যের চরিত্রও কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক পরিক্রমার সহযাত্রী হয়ে পড়ে। শিল্পীকে যেহেতু সবচেয়ে 'সংবেদনশীল' মানুষ মনে করা হয়, সেহেতু সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর সৃজনভুমে উঠে আসবেই। সমাজজীবন বা রাজনৈতিক জীবনের জ্বলন্ত প্রশ্নগুলির উত্তর গল্প-উপন্যাসে উঠে আসে, সেক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবেই লেখক তাঁর মতামতকে অঙ্গীভূত করেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সকল লড়াই-সংগ্রাম ঐতিহাসিক সমান গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস রচনা করেছে ক্ষমতাবান শ্রেণি-গোষ্ঠী, যারা নিজেদের স্বার্থবিরোধী বিষয়াদি ইতিহাসে স্থান দিতে মোটেও আগ্রহী নন। উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য-রচয়িতারা হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্ত করে দেওয়া, দমিত-নিস্পেষিত ইতিহাসকে পুনঃনির্মাণ করেন– একইসঙ্গে বর্তমানকেও ব্যাখ্যা করেন। উপন্যাসে সময় বা ইতিহাসকে তাঁরা দেখেন সম্পৃক্ত জনসমষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে, যা অবশ্যই উত্তরাধুনিক সাহিত্যচিন্তার অনুগামী। কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথনবিশ্বে এই কাজটিই করেছেন। এ-প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা এক আলাপচারিতায় বলেন:

> আমি কি কোনো সনাতন ব্যবস্থার বা রাজনৈতিক পক্ষের সঙ্গে থেকেছি? [...] সভ্য মানুষ হিসেবে আমার একটা বিশ্বাস আছে। সেটা আমার দেখা বৈষম্য, নির্যাতন, যুদ্ধ, ধনীদের তৈরি দুর্ভিক্ষ, নিচুবর্গের মানুষকে উচ্ছেদ ও অবর্বর্ণনীয় অত্যাচার– এসবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আমার কাছে বিশ্বাসের মতো। [...] যারা রাষ্ট্রের দ্বারা বা উচ্চশ্রেণির মাধ্যমে ক্রমাগত নানা নির্যাতনের মধ্যে পড়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না, তাদের কথাই আমি লিখতে চেয়েছি। আমি দেখেছি, আসলে রাজনীতিতে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই [...][৫]

বাংলা সাহিত্যে নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক বহু সাহিত্য রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পশ্চিমবাংলার কথাসাহিত্যে যেসব জাতীয়-রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপজীব্য হয়েছে এর মধ্যে দেশবিভাগের পরেই নকশাল আন্দোলন স্থান পেয়েছে। এর কার্যকারণের প্রকৃত সূত্রসন্ধান করে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন, 'বিশেষত গত পঁচিশ বছরের সাহিত্যিক উপার্জনের দিকে পেছন-ফিরে তাকাই যখন, সপ্তম দশকের অস্থির ও ধূসর প্রহরগুলিকে আজকের নান্দনিক ও সামাজিক সংবেদনা আর অন্বয়প্রত্যাশী দ্বিবাচনিকতার প্রকৃত উৎস হিসেবে বুঝতে পারি।'[৬] মহাশ্বেতার সাহিত্যে রাজনীতি-সংলগ্নতা প্রসঙ্গে বলা যায়:

> সত্তরে সারা ভারতে, বিশেষত পশ্চিম বাংলায়– নকশাল আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন ও লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাজবদলের স্বপ্নপ্রাণিত চেতনায় মহাশ্বেতা

> ভট্টাচার্য হয়ে উঠলেন মহাশ্বেতা দেবী। সৃজনশীল লেখালেখির ধারা–বিশেষত বাংলা আখ্যানের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ দিকদর্শন ঘুরিয়ে দিয়ে হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট। তাঁর লেখায় উঠে এলো রাজনৈতিক ঝাঁজ ও পরিবর্তনের চেতনা।[৭]

মহাশ্বেতা দেবীর মানসগঠনে রাজনীতি-সম্পৃক্তি বা রাজনৈতিক অভিক্ষেপ সম্পর্কে সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ:

> মহানাগরিক পরিশীলনের রিক্ততা ও বৈদগ্ধ্য থেকে দূরে ক্রমশ জেগে ওঠে জীবন-সংলগ্নতার নতুন সৈকত। প্রাকৃতায়ন ও উত্তরায়ণ মনস্কতার যুগলবন্দিতে দেখা দেন নতুন মহাশ্বেতা দেবী; আত্মবিনির্মাণের স্থাপত্যে একক বাচন ও সামূহিক বাচনের দ্বিরালাপ পুরোপুরি নতুন তাৎপর্য অর্জন করে নেয়।[৮]

প্রথাগত, প্রচলিত দলীয় রাজনীতির প্রতি মহাশ্বেতার কোনো মোহ ছিলো না, তবে প্রথম স্বামী বিজন ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে তিনি মানুষকে পাঠ করার বিদ্যায় গভীর অভিনিবেশে মনোযোগী হয়েছিলেন। সংসার-জীবনের টানাপোড়েন আর জীবনযুদ্ধে অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মহাশ্বেতা হয়ে উঠেছিলেন জীবন-রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী। সেজন্য প্রচল পরিধির রাজনীতি নয়, মহাশ্বেতা ছিলেন রাজনীতির বিকল্প ধারার মানুষ। এ-প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা নিজেই বলেছেন, 'আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়।'[৯] সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলন এদেশের মানুষকে বিশেষ কোনো সমৃদ্ধি এনে দিতে না-পারলেও কিছুটা হলেও মর্যাদাবান করেছিলো। সেই পরিবর্তনকে অন্যান্য লেখকদের থেকে আগেই মহাশ্বেতা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর গল্প-উপন্যাসে রূপ দিয়েছিলেন। মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যে কৃষকদের দুরাবস্থা, আদিবাসীদের অস্তিত্বসংগ্রাম ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব যে প্রক্রিয়ায় রূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> সমকালে একমাত্র তিনিই ভারতীয় ঔপন্যাসিক, যার লেখায় ভাগচাষী, খেতমজুর, বেঠবেগারদের সমস্যা ও সংগ্রাম বাস্তব অর্থেই রূপায়িত, তিনিই একমাত্র কথাশিল্পী যার লেখায় ভারতীয় সমাজের অন্যতম মূল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সামন্তবাদ ও কৃষকশ্রেণির দ্বন্দ্ব যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে।[১০]

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের প্রবণতা সম্পর্কে বলা যায়, তিনি গভীর শ্রমে সমাজপট তথা রাজনীতি ও ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, ক্ষুরধার মেধায় তা ব্যাখ্যা করেন এবং বলিষ্ঠ মানবিকতায় আখ্যানকে অন্যতর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেন।

২.৩ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে নানাভাবে এসেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংকলন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া মিলে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১০২টি, গল্পগ্রন্থ বা প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলন ৪০টি, শিশু-কিশোর পাঠ্যগ্রন্থ ২০টি, প্রবন্ধগ্রন্থ ৭টি; এছাড়া অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্পাদনা গ্রন্থও রয়েছে। তাঁর যে উপন্যাসগুলোতে নকশাল আন্দোলন ও এর অভিঘাত পাওয়া যায় সেগুলো হলো: *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪), *অপারেশন? বসাই টুডু* (১৯৭৮), *মাস্টার সাব* (১৯৭৯), *ঘরে ফেরা* (১৯৭৯), *বিশ-একুশ* (১৯৮৩), *গান্ধারী-*

পর্ব (১৯৯১), *উনিশ নম্বর ধারার আসামী* (১৯৯৮)। নকশাল আন্দোলন ও এর পরবর্তী সময়ের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে মহাশ্বেতা রচিত গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'দ্রৌপদী', 'জল', 'এম. ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ', 'রং নাম্বার, 'বিছন', 'ধীবর', 'পিণ্ডদান', 'এপার বাংলা ওপার বাংলা', 'ঘাতক', 'শরীর', 'জলসত্র', 'প্রাত্যহিক' প্রভৃতি। এছাড়াও অনেক গল্পে তিনি মুক্তির দশককে আখ্যানে নিয়ে এসেছেন। উল্লিখিত গল্পসমূহে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক অভিক্ষেপ মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩. নকশাল আন্দোলন সংশিষ্ট গল্পগুলোর আখ্যান-নির্মিতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় গল্পকার মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে চলমান নকশাল আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ, নকশালপন্থীদের পরিণতিতে পারিবারিক পরিস্থিতি, আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্তি বাঙ্ময় করে তুলেছেন— নকশাল আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির সমান্তরালে আমাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে। নকশাল আন্দোলন নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর সবচেয়ে উজ্জ্বল 'দ্রৌপদী' গল্পটি। গল্পের নামের নারী এই দ্রৌপদী কে? *মহাভারতে*র নারী দ্রৌপদীর আদলের কেউ— নাকি কোনো এক সাধারণ নারী। গল্পের অবতারণায় এই নারীর পরিচয় দিয়েছেন লেখক, এভাবে:

> নাম দোপ্দি মেঝেন্, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্ মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান্, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পালে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা.....[১১]

বোঝা যাচ্ছে, গল্পের দ্রৌপদী পুলিশের খাতায় চিহ্নিত আসামি, তাকে গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এখন প্রশ্ন হলো দ্রৌপদী ফেরারি হলো কেন? কী তার অপরাধ? সত্যিই কি সে রাষ্ট্রদ্রোহী? এহেন প্রশ্নের উত্তর লেখক সরাসরি না দিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন: 'ভারতীয় সংবিধানে জাত-ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র', তবুও কেন এই নারীকে পুলিশ খুঁজছে, কেন সে পুলিশের খাতায় 'মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে' হিসেবে চিহ্নিত। রাষ্ট্রপক্ষের হিসেবে দ্রৌপদীর অপরাধ তার স্বামী দুলন্ বীরভূমের জোতদার সূর্য সাউকে হত্যা করে শোষণমুক্ত-শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছিলো। আবার শহর থেকে আসা তিনজন নকশালকর্মীকে পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে সহায়তা করেছিলো। লেখকের বিবরণীতে:

> দুলন্ ও দোপ্দি দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজন ও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরাই মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিশের হাতে সারেন্ডার না করাতেও।[১২]

বীরভূম যখন প্রচণ্ড খরায় পুড়ছে, সামন্তপ্রভু সূর্য সাউয়ের বাড়িতে তখন 'কাকের চোখের মতো নির্মল' জলাধার পরিপূর্ণ। সরকারি টাকায় নিজ বাড়িতে দুইটি টিউবওয়েল ও কুয়া খুঁড়ে তিনটি।

কিন্তু খরাক্রান্ত কৃষিজমিতে এই জলাধার থেকে পানি দিতে সে নারাজ। শহর থেকে আসা শিক্ষিত ছেলে রাণার কথায় দুলন-দ্রৌপদীরা বুঝতে পারে অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী হতে হবে– প্রয়োজনবোধে জোতদারকে হত্যা করতে হবে। কেননা বিপ্লবী কৃষকদের যে নির্দেশনায় বলা হয়েছিলো, 'প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদার-জোতদারদের খতম করা হবে। শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া হবে।'[১৩] জোতদার সূর্য সাউকে হত্যার দায় স্বরূপ এরা বাকুলি থেকে বিতাড়িত হয়ে ঝাড়খানী এলাকায় আশ্রয় নেয়– নতুন নামে দ্রৌপদী হয় উপী মেঝেন আর দুলনার নাম হয় মাতং মাঝি। রাষ্ট্রীয় পুলিশি তৎপরতায় দুলনা নিহত হয়— একমাত্র টার্গেট হয় দ্রৌপদী। সুমাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় একসময় দ্রৌপদী ধরা পড়ে। সেনাক্যাম্পে দ্রৌপদী কোনো তথ্য দেয় না। ফলস্বরূপ, সেনানায়কের নির্দেশে সান্ত্রীদের দ্বারা নির্বিশেষ ধর্ষণের শিকার হয় দ্রৌপদী। ক্যাম্পের সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি লেখক বর্ণনা করেন অল্পকথায়:

> সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড হয়। ওকে নিয়ে পৌঁছতে লাগে এক ঘণ্টা। ঠিক এক ঘণ্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং 'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল' বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।[১৪]

সেনানায়কের নির্দেশ মতো দ্রৌপদীকে রাতভর 'বানিয়ে' সকালে হুকুমদাতার কাছে নিয়ে আসার আগে তার সম্বিত ফিরে, মনে হয়, 'এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে।'[১৫] এবার এক নতুন দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করান লেখক আমাদের। বড়কর্তার তাঁবুতে যাবার হুকুম শোনার পর দ্রৌপদী নিজের গায়ের উপরে থাকা কাপড় ফেলে দেয়– 'সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তার দিকে আসছে। [...] দ্রৌপদী হেঁটে হেঁটে আরো কাছে আসে।'[১৬] পরিস্থিতি দেখে বিহ্বল সেনানায়ক। গল্পের শেষবাক্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অসহায়ত্বকে তুলে ধরেন মহাশ্বেতা, দেখিয়ে দেন অন্যায়ভাবে যারা দমনপীড়ণ চালায় তারা মানসিকভাবে কতটা দুর্বল। হয়তো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সেনা অভিযান চালানো হয়, কিন্তু তা কতখানি যৌক্তিক? 'মহাশ্বেতা যখন এই দ্রৌপদীকেই প্রতিরোধের চরিত্র করে তোলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই চরিত্রটি হয়ে ওঠে আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রবহমাণতা ও প্রতিনিধিত্বের এক মহান প্রতীক।'[১৭] নকশাল আন্দোলনে সম্পৃক্ত এই প্রতিবাদী আদিবাসী নারী দ্রৌপদীর নিজ বস্ত্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা রচনা করেন এক 'নব মহাভারত'। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> পুরাণের দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের লজ্জাকে প্রতিহত করতে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার বস্ত্র হরণ করা যায়নি। এ গল্পের দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়ে বস্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে– নগ্নতাকে সে লজ্জা করেনি, প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে– এ যেন হাজার বছরের ভীত, লজ্জিত নারী অস্তিত্বের উজ্জ্বল মুক্তি।[১৮]

অগ্নিগর্ভ সংকলনের অপর একটি গল্প হলো 'জল'। গল্প শুরু হচ্ছে একজন লোকের নাম-পরিচয় দিয়ে, 'লোকটার নাম মঘাই।' জঙ্গল-পাহাড়-নদী এলাকার সরকারি জোতজমিকে মানুষের বসবাস

করার জন্য ব্লকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। চরসা ব্লকের বুক দিয়ে বয়ে গেছে চরসা নদী– পাহাড়ী এই নদীর বৈশিষ্ট্যই হলো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে নৈরঞ্জনা, আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে বাণভাসি, শরতে প্রবাহ কমে যাওয়া, শীতে শীর্ণধারা। জলবায়ু অনুসারে চরসা খরা ও অনাবৃষ্টির অঞ্চলভুক্ত। নদীতে পানিপ্রবাহ কমে গেলে চাষাবাদ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজের পানিরও সংকট দেখা দেয়। সেজন্য চরসা ব্লকে বছর বছর রিলিফ আসে, সন্তোষ পূজারী এই রিলিফের ভক্ষক– সামন্তপ্রভু। সরকারি টাকায় খননকৃত কুয়ার সবগুলো তার করায়ত্তে। পানির অভাবে ফসল তো দূরের কথা, মানুষ মরে গেলেও পানি দিতে নারাজ সন্তোষ। অথচ তার বাড়ির গবাদিগুলোকেও প্রতিদিন কুয়ার পানিতে গোছল করানো হয়। চরসার পুরুষ মানুষেরা পঞ্চায়েতি কুয়ার পানি না-পেয়ে রাতভর নদীর শুকনো বালিতে উনুই খুঁড়ে– ভোরবেলায় নারীরা সেই গর্তে জমাকৃত পানি পাত্রে করে ঘরে এনে ব্যবহার করে। মঘাই পানি বণ্টনের এই অব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলে কিন্তু সন্তোষ পূজারী তার অবস্থানে স্থির থাকে। মঘাইয়ের পৈতৃক পেশা 'জলের খোঁজ' করা। লেখক জানাচ্ছেন:

> মঘাই গুণী। ও পাতালে জলের খোঁজ রাখে। রাতভোর উপাসী থেকে সকালে স্নান করে কাচা কাপড় পরে, পলাশ পাতায় শাল-ঘি-চিনি নিয়ে, মন্ত্র পড়ে ও হাঁটতে থাকে। তারপর যেখানে দাঁড়িয়ে আঁজলা উছলে চাল ফেলে দেয় সেখানে ডিনামাইট দিয়ে ফাটালেই জল ওঠে, কুয়ো হয়।[১৯]

এই চরসায় বহিরাগত হলেও প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা জিতেন মাইতি– বুনিয়াদী প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের জেরে এক বছর জেলে ছিলেন, ছেচল্লিশে দাঙ্গা-বিরোধী মিছিল করেছেন, সাতচল্লিশ থেকে গ্রামসেবক সমিতি করছেন। জিতেন মাইতি শিক্ষা-প্রসারণে বিফল-সংগ্রামী হলেও চরসার মানুষের পানির অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সফল মানুষ। বর্ষার পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে তা শুকনো মৌসুমে ব্যবহারের উপযুক্ত পন্থার পথপ্রদর্শক সে। এই গল্পে নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষতা নেই, তবে ১৯৭১-পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল তৎপরতা বন্ধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উল্লেখ আছে। পুলিশ-ইন্টেলিজেন্সের খাতায় জিতেন মাইতির কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসমূলক হিসেবে দেখানো হয়েছে:

> জিতেন মাইতি, এক "ফর লং সাস্‌পিসাস ক্যারেক্টার", বুনিয়াদী প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের কর্তব্য ত্যাগ করে চরসা গ্রামের "ডিসেন্‌টিং এলিমেন্টস"দের সঙ্গে একজোট হয়ে সমাজবিরোধী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে উসকানি দিয়ে গ্রামজীবনের সন্ত্রাস সঞ্চারে রত ছিলেন।
>
> [...] "জল একটি ইস্যু মাত্র"।[২০]

এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে মঘাই শহিদ হয়– জিতেন ও ধুরা জেলে অন্তরীণ। মহাশ্বেতা বলেছিলেন, 'মানুষ হিসেবে যদি আমি সততা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, প্রতিবাদে বিশ্বাসী হই, সাহিত্যে কী করে আমি অন্য কথা বলি।'[২১] নিজের সম্পর্কে এই বিবৃতি বিষয়ে তাঁর সতর্কতা ছিলো, আমৃত্যু তিনি সাহিত্যে তাঁর এই প্রতিবাদ জারি রেখেছিলেন।

'এম. ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ' মহাশ্বেতা দেবীর একটি বড়গল্প। খেতমজুর বা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বা Minimum Wage-কে সংক্ষেপে এম. ডব্ল্যু. (MW) বলা হয়ে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কৃষকদের লড়াই-বিদ্রোহের ঘটনা রয়েছে। বিশেষত ভারতের স্বাধীনতা

অর্জনের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন অবিভক্ত বাংলার ২৪টি জেলায় শুরু হয়েছিলো। প্রত্যক্ষভাবে তেভাগা আন্দোলনে সফলতা না-এলেও 'বর্গাদার আইন' (১৯৫০), 'জমি অধিগ্রহণ আইন' (১৯৫৩), 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন' (১৯৫৩) প্রণীত হয়। তেভাগা আন্দোলনের সূত্রে ১৯৬৭ সালে শিলিগুড়ি মহকুমার প্রধানত নকশালবাড়ি, পাশাপাশি খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, ইসলামপুর, চটেরহাট এলাকায় খেতমজুর-চা বাগান শ্রমিক, আদিবাসী-ভূমিহীন কৃষিজীবীরা জোতদার-জমিদার, মহাজন-চা বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা করে, এদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলো নকশালকর্মী শিক্ষিত মেধাবী তরুণরাও। খেতমজুরদের জন্য কাগজে-কলমে এম.ডব্ল্যু. থাকলেও ওরা কখনোই পায় না। সুবিধাবাদী-বুর্জোয়াশ্রেণি সবসময় খেতমজুর বা শ্রমিকদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত করে। নকশাল আন্দোলনের মৌল বিষয়কে উপজীব্য করে মহাশ্বেতা দেবীর কালজয়ী রচনা 'এম. ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ'– লখিন্দ নামক এই আদিবাসী এম.ডব্ল্যু. বঞ্চিতদের প্রতিনিতিৃশীল চরিত্র। গল্পের অবয়ব নির্মিত হয়েছে মহাশ্বেতার অনায়াস সৃজনক্ষেত্র আদিবাসী সমাজকে কেন্দ্র করে যারা মূলত খেতমজুর বা ভূমিহীন কৃষক। ১৯৪৭-এ ইংরেজ উপনিবেশের অবসান ঘটলেও পরিবর্তন হয়নি সাধারণ মানুষের ভাগ্য, স্বাধীনতার মর্মকথার তাৎপর্যও কোনোদিন বোধগম্য হয়নি তাদের মনোজগতে। লখিন্দের ধারণা, 'ভারত স্বাধীন হলেও সোনাল গয়েশ্বরী গৌর লস্করের অধীনে। স্বাধীনতার ব্যাপারেও গৌরের হাত আছে বলে ওর ধারণা। নইলে গৌর পনেরই আগস্ট করে কি করে?'[২২]– জোতদার গৌর লস্কর সোনাল, গয়েশ্বরী, মুড়াইল গ্রামের 'একাই ঈশ্বর'। স্বনামে বা বহুনামে এই এলাকার সমস্ত জমির মালিকানা তার– সেজন্য খেতমজুরের পারিশ্রমিক নিয়ে এই জোচ্চুরি। আদিবাসী এই জনগোষ্ঠীর দাবি এম.ডব্ল্যু. তারা যেন পায়, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন! তাদের আলোচনায় উঠে আসে নকশালবাড়ির প্রসঙ্গ:

> ছিচরণ বলল, তুমি যি বললা সি লকসালবাড়ি দার্জিলিঙে আছু?
> আছু ত।
> যদি সেথা মজুরে মজুরি পেয়াছে তবে সেথা লকসালবাড়ি হল কেনী?
> সি আন কথা। এখন লখিন্দরে শুধাই। আটষট সালে মোদের জেলায় এম. ডবলু হল?
> লখিন্দ বলল, খু–ব হয়াছিল। ত্যাখন আমি লিত্য রেডিও শুনাচ্ছি ব্বাপো রে, রেডিওতে কতখন কত এম. ডবলু. হয়াছে।
> হাঁ হাঁ রেডিওতে হয়াছে, কাগজে হয়াছে, সরকারী রেকর্ডে মরদ মিঞা টোকা কত পেয়াছে? [...] রেকর্ডে মোরা রাজা হয়াছি। [...]
> হাতে কত পেয়াছ?
> ছ আনা। বিটিরা তাও পায় নাই।[২৩]

তাদের এই কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও সাধারণ মানুষ স্বাধীন হয়নি। এই গল্পে মহাশ্বেতা আঘাত করেছেন রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতি। গল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সরকারের তরফ থেকে এম.ডব্ল্যু. তদারকির ইন্সপেক্টর সুবোধ রুইদাসের মুড়াইলে পোস্টিং নিয়ে আসা। সুবোধ নিজেও খেতমজুরের সন্তান। সেজন্য বসাইয়ের নেতৃত্বে জোতদার লস্করের বিরুদ্ধে খেতমজুররা সংগঠিত হয়ে ধানকাটা নিয়ে ধর্মঘট করলে সুবোধ প্রেরণা ও সমর্থন দেয়। অন্ত্যজ পরিবারের সুবোধ জানে জোতদারদের দৌরাত্ম্য, তাই সে সরকারি-বিধি মোতাবেক ধানকাটা ও মজুরি দেবার জন্য লস্করকে চাপ দেয়। একদিকে বসাইয়ের নেতৃত্বে

ধর্মঘট ও অন্যদিকে এম.ডব্ল্যু. ইন্সপেক্টর সুবোধের কর্তব্যবোধ– এ দু'য়ের মাঝখানে লস্কর দিশেহারা। নয়দিন ধর্মঘট চলার পর উপর মহলের ইশারায় পুলিশি পাহারায় শর্ত ভেঙে বাইরের মজুর এনে ধান কাটে লস্কর। গোলায় ধান তুলতে পারলেও বসাইরা দাবি জানাতে থাকে এম.ডব্ল্যু.র জন্য। লস্করের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনির আক্রমণে নিহত হয় বসাই ও লখিন্দ, আহত হয় ইন্সপেক্টর সুবোধ। কর্তব্যে নিষ্ঠবান হয়েও সরকারের বিশেষ মহলের সংক্ষোভে চার্জশীট হয় সুবোধের নামে, চাকরি হারায়। এভাবেই খেতমজুরদের আন্দোলন বিক্রি হয়ে যায়, জোতদাররা দিনের দিনের পর শ্রমশোষক হয়ে সমাজপতির আসনে আসীন থাকে। গল্পের পুরো আখ্যানেই নকশাল আন্দোলনের অভিঘাত ফুটে ওঠে। শ্রেণিশত্রু নিধনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে 'বিছন' গল্পেও– আদিবাসী জীবনাচরণে নকশাল আন্দোলন ও এর অভিঘাত গল্পটির মূল উপজীব্য। শোষণ মুক্তির লড়াইয়ে অবতীর্ণ এই জনগোষ্ঠী 'বিছন' গল্পে জয়ী হয়, জোতদার লছমন সিংকে হত্যা করে দুলন। নিজের জমির পাকা ধান গ্রামের সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে দুলন সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা করে– লেখা হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস। দুলন বলে:

> 'আমার ধান তোমাদের লেগে বিছন। এই বিছন নাও।'
> 'দিয়ে দিচ্ছ?'
> হ্যাঁ নাও, কেটে নাও। [...]
> দুলনের গরাটা যেন ঘুড়ি কাটা সুতোর মতো হারিয়ে যায়। গলা সাফ করে দুলন বলে, 'তোমরা কাট! আমাকেও চারটি দিও। আবার রুইব, আবার।'[২৪]

এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ-উত্তর পরিস্থিতিতে পিষ্ট দলিত জীবনের ভাষ্যকার হয়ে ওঠেন।

৪. নাগরিক জীবনে নকশাল আন্দোলন ও এর প্রচ্ছাপ মহাশ্বেতার গল্পভুবনে ভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে। *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪) এর মতো অনন্য উপন্যাস তিনি শহরজীবনের পটভূমিতেই লিখেছেন। যে 'জোয়ার-ভাঁটায়' ষাট ও সত্তরের দশক আন্দোলিত এর ঢেউ পুরো পৃথিবীতেই লেগেছিলো– 'তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ছাত্র ও যুবদের অসীম সাহসিক কাণ্ডারীর ভূমিকা'[২৫] বাংলার ছাত্রসমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছিলো। ছাত্রসমাজের আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হওয়া ও তাদের মর্মন্তুদ পরিণতি নিয়ে মহাশ্বেতার গল্প 'রং নাম্বার'। মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিমণ্ডলে কলকাতায় বেড়ে ওঠা দীপঙ্কর গ্রাজুয়েশন করেছে। তীর্থঙ্কর চ্যাটার্জী ও সবিতার একমাত্র সন্তান দীপঙ্কর। সত্তরের দশকে কলকাতার মেধাবী শিক্ষার্থীরা নকশালবাদে দীক্ষিত হয়ে নতুন সমাজগঠনের সংকল্প করেছিলো। সে-সময়ের কলকাতা তথা পুরো পশ্চিমবঙ্গেই 'নকশাল-নিধনে'র নামে ছাত্রহত্যা চলছিলো। কারণ কলকাতার 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'তে বহুছাত্র-যুব জড়িত ছিলো বলে নির্বিচারে ছাত্রদের নৃসংশভাবে হত্যাযজ্ঞে নামে রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও সরকারি দলের ক্যাডারবাহিনি। এরা চেয়েছিলো একটি জেনারেশনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, যাদের বয়স ষোলো থেকে বাইশ বছর। এই গল্পের দীপঙ্করের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ রেললাইনের পাশে পাওয়া যায়, কিন্তু পিতা তীর্থঙ্কর তা জানলেও সে সবিতাকে জানাতে ভয় পায়। সেজন্য হাসপাতাল থেকে টেলিফোনে রং নাম্বারে কল এলে বিব্রত-ভয়ার্ত-বিমর্ষ হয়ে পড়ে

তীর্থঙ্কর-সবিতা। কলকাতার পরিস্থিতি খারাপ বিধায় দীপঙ্কর লক্ষ্মৌতে নীরেনের কাছে থাকছে, এমন প্রবোধ স্ত্রীকে দিলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তীর্থঙ্কর। তার কাছে মনে হয়:

> তীর্থবাবুর ভয় করে, খালি খালি ভয় করে। এ একটা অন্য কলকাতায় বাস করছেন তিনি, অন্য পশ্চিমবঙ্গে। দেখে মনে হয় সেই শহর। সেই গড়ের মাঠ-মনুমেন্ট-ভবাণীপুর-আলিপুর-চরকডাঙ্গার মোড়। [...]
>
> এ একটা ভুল শহর। রং সিটি। ভুল ট্রেনে টড়ে ভুল শহরে এসেছেন তীর্থবাবু।[২৬]

কলকাতার কলেজের মেধাবী ছাত্র তপন, নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্রহত্যার সেই দশকে তপনও পরিণত হয়েছিলো বিরোধীদের কাছে 'ওয়ান্টেড'– আত্মগোপন করেছিলো বোনের বাড়িতে। কিন্তু সেখানেও অনিরাপদ বোধ করায় সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয়ের পরিকল্পনা করে। কিন্তু তপন বাবা-মায়ের কাছে থেকে বিদায় নিতে বের হলে ক্যাডারদের হাতে ধরা পড়ে যায়। তপনের মৃত্যু নিশ্চিত হলে পুলিশ এসে তার লাশ নিয়ে যায়। এমনি এক বৃত্তান্তে মহাশ্বেতা দেবী লেখেন তাঁর 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' গল্পটি। সমাজবদলের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে নিজেরাই সমাজের কাছে নিগৃহীত, তাদের পাশে দাঁড়ায় না রাষ্ট্র কিংবা সমাজ। পরিবারও সাহস পায় না ঘরের ছেলের মৃতদেহ গ্রহণ করতে। বোনের বাড়িতে একলা ঘরে শুয়ে শুয়ে তার মনে হয়েছে মৃত-বন্ধু শঙ্কুর কথা, নিরুদ্দেশ-বন্ধু সঞ্চয়নের কথা। সঞ্চয়ন বলতো:

> একদিক থেকে দেখতে গেলে আমরা একটা লস্ট জেনারেশন রে। যখন বোমা ফাটার শব্দ শুনি, গুলিন আওয়াজ পাই, বারুদের গন্ধ পাই, তখনি বুঝতে পারি আমার তোর বয়স আর কুড়ি হবে না।[২৭]

মুক্তিকামী তরুণ প্রজন্মের আত্মত্যাগ ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাতময় পরিস্থিতি মহাশ্বেতার গল্পভাষ্যে এভাবেই রাজনৈতিক ইতিহাসের বিকল্প বয়ান হয়ে ওঠে।

'শরীর' গল্পে নগরের এক কঠিন জীবনে নকশাল আন্দোলনের অভিক্ষেপ বাণীরূপ লাভ করেছে। গল্পের নারী চরিত্রটি বাবা-মা ছাড়া সরকারি শিশুসদনে বড় হয়েছে। কারণ তার শৈশবেই রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের ফাঁসি হয়। আদিবাসী পরিবার থেকে উঠে আসা এই নারী জীবনযুদ্ধে ভিন্নমাত্রায় উপনীত। এক ধনাঢ্য, সরকারপন্থী রাজনৈতিক দলের উচ্চপদাধিকারী নৃপতির রক্ষিতা হিসেবে নগরজীবনের সকল সুবিধা নিয়ে বসবাস করে। জীবনের একপর্বে অনুপম নামে এক বন্ধু ছিলো তার– এখন নকশালকর্মী। নৃপতি ও তার সহযোগীরা মেয়েটির মাধ্যমে অনুপমকে বন্দি করে। মেয়েটি গ্রেফতারের আগে অনুপমের কথা শুনে নৃপতিদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে। 'অনুপম ওকে বলল, কত টাকা পাবি'[২৮] কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকে না– অনুপমের পরিণতি মুক্তির দশকের শত তরুণের মতো হয়েছিলো– এটা নিশ্চিত। অনুশোচনায় মেয়েটি সে রাতেই আটতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। শুধুমাত্র আশ্রিত অনুপমকে দেয়া 'কমিটমেন্ট' রক্ষা করতে না-পেরে এই জীবননাশের ঘটনায় নকশালবাদীদের রাজনৈতিক বিশ্বাসকেই ধারণ করেছে। 'শরীর' ছাড়াও নকশালবাড়ি আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্তি মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরেছেন 'জলসত্র', 'প্রাত্যহিক' গল্পে। 'জলসত্রে'র কুসুমও বারবণিতা, জীবন বাঁচাতে আহত এক নকশালকর্মী ওর ঘরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তার 'বাঁধা-বাবু' কালী শিকদারের

প্ররোচনায় কুসুম ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেই তরুণের কী পরিণতি হয়েছিলো তা গল্পে বর্ণিত না-হলেও আত্মদংশনে জর্জরিত কুসুম সবকিছু ছেড়ে দিয়ে পাপস্খলনের চিরাচরিত পথ বেছে নেয়– জলসত্র দেয়। এই ঘটনার বহুদিনপর যে পুলিশ কর্তকর্তা নকশালকর্মীকে ধরে নিয়েছিলো সেই কর্মকর্তা তৃষ্ণার্ত হয়ে কুসুমের জলসত্রে পানি পান করতে চায়। কুসুম সেদিন পানি না-দিয়ে শ্রেণিঘৃণাটুকু প্রকাশ করে। 'প্রাত্যহিকে'র রূপাও নকশালবাদে দীক্ষা নেয়। নিজ পরিবারে বাবা-মায়ের রাজনীতি সম্পৃক্ততা, স্বাধীনভাবে মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠায় রূপা কখনো নিজেকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি।

৫. যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাত কোনো-না-কোনোভাবে সমাজের সকল স্তরকেই স্পর্শ করে। নকশাল আন্দোলন তেমনি সর্বকূলপ্লাবী একটি আন্দোলন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নকশালবাদীরা অগ্রগামী হয়েছিলো। মহাশ্বেতা দেবীর নকশাল আন্দোলনকেন্দ্রিক গল্পগুলোর মধ্যে 'ধীবর' ও 'পিণ্ডদান' গল্পদুটিকে সমগোত্রীয় বলা চলে। দুটি গল্পেই নকশাল আন্দোলনে সন্তানহারা দুই পিতার হাহাকারচিত্রকে তুলে ধরেছেন লেখক। 'ধীবর' গল্পের জগৎ পেশায় জেলে– জাল আছে তার, কিন্তু এখন মাছের চাষ না হওয়ায় জগৎ-এর কাজে খুব ভাটা পড়েছে। তবে নতুন একটা কাজ পেয়েছে– সেটি হলো ডুবুরির কাজ। রায়দের পুকুর থেকে দারোগার নির্দেশে পানির নিচ থেকে মৃতদেহ উত্তোলন করা। লাশ প্রতি সে সাতটাকা পায়– 'এতো লাশ কেন এই পুকুরে' এমন প্রশ্ন তার মনের মধ্যে জাগে। লোকের মুখে শুনেছে, 'মাঝে মাঝে এ-পাড়া বে-পাড়া থেকে ছেলে নিখোঁজ হয়ে যায়। তখন জগতের ডাক পড়ে। কেননা, নিখোঁজ ছেলেগুলোর শেষ ঠিকানা পুকুরের নিচে।'[২৯] জগতের ছেলে অভয় পড়ালেখা শেষ করেছে– বেকার, বাবার অর্থবিত্তের অভাবে ব্যবসাও শুরু করতে পারছে না। এই সময়টা সত্তরের দশক, মুক্তির দশক। অভয়ের মতো শত শত তরুণ যোগ দেয় নকশাল আন্দোলনে। একদিন নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছয়জনের লাশ তুলে জগত– ইতোমধ্যে অভয়ও নিরুদ্দেশ। পিতা হিসেবে জগত অভয়কে মৃত বলে মেনে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই নিখোঁজ হয় থানার রড় দারোগা। রায়পুকুর থেকে লাশ তোলার জন্য ডাক পড়ে জগতের– পুকুরের তলদেশে দারোগার লাশ সে দেখতে পায়, অভয়ের গামছা দিয়ে বাঁধা। কিন্তু লাশ না তুলে মিথ্যা বলে জগত, পুত্রহারানোর শোক কিছুটা হলেও প্রশমিত হয় জগতের।

'পিণ্ডদানে'র দশরথ পুকুর থেকে কঙ্কাল তুলে বিক্রি করে। তার ছেলে রামলাল আজ দু'বছর ধরে জেলে আছে– পালবাবু তাকে এ কথাই জানিয়েছে। তবে পুত্র রামের জেলবাসের কোনো নির্দিষ্টতা নেই– কবে মুক্তি পাবে তা জানে না দশরথ। পালবাবুর কাছে রামের জেলের খবর পেয়ে দশরথ খুশি, 'জেলখানার পাথর ভেঙে রাম ধীরে ধীরে শাতিতপক্ষ হচ্ছে।'[৩০] দশরথ জেলফেরত ছেলের জন্য প্রতীক্ষা করে, ছেলের বিয়ে-থার কথা ভাবে। খরচাপাতি যোগানোর জন্য কঙ্কাল তোলায় আরো মনোযোগী হয়। কিন্তু আস্ত কঙ্কাল না হলে মহাজনেরা দাম বেশি দিতে চায় না। একদিন প্রতিপদের চাঁদরাতে দশরথ তুলে আনে একটি আস্ত কঙ্কাল, কঙ্কালের গলায় রুপার একটা হার দেখে খুশি দশরথ। দশরথ দেখে: 'একটা পদক। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা গড়েছিলো। দশরথ আঙুল বোলাল। 'রামলাল' লেখাটা এখনো খোদাই করা আছে।'[৩১] দশরথ ছেলের কঙ্কাল চিনতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মনে করে– সে মারা গেলে ছেলের হাতে মুখাগ্নি পাবে না, তার পিণ্ডি

হবে না মনে করে। 'ধীবরে'র জগৎ বা 'পিণ্ডদানে'র দশরথ এরা কেউই রাজনীতির লোক নন, কিন্তু রাজনীতির জটিলতায় দুই পিতাই আজ পুত্রহীন, শোকে কাতর। প্রসঙ্গত—

> আপাত বিবেচনায় ঘটনা বিন্যাসে রাজনীতি নেই, জগতও সে অর্থে রাজনীতি সচেতন নয়, কিন্তু সামান্য দু'একটি ইঙ্গিতে মহাশ্বেতা বুঝিয়ে দেন সমকালের রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।[৩২]

৬. এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন ও প্রতিঘাত যে বাস্তবতা নিয়ে রূপায়িত, তাতে নকশালবাদীদের প্রতি তাঁর সমর্থন-মমত্ববোধ স্পষ্ট। তারচেয়েও বেশি গুরুত্ব সহকারে এসেছে আন্দোলন দমনে রাষ্ট্র বা সরকারের ক্রুর মানসিকতা। শ্রেণিশোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মানুষের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছিলো তার স্বাক্ষী দিচ্ছে কালের ইতিহাস। বাস্তবিক অর্থে নকশাল আন্দোলন সফল হতে পারেনি, তাই বলে 'সার্থক না হওয়া মানেই পথটা ভুল নয়'। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'বড়দিদি'— 'মারাংদাই' মহাশ্বেতা দেবীর কাছে সত্তরের দশকের বাস্তবতা 'আপাত সিদ্ধিতে নয়, প্রচণ্ড অভিঘাতে' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। সেজন্য বাস্তব ও শিল্পের মেলবন্ধনে সৃষ্টি করেছেন তাঁর গল্পবিশ্ব। যেখানে দ্রৌপদী-লখিন্দ, অনুপম-তপন, রামলাল-অভয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি হয়েও একটি মৌল বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে— সেটি হলো শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়ন আর দুর্নীতির কবল থেকে মুক্তির সোপান তৈরি করেছিলো এই আন্দোলন। নির্বাচিত গল্পসমূহের মানুষ-ভূগোল ও তাদের কর্মপন্থা ভিন্ন হলেও রাজনীতির সঙ্গে এরা জড়িত হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বা লেখক মহাশ্বেতা জীবন ও রাজনীতিকে সমান্তরালে বিবেচনা করেন বলেই মহাশ্বেতার গল্পে রাজনীতি কোনো আরোপিত পরিস্থিতি নিয়ে হাজির হয় না, বরং রাজনীতি থাকে জীবনের গভীরতল নির্মাণ ও অনুসন্ধানের অনুষঙ্গ হিসেবে। তাঁর গল্পে রাজনীতি বিশেষত নকশাল আন্দোলন রূপায়িত হয়েছে ইতিহাস ও তন্বিষ্ট অভিজ্ঞতার সূত্রে— সৃজিত হয়েছে রাজনীতির বিকল্প পাঠ। তাই বলা যায়, শিল্পের জন্য শিল্প নয়, বরং রাজনৈতিক বোধ ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর সাহিত্যভুবন— গল্পভুবন।

তথ্যনির্দেশ

১. মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার, 'ওদের গল্পই রক্ত-মাংসের মতো আমার লেখায় স্থান পায়', 'অন্য আলো', *প্রথম আলো* (সম্পাদক: মতিউর রহমান), (ঢাকা: ৫ আগস্ট ২০১৬)
২. অমর ভট্টাচার্য, *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন*, (কলকাতা: নয়া ইশতেহার, ২০০২), পৃ. ৪০
৩. তপোধীর ভট্টাচার্য, *ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন* (কলকাতা: মহাজাতি প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ৩৪
৪. মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৭), ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য
৫. মহাশ্বেতা দেবী, 'অন্য আলো', পূর্বোক্ত
৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'মহাশ্বেতা দেবী: প্রস্তাব ও প্রহেলিকার পর্ব', *তবুও একলব্য* (সম্পাদক: দীপঙ্কর মল্লিক), (কলকাতা: ২০১৮), পৃ. ২৫-২৬
৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৯. মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য
১০. নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতাঃ করুণা প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১৪১
১১. মহাশ্বেতা দেবী, 'দ্রৌপদী', *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩
১২. তদেব, পৃ. ১৬৩
১৩. অমর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
১৪. মহাশ্বেতা দেবী, 'দ্রৌপদী', *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৮০
১৭. নির্মল ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
১৮. হোসনে আরা, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন* (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮), পৃ. ২৩৫
১৯. মহাশ্বেতা দেবী, 'জল', *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১
২০. তদেব, পৃ. ২০৭
২১. মহাশ্বেতা দেবী, *অন্যলেখা* (কলকাতাঃ আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ১২৭
২২. মহাশ্বেতা দেবী, 'এম. ডব্লু. বনাম লখিন্দ', *অগ্নিগর্ভ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬
২৩. তদেব, পৃ. ২১২
২৪. মহাশ্বেতা দেবী, 'বিছন', *প্রতিবাদের গল্প: নকশালবাড়ি* (সম্পাদনাঃ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায়), (কলকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৮), পৃ. ৩৩-৩৪
২৫. অমর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
২৬. মহাশ্বেতা দেবী, 'রং নাম্বার', *মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন*, (কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক স্ট্রাস্ট, ১৯৯৩), পৃ. ৪১
২৭. মহাশ্বেতা দেবী, 'এপার বাংলা ওপার বাংলা', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, খণ্ড ২০ (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮), পৃ. ৩৬৭
২৮. মহাশ্বেতা দেবী, 'শরীর', *মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প* (কলকাতাঃ প্রমা, ১৯৯৩), পৃ. ১২১
২৯. মহাশ্বেতা দেবী, 'ধীবর', *মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৩০. মহাশ্বেতা দেবী, 'পিণ্ডদান, *মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩
৩১. তদেব, পৃ. ১৩৫
৩২. নির্মল ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৪.১২.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২২

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুসলিম স্বর্ণযুগ (৬১০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)

সুফিয়া খাতুন*

Abstract:

In the medical history of the world, the contribution of Muslims was an amazing event. In the past, medical science was confined to a defined territory, knowledge in medicine, in particular, was primarily limited to family circles or to a few people who spoke a specific language and practised medicine as a hereditary profession. When Islamic culture flourished, a sea change occurred in the field of medical science. Diagnosis of various types of diseases was invented through various methods. In written texts, the findings related to medical research were recorded. The Jews and Christians got appointments as royal physicians underthe Muslims rulers. Many of them were also nominated as the private physicians of the Sultans. Big scientific institutions like Bayt-al-Hikmah, Dar-al-Hikmah in the branch of medicine were founded. The scientific works related to medicine and written in Greek and Syrian were translated into Arabic by these institutions. For example, we can mention the works of Galen. The Muslim rulers got these works translated, awarding huge wealth in gold, silver and money. In the period of our discussion, Caliph Abdul Malik, Harun al Rashid founded hospitals for the development of medical science. The Muslim physicians invented the symptoms of various diseases and their procedures of treatment including surgery, which they recorded in their written works. Al kindi, Al Razi and Ibn Sina were among the celebrated Muslim physicians. Even in a modern times, their works on medicine are an invaluable resources. That is why the period under our discussion has been denoted as Golden era of medical science.

চাবিশব্দ: ইসলামি শাসন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রোগ, মুসলিম চিকিৎসক, স্বর্ণযুগ।

ভূমিকা: সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মে মানুষের শরীরে নানারকম রোগব্যাধি ছিল। তাই সাধারণ নিয়মে প্রয়োজনের তাগিদে চিকিৎসার জন্যই মানুষের আগ্রহ জন্মেছিল। মানুষের রোগব্যাধি মোকাবেলার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। প্রাচীন কালে রোগীর চিকিৎসার জন্য মানুষ ঝাড় ও ফুঁক, গাছের লতা-পাতা, গাছ-গাছাড়া ব্যবহার করত। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন মিশরীয়রাই বিজ্ঞানের জন্মদাতা। পারস্যবাসীরা মনে করেন তারাই প্রথম বিজ্ঞানের জন্ম দেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষের হিন্দুরা মনে করেন চিকিৎসা বিজ্ঞান তাদের ভগবানের প্রত্যাদেশ ছিল। ঋগবেদে স্বাস্থ্য, জীবনরক্ষা, ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মাবলির বিষয়ে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম উদ্ভব ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী স্থানে হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। অর্থাৎ, যেখানেই প্রথম সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেখানেই শুরু হয়েছিল জ্যোর্তির্বিদ্যা, গণিত, ব্যাকরণ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চা। মানুষের ব্যবহৃত ধাতুর গ্রিক নাম অনেকগুলোই ব্যবিলনীয় সভ্যতা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। মিশরীয়রা চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে অধিক পারদর্শী ছিল। যার প্রমাণ পিরামিড/ মমি। গ্রিকদের দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। গ্রিকদের চিকিসাশাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে গবেষণা করে আরবরা চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

ঘটিয়েছিলেন। গবেষণার মাধ্যমে মুসলমানগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক পরিবর্তন করেছিলেন। মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান আর শল্য চিকিৎসার (অপারেশনের) কৌশল উন্নতি একটি জাতির প্রতিভার লক্ষণ। মুসলিম চিকিৎসকগণ গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন রোগের উপসর্গ, রোগ নিরাময়ের কৌশল, ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করেন। শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসকগণ বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ এবং নতুন গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। স্বর্ণযুগের বিখ্যাত চিকিৎসকগণ হলেন আল কিন্দি, আল রাজি, ইবনে সিনা প্রমূখ। তাদের রচিত গ্রন্থাবলি আজও চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল্যবান সম্পদ। আলোচ্য সময়ে মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লিখিত চিকিৎসকগণের গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রে আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি: আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানবদেহে নানা রোগের লক্ষণ, রোগ সনাক্তকরণ, অপারেশন, ব্যবস্থাপত্র প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে যেসকল পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেই যাত্রা শুরু করেন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ। তাদের রচিত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্র, অপারেশনের যন্ত্রাদির চিত্র, সেলাইয়ের সুঁচ সুতা আবিষ্কার সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এসকল বিষয় বর্ণনার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনায় প্রাথমিক ও দ্বৈতায়িক উৎসে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করে ইতিহাস গবেষণার বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের বিষয় সম্পর্কে সার্বিকভাবে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে প্রবন্ধটির রচনার উদ্দেশ্য হলো:

১. ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসকগণ নতুন গ্রন্থ রচনা ও অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বর্তমান সময়েও এসব গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

২. তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ চিকিৎসার উন্নয়নে বড় বড় হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে সেই বিষয়টিকে মূল্যায়ন করা।

৩. সর্বোপরি আলোচ্য সময় ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপস্থাপন করাই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যুগের চাহিদানুযায়ী চিকিৎসাপদ্ধতি তেমন উন্নত ছিল না। মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তৎকালীন সময়ে সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মীয়গুরু রোগীর পরিচর্যা ও চিকিৎসা প্রদান করতেন। সপ্তম শতকে আরবের বাইরের খ্রিষ্টান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইয়াহিয়া আন নাহবী চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরবদের অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। কারণ ইসলামের উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থায় অনেক অমুসলিম মুসলিম শাসকদের অধীনে চাকরির সুযোগ পান। ইয়াহিয়া আন নাহবী মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন।[১] তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী এবং এক গির্জার পাদ্রি। অষ্টম শতাব্দীর মুসলিম রসায়নবিদ জাবির বিন হাইয়ান-এর আগমনে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন তৎপরতা দেখা দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে অষ্টম থেকে তেরো শতক পর্যন্ত ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এসময়েই

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে ভারত মহাসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ইসলামের পতাকার উড্ডয়ন সম্ভব হয়েছিল। তৎকালীন সময়ের মুসলিম শাসকগণ যুগোপযোগী শিক্ষার সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন। এসময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জ্যোর্তিবিদ্যা, ভূগোলশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা হতো। মুসলিম মনীষীগণের অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল আল কুরআন এবং হাদিস। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এবং অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এই ধারণার পরিবর্তন করেন। ইসলাম রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা করা পূণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করেছিল।

মুসলমানগণ পবিত্র আল কুরআনকে কেন্দ্র করে মানুষের শরীরবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। এই মহাগ্রন্থে শারীরতত্ত্ববিদ্যা নিয়ে অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন– 'আর নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটে যা আছে (দুধ) তা থেকে পান করাই। আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকার।[২] সুরা আলাকে ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।[৩] সুরা ইনফিতার এ আল্লাহ বলেন যে, 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছেন'।[৪] সুরা সাজদাহতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, 'আর তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর প্রদান করেন'।[৫] চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আল কুরআন এ এরূপ অনেক সুরা রয়েছে যেমন– সুরা কিয়ামাহ ৩৭-৩৯ নং আয়াত, সুরা যুমার আয়াত ৬, সুরা আদ দাহার, আয়াত-২, আন নাজম, আয়াত-৪৫-৪৬, সুরা হজ্জ, আয়াত-৬, সুরা নিসা, আয়াত-৫-৬। এরূপ অনেক আয়াতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইঙ্গিত রয়েছে। হাদিসেও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক ধারণা পাওয়া যায়।

ইসলামের জন্মভূমি মক্কা ও মদিনা ছাড়াও বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, কর্ডোভা, দামেস্ক, জর্ডান প্রভৃতি কেন্দ্রে জ্ঞানচর্চা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু হয়েছিল। এসময়ে চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে শুধু গবেষণা হয়নি, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি, চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলোর ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ইসলামি শাসনের শুরুতে কিছু আরব চিকিৎসক পারস্যে গবেষণা করতে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন তাঈফের অধিবাসী আল হারিস ইবন কালাদাহ [Al Harith Ibn Kaladah (?-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)]। তিনি আরবদের চিকিৎসক হিসেবে ভূষিত হয়েছিলেন। রোগ নিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য তাঁর পুত্র আল নাযর (Al Nadr) খুব বিখ্যাত ছিলেন। মূলত, আল নাযর ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর খালাতো ভাই।[৬] মুসলমানরা যখন পশ্চিম এশিয়া জয় করেছিল সেই সময়ে গ্রিকদের বিজ্ঞানচর্চা ততটা শক্তিশালী ছিল না। তাদের বিজ্ঞান ছিল স্বল্পসংখ্যক সমালোচক এবং বিজ্ঞানচর্চাকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উমাইয়া শাসনাধীনে রাজসভার চিকিৎসকগণ ছিলেন একই দলভুক্ত। ঐসকল চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন মুয়াবিয়ার ব্যক্তিগত খ্রিষ্টান চিকিৎসক ইবন উসাল [Ibn Uthal (আনু: ৬৬৫-৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ)]। এছাড়াও ছিলেন আল হাজ্জাজের গ্রিক চিকিৎসক তায়াযুক (Tayadhuq)। আল বসরার অধিবাসী ইহুদি চিকিৎসক ছিলেন মাসারজাওয়াইহ [Masarjawayh (৭৭৭-৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)]। তিনি মারওয়ান ইবন আল হাকামের সময়ে খুব বিখ্যাত ছিলেন কারণ তিনিই প্রথম কিছু ঔষধের সিরীয় সূত্র আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।[৭] ঔষধের মাধ্যমে মানুষের রোগমুক্ত করার ক্ষেত্রে আরবরা এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। তারাই প্রথম ঔষধ প্রস্তুত ও সংরক্ষণবিদ্যা শিক্ষার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেছিল। ঔষধের দোকানও তারাই খুলেছিল এবং একই সময়ে ঔষধ প্রস্তুত করার প্রথম গ্রন্থ লেখা হয়েছিল।[৮] ঐসময়ে বাগদাদের ৮৬০ জন চিকিৎসকের একটি দল গড়ে তুলেছিলেন আল মুকতাদিরের উজির আলী ইবনে ঈসা। তারা ঔষধ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে মানুষের চিকিৎসা করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলতেন।

মুসলিমদের জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থ সংরক্ষণ পদ্ধতি: প্রাচীন সভ্যতাগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গ্রিক ও রোমান সভ্যতাকে জ্ঞানের দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করেছিল সুমেরীয়, ব্যবিলনীয় এবং মিশরীয় সভ্যতা। রোমান সভ্যতার পতনের ফলে পূর্বের জ্ঞানচর্চার সেই ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটে এবং মুসলিমরা ঐ স্থান দখল করেছিল। প্রায় সকল মুসলিম শাসকগণই বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং সংগ্রহশালা স্থাপনের পাশাপাশি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। তাদের গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছিল গ্রিক, রোমান, চৈনিক সভ্যতার মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলি। এসব গ্রন্থাবলি জ্ঞানের সমারোহ ও শোভা বর্ধন করেছিল।

আব্বাসীয় শাসন ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। এসময়ে শাসকগোষ্ঠী বড় বড় পণ্ডিতগণকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে সকল বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। খলিফা হারুন আল রশিদ এবং তাঁর পরবর্তী শাসকগণ বিশেষ করে খলিফা আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল সংখ্যক অনুবাদক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদ করেন। এই সময়ে বায়তুল হিকমাহ[৯] প্রতিষ্ঠা ছিল গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটাই পরবর্তীসময়ে বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। অ্যাডেসা, নিসিবিস, গন্দেশাপুরে পর্যায়ক্রমে অনুবাদের স্কুল গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শাসকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরিলক্ষিত হয় যে সম্রাট জাস্টিনিয়াস মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাকাডেমি অফ এথেন্স বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে দেখা যায় অনেক গ্রিক পণ্ডিত বিভিন্ন স্থানে চলে যান। ইসলামের সম্প্রসারণে অনেক পণ্ডিত বাগদাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অভিবাসী পণ্ডিতগণ গ্রিক ভাষায় চিকিৎসকগণের চিকিৎসা পদ্ধতি, শরীরবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করেন। 'হুসাইন ইবনে ইসহাক আল ইবাদি' একাই গ্যালেনের ১২৯টি মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেন।[১০] ডায়াস্কোরাইডসের 'ডি মেটেরিয়া মেডিকা' অনুবাদ আরবিতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নবম শতকে। উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ উৎস থেকে সংগৃহীত প্রায় ৫০০ উপাদানের বেশি ঔষধিগুণসহ এগুলোর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। এটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।[১১] মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঔষধগুলো নিয়ে মুসলিম চিকিৎসকগণ গবেষণা করেছিলেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে যে আরবি অনুবাদ প্রকাশিত হয় সেখানে মুসলিম গবেষেকদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান সংযুক্ত হয়ে উপাদানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০০। খলিফা আল মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.) ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমাহ (Bayt-al Hikmah) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১২] আল হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.) ১০০5 খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দার-আল- হিকমাহ (Dar-al-Hikmah) বা দার-আল ইলম (Dar-al Iim) বা বিজ্ঞানের গৃহ।[১৩] এসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হতো। আল হাকিমের সময়ে শুধুমাত্র চোখের চিকিৎসার ওপর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। গ্রন্থ দুটি হলো, বসরার অধিবাসী ইবন-আল-হায়সাম (Ibn-al-Haytham) রচিত 'কিতাব-আল মানাযির' (Kitab-al-Manazir) এবং আম্মার ইবনে আলী আল মাওসিলি (Ammar Ibn Ali Mawsili) এর 'আল-মুন্তাখাব ফী ইলাজ-আল-আয়ন' (Al Muntakhab fi Ilaj al Ayn)। আম্মার প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে, একটি ফাঁপা শোষণ নলের সাহায্যে

চোখের ছানির সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচার করা যায়।[১৪] চোখের অপারেশনের তাঁর এই আবিষ্কার ছিল তৎকালীন সময়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ইবনে সিনাও চোখের ছানি অপারেশনের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন।

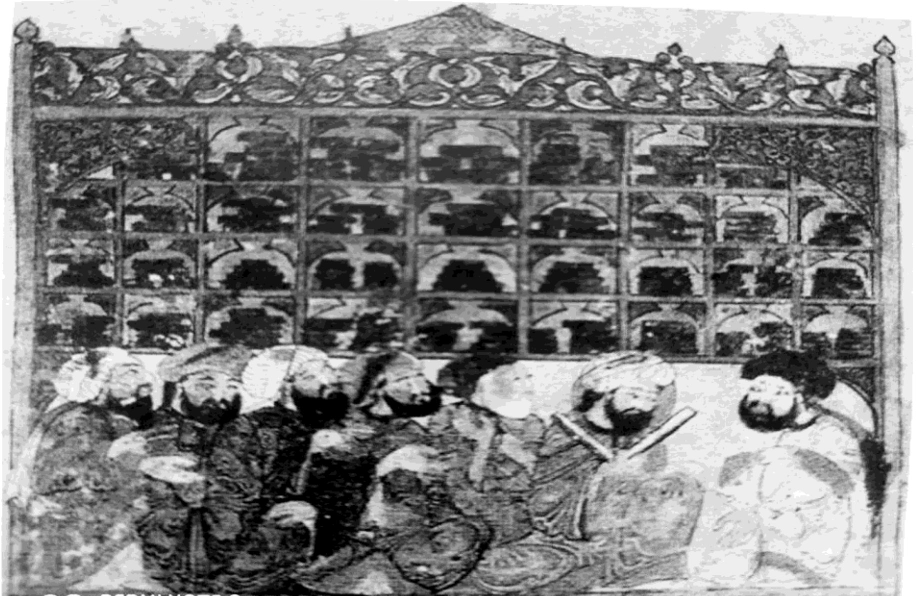

বাগদাদের পাঠাগারে পাঠরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (*চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা*, পৃ. ৫৯)

মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা: ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রোগীর সেবা এবং দেখাশোনা করতেন ধর্মযাজকরা। প্রতিটি রোগী আশ্রয় নিতো ধর্মীয় উপাসনালয়ে অর্থাৎ উপাসনালয় ছিল সেবাকেন্দ্র। মুসলিমগণ প্রথম চিকিৎসালয়কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। ঐসব চিকিৎসালয়কে বিমারিস্তানকে বা দাওয়াখানা হিসেবে পরিচিত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিদের সেবার জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় আহত সাহাবিদেরকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল 'রুফাইদা আল আসলামিয়ার' তাবুতে।[১৫] এ অভিজ্ঞতা থেকেই মুসলিম শাসকগণ স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের জন্য মুসলিমরা প্রথম বিমারিস্তান বা হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক দামেস্কে প্রথম একটি হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন। এই হাসপাতালে অন্ধ রোগীদের সেবা দেয়া হতো। এছাড়াও এখানে কুষ্ঠ রোগীদের সেবা দেওয়া হতো। যেসব চিকিৎসক কুষ্ঠ রোগীদের সেবা প্রদান করতেন, ঐসব চিকিৎসকদের প্রদান করা হতো উচ্চহারে বেতনভাতা ও অন্যান্য সুবিধা। রোগীদের পরিবারের ভরনপোষণের জন্যও ছিল সবরকম ভাতার ব্যবস্থা। খলিফা আল ওয়ালিদ কুষ্ঠরোগীর জন্য আলাদা হাসপাতাল তৈরি করেন। অন্যদিকে খলিফা দ্বিতীয় ওমর আলেকজান্দ্রিয়ার চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থান পরিবর্তন করেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো এন্টিয়ক (Antioch) ও হাররানে (Harran) স্থাপন করেছিলেন।[১৬] ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল মনসুর জটিল পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হলে জুন্দি শাপুর[১৭] হাসপাতালের

চিকিৎসক ইবনে বখতিসু খলিফাকে সুস্থ করেছিলেন। পরবর্তী কালে বখতিসু মনসুরের রাজসভার চিকিৎসক নির্বাচিত হয়েছিলেন। নবম শতকে খলিফা হারুন আল রশিদ সর্বপ্রথম সাধারণ জনগণের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম দেশগুলোতে চৌত্রিশটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল।[১৮] আলোচ্য সময়ে একই বংশের লোক প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে রাজসভার মূল চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করতেন। তেমনি একটি বিশিষ্ট পরিবারের শীর্ষব্যক্তি ছিলেন ইবন বখতিসু (Ibn Bakhtishu)। চিকিৎসক জুর্জিস এর পুত্র বখতিসু খলিফা হারুন আল রশিদের সময়ে বাগদাদে হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ইবনে তুলুনের সময়ে ৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি হাসপাতাল।

পারস্য বা বর্তমান ইরানের গন্দেশাপুরের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত চিকিৎসকগণ বাগদাদে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলেন। তৎকালে হাসপাতালগুলো তৈরি হতো লোকালয় থেকে অনেকটাই দূরে, পাহাড়ের ধারে কিংবা নদীর তীরে কারণ লোকালয় থেকে দূরত্ব বেশি থাকায় রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম ছিল। অন্যদিকে রোগীরাও প্রচুর আলো বাতাস পাওয়ার সুযোগ পেতো। এতে রোগ নিরাময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক আলী রাজীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল বাগদাদে একটি বড় হাসপাতাল তৈরির স্থান নির্বাচন করার জন্য। আল রাজী স্থান নির্বাচনের জন্য এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক টুকরা মাংস বাগদাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। কিছু দিন পর তিনি মাংসগুলো পরীক্ষা করে দেখেন কোন অঞ্চলের মাংসে কম পচন ধরেছে। বাগদাদের নির্মল ও পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ঐ স্থানেই হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়।[১৯] একইভাবে বাগদাদে এবং সমগ্র মুসলিম ভূ-খণ্ডে অনেক হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাসপাতালগুলো হলো– বাগদাদের আদুদি, কায়রোর আল ফুস্তাত, আল মানসুরি, দামেস্কের আল নুরি ইত্যাদি। এছাড়া মোবাইল বা ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ইসলামের আবির্ভাবের শুরু থেকেই গড়ে উঠেছিল।[২০] পর্যায়ক্রমে হাসপাতালের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান নগরের বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় জনগণের জন্য চিকিৎসাসেবা পৌঁছানোর জন্য ঔষধ, খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা হতো। শাসকগণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো এসব ভ্রাম্যমান হাসপাতাল। সেলজুক সুলতানগণ যে হাসপাতাল গড়ে তোলেন সেই হাসপাতালের পণ্য পরিবহনের জন্য ৪০টির বেশি উটের প্রয়োজন পড়ত।[২১] মুসলিম শাসনাধীনে প্রতিষ্ঠিত এসব হাসপাতালে নারীদের আলাদা ওয়ার্ড ছিল এবং প্রতিটি ওয়ার্ডেই নিজস্ব ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও বেশকিছু হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাগার ছিল।[২২] স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২-৯৬১ খ্রি.) এর সময় চিকিৎসক আবুল কাসেম জাহরাভী (৯৩৬-১০১০ খ্রি.) মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন ছিলেন।[২৩] সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী ১১৫৬-১১৭৪ খ্রি. পর্যন্ত দামেস্ক শাসন করেছিলেন এবং এই সময়ে তিনি দামেস্কে একটি বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২৪] মিশরের মামলুক সুলতান কালাউন কায়রোতে একটি বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম ছিল 'আল মারিস্তান আল মানসুরি'। যেখানে প্রত্যেক রোগের আলাদা বিভাগ ছিল এবং সেই হাসপাতালের নিজস্ব পরীক্ষাগার, ভোজনশালা, রান্নাঘর, শৌচাগার ও গুদাম ছিল। গরিব রোগীর চিকিৎসার জন্য সুলতান কালাউন হাসপাতাল তহবিলে বার্ষিক দশ লক্ষ দিরহাম জমানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৫] শাসকগণ প্রজাসাধারণের সুচিকিৎসার জন্য সবধরণের সুবিধা প্রদান করতেন।

হাসপাতালগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন রোগের জন্য আলাদা কক্ষ ছিল। ছোঁয়াচে রোগের রোগীদের জন্য আলাদা চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য আলাদা কক্ষ ছিল। এছাড়া নারী পুরুষেরও আলাদা কক্ষ ছিল। এসব ছিল সেই সময়ের হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন সময়ে হাসপাতাল নিরাপদ রাখার জন্য অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার করা হতো অ্যালকোহল। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল পদ্ধতিই ছিল যুগোপযোগী ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন। যেমন, মেডিকেল কলেজের ন্যায় বিমারিস্তানগুলোতে হাত কলমে শিক্ষা দেয়া হতো। মেধা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল। আলোচ্য সময়ে বিমারিস্তানে প্রচলিত নিয়ম কানুন আধুনিক হাসপাতালে চালু রয়েছে।

অষ্টম শতকের বিখ্যাত মুসলিম রসায়নবিদ ছিলেন জাবির বিন হাইয়ান ইবনে নাদিম, আল বাতরিক। এছাড়াও ছিলেন আলী ইবনে রাব্বান, আবুল হাসান আহমদ, আত তাবারী, হুসইন ইবনে ইসহাক, সাবেত বিন কুরা, সিনান বিন সাবেত, হাসান ইবনে নুহ, আবু মুনসুর মুয়াফাক, কাশেম ফালাক, ইবনুল জাজয়ার প্রমখু । গ্যালেন রোমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর ৫৯টি গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। ঐগ্রন্থগুলোর মধ্যে ষোলোটি গ্রন্থই চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়। গ্যালেন ও অ্যারিস্টটলের হাতে মানুষের শারীরবিদ্যার প্রাথমিক সকল তথ্য গড়ে উঠেছিল। গ্যালেন যেসব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তা ছিল বানর, ভেড়া, ষাঁড়, কুকুরের ব্যবচ্ছেদের ফল। অর্থাৎ, এসব পশুর দেহকে পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য খণ্ড খণ্ড করে আলাদা করা হয়েছিল। এই কারণে গ্যালেনের প্রস্তাব করা শারীরতত্ত্বের সাথে মানুষের শরীরের ব্যাপক তফাত ছিল। সাধারণত মানুষের দেহের পেশির গঠন, অস্থিসংখ্যা ও অস্থিসংযোগ, রক্তসংবহনতন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রচলন প্রভৃতি প্রক্রিয়াসহ সকলক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ পর্যবেক্ষণের কারণে মানবদেহের সকল রোগের সঠিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হতো না।[২৬] আলোচিত সময়ের মুসলিম চিকিৎসক ও গবেষকরা চিকিৎসাক্ষেত্রে বা মানব শারীরবিদ্যার এই ঘাটতি পূরণ করেন। এসব ভ্রান্তি নিরসনেরজন্য মানবদেহ ব্যবহার দ্বারাই শারীরতত্ত্বের নানা প্রস্তাব দেন। আল রাজি, ইবনে রুশদ, ইবনুন নাফিস প্রমখু চিকিৎসকগণ মানুষের শারীরতত্ত্ব নিয়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিখ্যাত আব্বাসীয় খলিফা আল নাসিরের অনুরোধে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে চিকিৎসক আব্দুল লতিফ আল বাগদাদি মিসর পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন। একই সময়ে মিসরে দুর্ভিক্ষ চলছিল। ফলে চারদিকে শুধু কঙ্কাল আর শবদেহের ছড়াছড়ি ছিল। বাগদাদি সেই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং গ্যালেনের শারীরতত্ত্বের অনেক ভুল ধারণা নিরসন করেন। চিকিৎসক বাগদাদি প্রমাণ করেছিলেন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের চোয়ালের হাড় দুটি নয় একটিই হাড় রয়েছে।[২৭] উইলিয়াম হার্ভের তত্ত্বের ৪০০ বছর আগেই ইবনুল নাফিস হৃদযন্ত্র রক্ত সংবহনতন্ত্রের নির্ভুল তথ্য তুলে ধরেছেন। মানবদেহের অস্থিমজ্জা, মুত্রযন্ত্রের গঠন ও রেচনপ্রণালি, চক্ষুবিদ্যা বিষয়ে মুসলিম চিকিৎসকগণের রচিত গ্রন্থাবলি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যবিষয় ছিল। মুসলিম চিকিৎসকগণের ব্যবহৃত অনেক শব্দকে সময়ের পরিক্রমায় সুপরিকল্পিতভাবে বাদ দিয়ে ল্যাটিন শব্দ সংযুক্ত করা হয়। একই সাথে ম্লান হয়ে যায় এসব শব্দের সাথে মিশে থাকা মুসলিম চিকিৎসকদের নাম। তবে এতো পরিকল্পনা স্বত্ত্বেও কিছু আরবি শব্দ আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শারীরতত্ত্ব গ্রন্থে জ্বল জ্বল করছে। শব্দগুলো হলো nucha, basilica, retina, saphena, sesamoid[২৮] ইত্যাদি।

মুসলিম চিকিৎসকগণ: মুসলিম চিকিৎসকগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক বিষয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। তারা যেসব গবেষণা করেছিলেন তখন থেকে অদ্যাবধি বিশ্ববাসী সেসব সূত্রের সুফল ভোগ করছে।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিন্দি (৮০০-৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ): আল কিন্দি আরবের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তিনি ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কুফাতে জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হলেও তাঁর রচিত ২৭০টি গ্রন্থের মধ্যে ২৭টি গ্রন্থ চিকিৎসা সংক্রান্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে দুটি গ্রন্থ তৎকালে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। প্রথম গ্রন্থটির নাম 'কিতাব ফি কিমিয়া আল ইতর ওয়াত তাসিদাত'। দ্বিতীয়টি হলো 'আকরাবাদিন'।[২৯] তৎকালীন সময়ের চাহিদানুযায়ী তেল, মলম, আতর তৈরির কৌশল সম্পর্কে জানা যায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ থেকে। দ্বিতীয় গ্রন্থে রয়েছে বিভিন্ন রোগের বর্ণনা এবং সে সব রোগের ব্যবস্থাপত্র। তাঁর বর্ণিত যেসব রোগ রয়েছে সেগুলো হলো- সর্দি, বাত রোগ, দুর্বলতা, যকৃৎ ও পেটের রোগ, আগুনে পোড়ার ঔষধ প্রভৃতি। বর্তমানকালেও এসব রোগের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্রে তাঁর বর্ণিত ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র সেসব ঔষধের কাঁচামাল (মেটারিয়ালস) উন্নত হয়েছে।

আবু জায়েদ হুনায়ুন বিন ইসহাক আল ইবাদি (৮০৯-৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ): হুনাইন ইবনে ইসহাক ছিলেন স্বর্ণযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক। আরবগণ কাছে তিনি ছিলেন অনুবাদকদের শেখ। গ্যালেনের হিপোক্রেটিস এবং ডায়োসকরিডিসের বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই তিনি গ্রিক থেকে সিরীয় এবং সিরীয় থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর দক্ষতার জন্য তিনি প্রচুর পারিশ্রমিক পেতেন। হুনায়ুনের দক্ষতার একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন ফিলিপস কে হিট্টি। তিনি বলেন যে, ইবনে শাকিরের পুত্রদের কাছে চাকরি করার সময় হুনায়ুন এবং অন্য অনুবাদকগণ মাসে ৫০০ দিনার প্রায় ২৫০ পাউণ্ড বেতন পেতেন। অন্যদিকে খলিফা আল মামুন তাকে অনুবাদ করা গ্রন্থটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ প্রদান করেছিলেন।[৩০] হুনায়ুন খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ সৎ এবং একনিষ্ঠ চিকিৎসক। খলিফা তাঁর সততা পরীক্ষা করার জন্য বিষ তৈরি করতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। এজন্য তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ডের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে কারাগার থেকে এনে খুনেরও হুমকি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু হুনায়ুন বলেছিলেন I have skill only in what is beneficial, and have studied naught else.[৩১] পরবর্তী কালে খলিফা তাঁর কাছে জানতে চান শাসকের নির্দেশ স্বত্ত্বেও কেন তিনি বিষ তৈরি করলেন না ? জবাবে তিনি বলেছিলেন–

> আমার সামনে দুটি জিনিস রয়েছে একটি ধর্ম অন্যটি আমার পেশা। আমার ধর্ম বলেছে শত্রুর সাথে সদাচরণ করতে, ঠিক যেমন বন্ধুর সাথে আচরণ করি। অন্যদিকে আমার পেশা শুধুমাত্র মানবসমাজের উপকারের জন্যই উৎসর্গীকৃত। শুধুমাত্র রোগ উপশম এবং মুক্তিই আমার কাম্য। তাছাড়া প্রত্যেক চিকিৎসককেই শপথ নিতে হয় সে কখনো কারো বিষাক্ত ঔষধ দেবে না।[৩২]

চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শাসকের নির্দেশ সত্ত্বেও শত্রুর জন্য বিষ তৈরি করেননি। শুধুমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন।

আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ): মুসলিম চিকিৎসকদের মধ্যে যার নাম বিশেষভাবেই স্মরণ করতে হয় তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক আল রাজি। তাঁর পুরো নাম আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজি। তিনি শুধু চিকিৎসাক্ষেত্রেই বিখ্যাত ছিলেন না,

একাধারে ছিলেন রসায়নবিদ, গণিতবিদ ও দার্শনিক। প্রাথমিক জীবনে তিনি গ্যালেনের শারীরতত্ত্ব অনুসরণ করলেও গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং গ্যালেনের বেশ কিছু তত্ত্ব তিনি ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন।

THE OLDEST REPRESENTATION OF THE CAESAREAN SECTION
From al-Bīrūni, *al-Āthār al-Bāqiyah*, MS. dated A.H. 707 (1307–8), in the Library of the University of Edinburgh

P.K Hitti, *History of the Arabs*, P. 407

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রদর্শক গ্রিকরা পারদকে খুব বিষাক্ত মনে করত কিন্তু আল রাজিই প্রথম পারদের মলম করেন এবং বানরের ওপর এর পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দুশো বই রচনা করেন যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল কিতাব আল হাবি'। গ্রন্থটি ২৩ খণ্ডে লিখিত। এই গ্রন্থে স্ত্রীরোগ, প্রসূতিবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি চোখের রোগের শল্যচিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন।[৩৩] এই গ্রন্থের নির্দেশনা যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তিনি মোট ৩৫ বছর চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আল রাজির অস্ত্রোপচার পদ্ধতির বিশ্লেষণ গ্রিকদের থেকেও উন্নত ছিল। আধুনিক যুগে রোগীদের অজ্ঞান করতে অ্যানেস্থেসিয়ার প্রয়োজন হয় কিন্তু তেরো শত বছর পূর্বে অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য রাজি আফিম ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তিনিই প্রথম পেডিয়াট্রিককে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে গুটি বসন্ত ও হাম রোগকে একই রোগ ভাবা হতো। আল রাজি তাঁর গবেষণায় দুটো রোগকে আলাদা রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরো একটি বিষয় হলো গুটি বসন্তের রোগী সঠিক চিকিৎসায় বেঁচে ফিরলে ঐ রোগীর দ্বিতীয়বার সে রোগ হয় না। আল রাজির এই নিরীক্ষণ বা প্রমাণ বহু বছর পর গুটি বসন্তের টিকা তৈরির পথ প্রশস্ত করেছিল।[৩৪] তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি গরিব রোগীদের চিকিৎসার বিনিময়ে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। সাধারণ মানুষের জীবনধারণ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তিনি অনেক উপদেশ সংবলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত এই গ্রন্থটির নাম ছিল 'মান লা ইয়াহদুরুহু আল তাব্বি'। রোগীর রোগ নির্ণয়, ঔষধ, ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তাঁর প্রদত্ত উপদেশ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আজও প্রচলিত রয়েছে।

আল আখাওইনি বোখারি (?-৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ): বর্তমান ইরানের বা পারস্যের চিকিৎসক ছিলেন আল আখাওইনি। তিনি ফারসি ভাষায় তিন খণ্ডের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম

'হিদায়াত আল মুতাল্লেমনি ফি আল তীবা।' বোখারির মূল্যবান গ্রন্থটি দুশো অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এটি তৎকালীন সময়ের শারীরতত্ত্ব ও মেডিসিনের অতুলনীয় গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। আখাওইনির গ্রন্থে মানুষের চোখ এবং স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের যে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে তা অতুলনীয়। তাঁর বিস্তারিত বিবরণ থেকে চিকিৎসকগণ অনুমান করেন যে, তিনি গবেষণার প্রয়োজনে মানুষের শবদেহকে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। বোখারির এই গবেষণা পদ্ধতি ছিল তৎকালীন সময়ের বিচারে অত্যাধুনিক গবেষণা এবং অভিনব উদ্যোগ। ইতঃপূর্বে মানসিক রোগকে সাধারণত রোগ বলে মনে করা হতো না। সবাই এটাকে মানবদেহে শয়তানের প্রবেশ বলে মনে করত।[৩৫] বোখারি মানসিক রোগকে রোগ হিসেবে প্রমাণ করেন এবং এর চিকিৎসার পথে অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রমাণের মাধ্যমে মানসিক রোগ সবার কাছে রোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো হওয়া সম্ভব।

আলী ইবনে আব্বাস (?–৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ): চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে আলী ইবনে আব্বাস মাজুসি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ও গবেষক। পারস্যে জন্মগ্রহণকারী আব্বাস ছিলেন বাগদাদের আল আদুদি হাসপাতালের চিকিৎসক। বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর রচিত 'কিতাব আল মালিকি' অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে পুর্বের তথ্যের সাথে তাঁর দেয়া তথ্য ছিল নতুন সংযোজন। আব্বাসের গ্রন্থটি দুটি ভাগে ভাগ করে রচিত হয়েছে। প্রথম ভাগ ছিল তাত্ত্বিক, দ্বিতীয় ভাগ ছিল ব্যবহারিক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারাবাহিক গবেষণায় পরবর্তী চিকিৎসক ও গবেষকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে তাঁর প্রদত্ত এই কাঠামো অনুসরণ করেন। তাঁর গবেষণা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছিল। আলী আব্বাস উল্লেখ করেন যে, জীবনে ভালো থাকার জন্য প্রয়োজন মনের আনন্দ ও সন্তুষ্টি; অহেতুক দুঃখবোধ, ভয়, উদ্বেগ মানুষের অসুস্থতার কারণ হতে পারে।[৩৬] পূর্বের গবেষক ও চিকিৎসকগণের সাথে তাঁর গবেষণার পার্থক্য হলো তিনি দেহের সুস্থতার জন্য মনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন দেহের সুস্থতার সাথে মনের সুস্থতার একটা সংযোগ রয়েছে।

ইবনে সিনা (৯৮০–১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ): চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইবনে সিনার নাম একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁর পুরো নাম আবু আলি হোসাইন ইবনে সিনা। তিনি একাধারে চিকিৎসক, গণিতবিদ, দার্শনিক ও জ্যোর্তির্বিদ। তাঁর বিচরণ ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায়। ইবনে সিনা বুখারার (বর্তমানের উজবেকিস্তান) আফসানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তোরো বছর বয়স থেকেই তিনি চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি চিকিৎসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর গ্রন্থের নাম 'কানুন ফিততিব' (Qanun-fit Tibb)। জন হপকিন্স হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ড. উইলিয়াম অসলার ইবনে সিনার চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন- The most famous medical book ever written. উইলিয়াম অসলার কানুনকে মেডিকেলের বাইবেল হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্যে তিনি তাঁর নামের ল্যাটিন প্রতিশব্দ আভিসিনা (Avicinna) বা হিব্রু প্রতিশব্দ আভেনসিনা (Aven Sina) নামে অধিক পরিচিত।[৩৭] তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছর ধরে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজসহ ইউরোপের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠিত হয়। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে Danial Le Clerc (1652-1728 A.D) Histoire La Meicine গ্রন্থে বলেন যে-ইবনে সিনা একজন বুদ্ধিদীপ্ত বিস্ময়। তাঁর মতো বহুমূল্যবান, তাৎক্ষণিক ও প্রশস্ত বুদ্ধির উদাহরণ আগে কখনো দেখা যায়নি। যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে এতো

বিস্ময়কর ও অনিবার্য কার্যকলাপ দ্বারা প্রসারিত করেছেন।[৩৮] মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের কারণে ঔষধ সেবন করা সম্পর্কে তিনি নতুন তথ্য দেন। তিনি বলেন– মেডিসিন হলো বিজ্ঞান যেখানে আমরা স্বাস্থ্যের বিভিন্ন অবস্থা জানতে পারি। যখন স্বাস্থ্য ভালো থাকে না বা স্বাস্থ্য খারাপ হয়, যে উপায়গুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ঔষধ সেবনের ফলে তখনও স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৩৯] অন্যদিকে তিনি বলেন মানুষের শরীর অসুস্থ হওয়ার পেছনে ঋতু পরিবর্তন দায়ী থাকে। তাঁর বর্ণনায় প্রথম জানা যায় শীতের কুয়াশা মানুষের মনে প্রভাব ফেলে।[৪০] তৎকালীন বুখারার সুলতান দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর চিকিৎসায় রোগ মুক্ত হয়েছিল। ফলে তিনি রাজদরবারের পাঠাগারে গবেষণার সুযোগ পান। উল্লেখ্য যে প্রাচীনকালের বিখ্যাত লেখকের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সেখানে সংরক্ষিত ছিল। রাজ পাঠাগোরে গবেষণায় ইবনে সিনার নিজস্ব জ্ঞানের সাথে নতুন নতুন জ্ঞান সংযুক্ত হয়েছিল। হৃদস্পন্দরের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে রোগের প্রকারভেদ নির্ণয়ের জন্য বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন কানুন গ্রন্থে। তাঁর লিখিত গ্রন্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের পথিকৃত হিসেবে কাজ করেছে। কিডনির জটিল সমস্ত রোগের সুলভ পথ্য ও শল্যচিকিৎসা (অপারেশনের) পদ্ধতি উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। চোখের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ছানি অপারেশনের মূল্যবান তথ্য তিনিই প্রদান করেন। মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সামগ্রিক পদ্ধতি তিনি তুলে ধরেছেন তা অনুকরণীয়।

আল জাহরাবি (৯৩৬-১০১৩ খ্রিষ্টাব্দ): স্বর্ণযুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরেক নক্ষত্র আল জাহরাবির পুরো নাম আবুল কাসিম খালাফ ইবনে আল আব্বাস আল জাহরাবি। কর্ডোভা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হাকামের রাজদরবারের চিকিৎসক।[৪১] তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'আল তসরীফ লিমান আজাজ আল তাআলিফ'। এই গ্রন্থে ক্ষতস্থানকে পোড়ানো, মূত্রাশয়ের পাথরকে নষ্ট করে দেয়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য শবব্যবচ্ছেদ ও জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি নতুন ধারণাগুলোর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪২] তাই এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থ। তাঁর গ্রন্থে অনেকগুলো বিষয় একসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে মেডিসিন, প্যাথোলজি, অর্থোপেডিকস্, দন্তচিকিৎসা, পেডিয়াট্রিকস প্রভৃতি বিষয় তাঁর গ্রন্থে সংযুক্ত করেছেন। যদিও গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে তিনি ৫০ বছরেরও বেশি সময় ব্যয় করেন। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– তিনি তাঁর গ্রন্থের শল্যচিকিৎসা বিষয়ক খণ্ডে ২০০ যন্ত্রপাতির নকশার প্রস্তাব দিয়েছেন। অন্য কোনো চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থে যা পরলক্ষিত হয় না। এই যন্ত্রগুলোর মধ্যে ২৬টি অত্যাধুনিক অভিনব যন্ত্র রয়েছে। যেমন– ফরসেপস, স্কালপেল, রিট্রাক্টর, কুরেট, স্পেকুলা, সার্জিক্যাল চামচ, হুক, রড ইত্যাদি। এসব যন্ত্র ছাড়া অপারেশন করা অসম্ভব। তাঁর বর্ণনা ও বিশ্লেষণের পর এসব যন্ত্রের সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, চোখের ছানি অপারেশন, মানুষের শরীরের ভাঙা হাড় বের করা, গাইনি চিকিৎসায় জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করা, মৃত ভ্রূণকে বের করা, মানুষের দাঁত তোলা, দাঁত পরিষ্কার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এসব যন্ত্র ব্যবহার করা হতো।[৪৩] তাঁর নকশা আধুনিক যুগেও ব্যবহার করা হয়।

বিশিষ্ট চিকিৎসক জাহরাবি অপারেশনের পর সেলাইয়ের ব্যবহারের জন্য তৈরি করেন নতুন ধরনের সুই। এছাড়াও সুতা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ভেড়ার ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সুতা।[৪৪] যুগে যুগে তাঁর সেই মূল্যবান গবেষণালব্ধ সুতাই অপারেশন করা রোগীর ক্ষত স্থান সেলাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সমসাময়িক সময়ে গবেষকগণ বর্ণনা করেন যে, কোনো কৃত্রিম সুতা মানবদেহ গ্রহণ করতে পারে

না। তাই এই সুতাই নিরাপদ। আল জাহরাবি তাঁর জীবনের সম্পন্ন সময়ই কর্ডোভায় কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি নিজে শিক্ষা নিয়েছেন, ছাত্রদের শিখিয়েছেন এবং মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছেন।

ইবনুল হায়সাম (৯৬৫-১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ): ইবনুল হায়সামের পুরো নাম আবু আলি হাসান ইবনুল হায়সাম। তিনি ইরাকের বসরা নগরীর এক আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে চিকিৎসক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে আলোকবিদ্যার জনক বলা হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে আলো বস্তু হতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসে বলেই বস্তুটি দৃশ্যমান হয়। তাঁর গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুনমাত্রা সংযুক্ত করেছিল। মানুষের চোখের ভেতরের গোল অংশের বা অক্ষিগোলকের গঠন এবং মস্তিকের সাথে চোখের সংযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কিতাব আল মানাজির'।[৪৫] তাঁর এসব বিবরণ ছিল অভিনব এবং পথপ্রদর্শী। ইতোঃপূর্বে পাওয়া দলিল দস্তাবেজের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে হায়সামের তৈরি বিবরণই সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ। মোটকথা চক্ষু চিকিৎসায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

ইবনে জুহর (১০৯৪-১১৬২ খ্রিষ্টাব্দ): চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের অন্যতম চিকিৎসক ছিলেন ইবনে জুহর। স্পেনের সেভিল নগরে জন্মগ্রহণকারী আরব চিকিৎসক ইবনে জহুর এর পুরো নাম আবু মারোয়ান আব্দাল মালিক ইবনে জুহর। মুয়াহ্হিদ বংশের খলিফা আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মনসুর তাকে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অনন্য কীর্তি ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল তাইসির'। যা শল্যচিকিৎসার এক যুগান্তকারী প্রকাশনা। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের অপারেশনের পূর্বে তিনি অন্য প্রাণীর দেহে পরীক্ষা করে নিতেন। জুহরের বিশেষ দিক হলো তিনি শ্বাসযন্ত্রের অপারেশন করা সম্ভব বলে প্রমাণ করেছিলেন। তাই মানুষের শ্বাসযন্ত্রের অপারেশন করার উদ্ভাবক তিনিই। এজন্যই তাঁকে পাইওনিয়ার হিসেবে স্মরণ করা হয়। এছাড়াও তিনি সর্বপ্রথম হাড়ের অনুভূতি এবং খোস পাঁচড়ার বর্ণনা করেছেন।[৪৬] তিনি শল্যচিকিৎসাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলাদা বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইবনুল নাফিস (১২১৩-১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দ): চিকিৎসক ইবনুল নাফিস এর পুরো নাম আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলি ইবনে আবুল হাজম ইবনুল নাফিস আল কোরায়েশি আল দামেস্কি। দামেস্কের আরব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় কাটান মিসরে। ঊনত্রিশ বছর বয়স থেকে তিনি তাঁর পূর্বের সকল চিকিৎসাবিজ্ঞানীর গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি ইবনে সিনা প্রদত্ত শরীরবিদ্যা তত্ত্বকে আরো বিস্তারিতভাবে গবেষণা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাফিস এর গবেষণা গ্রন্থটি অভিজ্ঞতা, যুক্তির ও আত্মবিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির নাম 'আল শামিল ফি আল তীবা'। এই গ্রন্থটি ৩০০ খণ্ডে রচিত। উল্লেখ্য যে তাঁর জীবদ্দশায় সবগুলো খণ্ড প্রকাশিত হয়নি, শুধুমাত্র ৮০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৭] ইবনুল নাফিস এর এই বিশাল প্রকাশনা ইসলামের স্বর্ণযুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনবদ্য সংকলন। তিনি মানুষের দেহের রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা এবং পালমোনারি সার্কুলেশনের নিখুঁত বর্ণনা প্রদান করেছেন। মানুষের দেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি ছাড়াও ফুসফুসের সঠিক গঠনপদ্ধতি শ্বাসনালির অভ্যন্তরীণ অবস্থা, হৃৎপিণ্ড, শরীরে শিরা-উপশিরায় বায়ু ও রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। চিকিৎসক নাফিস ছিলেন মূলত কালাউনের হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক।[৪৮]

মুসলিম শাসনের শুরু থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এবং পরবর্তী কালেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে মুসলিমদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল এবং এই সময় কাল মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল। এরপর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং স্বর্ণযুগের অবসান হয়। স্বর্ণযুগের পতনের একাধিক কারণ ছিল– একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৭টি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। এই ক্রুসেডের ফলে ধ্বংস হয়েছিল মুসলিম জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রগুলো। ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণে ঐ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র সমরকন্দ, বুখারা এবং খাওয়ারিজম ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া হালাকু খান দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে মিসর পর্যন্ত মুসলিমদের অধিকৃত সকল ভূমি দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। হালাকু খানের আক্রমণে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের পতন ঘটেছিল। এই বাগদাদ নগরী মুসলিম গবেষকদের কাছে ছিল পবিত্র ভূমি বা তীর্থস্থান। এখানকার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের র্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থাবলি ও গবেষণামূলক অন্যান্য গ্রন্থ। খলিফা মুস্তাসিমের হত্যার মাধ্যমে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটে। বাগদাদের বাইরেও অনেক শহরে হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। ধারণা করা হয় যে, ঐ সময়ে বিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। মোঙ্গলীয়রা শুধু গণহত্যাই করেনি তারা শত শত বছরের পরিশ্রমের ফসল বৃহৎ গবেষণার 'গ্রাণ্ড লাইব্রেরি' ধ্বংস করেছিল। তারা মুসলমানদের সকল গ্রন্থ, গবেষণালব্ধ সম্পদ, অনূদিত সমস্ত গ্রন্থ জ্বালিয়ে দেয়। ষোড়শ শতকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং বড় বড় বিজ্ঞানী ইউরোপে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাদের দ্বারাই ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞান পরবর্তীতে উন্নত হয়েছিল। মূলত যে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নেতৃত্ব দিতেন, তারাই সর্বশান্ত হয়ে যায়। সারা বিশ্ব থেকে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতো বাগদাদ, কর্ডোভা আরো অন্য শিক্ষাকেন্দ্রে। কিন্তু এই ধ্বংসলীলার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নেতৃত্বের স্থানে তৈরি হয় শূন্যতা এবং মুসলিম পণ্ডিতগণ জীবন রক্ষার্থে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন ফলে তাদের পূর্বের সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেননি।

উপসংহার: চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানবজীবন গভীরভাবে সম্পৃক্ত। মুসলিম চিকিৎসক ও গবেষকগণ প্রাচীন সভ্যতার তথা গ্রিক ও মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রকে গবেষণা করে নতুনত্ব প্রদান করেন। পূর্বের অনেক তথ্যকে তারা সংশোধন করেছেন। মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। আলোচ্য সময়ে নতুন নতুন হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে চিকিৎসাব্যবস্থা যুগের চাহিদানুযায়ী উন্নত ছিল। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। নতুন নতুন রোগের উপসর্গ, ঔষধ, অপারেশন পদ্ধতি, অপারেশনে কোন সুঁই ও সুতার ব্যবহার করা উচিত–এমন প্রতিটি বিষয়ে মুসলিম চিকিৎসক গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য তুলে ধরেছেন। চিসিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে তারা গ্রন্থ রচনা করেছেন যা সাম্প্রতিক সময়েও ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়। ফলে মুসলিম চিকিৎসকগণের নিষ্ঠা-সাধনা এবং সেবার মনোবৃত্তি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশে অনন্য হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. নুরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০২), পৃ. ৫৮

২. সুরা মুমিনুন, আয়াত- ২১

৩. সুরা আলাক, আয়াত-১-২

৪. সুরা ইনতিফার, আয়াত-৭-৮

৫. সাজদাহ, আয়াত-৯

৬. P.K Hitti, *History of the Arabs,* (London; Mecmillan & Co. Ltd. 1958. 5th ed.) p. 254

৭. *Ibid,* p. 255

৮. *Ibid,* pp. 364-365

৯. আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে জগৎবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বায়তুল হিকমাহ বা জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামের অগাস্টান যুগের বিখ্যাত এই খলিফা জ্ঞানচর্চার জন্য এখানে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। সুষ্ঠুভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য তিনি হুনায়ুন ইবনে ইসহাককে বায়তুল হিকমাহ-এর মহাপরিচালক নিয়োগ দেন। এই অনুবাদ দফতরে গ্রিক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহ করে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। যেসব লেখকের মৌলিক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করা হয় তার মধ্যে ছিলেন প্লেটো, এরস্টিটল, লিউক, গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমূখ। এছাড়াও মানকাহ ও দুবান নামক সংস্কৃত ভাষার দুজন পণ্ডিতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিবিদ্যার গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য। মূলত, এই জ্ঞানগৃহ ছিল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন ও উন্নত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১০. অধ্যাপক ডাঃ এস এম মোস্তফা জামান ও জয়দীপ দে, *চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা* (ঢাকা: কবি প্রেস, ২০২১) পৃ. ৫২

১১. তদেব, পৃ. ৫২

১২. P.K Hitti, *op.cit.,* p. 310

১৩. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam A History of the Evolution and Ideals of Islam with a life of the Prophet* (New Delhi, Kitabbhavan, 1 st ed.1922), p. 306; P.K Hitti, *op.cit.,* p. 628

১৪. P.K Hitti, op.cit., pp. 628-629

১৫. অধ্যাপক ডাঃ এস এম মোস্তফা জামান ও জয়দীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

১৬. P.K Hitti, op.cit., p. 255

১৭. আরবিতে নাম জুন্দেসাবুর। এর অর্থ ছিল শোপুরের শিবির। শহরটি সাসানিদ প্রথম শাপুর স্থাপন করেন। পারস্যের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে খুজিস্তানের শাহাবাদ গ্রামে এখনও এই নামের ফলক রয়েছে। শহরটি চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত ছিল।

১৮. P.K Hitti, op.cit., p. 365

১৯. Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, p. 317

২০. P.K Hitti, op.cit., p. 365

২১. P.K Hitti, op.cit., pp. 577-578

২২. *Ibid.*, p. 365

২৩. নুরুল আমীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

২৪. তদেব, পৃ. ৮৫

২৫. P.K Hitti, *op.cit.*, p. 679

২৬. অধ্যাপক ডা: এস এম মোস্তফা জামান ও জয়দীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

২৭. তদেব, পৃ. ৫৪

২৮. তদেব

২৯. নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, *পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০০) পৃ. ৩৪৫-৩৪৭

৩০. P.K Hitti, *op.cit.*, p. 313

৩১. *Ibid*, p. 313

৩২. *Ibid*

৩৩. শল্যচিকিৎসা অর্থ অপারেশন বা অস্ত্রপচার। প্রাচীনকালে ভারতে অপারেশন বা সার্জারিকে বলা হতো শল্যতন্ত্র। এখানে শল্য অর্থ বোঝাত যন্ত্র বা অস্ত্র আর তন্ত্র হচ্ছে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।

৩৪. P.K Hitti, *op.cit.*, pp. 365-366

৩৫. অধ্যাপক ডা: এস এম মোস্তফা জামান ও জয়দীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৩৬. তদেব

৩৭. S. M. Ikram and Percival Spear, *Aspects of Muslim Civilization*, (Lahore: Oxford University Press, 1961), p.5

৩৮. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, p. 314; মফিজুল্লাহ কবির, *ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ১৫০

৩৯. Ibn Sina, *The Canon of Medicine of Avicenna*, Book-2, (New York: AMS Press, 1973), p.185

৪০. ইবনে সিনা বলেন যে, শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন বায়ু মানুষের মনের ওপর একটি হতাশাজনক প্রভাব ফেলে এবং মানুষের মানসিক অবস্থা বিরক্তিকর ও খিটখিটে হয়ে থাকে। Ibn Sina, *The Canon of Medicine of Avicenna*, Book-2, p.187

৪১. P.K Hitti, *op.cit.*, p. 576

৪২. *Ibid*, p. 577

৪৩. অধ্যাপক ডা: এস এম মোস্তফা জামান ও জয়দীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৪৪. তদেব

৪৫. তদেব, পৃ. ৫৯

৪৬. P.K Hitti, *op.cit.*, pp. 577-578

৪৭. অধ্যাপক ডা: এস এম মোস্তফা জামান ও জয়দীপ দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৪৮. P.K Hitti, *op.cit.*, p. 685

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.১০.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৬.১২.২০২২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

রাজধানী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শহর: ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণে রমনা এলাকার ঐতিহাসিক বিবর্তন

সুরাইয়া আক্তার*

Abstract:

The spatial importance of the Ramna area in the urban history of Dhaka is still splendid. With the grand starting of Dhaka as a capital city of Suba Bangla under the Mughal Empire, Ramna came under the focus of the ruling class by inaugurating Mahallas and gardens. During East India Company rule, Ramna lost its dignity and glory for a short period but regained it when the colonial officials founded a racecourse and a rest house, giving Ramna a new inauguration with modern features. These new features attracted Europeans, the local elites, and zamindars who made their garden houses there. From the first decade of the twentieth century, the British Government chose Ramna as suitable for establishing the civil station of the capital city Dhaka for the newly formed Eastern Bengal and Assam provinces. The demise status of the short-lived provincial capital city (1905-11) was reverted by the declaration of making a university in Dhaka. Ramna was again selected as the site for the university. Under colonial settings, the spatial changes of Ramna had a great impetus on the citizen of Dhaka. Keeping it in mind, the Scottish Town Planner Patrick Geddes found Dhaka's features to be a university city. This article will focus on the spatial change of Ramna from the Civil Station of the capital Dhaka to a site for the first University of East Bengal. This connection will explore how the civil station and the university changed the urban spatial arrangement in colonial Dhaka.

চাবিশব্দ : নগরায়ণ, ঢাকা, রমনা, সিভিল স্টেশন, স্থানিক পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

কলকাতার ন্যায় ঢাকা ব্রিটিশদের তৈরি না হলেও এর বিবর্তনে ঔপনিবেশিক আমলের লক্ষণগুলো প্রবলভাবে দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। মুঘল সুবা বাংলার সমৃদ্ধ রাজধানী হিসেবে ঢাকার পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে কোম্পানি আমলে বিভাগীয় শহর হিসেবে এর পুনরুত্থান ও ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সালের স্বল্প সময়ের জন্য পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ও পুনরায় বিভাগীয় শহরের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার বিবর্তন এই সত্যকেই সামনে নিয়ে আসে। মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীর কেন্দ্র থেকে কিছুটা উত্তরে শাসক পরিবারের উদ্যোগে রূপ লাভ করা রমনা কালের আবর্তে হয়ে উঠেছিল পূর্ব-বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। বিশ শতকের প্রথমভাগে নতুন প্রদেশের রাজধানীর সিভিল স্টেশন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি নীতির বাস্তবায়ন– সব কিছুই রমনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। ঢাকার এই বিবর্তনের রূপরেখা চিহ্নিত করার জন্য বর্তমান গবেষণায় রমনা এলাকাকে বেছে নেয়া হয়েছে। এখানে ১৯০৫ সালে গঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশে নতুন রাজধানীর সিভিল স্টেশন হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই এলাকার কী ধরনের বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত এ সময়ে রমনার যে স্থানিক, সামাজিক,

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে ঢাকার পরবর্তী ইতিহাস গঠনে এটি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরিশেষে ইতিহাসের নির্মাণ দ্বারা উল্লেখিত সময়কালে এই রমনাকে ঘিরে নগরায়ণের আবর্তন ও ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাসে এর স্থান নির্ণয়ের প্রয়াস নেয়া হবে।

ঢাকা নগরীর ইতিহাস চর্চার ধারায় রমনা:

ঢাকার ইতিহাসে রমনা বর্তমানকাল পর্যন্ত একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফলে ঢাকার ইতিহাস রচনায় এর প্রাসঙ্গিকতা বহুল আলোচিত। এ যাবৎকালে ঢাকা ইতিহাস নিয়ে বহু গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যেখানে বঙ্গভঙ্গ, ও রমনা সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর রচিত *Glimpses of Old Dhaka: A short Historical Narration of East Bengal and Assam with special Treatment of Dhaka (1956),* আহমেদ হাসান দানী রচিত *Dacca: A Record of Its Changing Fortunes (1956),* সৈয়দ আওলাদ হাসান এর *Antiquities of Dacca (1905),* গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে ঢাকার ইতিহাস বর্ণনায় মূলত রমনা অঞ্চলে ব্রিটিশপূর্ব ও পরবর্তী কালের টিকে থাকা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতাদির বর্ণনা ও পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। তবে রমনায় নগরায়ণের প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ সকল গ্রন্থে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আঠারো ও উনিশ শতকে ঢাকার জন জীবন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উর্দু ও ফার্সিতে লেখা কিছু গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়, যেখানে সমকালীন রমনার প্রাসঙ্গিকতাও প্রাধান্য পেয়েছে। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে মুনসী রহমান আলী তায়েশ রচিত *তাওয়ারিখে ঢাকা*, হাকিম হাবিবুর রহমানের *ঢাকা পচাশ বরস পেহলে* গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য। দুটো গ্রন্থেই তৎকালীন ঢাকাবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তায়েশ মুঘল ঢাকার নাজিম ও নায়েব নাজিমদের শাসনকাল, তাদের প্রাত্যাহিক জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে প্রচলিত ইতিহাস, তাদের অধীনে ঢাকার নাগরিক উন্নয়ন, ধর্মীয় ও পার্থিব স্থাপত্য ও অবকাঠামো নির্মাণসহ ১৯০৫ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর সিভিল স্টেশন হিসেবে রমনার নবরূপে প্রতিষ্ঠালাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। হাবিবুর রহমানের গ্রন্থটির আলোচনার সীমা উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত। তবে এই গ্রন্থটিকে বাংলা বিভাগপূর্ব ঢাকার সমকালীন সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি তথা ঢাকায় প্রচলিত রীতি-নীতি, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা চর্চা ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা সমকালীন নাগরিক জীবনে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান সেই স্থানের নগরায়ণের পরিচয় বহন করে। এ সকল আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে রমনার বিবর্তনের ও উনিশ শতকে রমনাকে ঘিরে তৎকালীন ঢাকার নওয়াব পরিবারে প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির পরিচয় পাওয়া যায়, যা ঢাকা সম্পর্কিত গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। আব্দুল করিম রচিত *Dacca: The Mughal Capital (1964),* মুঘল ঢাকার উত্থান, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ও অবনতির প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে এর প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর গভীরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ঢাকার রূপান্তর বিশ্লেষণে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে শরীফ উদ্দিন আহমেদ রচিত, *Dhaka: A Study In Urban History & Development 1840-1921(1986)* একটি অমূল্য গ্রন্থ।

এখানে লেখক কোম্পানি ও রাজ আমলে ঢাকার নগরায়ণের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ঢাকায় আধুনিক নাগরিক সুবিধাগুলো প্রণয়নের জন্য ইংরেজ শাসক ও সিভিলিয়ানদের প্রচেষ্টা, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা ও বিরোধিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। অবশ্য রমনার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো কীভাবে কাজ করেছে, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ পাওয়া গেলেও এর পরিসর কিছুটা সীমিত। রমনা সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন ঢাকা নিয়ে বহু গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে তার লেখা *ঢাকা সমগ্র* অন্যতম। ছয় খণ্ডে লেখা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে রমনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন যেখানে রমনার পরিচয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক রমনার বিবর্তন, কোম্পানি অফিসারদের দ্বারা রমনা রেসকোর্স নির্মাণ, রেসকোর্স নিয়ে ঢাকার নওয়াবদের উৎসাহ ও বিভিন্ন সময়ে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন প্রভৃতির পাশাপাশি রমনাকে ঘিরে ঢাকার মানুষের কৌতূহল ও পরিশেষে রমনায় গড়ে ওঠা সিভিল স্টেশন ও অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ– এর সব কিছুই সাবলীল ভাষায় ফুটে উঠেছে। তবু এ সকল রচনাবলি ও গবেষণাকর্মে ঢাকার নগরায়ণে রমনার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা সীমিত পরিসরে লক্ষ করা যায়। তাছাড়া এ সকল গ্রন্থে নগরায়ণের ক্ষেত্রে সময় ও স্থানিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্রের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাও সীমিত। বলা যায়, ঔপনিবেশিক ঢাকার শহরতলীতে অবস্থিত এই এলাকাটি কেন বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে নাগরিক জীবনের মূল স্পন্দনে রূপ নিল তার আলোচনা এ যাবতকালের কোনো গবেষণায় স্থান লাভ করেনি। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো রমনা সর্ম্পকে আলোচিত ইতিহাসে অনুল্লেখিত বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধনের মাধ্যমে ইতিহাসের শূন্যতা পূরণের প্রয়াস নেয়া।

গবেষণার যৌক্তিকতা:

ইতঃপূর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের সম্পাদিত রচনাবলি ও গবেষণাকর্মে ঢাকার নগরায়ণে রমনার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস সীমিত। ফলে বর্তমান গবেষণাকর্মটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এই শূন্যতা পূরণ করবে। ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাস রচনা একটি নতুন প্রয়াস। নগরের স্থানিক ইতিহাস একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। ফলে উক্ত রমনার ইতিহাস নির্ণয়ে পরিচালিত বর্তমান গবেষণাকর্মটি ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে এবং একটি ইতিহাস সচেতন জাতি গঠনের মাল-মশলার জোগান দিবে।

রমনার পরিচয় ও স্থানিক বিবর্তন : প্রাক-কথন

বিশ শতকের রমনার গঠন প্রক্রিয়া ঢাকার ইতিহাসে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমগ্র উনিশ শতক ধরে কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনাধীনে মুঘল রমনা ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য লাভের মাধ্যমে ঢাকার নাগরিকদের জীবনে অনেকটাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে; উভয়ের মধ্যে তৈরি হয় এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ফলে ঢাকার ইতিহাস রচনায় এর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। ঢাকার ইতিহাসে রমনা এলাকাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মুঘল শাসনামলে। 'রমনা' ফারসি শব্দ। এর ইংরেজি হলো "Lawn"। বাংলায় এর কোনো প্রকৃত অর্থ না থাকলেও ধরে নেয়া যায়– সবুজ চত্বর বা সবুজাবৃত ভূমি।[১] মোগল শাসনালে রমনায় দুটি বড় আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। এই দুটি আবাসিক এলাকার নাম ছিল মহল্লা চিশতিয়া ও মহল্লা সুজাতপুর। ঐতিহাসিক উৎস থেকে জানা যায় সুজাতপুর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কলাভবন থেকে বাংলা একাডেমী পযর্ন্ত বিস্তৃত। আর কিছু দুরেই দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল মহল্লা চিশতিয়া। সুবেদার ইসলাম খান চিশতির ভাই সুজাত খান

ছিলেন এখানে বসতি গড়ে তোলার প্রধান উদ্যোগী। জানা যায়, ইসলাম চিশতির আত্মীয়-স্বজন ও বংশধরেরাও রমনায় বাস করতেন। আব্দুল করিমের বর্ণনানুযায়ী, এই এলাকার বেশিরভাগ জায়গা ছিল বাগান। দিল্লী থেকে আগত মোগল অফিসারদের অনেকে এসে এই ফাঁকা জায়গায় তাবু খাটিয়ে অবসর কাটাতেন। মোগলদের নগর সংলগ্ন উত্তরের এই এলাকাতে বসতির সাথে সাথে গড়ে উঠেছিল ঢাকার বিখ্যাত বাগ-ই-বাদশাহী। তৈফুরের মতে, এই বাগানটি ছিল পুরাতন হাইকোর্ট এলাকা থেকে শুরু করে বর্তমান সড়ক ভবন পর্যন্ত। তবে এ অঞ্চলে মোগল শাসনামলে নির্মিত হাজি খাজা শাহবাজের মসজিদ (১৬৭৯), মুসা খানের মসজিদ (সপ্তদশ শতক) ও ইসলাম খান চিশতির সমাধি (সপ্তদশ শতক) এ অঞ্চলে জনবসতির প্রমাণ দেয়।

১৭৬৫ সালে ঢাকা ঔপনিবেশিক শাসনের অধিনে চলে গেলে মোগলদের বিখ্যাত বাগ-ই বাদশাহী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সুজাতপুর-রমনা জঙ্গলে ঢেকে যায়। ১৮২২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে দায়িত্বরত ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডজ (Charles Dawes) জঙ্গল পরিস্কার করে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর ও তাকে ঘিরে ১৮২৫ সালে তৈরি করেন ডিম্বাকৃতির রেসকোর্স বা ঘোড়াদৌড়ের ট্রাক। আর নিকটবর্তী স্থানেই তৈরী হয় এই উন্মুক্ত স্থানে বেড়াতে আসা অতিথিদের জন্য তৈরি আপ্যায়নস্থল ডজ ফলি। ঢাকাকে আধুনিক নগরে পরিণত করার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বলা যায়, রমনাকে ঘিরেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বিশিষ্ট আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর পরিকল্পনার সূচনা হয়। একটি নতুন রাস্তা তৈরি করে ডজ রমনাকে সংযুক্ত করেন মূল শহরের সাথে আর উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে নির্মাণ করেন একটি বড় পুকুর। ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় ইউরোপীয়গন ঢাকায় 'সাদা শহর' (White town) ও 'কালো শহর' (Black town)-এর ধারণা প্রতিষ্ঠা না করলেও নিজেরা খোলামেলা জায়গায় বাস করতে পছন্দ করতেন। দেখা যায়, রেসকোর্সের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ডজ নির্মাণ করেন তার সুন্দর বাংলো। ১৮৩২ সালে বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি ওয়ালটারস (Henry Walters, ১৭৮৫-১৮৫৯) কর্তৃক পরিচালিত গণনা থেকে জানা যায়, এখানে দু-তিন তলা বাড়ি, বাংলো, অভ্যর্থনার জন্য বড় হলঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৪০ সাল থেকে এখানে নতুনভাবে বসতি গড়ে উঠতে থাকে। এদের বেশিরভাগই ছিল আর্মেনিয়, গ্রীক ও স্থানীয় সদ্য ধনী ব্যাক্তি। এই শ্রেণি রমনায় জমি ক্রয় ও বাগান বাড়ি নির্মাণ করে বসতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেন। ১৯০৫ সালে ঢাকাকে নব-গঠিত পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হলে রমনায় গড়ে তোলা হয় 'নিউ সিভিল স্টেশন'। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর প্রদেশ তৈরির প্রক্রিয়াটি থেমে গেলেও রমনা লাভ করে আরেকটি নতুন পরিচয়। ১৯২১ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ১৯১৭ সালে বিখ্যাত স্কটিশ নগর পরিকল্পনাবিদ প্যাট্রিক গেডেস (Patrick Geddes, ১৮৮৪-১৯৩২) এই রমনাকে আবিষ্কার করেন পুরো শহরের মধ্যে সবচাইতে স্বাস্থ্যসম্মত এলাকা হিসেবে, যেখানে আধুনিক নাগরিক সুবিধাদির সবটুকুই বিদ্যমান রয়েছে। ঢাকার পরবর্তী নগরায়ণ এই রমনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও রাজধানী ঢাকার সিভিল স্টেশন হিসেবে রমনাঃ

লর্ড কার্জনের জীবনীলেখক ল্যুভেট ফ্রেজার ১৯০৪ সালে পূর্ব বাংলা সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

> Of all the territories of India, none was less known or less cared for until recently than the present province of Eastern Bengal. Assam was comparatively familiar to the world without; it had its own chief

> Commissioner, and the tea interest, at any rate, was audible enough. But Eastern Bengal, although its chief city, Dacca, was only 250 miles from Calcutta, was groundless trodden by Englishmen than the Khyber[২]

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার পর উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ঢাকা বাংলার দ্বিতীয় শহর হিসেবে পরিগণিত হলেও[৩] বিশ শতকের পূর্বে শাসক গোষ্ঠীর কাছে এটি ছিল নিছকই বিভাগীয় সদরদপ্তর। আলোচ্য শতকের প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার অধঃপতিত অবস্থা ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে তা উন্নয়নের চিন্তা করা কোনো সাধারণ বা চলমান প্রক্রিয়া ছিল না। মূলত এর পেছনে ছিল ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের এক বিরাট সমীকরণ। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করে দুটি আলাদা প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে ১৯০৫ সালে তাদের গৃহীত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকরী ও ১৯ জুলাই ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশের যাত্রা শুরু হয়। একটি সাধারণ বিভাগীয় শহরকে সরকারের অধীন প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা ধারণ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ। বিশেষ করে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের উচ্চাভিলাসী চিন্তা ও পরিকল্পনার ছাপ পড়েছিল ঢাকায়। রমনাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন নতুন রাজধানীর সিভিল স্টেশন নির্মাণের জন্য। ১৯০৪ সালে রমনার মাটিতে ঢাকা কলেজের ভিত্তি স্থাপনের সময় লর্ড কার্জন মন্তব্য করেন, “that very soon in place of these jungles would raise the new city of Dacca”[৪]। ফলে রমনা হয়ে ওঠে নতুন প্রদেশের কেন্দ্রবিন্দু।

রমনাকে নব-গঠিত পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর ‘নিউ সিভিল স্টেশন’ তৈরির জন্য নির্বাচন করার পেছনেও শাসকগোষ্ঠির কিছু উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে বুড়িগঙ্গার তীরে গড়ে উঠা ক্ষুদ্র শহরের কেন্দ্র নতুন প্রদেশের রাজধানীর জন্য উপযুক্ত ছিল না। নতুন নতুন কাঠামো নির্মাণ, অফিস আদালত ও প্রয়োজনীয় দপ্তর গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট জায়গার ছিল অভাব ।[৫] আর রমনার এক বিশাল ভূমি এর জন্য অনেকটাই প্রস্তুত ছিল। ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসহ এর বিরাট একটি অংশ ছিল সরকারি ভূমি। অন্যদিকে রমনার সঙ্গে ছিল মুঘল রাজকীয় ঐতিহ্যের সংযোগ যা পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণকে তাদের অতীত ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত করেছিল। মূলত ভারত শাসনের জন্য কার্জন যে ভারতীয় মুঘল ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন রমনাকে নতুন প্রদেশের সিভিল ষ্টেশন করার পেছনে তা কাজ করেছে। এ সকল কিছুর মধ্যেই ফুটে উঠেছে ঔপনিবেশিক আদর্শ যা লর্ড কার্জন ধারণ করেছিলেন। ১৯০৪ সালে ঢাকায় দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেন,

> It would make Dacca the center and possibly the capital of a new and self-sufficient administration which must give to the people of these districts by reasons of their numerical strength and their superior culture the prepondering voices in the province so created, which would invest the Muhammadans in Eastern Bengal with such unity, they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and kings, and it would go far to revive the tradition which the

> historical students assured the rulers attached to the kingdom of Eastern Bengal.[৬]

মূলত, ঢাকায় তার দেয়া বক্তব্য ও রমনায় ঢাকা কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন– সব কিছুই ছিল একইসূত্রে গাঁথা। ঢাকায় লর্ড কার্জনের ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ধারণাকে সামনে নিয়ে খুব দ্রুততম সময়ে গভর্নর হাউজ, কার্জন হল, সচিবালয়, সরকারি কর্মচারীদের জন্য মিন্টু রোড, হেয়ার রোড আর নীলক্ষেতে লাল রঙের বাড়িঘর তৈরি হতে শুরু করে। সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের একটি রূপও 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে পাওয়া যায়,

> ১ম অংশ -উত্তরে সাহবাগ, মৌজে ধনমন্দি ও গোবিন্দপুর; দক্ষিণে নবাবকাটারা, বাজার মির মুরাদ, বক্সীবাজার ও বনোয়ারীটুলী; পূর্ব্বে নিমতলী, দেওয়ান বাজার ও একটা সাধারণ গম্য পথ; পশ্চিমে ঢাকেশ্বরী, আজিমপুরা বাবুপুরা ও মৌজে ধনমন্দি; ২য় অংশ- উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে মৌজে কাটগরা; ৩য় অংশ- উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ফুলবাড়িয়ার অর্ন্তগত সাধারণ গম্য পথ।[৭]

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রমনা প্লেইনের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে নতুন রাজধানীর প্রশাসনিক দপ্তরাদি নির্মাণের বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর করা শুরু হয়ে যায়। শহরের এ সকল যজ্ঞ নিয়ে ঢাকাবাসী ও এখানে আগমনকারীদের মধ্যে যেমন ছিল কৌতূহল, তেমনি তাদের মধ্যে ছিল অসন্তোষ। ১৯০৬ সালে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান বার্ডলি বার্ট ঢাকার আসন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

> To-day the new era in its history had dawned for Dacca. After eclipse for just two hundred years, it once more regains the proud position of a capital… To Dacca itself the partition has brought a wonderful revival. Already there is an unwonted stir of life and interest of the old Imperial city. The sense of awakening is in the air. New buildings are rapidly rising to accommodate the army of officials and all the following that government necessarily carries in its train. The pulse of the city so long weak and listless throbs with renewed vigour.[৮]

সমসাময়িক পত্রিকা পিরিয়ডিকালগুলোতেও এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হতে থাকে। *ঢাকা প্রকাশ* রাজধানী তৈরির যজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করে,

> ঢাকা বঙ্গের পুরাতন রাজধানী; মুসলমান সম্রাটগণ যখন ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন, তখন হইতে ইহা রাজধানীরূপে সুপরিচিত ছিল। কালচক্রের আবর্তনফলে, মুসলমানগণের মস্তক হইতে বঙ্গের- তথা ভারতের -রাজমুকুট স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচীনা রাজধানীর দীনা, ক্ষীণা ও শ্রীহীনা হইয়া গিয়াছে। ...সুদীর্ঘ সময়ের অবসানে, পুনরায় এখন সেই দীনা, শ্রীভ্রষ্টা, প্রাচীনা নগরী নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীরূপে নবৈশ্বর্য্যলাভের পথে অগ্রসর হইতেছে।[৯]

কিন্তু জমি অধিগ্রহণের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করে,

> রমনায় ঢাকার নবাব বাহাদুরের যে উদ্যানবাটিকা আছে, সাধারণ্যে উহা 'সাহবাগ' নামে পরিচিত। ঐ সুবিস্তীর্ণ বাগান ও বাগানবাড়ি গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু উহার দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর দিকে বহু ভূমি গৃহীত হইয়ছে।.. এই ভূমি খন্ডে ঢাকার বহু অধিবাসীর বাড়ি, ক্ষেত্র এবং বাগান ইত্যাদি; হিন্দুর দেবমন্দির প্রসিদ্ধ "বুড়া শিবের বাড়ি এবং তৎসংলগ্ন অপর একটা দেবালয়ও ইহারই মধ্যে অবস্থিত। ...তদুপরি রাজপ্রতিনিধি প্রধান সচীব (চীফ সেক্রেটারী) মহাশয়ের আবাসবাটি চিহ্নিত করা হইয়াছে; শুনিতেছি বুড়াশিব ও অপর দেবমন্দিরটি এই সচীব মহাশয়ের বাড়ির অঙ্গনকোণে প্রাচীর মধ্যে নিপতিত হইবে।[১০]

রমনার ২২৫০ বিঘাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে সিভিল স্টেশনের প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সীমানা থেকে কালী মন্দির ও শিব মন্দির প্রভৃতি জায়গায় সিভিল স্টেশনের বিস্তৃতির আশংকায় *ঢাকা প্রকাশ* শহরের বাসিন্দাদের নিকট অনুরোধ করেন যেন তারা সরকারি ভূমি অধিগ্রহণকালে এ সকল ধর্মীয় স্থানের ভূমি অন্তর্ভুক্তিকরণের বিরূদ্ধে আবেদন করেন। দেখা যায়, স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সহস্র অধিবাসী সরকারের নিকট পুরাতন দেব মন্দিরের ভূমি সংরক্ষণের আবেদন করলেও কালী মন্দিরের ২ বিঘা ২ ছটাক ও শিব মন্দিরের ২ বিঘা ৫ কাঠা, ১ ছটাক জমি নিয়ে সরকারের সঙ্গে মন্দিরের সেবায়েত নিত্তানন্দ গিরি গোস্বামীর মামলা চলে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত।[১১] কিন্তু মামলাটি বাতিল হয়ে যায় এবং কোন ধরনের সংঘাত বা শহরের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ বাধা ছাড়াই তা অধিগ্রহণ সম্ভব হয়। তবে কোন স্থাপনা নির্মাণ না করে ভূমিটি রমনা গ্রিনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১২]

এ সময়ে রমনা তিনটি অংশ নিয়ে নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর একটি রমনা সিভিল স্টেশন, একটি রেসকোর্স, আরেকটি হলো রমনা পার্ক। ইতঃপূর্বে রমনার পার্শ্ববর্তী দিলকুশা, তোপখানা রোড, পুরানা পল্টন, মতিঝিলব্যাপী বিস্তৃত অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় নতুন রাজধানীর মহাযজ্ঞে। তাছাড়া ফুলবাড়িয়ার রেললাইনটিও স্থানান্তর করা হয় জায়গা সংকুলানের জন্য। ব্রিটিশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রর্বার্ট লুইস প্রাউডলক (Robert Louis Proudlock, ১৮৬২-১৯৪৮) ছিলেন রাজধানীর 'নিউ টাউন' হিসেবে প্রসিদ্ধ সিভিল স্টেশনের ভূদৃশ্য (Landscape) পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্বে। তিনি ছিলেন ইয়োরোপের 'গার্ডেন সিটি' আন্দোলনের অন্যতম অনুসারী।[১৩] হাতে নিলেন নতুন ঢাকাকে নয়নাভিরাম রূপে রূপায়িত করার কাজ। ১৯০৯ সালে ঢাকায় আগমনের পর এই উদ্যানবিদ রমনাকে তৈরি করতে শুরু করলেন আধুনিকতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম স্থান হিসেবে। মিজানুর রহমান তার স্মৃতি থেকে বলেন, পঞ্চাশের দশকের আগেকার রমনা ও সংলগ্ন এলাকায় তরুসজ্জার সবটুকুই প্রাউডলকের সৃষ্টি।[১৪]

নতুন ঢাকার জন্য মোট বাজেট করা হয় পঞ্চাশ লক্ষ রুপি। পাঁচটি খাতে এই বাজেট খরচ করার প্রস্তাবনা থাকে। প্রথম পর্যায়ে গভর্নর হাউজ, কার্জন হল, সচিবালয়, সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং রাস্তা, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এই বাজেট আরও বৃদ্ধি পায় স্থানীয় বিত্তবানদের সহযোগিতায়। বিশেষ করে কার্জন হল নামক তৎকালীন ঢাকা কলেজের হল তৈরির জন্য ভাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় এর জন্য ১৫০০০০ রুপি দান করেন। ঢাকা কলেজের এই ভবনটি তৈরি হয়েছিল ইন্দো সারাসেনিক রীতিতে।[১৫] গম্বুজ, খাজ খিলান, মিনার, কিউপলা আর ঠেকনাযুক্ত কার্নিশ ব্যবহারের মাধ্যমে ইমারতটিকে মুঘল রীতির উত্তরসূরি হিসেবেই

উপস্থাপন করা হয়।[১৬] লাল ইটের তৈরি দ্বিতল এই স্থাপনাটি মিশে গিয়েছিল রমনার সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে। এর পাশে একই রীতিতে নির্মিত হয়েছিল ছাত্রাবাস। এ অঞ্চলের স্থাপত্য নির্মাণে পরিকল্পনাবিদগণ যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালের মন্তব্য থেকে। তিনি ১৯১০-১১ সালে ঢাকা কলেজ পরিদর্শনে আসলে রমনার বুকে গড়ে ওঠা কলেজ কম্পাউন্ডের প্রশংসা করে বলেন,

> I saw during my short visit here many pleasant evidences of healthy and harmonious college life. The Government of Eastern Bengal and Assam are to be congratulated on the liberality with which they have planned and the thoroughness with which they have carried out the design for a residential college on the great scale.[১৭]

কার্জন হলের উল্টো দিকে পূর্ব-বাংলা ও আসাম সরকারের গভর্নরের জন্য বাসভবন তৈরি করা হলো একই রীতিতে। রেনেসাঁ যুগের স্থাপত্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত উইলিয়াম এমারসন লর্ড কার্জনের ইচ্ছানুযায়ী ভারতের জন্য যে নব রীতির সূচনা করেছিলেন গভর্নর হাউসটি মূলত সেই রীতিকেই ধারণ করেছে। তার পরিকল্পিত ধবধবে সাদা রঙের ইমারত হলো কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। প্রায় একই সময়ে পরিকল্পিত গভর্নর ভবনটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ন্যায় মার্বেল পাথরে তৈরি না হলেও সাদা ধবধবে রঙ এর মাধ্যমে এর সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর নির্মাণকাজ ১৯০৭ সালে শুরু হয়ে ১৯১০ সালে শেষ হয়।[১৮] সাচিবিক কাজ পরিচালনার জন্য নির্মিত সেক্রেটারিয়েট ভবনটি ভিক্টোরীয় রীতির গাম্ভীর্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। 'এইচ' অক্ষরের ন্যায় পরিকল্পিত ভবনটিকেও তৈরি করা হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে। এ প্রসঙ্গে থমাস মেটকাফের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, ব্রিটিশ শাসকগণ প্রত্যেকটি পাবলিক বিল্ডিং নির্মাণ করতেন নিজেদের সাম্রাজ্যিক আদর্শকে উপস্থাপন করার জন্য এবং তাতে সর্বদাই এক ধরনের 'সুপিরিয়পিটি' (Superiority) প্রদর্শনের চেষ্টা অব্যাহত থাকতো।[১৯] রাজধানীকে সাজানোর জন্য তৈরি রমনার পাবলিক বিল্ডিংগুলোও একই আদশর্কে ধারণ করে পরিকল্পিত হয়েছে। পরিকল্পনা ও আকৃতিতে বৃহৎ ইমারতগুলো কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও আলংকারিক শৈলীর সমন্বয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।[২০] শুধু পাবলিক বিল্ডিং নয়, সরকারি কেরানি, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের থাকার জন্য ৩৩টি বাংলো তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। সুপরিসর বাগানের ভেতরে নির্মিত প্রতিটি বাড়ি যেন আলাদা রূপ ও আভিজাত্য নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। এছাড়া পোস্ট মাস্টার জেনারেলের অফিস, মিউনিসিপাল মার্কেট এবং একটি গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও তা তখন বাস্তবায়িত হয়নি।[২১]

সিভিল স্টেশনটি শুধু উদ্যানের দ্বারা সৌন্দর্য বিধান আর প্রয়োজনীয় ইমারতাদি নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং এর প্বার্শবর্তী পরিবেশকে মানানসই করার চেষ্টাও অব্যাহত ছিল। রমনার ঠিক পাশেই ছিল শহরের ময়লার ভাগার। ১৯০৮ সালে বাংলার তৎকালীন সেনিটারি কমিশনার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেন তৎকালীন ঢাকা কলেজের উত্তর-পূর্বদিকে এর অবস্থান থাকায় তা নিকটবর্তী বসবাসকারীদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টিকারী ট্রেজিং গ্রাউন্ডটি দুরে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন।[২২] তার প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রধান প্রকৌশলী ডব্লিউ বেংকেস গেথার গ্রাউন্ডটিকে শহরের তিন মাইল উত্তর-পূর্বদিকে আদাবরে সরিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও পিডব্লিওডি পূর্ব-বাংলা ও আসাম সরকারকে একটি ট্রামওয়ে

নির্মাণের সুপারিশ করেন।[২৩] এ অনুযায়ী ট্রাম লাইনটি মুল ডিপো মিরানজলা থেকে আদাবর পর্যন্ত পাঁচ মাইল দুরে সরিয়ে নেয়া হয়।

রমনার জন্য করা হয় আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িগুলো দখল করে নেয় ইতঃপূর্বে বাংলা বাজার, সদরঘাট এলাকায় বসবাসকারী ইউরোপীয় অধিকারীরা।[২৪] উনিশ শতকের বিলাস নিকেতনের জন্য ব্যবহৃত রমনা আবার হয়ে ওঠে অভিজাতদের এলাকা আর শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায় এবং প্রাউডলকের পরিকল্পনার অনেকটাই অবাস্তবায়িত থেকে যায়। তা সত্ত্বেও এই অসম্পূর্ণ রমনাকে নিয়েই ঢাকা ও পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস যার আভাস পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনায়; "স্থাপত্যে কোন একঘেয়েমি নেই, স্মরণি ও উদ্যান রচনায় নয়া দিল্লীর জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি। [...] সর্বত্র প্রচুর স্থান, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলির কোন কথাই ওঠেনা"।[২৫]

১৯১৭ সালে বিখ্যাত স্কটিস নগর পরিকল্পনাবিদ প্যাট্রিক গেডেডস পরিকল্পিত রমনাকে ঢাকার সুন্দরতম ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভারতের কয়েকটি নগর পরিকল্পনা তৈরীর অংশ হিসেবে ১৯১৬ সালে তিনি অতি স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকায় অবস্থান করলেও তিনি প্রকৃতিকে অনুসঙ্গ করে ঢাকার জন্য একটি উদ্যান-শহরের পরিকল্পনা তৈরি করেন। তার মতে, পুরো ঢাকা শহরে দুটি স্থান আছে নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত। তার একটি হলো ওয়ারি এবং অপরটি হলো রমনা। তিনি আরও বলেন, এলাকাটি তৈরি হচ্ছে নির্দিষ্ট নাগরিকদের জন্য যারা এর জন্য সত্যিকার অর্থেই উপযুক্ত।[২৬] ঢাকার পরবর্তী নগরায়ণ এই রমনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[২৭] মূলত তখন বঙ্গভঙ্গরদ পরবর্তী পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকার সিভিল স্টেশনটি তৈরি হচ্ছিল এ অঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করার জন্য। পরবর্তী অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে রমনার নতুন পরিচয় এবং ঢাকার নগরায়ণে এর সূদুরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সিভিল স্টেশন থেকে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে রমনা:

নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে যখন দ্রুত উন্নয়ন কর্ম সম্পাদিত হচ্ছিল, নব নির্মিত ইমারতে রাজধানীর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হওয়ার পূর্বেই বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা সব কর্মযজ্ঞকে ম্লান করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণার পর রাজধানী তৈরির প্রক্রিয়াটি থেমে গেলেও রমনা লাভ করে আরেকটি নতুন পরিচয়। প্রায় এক দশক ধরে চলমান প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ১৯২১ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।[২৮]

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে এই বাংলার মুসলিম জনগণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে দেয়ার পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় যখন ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর ও বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন মন্তব্য করেন, [...] university was restitution to the Muslims for the annulment of the partition of Bengal.[২৯] মূলত ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী লর্ড হাডিঞ্জ এ অঞ্চলের জনগণের বিশেষ করে মুসলিম নেতাদের দাবির প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে

মত প্রকাশ করেন এবং ঢাকায় তা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশের আশ্বাস দেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারও সুপারিশ করেন।[৩০] এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয় রমনা, আর সিভিল স্টেশনের পরিত্যক্ত ও ঝিমিয়ে পরা বিল্ডিংগুলো বরাদ্ধ দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। শুরু হয় রমনাকে ঘিরে ঢাকার নতুন নগরায়ণের ধারা।

১৯১২ সালে এ অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য ঢাকা তথা রমনা কতটুকু প্রস্তুত; পূর্ব বাংলার জনগণের শিক্ষার উন্নয়নে এটি কতটুকু কার্যকরী হবে; এর দ্বারা কারা, কতটুকু উপকৃত হবে; এটি আবাসিক হবে না এফিলিয়েটেড হবে; কী ধরনের সিলেবাস এবং বিভাগভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে– প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান তথা একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯১২ সালের ২৭ মে তৈরি হয় “Dacca University Committee” নামে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন, যা ‘নাথান কমিশন’ নামে সমধিক পরিচিত। রবার্ট নাথানকে সভাপতি ও ডি এস ফ্রেজারকে সেক্রেটারি করে মোট তের সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় এই কমিটি। ১৯১৪ সালে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি, পাঠদানের বিষয়, এফিলিয়েটেড কলেজসমূহ, এর প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা, হোস্টেল ও আবাসিক ভবন প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করে। কমিটি রমনার ৪৫০ একর ভূমিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করেন এবং এর পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের সিভিল স্টেশনের কার্য নির্বাহের জন্য তৈরি অফিসসমূহ ও বিভিন্ন এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা ও কেরানিদের জন্য তৈরি আবাসিক ভবনসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে নির্মিত ছোট-বড় ইমারতের সবগুলোই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার সুপারিশ করেন।[৩১] কিন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পূর্ব-বাংলা এ যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত না হলেও এর প্রভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ধীর গতি লাভ করে। পরিশেষে ১৯১৭ সালের ২৩ এপ্রিল লর্ড চেমস্ফোর্ড পূর্ব-বাংলার জনগণকে লর্ড হার্ডিঞ্জের দেয়া আশ্বাস কার্যে পরিণত করেন। লর্ড চেমসর্ফোড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা ও বাস্তবতা নিরীক্ষণের জন্য ‘Commission for the University of Calcutta’ গঠনের পরামর্শ দেন। এই কমিটি দুই বছর সময় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রবর্তন করেন যা ‘Calcutta University Commission 1917-1919’ বা সংক্ষেপে ‘সেডলার কমিশন’ নামে পরিচিত।

এই কমিটির সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ১৯২১ সালের ১ জুলাই রমনার বুকে পূর্ব-বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। তবে ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত রমনার মালিকানা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি সংশ্লিষ্টতায় রমনা সিভিল স্টেশনের ভূমি ও ভবনাদি বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দ দেয়া হলেও বাংলা সরকার সাতশো আটাশ বিঘা ভূমির জন্য ভাড়া দাবি করে। রমনার এই ভূমি ও ভবনাদি বাংলা সরকারের নিকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ইজারা নিতে হয়েছিল বাৎসরিক এক হাজার টাকা জমায়, আর সঙ্গে দিতে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যা রমনা ভূমির তৎকালীন মূল্য থেকে অনেক বেশি।[৩২] দেখা যায়, বাংলা সরকারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ছিলেন অনেকটাই অনুদার। ফলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পূর্ব-

বাংলার সমর্থন ও প্রচেষ্টা আর কলকাতার বিরোধিতাকে আমলে নিয়েই ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ পর্যন্ত রমনাকে ঘিরে বিস্তৃতি লাভ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড।

পূর্ব-বাংলার মুসলিম নেতাদের পাশাপাশি প্রভাবশালী কিছু ভারতীয় নেতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সকল ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন, যার ফলস্বরূপ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সফল হয়, আর রমনা হয়ে ওঠে পূর্ব-বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সর্বোচ্চ স্থান। একই সঙ্গে এটি হয়ে ওঠে এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। ইতোমধ্যে সচিবালয়, গভর্নর হাউস এবং ঢাকা কলেজ ভবনের পাশাপাশি তৎকালীন ওয়ারী এলাকার ন্যায় এখানে সরকারি অফিসারদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল বাংলো ধরনের ইমারতাদি, যার সবই বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য।

এ প্রসঙ্গে রমনাকে কেন্দ্র করে প্যাট্রিক গেডেস এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রনিধাণযোগ্য। তিনি রমনার বিবর্তনের দিকে আলোকপাত করে ঢাকাকে দেখতে চেয়েছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহর হিসেবে। তিনি রমনায় গড়ে ওঠা সিভিল এরিয়াটিকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত বলে মনে করেন। ভারত সরকারের অর্থায়ন ও পরিকল্পনামাফিক নতুন রাজধানী শহরের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এলাকাটির যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রমনা ছিল তার কাছে শহরের জন্য প্রয়োজনীয় একটি শহরতলী যাকে কেন্দ্র করে নগরীটি তার ঘিঞ্জি পরিবেশ ও আবাসিক সংকট থেকে কিছুটা পরিত্রাণ লাভ করবে; তার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত নতুন প্রাণের স্পন্দনে ও জ্ঞানচর্চার ধারায় যে নাগরিক সমাজ গড়ে উঠবে তারাই শহরকে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের স্বাদ দিতে সক্ষম হবে। তার মতে, নতুন গড়ে উঠা এই পরিবেশ নতুন নাগরিকদের জন্য অপেক্ষমান। এটি এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন পরিবারগুলোকে স্বাগত জানাতে, তার ভাষায়, "as naturally happens with every University town and provincial capital".[৩৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০০০ একর জায়গা। এটি তৎকালীন অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের যৌথ আয়তনের অধিক এবং ইয়োরোপের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সরকারি প্রস্তাবনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিস্তৃতি রেললাইনের সীমানা ছাড়িয়ে আরও জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ছিল। গেডেস এ প্রস্তাবকে শহরের জন্য ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত হিসেবে মত দেন। কেননা বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠলে তা নগরের অন্যান্য অংশ থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে শহরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার পক্ষে ছিলেন যাতে এটি শহরের মূল স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। এ সংক্রান্ত তার পরামর্শসমূহ প্রণিধানযোগ্য। তিনি একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে এর চারপাশে প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, এমনকি মেডিকেল মহাবিদ্যালয়কে আরও কাছে স্থাপন করার সম্ভাব্যতার ওপর গুরুত্ব দেন। এতে করে ধর্ম, বর্ণ, ব্যক্তিগত মতামত ও জ্ঞান শাখার পার্থক্যের বাইরে একে অপরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে একটি সমন্বয়বাদী জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হবে, যা প্রকৃত অর্থেই একটি উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য করবে।[৩৪] শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, রমনার পার্শ্ববর্তী পুরোনো ও নতুন অংশের কাছাকাছি ঢাকেশ্বরী মন্দির ও শাহ সাহেবের বাড়িকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যে স্বাভাবিক বসতি গড়ে উঠেছে তাদের জন্য কিছু জায়গা খালি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং এটি অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বজনীন ধারণার পরিপূরক। এটি শুধু

শহরের ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে না, এর উচ্চতাকেও বজায় রাখবে। ফলে একে অপরের প্রতি সম্মানবোধকেও সমুন্নত রাখবে। তিনি মাত্র এক সপ্তাহ ঢাকায় অবস্থান করলেও সম্ভত এখানকার সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে উপলব্ধি করে সমন্বয়ধর্মী ধারণার প্রতি গুরুত্ব দেন। তার মতে, উভয় ধর্মমতের অনুসারী পৌরসভার ও অন্যান্য প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি এ সকল পরিকল্পের উপযুক্ততাকে বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করবে। ইতিমধ্যে প্রস্তুতকৃত এই বিশাল নির্মাণস্থলকে কাজে লাগানো স্পষ্টতই এক সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ এটিকে মন্দির ও মসজিদ এলাকার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সামান্যই পরিবর্তন প্রয়োজন।[৩৫]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির আগ্রহের জায়গাটি ছিল সীমিত। মূলত বঙ্গভঙ্গ ও পরবর্তী কালে তা রদ করার প্রতিদানস্বরূপ পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ সমর্থনকারী মিউনিসিপ্যালিটির বেশিরভাগ সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে অংশগ্রহণে ইচ্ছা পোষণ করেননি।[৩৬] মিউনিসিপালিটি কমিশনারদের অনাগ্রহের বিষয়টি গেডেডসের দৃষ্টি এড়ায় নি। তার মতে, এটি শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। প্রকৃতঅর্থেই, শহরের অন্যান্য অংশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির যে ভূমিকা দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ছিল দৃশ্যমান। গেডেডস মনে করেন যেভাবেই হোক এ অবস্থা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ বিশ্ববিদ্যালয় ও শহর উভয়ের জন্য মঙ্গলকর।[৩৭]

বিখ্যাত লেখক ডব্লিউ এ আর্চবোল্ড ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি কেমন হবে, সে সম্পর্কে বলেন:

> This is constantly forgotten, Money will not make a University, building will not make it, it is essencially a society of learned men and unless we secure their presence, it is in vain to expect any real love of learining, the love of learning for its own sake, to be created in those who belong to it.[৩৮]

১৯১৭ সালে প্রণীত গেডেডজ এর রির্পোটে তাঁর এ-সকল ধারণার আরও স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। আর এ সকল ধারণাকে অবলম্বন করেই শুরু হয় রমনাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আন্দোলনকারীদের পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা, ১৯১৪ সালে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ- সব মিলিয়ে এ কাজটি সহজ ছিলনা। যাহোক, ১৯২১ সাল থেকে প্রকৃত অর্থে ঢাকা গেডেডসের ধারণাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ও এর সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদেরকে বরাদ্দ দেয়া হয় রমনা সিভিল স্টেশনের প্রায় সব ভবন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকারী রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনায়, "ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে রমনার মাঠ নামে একটি বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। এই রমনার মাঠে নতুন শহর পত্তন করে বড় বড় সরকারি দফতর এবং কর্মচারীদের বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর অনেক বাড়ি হয়। প্রত্যেক বাড়িতেই বড় বড় কম্পাউন্ড, বাড়িগুলিও ফাঁকা ফাঁকা, প্রশস্ত এবং সুপরিকল্পিত রাস্তা।"[৩৯]

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় কার্জন হল আর সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং দুটুকে অনুষঙ্গ করে। ১৯১২ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে রমনা এলাকার যে সকল ভবন ঢাকা কলেজ,

জগন্নাথ কলেজ ও সরকারি কর্মকর্তাদের ভাড়া দেয়া হয়েছিল, তা একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।[৪০] একদিকে কার্জন হল, বিজ্ঞানাগার আর ঢাকা হল, অন্যদিকে সেক্রেটারিয়েট ভবনের দোতলায় মুসলিম হল ও একতলায় বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিভাগ বিশেষত কলা অনুষদের বিভাগ এবং ক্লাসসমূহ নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের আবাসন দিয়ে শুরু হয় অনেকটা আবাসিক রূপ নিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, উচ্চশিক্ষার জন্য তৈরি এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু থেকেই বঙ্গভঙ্গ ও এর রদ হওয়ার পেছনে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ কাজ করেছে, তাকে ধারণ করে গড়ে ওঠে। ফলে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে নতুন আগতরা গড়ে তোলে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। হল ভিত্তিক আবাসনের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মুসলিম হল আর হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য জগন্নাথ হল গড়ে তোলা হয়। হলের চরিত্রেও ছিল পার্থক্য। ঢাকা হলের পরিচয় ছিল অভিজাতদের হল হিসেবে। ঢাকা হলে হিন্দু-মুসলিমসহ সকল ধর্মাবলম্বীরা আবাসনের সুযোগ থাকলেও সেখানে ধনী হিন্দু পরিবারের সন্তানদের বসবাস ছিল অধিক। এটিও সত্য যে সে সময়ে পূর্ব-বাংলার মুসলিম কৃষকপুত্রদের খুব কমই উচ্চশিক্ষার গ্রহণের জন্য আর্থিক ও একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করেছিল।[৪১] মূলত ১৯৪৭ সালের ভারতভাগের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। ফলে আলাদা ধর্মভিত্তিক হল নির্মাণের মধ্যদিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবিম্বটি চাপিয়ে দেয়া হয়। এটি একদিকে যেমন ছিল উচ্চশিক্ষার আদর্শের পরিপন্থি একই সাথে একটি বিভাজিত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাল-মসলার যোগান দেয়।

একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ব-বাংলার নারীদের জন্য ছিল অনেকটা অপ্রবেশ্য। এর কোন ছাত্রী হোস্টেল ছিল না। এমনকি এ ধরনের কোনো সুপারিশও নাথান কিংবা সেডলার কমিশন থেকে আসেনি। ছিল না সহশিক্ষার ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ রায়কে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়েছিল তৎকালীন উপাচার্য পি জে হার্টগ এর বিশেষ অনুমোদন নিয়ে। ১৯২৫ সালে ভর্তি হন একমাত্র মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুন্নেছা। ১৯৩৫ সাল নাগাদ হিন্দু-মুসলিম মিলে আটজন ছাত্রী বাস করতেন ইউনিভার্সিটি উইমেন্স রেসিডেন্স নামক দশ নম্বর বাংলোতে।[৪২]

রমনার বিবর্তনের অভিজাত ও বিনোদনস্থল হিসেবে গড়ে ওঠা রমনা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হলেও এর পুরোনো ঐতিহ্য তখনও বিদ্যমান ছিল। সরকারি অধিকারীদের বিশালাকৃতির কোয়ার্টারের অদূরে রমনা পার্ক, রেসকোর্স আর নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ক্লাবকে ঘিরে দেশীয় অভিজাত আর ঔপনিবেশিক অধিকারীদের কর্মকাণ্ড; পাশের কালী মন্দিরে ধর্মানুসারীদের আনাগোনা - দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য আগত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের চোখে বিস্ময়ের সূচনা করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকে ছাত্র বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনায় এর আভাস পাওয়ার যায়। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন,

> [...] উত্তর অংশটি সরকারি কেষ্টবিষ্টুদের বাসভূমি, মধ্যিখানে বিলেতি ব্যসন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আছে অপ্রবেশ্য ঢাকা ক্লাব, যেখানে মধ্য বিলাসী বল নৃত্যপ্রিয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও নারায়ণগঞ্জের পাটকল চালক ফিরিঙ্গিরা নৈশ আসরে মিলিত হন; আর আছে কানন বেষ্টিত উন্নত চূড়া একটি কালী মন্দির, যেখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্ঘ্য দিতে আসেন। [.. .] কিন্তু দক্ষিণ অংশটি পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় অধিকারভুক্ত, যেখানে ছাত্র এবং অধ্যাপক ছাড়া ভিড় দেখা যায় শুধু শীতে বর্ষায় শনিবারগুলির অপরাহ্নে যখন জুয়াড়ি এবং বেশ্যায় বোঝাই খড়খড়ি তোলা

> ঘোড়ার গাড়ি ছোটে অনবরত রেসকোর্সের দিকে-শান্ত রমনাকে মর্দিত করে, কলেজ ফেরতা আমাদের চোখে মুখে কর্কশ ধুলো ছিটিয়ে [..][৪৩]

নবাব সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর নবাব পরিবারের জৌলুস কমে যায়। সরকারের নিকট নবাবের ঋণের প্রকৃত অবস্থা ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে তাদের সম্পত্তি ওয়ার্ডের অধীনে চলে যায়। রমনা এলাকায় নবাবদের যে বাগানবাড়িসহ বিপুল সম্পত্তি ছিল তা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ১৯৪১ সালে নবাবদের কাছে থাকা রমনা এলাকার ৫২৪ বিঘা জমি সরকার নিয়ে ঢাকা ক্লাবকে লিজ দেয়। মুসতাসির মামুন বর্ণনা করেন, এ জমিগুলোর মধ্যে রেসকোর্স ছিল দুশো নব্বই বিঘা, গল্ফ কোর্স দুশো উনিশ বিঘা এবং বাকি পনের বিঘা ছিল ক্লাব ভবন ও চত্বর।[৪৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকালীন সময় পর্যন্ত রমনার অভ্যন্তরের ব্যক্তিগত ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ও একাডেমিক ভবনসমূহের স্থানিক পরিবর্তন হয়েছে কয়েক দফা। সেক্রেটারিয়েটের একটি কক্ষে ১৯১৩ সালে যাদুঘরের জন্ম হয় এবং পরে ১৯২০ সালে তা নিমতলী কুঠির বারাদরিতে স্থান লাভ করে। সেক্রেটারিয়েট ভবন থেকে মুসলিম হলটি ১৯২৯ সালের পর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে স্থানান্তরিত হয়।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে রমনা এলাকা তথা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সেক্রেটারিয়েট ভবনের পূর্বাংশ ছাড়া বাকি অংশ এ সময়ে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হয়। রমনার রেসকোর্স পরিণত হয় ভিনদেশি সৈনিকদের অনুশীলন কেন্দ্রে। যুদ্ধ থেমে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। ভিনদেশি অস্ত্রধারী সৈনিকেরা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সংকীর্ণ হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ। পুরাতন কলা ভবনের এক-চতুর্থাংশে কলা, আইন, বাণিজ্য ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভাগগুলো ছাড়া অল্প পরিসরের মধ্যে ঠাঁই করে নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীটিকে। আর ভারত বিভাগের পর মিন্টু রোড, হেয়ার রোডের বাড়িগুলো পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের বরাদ্দ দেয়া হয়।

তথাপি থেমে থাকেনি রমনাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া। রমনার খোলামেলা প্রকৃতির ন্যায় গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ। ছাত্র ও শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করার ক্ষেত্রে ছিল সচেষ্ট। আব্দুর রাজ্জাকের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তী পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান ও ঢাকায় যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এর তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি, নাজির হত্যার ন্যায় একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া। ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফসল হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হলেও তা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করতে থাকে।

আর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে শহরে জুড়েই আসে নানা পরিবর্তন। পূর্ব-বাংলার মুসলিম পরিবারের শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে; ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করে।[৪৫]

উপসংহার:

কালের আবর্তে ঢাকার ফুসফুস নামে পরিচিত রমনার স্থানিক পরিবর্তন ঘটলেও মুঘল রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা হিসেবে এর ঐতিহ্য কখনও ম্লান হয়নি। বরং দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী একে নতুন রূপে ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলে।

ফলে শহরতলী হয়েও তৎকালীন ঢাকার স্থানীয় অভিজাত শ্রেণি ও ইউরোপীয় অধিকারীগণের নিকট রমনা অবসর যাপন ও বিনোদনের অনন্য স্থানে পরিণত হয়। বিশ শতকের শুরুতে রমনায় নতুন প্রদেশের রাজধানীর সিভিল স্টেশন তৈরির যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ ছিল মুখ্য। ফলে দ্রুত সময়ে রমনাকে বাগান-নগরীর বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরির প্রবণতা দেখা যায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে স্বল্পস্থায়ী রাজধানীর সিভিল স্টেশনটির জন্য গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ অনেকটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ স্বল্প ব্যবধানে নতুন রূপ ও গুরুত্ব নিয়ে শুধু ঢাকা নগরীর একটি এলাকা হিসেবে এর পরিচয় সীমাবদ্ধ না থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে তা পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। রমনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পায় শহর পায় এক নতুন পরিচয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পরিবেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে একইসঙ্গে যে উদারবাদ, সাম্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণিবিভাজন বিরাজমান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার দর্পণস্বরূপ। ফলে এরূপ পরিবেশে তৈরি হওয়া চেতনাবোধ সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একদিকে এটি যেমন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে সফল করে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রেখেছে, অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করে ভাষা ও ভূ-খণ্ডভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়েছে। আর এর সব কিছুই ছিল রমনায় গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল। এক্ষেত্রে পরিশেষে পেট্রিক গেডেসের ভাষায় বলা যায়, ঢাকা হয়ে উঠেছিল মূলত একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহর। আর এ সকল ইতিহাসের সঙ্গে রয়েছে রমনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

তথ্য ও টীকা:

১ নাজির আহমেদ, *কিংবদন্তির ঢাকা* (ঢাকা: নওরোজ প্রকাশনী, ১৯৫৬), পৃ. ৪৮

২ Lovat Fraser, *India Under Curzon & After* (London: Heinmam,1911), p. 367

৩ ১৮৭৪ সাল নাগাদ ঢাকা শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে পূর্ব বাংলার প্রথম শহর ও ১৮৮৮ সাল নাগাদ জনসংখ্যার দিক থেকে কলকাতা ও পাবনার পর পর্ব ভারতের তৃতীয় শহরে পরিণত হয়। Editorial, *The Pioneer* (Allahabad, 1874), p. 3; *Report on the Census of Bengal, 1881*" by J.A. Bourdillon, of the Bengal Civil Service, Inspector-General of Registration, Bengal. Calcutta, 1883

৪ Ahmed Hasan Dani, *Dacca: A Record of its Changing Fortunes* (Dhaka: The Saogat Press, 1956), p. 73

৫ ঢাকা প্রকাশ, "পুরাতন রাজধানীর নব পরিবর্ত্তন", ২৪ আষাঢ় ১৩১৩, ৮ জুলাই ১৯০৬

৬ For the speech delivered by Lord Curzon at Dacca, see "All about Partition" edited by P. Mukherjee, Calcutta, 1906

৭ "পুরাতন রাজধানীর নব পরিবর্তন" *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ আষাঢ়, ১৩১০, ৮ জুলাই ১৯০৬

৮ F.B. Bardely Birt, *Romance of an Eastern Capital,* London, 1906, p. 19-21

৯ "পুরাতন রাজধানীর নব পরিবর্তন" *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ আষাঢ়, ১৩১০, ৮ জুলাই ১৯০৬

১০ "রাজকার্যালয় ও প্রধান রাজকর্ম্মচারিগনের বাসস্থান" *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ আষাঢ়, ১৩১০, ৮ জুলাই ১৯০৬

১১ Petition of Nityananda Geiri Goswami and others protesting against the acquisition of land required for the new civil Station at Ramna in the Town of Dacca, Nos. 1-2., file-4-B/17. 1, 9th February, 1914

১২ ঢাকার কালেক্টর মি. বিরলে, বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য মি. পি সি লিয়ন, নবাব সামস-উল-হুদা ও মি. জে এইচ কার এ অংশটিকে খোলা অংশ হিসেবে রাখার পক্ষে মত দেন। অনুমোদন- "Order in Council" by Carmichael, no. 3. L.A. 13th March, 1914

১৩ বিস্তারিত দেখুন-, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Proudlock,_Robert_Louis

১৪ মীজানুর রহমান, *ঢাকা পুরাণ* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ১০৫

১৫ এটি ছিল মুঘলদের ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পরবর্তী মুঘল ভারতীয় ও ইউরোপীয় রীতির সমন্বয়ে তৈরী একটি নতুন রীতি যা বৃটিশরা গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয়দের সমর্থন লাভের জন্য। Thomas R Metcalf, Metcalf, *Imperial Vision, Imperial Vision and Britain's Raj,* 1989, p. 24

১৬ বিস্তারিত দেখুন- Dani, *Dacca*, p. 139-40

১৭ Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam During the years 1907-1908 to 1911-1912, vol-I, Chapter -IV, p. 27, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913, Files (Education), BNA

১৮ সাইফ উল হক, "উপনিবেশিক আমলে ঢাকার স্থাপত্য" *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২), পৃ. ১৭২। গভর্নর এই ইমারতটিতে অবস্থান না করায় তা ঢাকা কলেজকে দেয়া হয়।

১৯ Thomas R Metcalf, Metcalf, *Imperial Vision, Imperial Vision and Britain's Raj,* 1989, p. 1-2

২০ দানী, *কালের সাক্ষী ঢাকা*, (আবু জাফর অনুদিত) (ঢাকা: খোসরোজ কিতাব মহল, ২০০৫), পৃ. ১২২

২১ রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, (আ ম ম শরফুদ্দিন অনুদিত), (ঢাকা: ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ২৩০

২২ Report of Inquiry of Deputy Sanitary commissioner (1906) to the Chief Engineer, file dated- 5 December 1908, file-66, collection-V, Bundle -1, Dhaka Municipal Record Room (DMRR), Dhaka City Corporation Records (DCCR), Bamgladesh National Archive (BNA)

২৩ Report of Inquiry of Deputy Sanitary commissioner (1906) to the Chief Engineer, file dated- 5 December 1908, file-66, collection-V, Bundle -1, DMRR, DCCR, BNA

২৪ B C Allen, *Dacca, Eastern Bengal District Gezetteers,*Allahabad:The Pioneer Press, 1912, p. 181

২৫ বুদ্ধদেব বসু, *আমার যৌবন* (কলকাতা: এমসি সরকার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭), পৃ. ৫

২৬ P. Geddes suggested not to include the Clerk's residences in this new area, this area should only for the existing and the new citizens, Report, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot 1917, p. 11

২৭ P. Geddes,*Report,* p. 11

২৮ বিস্তারিত- M A Rahim, *The History of the University of Dacca,* Dacca: University of Dacca, 1992

২৯ Chancellor's Convocation Address, 22 February, 1923. (Cited from Shah M. Farouk, 'The Universities of Bangladesh' in *Universities of Commonwealth Countries*. London, 1996, p. 265

৩০ কোলকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্ট, খণ্ড-৪, পৃ. ১২২

৩১ Report of the Dacca University Committee, Calcutta, 1914
৩২ মুসতাসীর মামুন (উদ্ধৃত), *ঢাকা সমগ্র-১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭) (২য় মুদ্রণ), পৃ ৯৭
৩৩ P. Geddes, *Report,* p.15
৩৪ P. Geddes, *Report,* p.16
৩৫ P. Geddes, *Report,*p. 15
৩৬ বিস্তারিত- শরিফউদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১* (ঢাকা: ইউপিএল, ২০০১), পৃ ২৯৬-৩০১
৩৭ P. Gegges, *Report,* p.
৩৮ W A J Archbold, "The Future of Universities in India" *Dhaka Review,* v. I, April 1911, p. 3, Dhaka University Library (DUL), Dhaka, Bangladesh,
৩৯ মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃ. ৯৭
৪০ "দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ড. সিরাজুল ইসলামের চিঠি থেকে উদ্ধৃত", মুনতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃ.৯৬-৯৭
৪১ সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ২৭-২৮
৪২ রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর ১৯২১-২০০১*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৩, পৃ.৮০
৪৩ বুদ্ধদেব বসু, *আমার যৌবন*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ১৩৮৩ বাংলা (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৫-৬
৪৪ মুসতাসির মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, পৃ. ১০২
৪৫ গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ* (১৮৮৫-১৯২১) (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০১৩), পৃ. ৯; শিক্ষা সংক্রান্ত ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৭ আগষ্ট ১৮৭১, অনুচ্ছেদ ১, (Indian Education Processings, August 1871)

জমা প্রদানের তারিখ : ২৯.০৮.২০২২
গৃহীত হবার তারিখ : ২৮.১২.২০২২

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

Dalit Children in Primary Education: An Overview of Their Status in Munshigonj District

Ayesha Siddequa Daize*
Md. Ershadul Islam**

Abstract

The Constitution of Bangladesh is not considering Dalit as untouchables, but in practice, still most of them bear this stigma. In Bangladesh society, they face different types of inequalities in their basic education and employment for their low caste identity and ethnicity. Government and Non-Government organization has been working together to ensure the schooling of minority children but those organizations are not able to bring large scale changes in the lives of the Dalit child. As a result a large number of children are still now out of the school and most of them are started working in their traditional field to maintain livelihoods. Legally, it is not allowed to do discrimination in spear of social activities on the basis of caste and ethnicity even though it is still in practice. The study was conducted among the 35 Dalit students and 10 guardians were participated in-depth interview at Munshigonj district in Bangladesh. Purposive sampling technique was used to select the respondents from the Dalit communities and school enrolled children were participated in this study. Semi structured questionnaire was formed to collect the perceptual data. Dalits are still physically and emotionally harassed in the society but unchanging social norms, attitudes and mentality inducements to pursue education were negligible for them. Poverty, fixed traditional occupation, lack of the parent's awareness, poor physical environment, lower right of entry to basic facilities and services are the major causes to slow development of Dalit child education. As a result, those are affecting the Dalit children's access to education badly. On the other hand, humiliation, tease and ill-treatment by the peer and teachers in the school that atmosphere create Dalit children's schooling experience very bad and it makes them traumatic drops out from their school in their early stage. This study tried to understand and explain the phenomenon of educational barrier among the Dalit child in education and that are to be considered as major effects for early drop out from their education.

Keywords: Dalit, Exclusion, Vulnerability, Empower, Inequality, Discrimination

1. Introduction

The position of Dalit communities as untouchables in the caste structure was the most important factor that historically led to their exclusion from knowledge and education in traditional Hindu society. Though schools were legally opened to these communities in the mid nineteenth century, attempts by Dalits to avail of education were met with considerable caste opposition (Nambissan, 1996). Although in Bangladesh primary education is compulsory, school enrollment has not reached a satisfactory level yet, especially among Dalit children. School drop out rates are very high among Dalit children and Dalit boys and girls rarely continue their education beyond primary school. Caste-based discrimination is a significant cause of low

* Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh
** Assistant Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

school admission and retention of the Dalit children (Islam & Parvez, 2013). In other words, the discriminatory practices have been internalized by the higher caste groups towards the Dalit (teacher, colleague, student, peer groups) in education and social networking on every day basis. More strikingly, education has not been significant to perpetuate awareness against nor ensured a value system that can resist discrimination at grassroots level (Nambissan, 2009). A survey conducted in 2008 in Bangladesh showed that school enrollment rate among Dalits was 10 per cent, dropout rate among enrolled Dalit children was 95 per cent (Chowdhury 2008, as cited in Islam and Parvez 2013) when national enrollment rate was 93.9 (BANBEIS 2016). In 2016, the Special Rapporteur on minority issues presented a report which concludes that discrimination on the basis of caste and analogous systems is a major cause of poverty, inequality and social exclusion of affected communities and recommends that states should consider including caste specific indicators in the implementation of the 2030 Agenda for sustainable development to ensure that the SDGs and their targets address the situation of caste affected groups. So, it can be said that despite of many attempt to decrease caste discrimination in our society and ensure their easy accessibility in their basic services, the Dalits children have low enrollment rates in primary education in comparison to the rest of the mainstream people in Bangladesh. This study intends to make an investigation to the status of Dalit community as an untouchable community, analyze the situation of their accessibility to basic education and recommend some guidelines to develop an easy and effective mechanism for provision of basic services for their improvement.

2. Objectives of the Study

1. to find out the actual causes those prohibit *Dalit* children to access their primary education.
2. to identify the underlying causes of the drop out of Dalit children from educational institutions.
3. to find out how the educational system itself carry out discriminatory practices that affects Dalit student.
4. to recommend the advocacy issues and intervention strategies to change the situation.

3. Methodology

The study was conducted within November 2021 to March 2022 at Munshigonj district. Among the six Upazilas in Munsigonj, one Upazila Munshigonj Sadar covering nine Union parisads and two Municipalities has been selected as the area of the study. The researcher used the purposive sampling method to select the respondents of this study. In order to discuss this issue, we have used in-depth interview, field observation to collect data for this study. For qualitative data, the researchers followed a flexible approach in adopting qualitative methods. The follow up questions were formulated semi structure during the interviews. The researchers took extensive notes during each of the interviews, discussions, observation and conversation. These field notes were expanded in order to find out information for

this study about the experiences and barriers faced by Dalit child when accessing education and help explore the root causes of the major barriers. The qualitative information provided the basis for the in-depth understanding of the issues raised in the objectives of the study. A total of 35 Dalit students participants are chosen from the ages of ten to eighteen and 10 Dalit guardians were part of the research, who were lived in selected study areas. Among them thirty participants were Dalit schools going children and five children who recently dropped out from their school. All interviews ranged from 50 minutes to 1 hour 15 minutes approximately. All the interviews were recorded to ensure that all data is stored carefully and important information is not excluded. The respondents were consulted to schedule time and date as per their availability. All the interviewees started with questions to make the interviewees comfortable and the researcher was sensitive towards privacy and confidentiality of respondents and carefully avoided questions that could affect their psychological wellbeing. The data were stored thematically according to the relevance of the aim of the study using.

4. Theoretical Framework

4.1. Social Exclusion Theory

Social exclusion theory is generally defined that social exclusion reflects the multiple and overlapping nature of the disadvantages experienced by certain groups and categories of the population, with social identity as the central axis of their exclusion but social exclusion is widely defined,

> Social exclusion is a complex and multi-dimensional process. It involves the lack of denial of resources, rights, goods and services and the inability to participate in the normal relationships and activities, available to the majority of people in society, whether in economic, social, cultural, or political arenas. It affects both the quality of life of individuals and the equity and cohesion of society as a whole (Levitas et al., 2007).

The definition makes clear the view that social exclusion is broader idea than poverty, taking up the issues of the rejection of human rights and lack of participation in the society. It argues that when anywhere placed in the broader context of inequality and deprivation, there social exclusion can be better understood. Due to the still-existent prejudice around the Dalit community, children from Dalit communities face discrimination even within the school from their peers and teachers. The Dalit children are faced different forms of discrimination in school and ultimately it leads to hindrance in their learning achievements, which often lead to dropout from school in early age. However, the causes for exclusion of Dalit child from education are deeply rooted in social, structural and behavioral features of the society. The school, society and the community work together to ensure exclusion in their education in society. As a result, it can be said that social policy should be focused on providing universal benefits or *reaching the* lower caste poor people rather than ensuring the social inclusion of the excluded.

4.2. Human Capital Theory

Researcher in this study feels that human capital theory would be an appropriate tool to guide the research to understand about the education attainment of the poor Dalit children in third world countries. In the context of Indonesia over the period 1997 to 2000, Treena Wu (2010) has used this idea to explore the constraining factors to human capital investment. She wants to analyze how family income and physical facilities works together as constraining factors for the poor people to the investment in education. This concept is similar with this research and researcher would like to see how Dalit family status of income works as constraint factor for human capital.

> Backer, 1993 presented that the concept of human capital refers to investment in education by family and state with the expectation from future earning and productivity. It also presents the link between birth rates and investment in education and training and how family influences the human capital of their children and the relation between investment in human capital and economic process (Becker, 1993).

Recently, human capital theory is playing important role to analyze the relationship between education and development of human capital in different societies. It also finds that family investment in education in developing countries is much lesser that developed countries. In the context of Bangladesh, most of the *Dalit* family income is very low and it became very hard to maintain educational expenditure for their child. Their children are engaged income generating work from their childhood to maintain their family expenditure and it became very difficult to them to continue their school with work. Thus results in disappointed in school education and activities which drives them out of school and update their skills and knowledge.

5. Data Findings & Analysis

5.1 Socio-demographic profile of the respondents

The present study was conducted among the *Dalit* community in *Munsigonj* district. In total 35 respondents ranging from age 10 to 18 years were interviewed. The table shows that the age group of the respondents where it is clear that a large number of respondents (54.29%) belong to the age group (10-12); while 28.57 percent is under the age group (13-15); besides 17.14 percent of the total respondents belong under (16-18) age group. The table indicates that 65.71 percent respondents are male and 34.29 percent respondents are female. The findings of the religious status of the respondents reveal that 57.14 percent respondents belong to the lower caste Hindu, 34.29 percent respondents are Muslim and 8.57 percent belongs to others religion.

Table 5.1.1: Education status of the respondents

Education level	Frequency	Percent
Lower primary level (1-4)	18	51.43
Primary level (5)	10	28.57
Lower secondary level (6-8)	6	17.14
Secondary level (9-10)	1	2.86
Total	35	100

The table signifies that a large number of respondents have lower primary level education 51.43 percent and about 28.57 percent of the respondents have understood completed their primary level education. While, near about each 17.14 percent of the total respondents have education level is lower secondary and 2.86 percent respondent completed higher secondary education.

5.2. Poverty and Vulnerability

Poverty is one of the major causes of low participation of *Dalit* in education. The prevailing attitude towards the *Dalit* also discourages them to pursue education. In the school, *Dalit* children are discriminated against and reject by other students and teachers; as a result, many of the *Dalit* children conceal their identity in the school. They also know that they will face discrimination in getting a suitable job due their *Dalit* identity and lose interest in studies (Nahar & Hasan, 2016). On the other hands, lack of money to buy essential school materials for children's schooling is likely to cause lack of enrollment in the first place and potentially high dropout at a later stage (Kadzamira and Rose, 2003). So, the dropout rate among the *Dalit* children is very common due to poverty and their vulnerable position. *Dalit* children face different types of discrimination, discouragement, exclusion, physical and psychological abuse from their class teachers and their classmates.

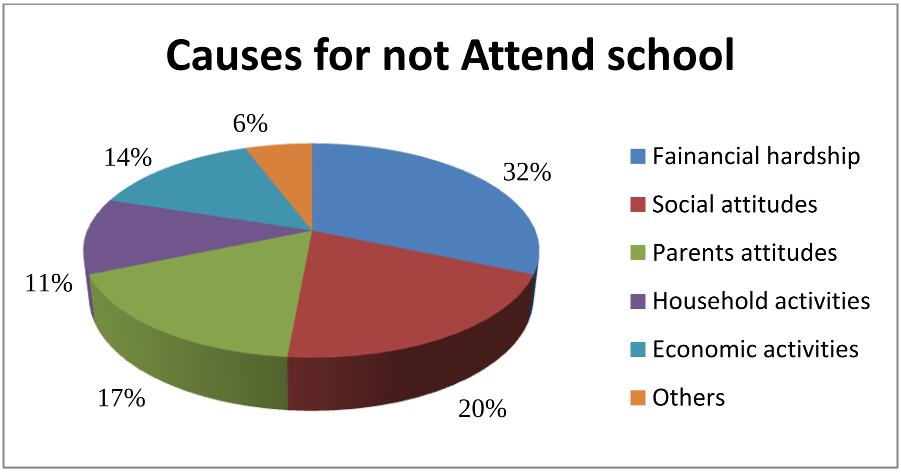

Figure: 5.2.1 Percentage distribution causes for not attended school of the respondents

Figure 5.2.1 shows that economic crisis have been identified as the main cause for not to continue their education that is 32 percent and 17 percent are not attending school for their parent's attitudes. Another 20 percent is not attending school due to social attitudes and 14 percent and 11 percent are not attending school for participation in economic and household activities respectively. In the remaining 6 percent are not attending school for other reasons. So, most of the *Dalits* are

dropping out of schools due to poverty and others escape for humiliation and bullying by their classmates, members of the higher castes and even teachers. Most of the respondents have to emphasis more on family stable income than education because of their economic hardship and their minimal income from their fixed occupation. Children have to contribute in family income, help their parents at household work and also go to school. Such load from early life seemed to affect their performance in school activities. Because of this reason they are not able to show expected outcome in their education. On the other hand, still now Dalit parents are not interested to send their children to school. One *Dalit* parents said:

> The main barrier for our children is economic condition, which prevents them from going to school and completing the school's cycle. Our children when they start to mix with other students in their school then increase their necessities and demands too. When the parents are not able to fulfill their demands, they feel inferior in front of friends. This makes them quit the education and get involved in income generating activities. The less attention of the Dalit parents towards their children is also a major barrier for Dalit children to complete the school cycle. As they grow up ten to twelve years or more, Dalit parents are expected to do households and income generating activities. So, the Dalit children do not get the proper attention to their overall development.

As a member of lower caste, Dalit started to involve in their family work early in their life to maintain their family expenditure. So, it is one of the main causes behind the low rate of school participation and high rate of drop out from school among Dalit children.

5.3. Physical Distance of School

While children from all castes, especially in rural areas, have to travel long distances to reach their schools due to the physical remoteness of the place, the social distance created by caste-based segregation further exacerbates the inaccessibility for *Dalit* students. The inaccessibility could be part of the reason for low school participation of the *Dalit* students (Rajak, 2015). So, distance plays an important role in determining a Dalit child's ability to attend his school. Most of the Dalit live in a ghetto which is often located outside of a village. It is very difficult for *Dalit* children to travel this long distance and sometimes they face assault, sexual abuse or abduction in the way of school. In this study data present that 65.71 percent respondents have bad experience in the way of their school. Among them in the way of school 60.87 percent have the teasing experience and another 21.74 percent have experience of assault by the upper class villager. On the other hand 8.7 percent face sexual abuse and abduction and rest of the 8.7 percent have others experience. So, school distance is often creating as a barrier for *Dalit* children in Bangladesh for their education. For this reason, physical separation is considered to prohibit their interaction and communication within the villagers. 42 years old Dalit parents narrated:

> Particularly in the rural area, the physical distance to school is often cited as a barrier for our child education. Because most of the cases it is tru that Dalit children as they often live in communities which are the outer edge of the village. Although, it should be noted that where the Dalits lived in a Harijanpara causing the children to walk through the dominant Dalits caste habitation in order to access the school. Our children's hesitations to move freely, forced to negotiate their way through the dominant caste village on a daily basis. The geographical separation is designed to prohibit interaction and free movement within the village and sometimes our children face tease on the way to school and sometimes they felt uncomfortable to walk in the upper caste village. For this reason, many Dalit children lost their interest in attending school.

Parents, however, often take on an unreceptive attitude, but dropout is due to the influence of other drop out friends in these colonies. Their friends, many *Dalit* children have always influenced the school-going children to discontinue their studies. One guardian told about her son:

> It is true that most of the school is far from our locality but my son does not want to walk there alone. If his friends are not going, he also stays home to play with them. I like to be strict and order him to go, but he does not listen to me. Sometimes my son misbehaves and one day raises his hands on me. Now I keep silent because of experiencing such things. I suffered more than that, but I forgot. I cannot think my children will be illiterate. They are growing now; all time I am worried about their future. When I think all those things, I wish to die.

5.4. Social Distance

Typically, *Dalit* enclaves are located outside of the mainstream society, resulting in *ghettoized* living in many regards. This residential segregation is a direct form of exclusion as it obstructs access to public facilities mainly located in the dominant caste habitations: *Untouchability* is further reinforced by state allocation of facilities; separate facilities are provided for separate colonies (HRW 2003). In the context of Bangladesh, physically separated from the rest of society, they are also psychologically segregated. Considered second class's sort of human beings, they are often refused a place in restaurants, shops and public venues in general. Social exclusion fall into them vulnerable condition and they are not able to attend to their child education.

The figure 5.4.1 shows that due to their lower caste identity, around 24 percent of the respondents tolerate obstacles in getting admission in the non-community schools. At the time to get admission in schools, 23 percent *Dalit* children have to hide their identity. The study found that 33 percent of *Dalit* students have bitter experienced like physical and mental abuse from their classmates and 24 percent faces discriminatory attitudes of teachers towards them. Moreover, 3.5 percent of the

respondents said that they must be seated on separate benches in school still now. *Dalits* are not allowed to interact with mainstream society. It is hardly showed the picture that *Dalit* people get a chance for social interaction and communication with mainstream society of the village for their needs. *Dalit* are not acceptable to visit the holy place and they are prohibited in any common socio-religious and cultural events in the village.

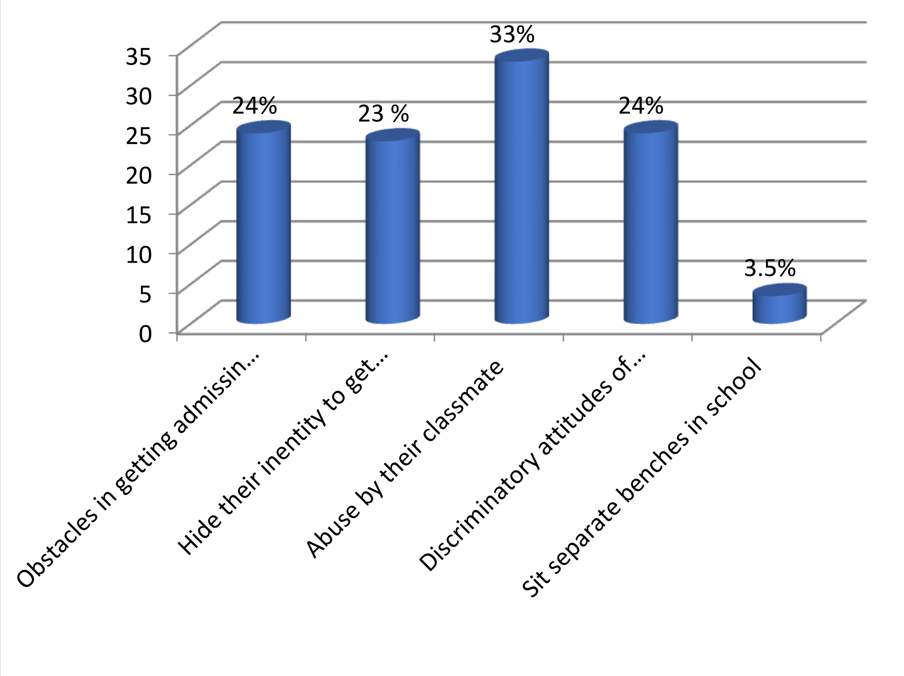

Figure 5.4.1: Percentage distribution of the respondents face discrimination in the education sector

Mukesh Das, 17 years, secondary student belonging to the *Dalit* caste and said:

> People from our caste are not invited to village festivals, marriages and other celebrations. In some cases, if they like to invite any Dalit in the communal feast or marriage ceremony, they make also separate sitting arrangement and menu for the Dalits. So, they are not allowed to sit with them and eat together. A group of people from mainstream society is taken all the decisions related to the whole village. Even in the matter of ours, they don't consult with our representative.

Due to social exclusion parents lost their interest in their children's education because they think that their child will not get any white color job after completing their education and it also makes *Dalit* students indisposed to education. Thus the study finds that a complex social, economic, cultural and physical aspects are responsible for limits the access of *Dalit* children to education.

5.5. **Parents Attitudes towards Child Education**

To estimate the total capital investment in education, it is necessary that one should add to the loss of wages (as a result of not getting a job) both the direct and the indirect costs of school (Voiculescu, 2009). Due to the loss of opportunity cost in education, Dalit parents are not satisfied with their decision of sending their children to school. They seem that their choice of sending their children for schooling does not carry on any positive outcome rather it turns out be a waste of productive time. It is better for them that their child can be used for earning some money by helping them in their work. Though, the possibilities to find a good job is very rare for the Dalit child after completing their education, parents holdback from sending their children to school. Dalit people have realized that if they send their children in school, they will loss their probable income for the family. On the other hand, after finishing their education successfully, they will not get any white color job for their caste identity. So, it can be said that lack of their expected outcome from the schooling are major dissatisfaction regarding schooling in the community. The majority (37.14%) of the respondent said that their parents were not interest their higher education because they will not get white color job after completing their education and 25.71 percent think education is not necessary for our job. Among them, 11.43 parents are not interests on education because education cost is so high that they will not able to bear it. On the other hand, 5.71 percent think that if their child educated, it will be tough for them to get marry their children within their community and 8.57 percent parents are worried for their security. Rest of the (11.42%) are not interested about our education for others reasons. A *Dalit* parents said that in this matter

> Frustration among the literate person in our community plays an important role for our children's apathy from their education. In our community, most of the parents are more interested to engage their children in work than education. They consider that event with education their children will never get any better job and place them in a better position due to their inborn status. In recent years due to many educational facilities of the government and various campaigns and direct and indirect support by many organizations helped in the enrollment of the marginal students. However, there are still many children who do not go to school because our social and economic situations prohibit them to go to schools. Dalit parents also think that this will not afford our child sufficient opportunities to enter the better position.

Generally, education of Dalit girls is denied in Dalit communities**.** As a result**,** Dalit girls have inadequate access to education compared to their male counterparts. Normally our society considers that boys are the inherent of parents and they will stay with them all over their life. On the other hands girls who has to go to husband house after their marriage. So, the parents have a tendency of preferring boys than girls to send school. Moreover, *Dalit* girls who get the opportunity to be enrolled in schools, often it leads to drop out before completing their studies. It mentioned that one of the major factors discouraging parents to send their daughters to school is

sexual harassment. One 16-year-old *Dalit* girl narrated the present situation for drop out in the early stage of education:

> Many parents of our community think that education is not a necessity for our girls because our girl will be married at an early age and if they became educated, they will not get them better marriage or not get them white color jobs for our caste system. On the other hands, education being a particularly expensive commodity for Dalit families, it is better for women to focus on maintaining the household. Sexual harassment is on the important factors discouraging parents to send their daughters to school. Often parents prevent girls from going school because they fear the girls will be faced harassment on the grounds of their caste status.

It has been observed that the family economic hardship, household responsibility, patriarchy attitudes and traditional social practices are creating as restricting factors for not completing the education for Dalit girls.

5.6. Discriminatory Attitudes of Teacher

Teachers are the key players to make children perfect on their schooling. They are the future makers of raw children (Bishwakarma, 2011). Teachers' empathy with children from diverse or disadvantaged backgrounds are important in providing an education service which is attractive to marginalized groups (Kabeer, 2011). Sometimes teacher's behaviors and attitude towards the students can have very negative impact on students. Especially the physical punishment and the attitude towards the underperformed students work as a discouraging factors for children to go to school (Mishra et al, 2010).Teacher's fellow feeling and discrimination attitude is a common part of *Dalit* children's school experience. Some previous qualitative studies suggest that most of the cases, teacher attitudes and practices in the classroom negatively affect *Dalit* children. As a result it is one of the major *push factors* from their school. One of the drops out boy mentioned that he left the school because he has been getting beaten up in school often. He also mentioned that his relationship with one teacher was not good at all and he explained his feeling as follows,

> Our class teacher said that we (Dalit child) would sit in the last bench every day. For this reason I could not hear the lecture properly and sometime if we asked any questions toward teacher to know anything answer the question, they scold us badly. My math teacher used to scold me and beat me like every day. When he used to enter the class, first he asked for my homework but most of the day I did not understand math for sitting last bench. So, I usually got beaten up. One day I scold back the teacher and I left to go to school. Everybody asked me to go but I did not go. I did not attend final exams and left my school completely.

One guardians of the *Dalit* child complained:

> Teachers' behavior often tends to humiliate to our child. Through we are poor and marginalize community; we are not able to send our children to

> school regularly for our economic and social vulnerable condition. Not only teachers in the school but also school managing committee show discriminatory attitudes to our child. Sometimes, they don't distribute all the things that the government sends to our kids. So, there is corruption going on in this Dalit scholarship scheme in public schools. Management committee and school administrations, which lack participation of Dalit communities, are never transparent, practical and accountable. Without notice most of the time teachers are absent in their class room. But as a parent, we cannot say anything because all teachers have a strong connection with school managing committee or local politicians.

Though most of the *Dalit* belongs to poverty line, their children are enrolled in government or community schools with substandard facilities like, lack of basic infrastructure, teaching space, teachers, and teaching aids. As a result, large numbers of *Dalit* children drop out of school in the early elementary stages for their teacher's discriminatory treatment.

5.7. Discriminatory Attitudes of Peer Groups

Peer treatment also plays a pivotal role in shaping the *Dalit* children's experiences of school as teasing and the requirement to use titles of respect for the dominant caste children define their every day (Holzwarth et.al. 2006). The behavior of peers to *Dalit* student becomes a cause of school dropping out by *Dalit*. Inside class room, the higher caste students do not give permission to sit with them. Mostly *Dalit* student sit behind of the class room separately and in some schools *Dalit* are not still allowed to enter the schools (Bishwakarma, 2011). In previous study indicates that all peer students from mainstream society are not behaved in the same way and most of the *Dalit* students have experience a mixed peer relation. Some are friendly behaved while others are rude and discriminatory behave showed to their peer groups in the educational institution. However, all of the *Dalit* students have revealed negative impression about mainstream peers. Peer groups from mainstream society usually tease them and insult them for their parent's profession and lower caste identity. As a result, for their peer group's negative behavior, many Dalit child leave school in the early stage of their education. So, the prejudiced patterns for *Dalit* children discourage them to continue their education. *Dalit* children do not get support from higher caste children in learning process e.g. discussion to related topics, sharing and exchanging talents.

Table 5.7.1. Percentage distribution attitudes of peer groups towards respondents

Attitudes of Peer Groups	**Frequency**	**Percent**
They behave friendly		
Yes	6	17.14
No	29	82.86
Negative attitudes on peer groups		
They behave rough and tease us	9	31.03
They are not play with us	6	20.69
They are not sit with us	4	13.79
They are not share their tiffin with us	3	10.34
All of those	5	17.24
No response	2	6.9
Total	**29**	**100**

The present study data shows that 17.14 percent of the total respondent said that peer groups attitudes is positive and friendly towards them and 82.86 percent said that they face different types of negative attitudes from their peer group in school. Among them 31.03 percent said that their peer group behave rough and tease them. Another 20.69 percent & 13.79 percent respondent said that they do not play and sit with the respondent respectively. Moreover, 10.34 percent respondent said that peer group do not share their tiffin with them and 17.24 percent said that they faced all of the negative attitudes from their peer group in their school. Mainly the majority of higher caste students make a gang to discourage *Dalit* students, which embed the dropping out of *Dalit* children. In this regards a *Dalit* student said:

> Student of mainstream society doesn't like to set or share food with us. Sometimes they bring some foods specially birthday cake or other foods and share with other students but they don't offer us. I don't eat it. I think that they hate us, but still they don't feel good to have food from us.… that they are being dirty is entrenched in my mind and difficult to put it aside .

Dalit students do not get opportunity to admit the school in appropriate age. Therefore, peer's tease them that they are older than other peers. Some of them want to study though they do not go to school because of humiliation. The prejudiced practices discourage *Dalit* children to continue their education (Mahat, 1999). So, sometimes they were a victim of verbal abuse by their peers. It was particularly distressing to hear a *Dalit* girl story with frustration. She said:

> Some of my mainstream classmates look down at me because I am a Dalit girl and I am oldest than them. Some even they treat me as an unclean girl. I remember one day, one of my classmates shouted and said that she felt a

> bad smell from my body. She covered her nose with his hands and said not sited with her. She said that in front of the whole class and I felt awful. It's sad that even in the twenty first century; we have to deal with such things.

On the other hand, most of the *Dalit* are poor and they are not able to bear educational expenditure for their children. But fortunately who are enrolled in schools, they face different types of discriminatory treatment in their educational institution. As a result of their discriminatory behaviour, enormous numbers of *Dalit* children drop out from their school in their early life.

6. Discussion and policy implication

Now-a-day, it is accepted by all the groups of the society that education is the basic tool for bringing the change in the society, but the school participation rate of the Dalit children is still very low with compared to other higher caste in the society. Dalit children often face considerable physical and psychological abuse in schools, including exclusion, alienation, discouragement and segregation from both their teachers and peer groups. Most of the cases Dalit children continue their study in a hostile environment and frequently facing different types of abusive words, teasing and mocking for their low caste identity. It makes a bad impact on the sensitive minds of Dalit children, leading to drop out them from their early stage of education. The findings from the study suggest that most of the children from this community seemed to be dropping out early stage from their primary education. The lower rate of school participation and higher rate of drop out in these social groups are not only causes for the lack of knowledge among parents and children but also because of the gap between knowledge and reality. On the other hands, there is the negative relation between numbers of children and invests in human capital in the aspect of Dalit family. A large number of children increase the actual cost, an additional money and hour of time spent on each child. But it has no certainty that they will get any kind of white color job from their community. As a result, Dalit parents are not interested on the investment in education for their child. Some social groups seemed to be aware with the benefits of schooling but somehow they are not serious to materialize their knowledge into practices. It is realized that different types of economic like, cost of schooling, child work benefit and social and cultural factors like, exclusion, child marriage and migration trends play an important role to constrain their knowledge into practice. It is true that in spite of active encouragement for these socially disadvantaged groups, indifferent treatment by teachers, peer groups and school administrators largely constrain them from education. The educational institution must take a leading role to alleviate this situation. Educational institution should make an integrative space in the community and that can contribute to change children's perceptions. Therefore, caste-based discrimination in schools is an important problem in third world country and needs urgent consideration to solve this problem by researcher and policy-makers. A broader approach however is needed for education policy and resulting programmes to effectively address social exclusion and discrimination of *Dalit* children from primary school. Governments and non-government organization should take all necessary measures to remove obstacles, including child labour, which keep children from regular full time

education and national and local governments of Bangladesh should take effective measures to reduce dropout rates and increase enrollment rates among children of affected at all levels of public and private schooling. On the other hand, through various internal training and public campaigns, national and local governments should take specific measures to raise awareness both among the public and among government officials, teachers, and media practitioners on discrimination based on work and descent in Bangladesh. So, a more comprehensive approach is therefore proposed which highlights the various inter-related processes which influence decision-making at various levels related to a child's education and it brings tangible benefits in return.

7. Conclusion

The Constitution of Bangladesh provides the Dalits equal rights to assess to common resources but they are still been excluded based on their social- category. Different forms of discrimination against Dalit children are noticed at various stages in schools. The discrimination appears directly or indirectly in the forms of sitting arrangements in classes and share meal, sexually extensive harassment of Dalit girl, participation into school games and cultural activities, facing lack of respect from non-Dalit students and teachers. Collaborative efforts of both government and non-government entities concerned has become indispensable to build an equal society on the basis of equality, dignity, prosperity and security by eliminating all forms of discrimination against them.

Reference

BANBEIS (2016).*Bangladesh education statistics 2015*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, Ministry of Education.

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education* (3d ed.). Chicago, France: University of Chicago Press.

Bishwakarma, M. B. (April 25, 2011). Comparative study of Dalit education in Nepal available at SSRN. Retrieved fromhttps://ssrn.com/abstract=1822163

Holzwarth, S. Kanthy, S, Tucci, R. (2006). *Untouchable in school experiences of Dalit children in schools in Gujarat, Summer internship programme,Unicef. New Delhi. India: Institute for Dalit Studies*. Retrieved from https://idsn.org/wpcontent/uploads/user_folder/pdf/New_files/India/Unicef_Report_CD_in_Education.pdf

HRW.(2003). Caste violence against India's "Untouchables".Retrieved from https://www.hrw.org/reports/1999/india/India994.htm

Islam, M. and A, Parvez. (2013). *Dalit initiatives in Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: Nagorik Uddyog & Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement*. Retrieved from https://www.google.com/

Kabeer, N. (March, 2006). *Social exclusion and the MDGs: The challenge of 'durable inequalities' in the Asian context.* Institute of Development Studies, paper presented at the Asia 2015 Conference. Retrieved from

https://cdn.atria.nl/epublications/2006/ Social_Exclusion_and_the_MDGs.pdf

Kadzamira, E. and Rose, P. (2003). Can free primary education meet the needs of the poor? Evidence from Malawi, *International Journal of Educational Development*, 23(2).501-516.

Mahat, P, B. (1999). *Educational conditions of Sarki children in primary schools).* Kathmandu. Nepal: Action-Aid.

Mishra, N, Thakur, K, K., Shrestha, R., Poudel, D.& R, Jha, R. (2010). Corporal punishment in Nepalese school children: Facts, legalities and implications. *Journal of Nepal pediatric Society*, 30(2):98-106.

Nahar, A & Hassan, Mahmudul, A.A (2016), *Dalit communities living in Railway colonies/lands in northern part of Bangladesh (2016), Bangladesh & HEKS.* Retrieved from *https://bdplatform4sdgs.net/wp-content/uploads/2016/08/Dalit-Communities-Living-in-Railway-Colonies-or-Lands-in-Northern-part-of-Bangladesh.pdf*

Nambissan, G. B. (2006). Terms of inclusion: Dalits and the right to education. In Kumar, Ravi (ed.), *The crisis of elementary education in India*, (pp.225-265). New Delhi, India: Sage Publications.

Nambissan, G. B. (2009). *Exclusion and discrimination in schools: Experiences of Dalit children.Working paper seriesIndian Institute of Dalit Studies and UNICEF.* Retrieved from

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bi0tDqC_Wi8J:dalitstudies.org.in/wp/wps0101.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd

Rajak, L. (2015).*Voicing the unheard: An examination of the school experiences of Nepali Dalit students*. (Doctoral dissertation, Duki university), USA. Retrieved from https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/9726/FINAL_Laxmi%20Rajak.pdf;sequence=1z

Sen, A. (2000). *Social exclusion: Concept, application, and scrutiny*. Manila, Philippine: Asian Development Bank.

Treena, Wu. (2010).*Constraints to human capital investment in developing countries: Using the Asian Financial Crisis in Indonesia as a Natural Experiment*. (Doctoral dissertation, Maastricht University, Minderbroedersberg, Netherland). Retrieved from

file:///C:/Users/daisy/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/TreenaWu_BW_17%20(1).pdf

Voiculescu, F · (2009).Opportunity cost of educational human capital. Retrieved from http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1120092/15.pdf

Date of Submission : 24.08.2022
Date of Acceptance : 20.11.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July–December 2022

Why do Women Migrants Return? Evidence from Bangladeshi Migrants

Azmira Bilkis*

Abstract

Bangladeshi women basically migrated to Middle East countries for earning a better livelihood. Recently, Bangladeshi female migrant domestic workers faced many problems in their destination countries. Therefore, many migrants have returned home before concluding their working tenure. This article identifies several challenges and experiences that returnee women domestic workers face during their stay abroad which are crucial in return migration. To analyze why women migrants return to Bangladesh, a mixed-method was employed in the twelve villages of five Unions (Manikganj, Bangladesh). Based on the return migrants (on a ten-year reference period), the study used purposive sampling, where a combination of closed and open-ended questions was included in the interview schedule to collect data through face-to-face interviews with 123 respondents among different categories of participants. The findings of this study reveal that the three commonly identified forms of return migration (i.e. end of contract, forced back, and nostalgia), are the main factors of female return migration. The study's findings suggest that there should be an effective reintegration program for the returnee migrants to ensure their social and economic well-being.

Keywords: Migration, Female Domestic Migrants, Returnee Migrants, Forced Return, Return Migration

1. Introduction

The labor markets are significantly impacted by globalization, which increases prospects for women to migrate internationally. Lee (1966) asserts that both push and pull forces affect migration. Olwig (2001) argues that migrants are either drawn by alluring prospects in the country of destination or are forced away from their original place. While poverty, overpopulation, unemployment, and difficulties in the local job market act as push factors for this current migration trend, the effects of globalization and potentially increasing demand for workers can be seen as pull factors (Jureidini, 2005; Piper, 2005; Piper, 2003; Singh et al., 2012). People were compelled to migrate for a variety of reasons, including seeking new employment, enhancing one's professional opportunities, raising one's income, and raising one's standard of living (Klagge/Klein-Hitpaß, 2007).

Bangladesh has emerged as an essential migrant laborer for developed and developing nations and recently, migration has created a vast opportunity for poverty reduction, women's empowerment, and income generation (Masud and Hamzah, 2018). Female labour migration began and expanded quickly from Bangladesh because of the increasing demand for paid domestic workers in Middle Eastern countries (Barkat and Ahsan, 2014). Compared to the other labor-sending countries,

* Assistant Professor (Sociology), School of Social Sciences, Humanities & Languages, Bangladesh Open University, Bangladesh

the number of Bangladesh migrants is primarily short-term in employment, less skilled in working performance, and low-paid (Masud and Hamzah, 2018). About 700,159 people migrated from Bangladesh for overseas employment in 2019. Among them, about 104,786 were female workers, comprising 14.96% of the total migration from Bangladesh in 2019 (Bureau of Manpower, Employment and Training [BMET], 2021b). Usually, migrant female workers have to return home after two to three years of their contract tenure (Barkat and Ahsan, 2014). Although, excessive workload, lack of communication with their home, and physical exploitation make their stay abroad more challenging and problematic. As a result, in recent years, a rising number of Bangladeshi migrated women have returned home from abroad (*The Daily Prothom Alo*, 2019). It is noteworthy that, Bangladeshi female migrant domestic workers are often forcefully returned from the Middle East before concluding their working tenure due to the various difficulties and challenges they face while working there. Although there are some specific challenges, educational qualifications, lack of information, and training are major causes of suffering in all stages of overseas migration.

In this study, *migration* and *return migration* depend on poverty, violence, income, and employment, and the figure below depicts how these variables are related to each other.

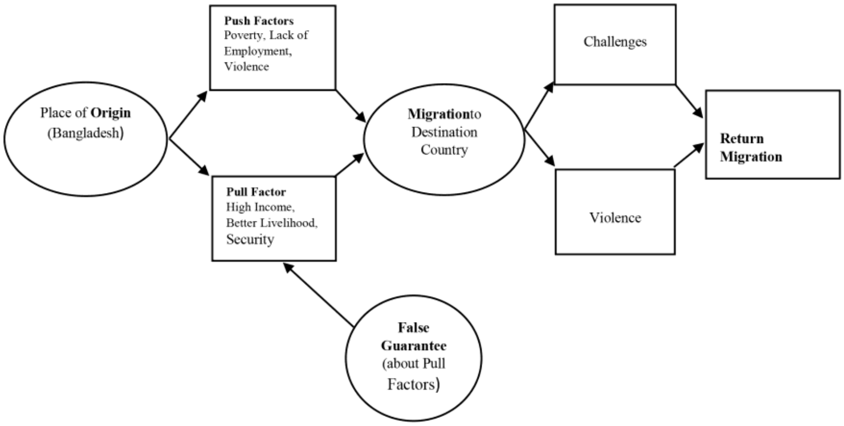

Figure 1: Relationship between different Concepts used in this Research

Source: drawn by researcher.

In Bangladesh, most of the returning population belonged to the most impoverished strata in society; they faced multidimensional problems while returning to their community, culture, and country (Nawaz & Tonny, 2019). Despite the prevailed realities, related literature lack about the female return migration in various areas of Bangladesh, and the challenges and difficulties they faced abroad. Realizing this gap, this paper finds it crucial by analyzing the return migrants as a consequence of international migration in the context of Bangladesh. The study suggests that it is necessary to incorporate integrated approaches for return migrants at the individual, structural, and communal levels. It is expected that the study will extend the previous

studies and specify the challenges of women returnees in Bangladesh. Since female migration is among the country's most important revenue sources, the study's results will serve as a valuable resource for policymakers, educators, community development and social welfare workers, and activists.

1.1 Rationale of the Study

Historically, unskilled laborers' return migration rate is comparatively higher in Bangladesh among all Asian countries. Previous studies show that most women are sufferers and subject to harassment by their employers and brokers through a lonely and traumatic return process. As there is no record of returnee migrants, it is impossible to estimate how many migrants returned or who returned to Bangladesh after facing abuses. In Bangladesh, the multidimensional aspects of development, including social, cultural, and political perspectives, are relatively absent in the return migration phenomenon. From the literature review, it becomes apparent that some research works have dealt with the obstacles that migrant women face in the Middle East. Nevertheless, Bangladesh is a sending site, and the Middle East countries as the recipient site are relatively absent. In contrast to several studies, this study aims to meet the mentioned gap by analyzing the return migrants as a consequence of international migration. To my knowledge, there is no study conducted solely on the challenges of migrants from the Middle East returning to Manikganj. In my view, there is a need to examine the challenges the female returnee migrants have been facing while they return to their families and community. The study will also analyze the factors that influence the migrants' decisions to return and the challenges they face while living abroad, and the experiences of Bangladeshi female domestic workers who have returned from the Middle East.

It is important to note that not all Bangladeshi return migrants represent the sample utilized in this study. Even then, this study has significance on both practical and theoretical levels. Furthermore, studying the case of Bangladeshi female return migrants would benefit Bangladesh by understanding female migrants' challenges and difficulties abroad. However, taking Bangladesh as an example, this knowledge can also be used in other developing regions. Moreover, this study will supply ideas for the new researcher to go for explanatory research in the future. In Bangladesh, most returning migrants belong to the most impoverished strata of society. It is also a significant concern for the Bangladeshi government. Therefore, return migration has a massive social impact and is also eligible for social research.

1.2 Research Questions:

Specifically, the research aimed at finding answers to the following questions:

RQ1: What is the socio-economic background of the return migrants?

RQ2: Which factors are influencing the return decision?

RQ3: What obstacles do migrants face during their return?

2. Theoretical Overview of Return Migration

The migratory cycle includes a large amount of return migration (IOM, 2013). When a migrant arrives in their home country, they are referred to as a 'return migrant' (Cassarino, 2008). So, the person who returns to their home country after living abroad is known as return migration. Smoliner et al. (2012) stated that returning to the origin country is part of the migration plan. Cassarino's (2004) study of Theorizing Return Migration also suggested that a return migrant temporarily or permanently returns to their native country following an international migration experience (short-term or long-term). Within the mix of push and pull factors, migrants' experiences of failure in the destination country and nostalgia for the home country are key drivers for return decisions. King (2000) stated that "return migration may be defined as the process of individuals returning to their birthplace or place of origin after spending a significant amount of time in another nation. Returnee migrants, according to UNESCO, are those who return to their home country after spending time in another nation." The decision to return is related to structural or individual factors (Martin, 2003). On the personal level, age, gender, duration of stay, savings, and family conditions can contribute to deciding to return. On the other hand, return migration is complicated by circumstances that confound the typology of return motivation (King, 2010). The positive contribution of return migration to home countries' development is gaining recognition worldwide (Willoughby & Henderson, 2009). The problem is aggravated if the families had to enter into debt to finance the migrant abroad (Kleist & Millar, 2013). Likewise, the return back of the migrants means sudden impeding of remittances. They had been experiencing several causes not presumed previously by the respondents, associates, and senders. Several obstacles faced by the women workers forced them to return to their homeland (Ketema, 2014). The factors were excessive workload, physical and mental harassment, unhealthy work environment, delayed payment, and nonpayment that had been significantly important. After returning home, female migrants usually face problems finding a job, although they have higher skills and practices (IOM, 2018). A study by Nazli Kibria (2004), where she used an in-depth face-to-face interview, was performed with some returned workers. Applying the quantitative method to returnees in Bangladesh, Kibria (2004) said that highly abused situations of domestic migrants throughout the Middle Eastern countries of Bangladeshi female migrants.

This study has focused on Neo-classical Economics and Neo-economics on labour migration perspectives to explain the phenomenon of return migration. According to Neoclassical economic theories, return migration occurs due to a mismatch between information obtained about the destination country's prospective working circumstances and actuality. In this light, when migrants fail to fulfill their hopes and dreams about the migration plan, they return to their home country. In general, it could be stated that their return is a result of their failed overseas experiences. Thomas (2008) says that migrants return when they do not receive the promised benefit from improved incomes abroad (Constant & Massey, 2002; Cassarino, 2004). According to Todaro (1969) and Cassarino (2004), migrants leave the country because of the difference between their origin and destination and feel that they can

get a job in their destination country. On the other hand, Neoclassical economic theories state that return migration happens due to the mismatch between the information received about the prospective working conditions of the destination country and the reality. According to Cassarino (2004), migrants returned due to imperfect information and failed experiences abroad. It was the primary concern of the neoclassical approach. It finds that wage differential is the key motivator of migration. For that reason, most individuals decide to migrate.

The New Economics of Labor Migration (NELM) refers to the migrants for a specific period, and the main target is to receive higher income and accumulate savings. Similar findings have been found in a study by Smoliner et al. (2012), which shows that migrants move overseas for a specific period to earn more money and save, according to the New Economics of Labour Migration. The number of women returning from Saudi Arabia as domestic workers have been rising. Some of them return to a mental imbalance condition, some with injury or signs of sexual abuse. During the first eight months of last year, at least one hundred fifty-five female domestic workers returned from Saudi Arabia only (*The Daily Prothom Alo*, 13 September 2018). Remarkably, in 2018 several 401 migrant workers back to Bangladesh after being harassed by various forms of violence in their destination country; 368 of them were women, which is hugely concerning for Bangladesh (*The Daily Prothom Alo*, 29 August 2019). According to BRAC Migration Program estimates, every month, around 300 to 400 female workers return from the Middle East, especially Saudi Arabia, after being tortured. About 800 domestic workers returned to Bangladesh in January 2018 (*The Daily Prothom Alo*, 29 August 2019). They stated that they were treated with various harassment in their destinations, including physical and sexual assault (*The Daily Star*, 12 June 2018; *The Daily Prothom Alo*, 5 June 2018). About 550 domestic workers returned to Bangladesh for two and half months (*The Daily Prothom Alo*, 23 January 2019). Newspaper stories frequently mention the forced and unexpected returns of FMDWs from the Middle East, despite the lack of precise recent information about the ratio of successful or failed returnee Bangladeshi FMDWs (Ara, 2018; Tithila, 2020). Since many FMDWs leave before the end of their contracts, they are unable to attain their objectives (Nawaz and Tonny, 2019). The returnees face difficulties in their home country and confront new challenges.

3. Study Area and Methodology

This study looked at the current situation of return migrants who went to other countries and then returned to Bangladesh for various reasons. These causes range from psychological, societal, political, and economic factors to personal factors. To obtain a complete picture of the situation concerning return migrants, data were collected through a mixed method approach (i.e. qualitative and quantitative) (Creswell, 1999; Creswell and Clark, 2007). Since the study was an attempt to analyze the situation related to returnee migrants, a purposive sampling procedure has been applied to identify the study respondents for the study.

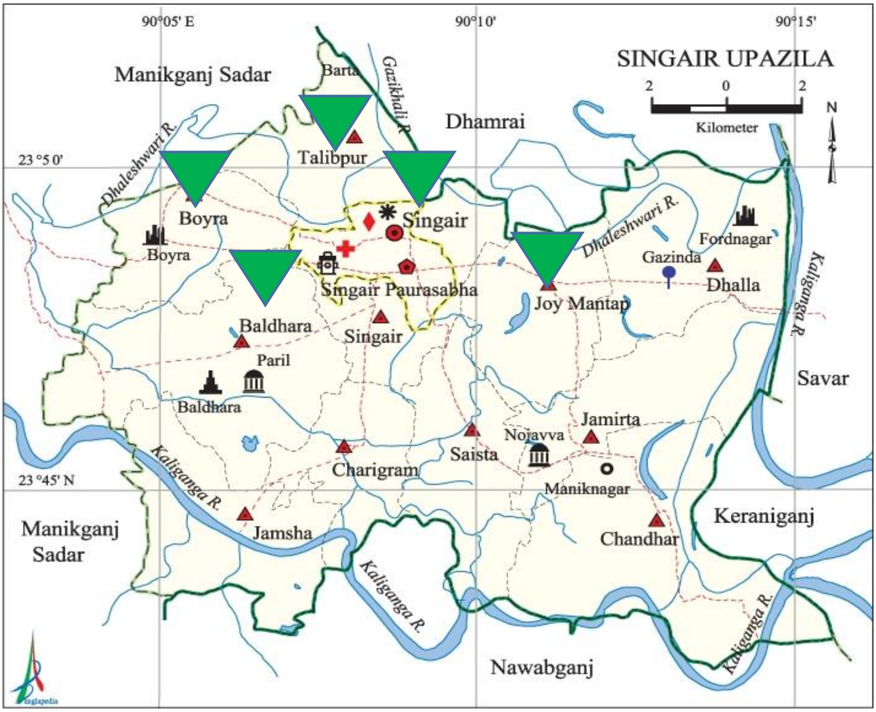

Figure 2: Baldhara, Bayra, Joymontop, Singair, and Talibpur Union, the study location in Singair Upazila, Manikganj District.

Source: Adapted from Banglapedia (2019)

This paper is part of the author's PhD thesis, which uses a section of analysis relevant to the understanding of female returnees in Bangladesh. For choosing the study area, the researcher used multi-stage sampling techniques and a purposive sampling procedure. Manikganj has been selected as the study area purposively due to its number of return migrants, according to BMET (2018) data. By following a multi-stage sampling technique, gradually from the districts, one Upazila (Singair), (out of 7 Upazilas), five unions (Baldhara, Bayra, Joymontop, Singair, and Talibpur; a total of 11 unions), and finally, twelve villages were selected purposively. These twelve villages were covered in this fieldwork due to a significant number of returnees in these areas.

A total of 123 respondents were selected and interviewed for this research from one Upazila (Singair), of Manikganj District in Dhaka Division of Bangladesh and the interviews were conducted between March to May 2019. A combination of closed and open-ended questions was included in the schedule to interview the respondents. Questions were asked on the socio-demographic features of return migrants, their overseas migration experiences, and their return experiences. Aside from the survey, the research developed a plan to gather respondents' information through Focus Group Discussions (FGD). Four groups participated in four focus groups (two with

return participants and two with family members of return migrants). The snowball sampling technique was used to select the responders.

The distribution of different categories of respondents covered in this study is as follows:

Table 1: Categorical Distribution of Sample

Target Group	Number of Respondents	Methods of Data Collection
Return migrants	123	Interview
Return migrants	Two groups (8 participants in each group)	FGD
Family member of the Return migrants	2 groups (10 participants in each group)	FGD
Return Migrants	10	Case Study
Government officials of the concerned ministry (including NGO personnel working on migration)	2 Government officials & 2 NGO Personel	In-depth Interview

In this study, a migrant worker who had returned to Bangladesh was considered as a sample unit. In total, 123 returnee migrants were selected purposefully to interview for this study. This research includes only those female workers who returned in the last ten years as participants. It refers to migrants who stayed overseas for at least one year before returning to Bangladesh and those who returned three months before the interview. The data were tabulated using computer-assisted data analysis software, "Statistical Package for Social Science (SPSS)" (version 25). Few data were analyzed using a five-point Likert scale. Even though FGD is a method for collecting qualitative data, the researcher attempted to quantify a number of the findings using a 10-point scale. A detailed description of return migrants has been provided and triangulation was used to ensure the validity of this study. For reliability, the checklist and interview schedule was adapted from two previous studies of Kuschminder's Ph.D. dissertation (2014) and Mengesha, M. (2016).

4. Findings of the Study

Table-4.1 presents the frequency distribution with a field survey of 123 respondents according to their Age, Marital Status, Religion, and Educational Qualification and age between 18-50+ years old.

Table 4.1: Demographic Variables of the Respondents (in %)

Variables	Categories	%	N
Age	18-29	33.3	41
	30-49	60.2	74
	50+	6.5	8
Marital Status	Married	72.2	95
	Unmarried	11.4	14
	Widowed/Divorced	11.4	14
Religion	Muslim	95.9	118
	Non-Muslim	4.1	5
Education (Self)	Illiterate	52.8	65
	Primary	32.5	40
	Secondary and above	14.6	18
Highest Educational Qualification in Family of the Respondent*	Primary	73.2	90
	Secondary	18.7	23
	Secondary and above	4.1	5

Source: Field data, 2019

*5 samples are excluded from the analysis as those families do not have any educated person.

From the Table, it is evident that participants were between 18-55 years old. The highest number of respondents (N=74) are from the age group of 30-49 years old, which indicates that the migration rate of this age group is higher than any other age group. In contrast, only 6.5% of participants were more than 50 years old. Overall, the mean age of the participants was 33.17 years. The majority of the respondents (77.2%) were married, and 95% of respondents were Muslims. The analysis of field survey data showed that the majority of the respondents are illiterate. Only about 15% of the respondents had secondary and higher secondary education. Concerning the highest educational qualification of the participant's family members, it is evident that only 4.2% completed higher secondary education (see Table 4.1).

When asked about their socioeconomic circumstances, most respondents stated that they came from the most depressed socioeconomic background.

Table 4.2: Family Profile of the Respondents

Variables	Categories	%	N
Family Members*	2-3	22.0	27
	4-5	72.4	89
	More than 6 persons	5.7	7
Total Income of the Family	Less than 24000Tk	11.4	14
	24001- 48000Tk	45.5	56
	48001-72000Tk	32.5	40
	72001-96000Tk	4.9	6
	More than 96000Tk	5.7	7
Occupation of Husband (If Married) N=89	Day Laborer	1.6	2
	Driver (Van, Auto, Rickshaw, Trolly, Mahendra)	8.1	10
	Farmer	31.7	39
	Small Business	18.7	23
	Others	12.2	15
Occupation of Father (If Unmarried/Widowed/Divorced) N=16	Day Laborer	6.2	1
	Farmer	81.2	13
	Others	12.5	2

Source: Field data, 2019

Table 4.2 shows that 72.4% of the participants' families are constituted with 4-5 members. The mean deviation of the family members of the respondents is 4.16. 45.5% of the respondents' have a total income is 24001-48000Tk. On the other hand, only 4.9% of the respondents' families earned 72001-96000Tk. From the Table, it is evident that most of the respondents' family's yearly income is too low. The mean deviation of total annual family income is 59121.95. The Table shows that the majority of respondents' husbands were farmers (31.7%). Near about 19% of the respondents said their husbands engaged in small business. It is noted that 34 respondents are excluded from the analysis as they are not married, and some of them are separated/divorced/widows. Regarding the occupation of respondents' fathers (in the case of unmarried/widow/divorcee), only 6.2% of respondents mentioned that their father was a day laborer (different types of the low-paid job). In contrast, more than 80% of participants informed that their fathers are a farmer (see Table 4.2).

Table 4.3: Problems faced at Work Place (in %) (N=106)

		%	N
Problems faced by Respondents*	Language Problem	69.1	85
	Food Habit	58.5	72
	Others (Misbehave, Torture)	42.3	52
Got Committed Salary	Yes	61.0	75
	No	39.0	48
Delayed Salary	Yes	56.9	70
	No	43.1	53
Daily Working Hour (in abroad)	1-10 hours	1.6	2
	11- 20 hours	98.4	121
Behavior with Respondents	Satisfied	57.7	71
	Not Satisfied	42.3	52
Treatment Cost	Employer	22.0	27
	Self	4.9	6
Communication Facilities	Yes	88.6	109
	No	11.4	14
Reason of Returning	End of the Contact	29.3	36
	Forcefully Return	65.9	81
	Nostalgia	7.3	9

Source: Field data, 2019 (*More than one response involved in the Table)

Table 4.3 explains that of the respondents 106 reported having problems, and others did not mention any problem. The data reveals that approximately 70% of the 106 respondents said they had encountered linguistic barriers when engaging with their host community, whereas 58.5% of respondents initially faced problems adjusting to Middle Eastern food. In addition, data shows that 42.3% of the respondents faced some issues like misbehaving and torture abroad.

Regarding migrant workers' salaries, 56.9% of participants stated that they were not paid on time. From the Table, it is evident that almost all respondents (98.4%) worked above 20 hours in a day. In analyzing the behavior of respondents, 42.3% of respondents were not satisfied with their owner’s behavior. When respondents were asked why they returned, about 30% of respondents noted that they would return to the country after the agreement ended. Reason for returning almost two-thirds of

respondents (65.9%) was forcefully returned to Bangladesh. Only 7.3% of responders choose to return on their own, according to Table 4.3. Their return to their homeland was mainly motivated by their family factors (Nostalgia/homesickness).

Return is a complicated phenomenon that varies from person to person as shown in figure 3, and it is a micro-level decision made by an individual influenced by several factors. Many factors causing return migration include family ties and different socio-cultural issues, both economic and non-economic. Based on the motivations for return, Battistela (2018) identified four main categories of return migrants: thereturn of achievement, return of completion, return of setback, and return of crisis (forced return). According to the International Organization for Migration (IOM, 2012a), voluntary return is based on the individuals' own voluntary decisions. It has complete freedom of choice without physical, psychological, or material coercion (Ammendola et al., 2006).

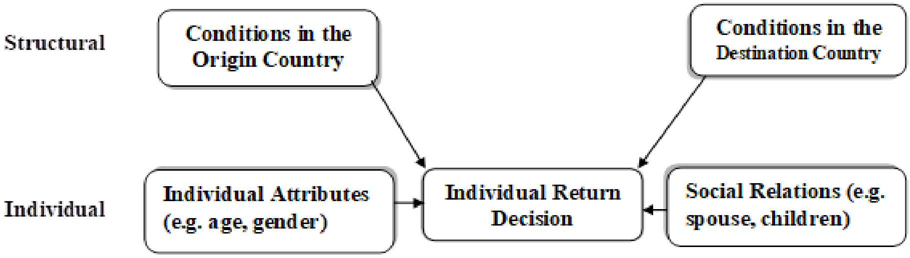

Figure 3: Factors that influence the Return decision

Source: Adapted from Koser and Kuschminder, 2015, p. 13; redrawn by the researcher.

The Table provided options based on respondents' responses to the causes of returning home from abroad and received the following answers.

Table 4.4: Causes of Return by selected variables (%)

Selected Variables: Age, Marital Status, Education

Selected Variables		Causes of Return			N
		End of Contract (%) **N=36**	**Forced back * (%)** **N=81**	**Nostalgia (%)** **N=9**	**N=123**
Age	18-29	31.7 (13)	65.9 (27)	4.9 (2)	**41**
	30-49	27.0 (20)	67.6 (50)	8.1 (6)	**74**
	50+	37.5 (3)	50.0 (4)	12.5 (1)	**8**
Marital Status	Married	31.6 (30)	62.1 (59)	8.4 (8)	**95**
	Unmarried	28.6 (4)	78.6 (11)	0.0 (0)	**14**
	Widowed/Divorced	14.3 (2)	78.6 (11)	7.1 (1)	**14**
Education	Illiterate	24.6 (16)	66.2 (43)	10.8 (7)	**65**
	Primary	30.0 (12)	65.0 (26)	2.5 (1)	**40**
	Secondary and Secondary+	44.4 (8)	66.7 (12)	5.6 (1)	**18**

*More than one response is included in the analysis

According to the data, force back is found among younger people aged 18-49 years and unmarried and widowed. Among the widowed and unmarried respondents, samples are insignificant (n=11) compared to married respondents (n=59). Among the younger, aged 18-29 years of age, about 66.0% expressed that they are forced to return home from their workplace. Almost identical percent (67.6%) expressed by respondents aged 30-49 forced-back 4.4). From a literary perspective, forced back returnees have been forced the same percentage of respondents both literate and illiterate people. Thus, Table 4.4 concludes that although the respondents identify more than one factor, the "force back" dominates the returnees to come back home and why the force was employed, which has been discussed in other sections of the text. Problems encountered by the respondents by age, marital status, and education.

5. Discussion

The study was conducted at Singair Upazila (see Fig. 2) of Manikganj District in Dhaka division of Bangladesh. This study looked at the current situation of return migrants who went to other countries and then returned to Bangladesh for various

reasons. The study identified many returnees were compelled to return to Bangladesh due to worsening living and working circumstances overseas. According to the study results, the demographic profile of return migrants determines migration rates, and the socio-economic profile influences migrants, and the study's findings are related to the NELM approach in this example.

The reasons for migration can be stated as "push" factors from the origin country and "pull" factors from the destination country. Migrant women often find false guarantees from brokers that pull them to their destination. Similarly, when they are subjected to various harassment abroad, they are forced to return (push) to their country. In some cases, return is affected by some "pull factors" in Bangladesh. The pull factors also include homesickness, personal matters such as marriage or broken family, children-related affairs, monetary crisis, etc. Bangladeshi migrant workers are employed in 132 countries throughout the world (Akond, 2019). Middle Eastern countries have a great need for Bangladeshi women workers. In 2018, the number of Bangladeshi workers who went to Saudi Arabia reached a record (Siddiqui et al., 2019). According to this statistic, Saudi Arabia (KSA) is the most favored destination for Bangladeshi women, consistent with the national trend. Bangladesh has always had a higher rate of return migrants of unskilled labourers than any other Asian country. Return is typically regarded as the conclusion of a migratory journey (Battistella, 2018).

This study found that the age distribution of respondents is between 18-55+ years, and the majority of the respondents migrated in middle age (between 30-49 years) in their life. It is evident in a study by Siddiqui and Bhuiyan (2013) found that the majority of the returnees were in their prime working years, which is typical of Bangladeshi migrant women's migratory patterns. Contrary to that study, REACH, and Mercy Corps conducted a survey on Tunisian Migration entitled: “Tunisia, country of emigration and return: migration dynamics since 2011”, and found that only 80 in-depth individual interviews (not a statistically representative sample survey) were conducted; however, most respondents (32 in number) interviewed in this study were aged 18-24 years old. Although the study was conducted many years ago, similar to that study, Islam (2010) found that most respondents (33.51%) were between 26-30 years old and went abroad for work. According to the study, most respondents are Muslim and married and studied up to the primary level. Siddiqui and Bhuiyan's (2013) findings are similar to those of the current study.

According to the New Economics of Labor Migration (NELM) theory, people migrate for a specific period, and the main target is to receive higher income and accumulate savings. The study findings are similar to the NELM theory. The study reveals that 'the desire for the job' or 'a higher wage' was a driving motivation behind their migration. “We anticipated going and working hard and altering our fortunes in a short amount of time”, according to interviews. The family members of returnees claimed, “We were in a vulnerable situation before that’s why they started leaving home to earn money.” ‘In a similar study, Islam (2010) found that most employees (44%) wanted to migrate to improve their family's financial condition. The survey reveals that most married respondents (72.2%) went abroad for employment. This

result corroborates with the study of Akond (2019), in Situational Analysis of Overseas employment from Manikganj, which found that 74.2% of the female participants were married and migrated from Bangladesh to the Middle East. This result corroborates Setrana & Tonah's (2014) study result, showing that most respondents (62%) were married. The study revealed that most of the returnees have a low educational level. This result is much similar to Islam (2010) and Bilgili et al. (2018). In his study, Islam studied women migrants' situation where he interviewed 185 migrant women and found that 32.97% were illiterate Siddiqui and Bhuiyan (2013) found that migrant workers who went to Libya were less educated. In addition, Bilgili et al. (2018) found that Ethiopian return migrants' primary education was 38.51%.

Based on the statistics, it can be said that the burden of the family (poverty) majority of respondents migrated for better livelihood. Siddiqui and Abrar (2003), in their study on Migrant Worker Remittances and Micro-Finance in Bangladesh, also found that the average family income per month is taka 16.699.25. It is also evident in the current research, which shows that 45.5% of the respondents have a total family income is 24001-48000Tk. Akond (2019), in his study of the situational analysis of overseas employment from Manikganj, also found that majority of respondents' family income is too low. It proved true in the current research. Similar to this study (Buchenau, 2008) found that Bangladeshi people have been adopting migration as a poverty-alleviation strategy for decades. From this study, it is evident that most of the respondents' husbands were farmers. It is evident in a study by Islam (2010) found that 30% of respondents' husbands' occupation was a farmer. Thus, the result of Islam (2010) is much similar to the current study.

According to Neoclassical economic theories, return migration occurs due to a mismatch between information acquired about the destination country's expected working circumstances and reality. When the respondents arrived at their location, the study discovered that many of them did not receive the job they were offered, nor did they receive the money they were promised. “I received only three months' salary instead of five, at the cost of 25,000 takas per month — for less than the promised 40,000tk,” said one returnee in an interview. The respondents stated that they were paid irregularly and that their salaries were sometimes withheld for no particular reason. The study reveals that nearly all respondents stated that they worked for more than 20 hours a day and did not relax. Siddiqui's (2008) study revealed that domestic workers suffered extended working hours and had no holidays or free time. When they reach a destination country, most migrants go through different problems (Siddiqui & Bhuiyan, 2013). It is evident in the current research, which shows that most of the respondents (69.1%) faced language problems. This result is much similar to the study by Kuchminder (2014).

The study has become evident that migrant women attend the job with a contract in Middle Eastern countries. Comments made by respondents indicated that 29.2% of participants returned to their home countries after the agreement's term ended (see Table 4.3). The causes of return of the respondents are compared with the result of Islam (2010). It is significantly evident in the current research, which shows that

respondents were forced to return to their native country in most situations. Similar results have been found in REACH and Mercy Corps (2018) and BILS (2019), which show that respondents were forcibly back to their own countries. In this regard, a returnee from Saudi Arabia as the case focuses:

> A known broker sends me to Saudi Arabia without any cost. I worked in the household and was bound to do the entire household chore. I was harassed physically and mentally during my stay in Saudi Arabia. At last, I had no choice but to go back to Bangladesh. (Panna Akter, 30 years old female)

Another returnee told her story like this:

> I was in my mid-40s. The most shocking thing that occurred to me was the employer's son's abusive behavior. I was continuously harassed at night. My family refused to spend money to bring me back when I called them. Finally, I returned to Bangladesh after 18 months of painful suffering and the loss of two months' wages with nothing but an air ticket. My husband refused to accept me back and left me away. (Kohinoor, 16 years old female)

This study also shows that respondents commonly reported nostalgia, another essential element responsible for returning home and leaving the job abroad. It is evident in the study of Bachmann et al. (2004), which shows that respondents return to their home country due to homesickness/nostalgia for their homeland. As noted by interviewees:‘*I missed everyone in the family. I missed my homeland so much, I missed everything, such as the orchard, the pond, the backyard where the kids played. Sometimes I cried and thought that I would come back*.’ In contrast to that study, Arowolo (2000) found that if migrants cannot achieve their objectives, they will return to their native country. According to Neoclassical economic theories, return migration occurs due to a mismatch between information acquired about the destination country's expected working circumstances and reality. It also refers that when migrants fail to fulfill their hopes and dreams about the migration plan, they return to their home country. Upon return, the most commonly reported challenges by the respondents' that about the socio-economic condition of their home country, as they feel that it was a failure (Nawaz & Tonny, 2019). Like other studies (REACH and Mercy Corps, 2018; Bilgili et al., 2018), this study identifies that respondents faced economic hardship upon their return. The study findings suggest that the lack of integrated programs for returnee migrants is a significant barrier to their reintegration.

Conclusions and recommendations

This article has identified that female migrants return home due to a number of challenges and problems. Findings explore that the return decision is influenced by

'structural' conditions (in the origin and destination country). Push and pull variables play a role in return decisions as well. Above all, the findings theorize that the three commonly identified forms of return migration (i.e. end of contract, forced back, and nostalgia), are the main factors of female return migration. Conclusively, the study suggests that it is essential to have a well-defined policy framework for returnee migrants as well as there should involvement of the family and community in the reintegration process is also important. Thus, it is evident that Bangladesh should have an effective reintegration program for the returnee migrants to ensure their social and economic well-being. Thereby, it is worth noting that reintegrating the returned migrant workers has been a national policy concern, and also essential to look at returnee migrants' challenges while reintegrating into the local economy and community.

References

1. Akond, Aurongajeb (2019). SITUATIONAL ANALYSIS OF OVERSEAS EMPLOYMENT FROM MANIKGANJ: Trends, challenges and opportunities of womenMigrations. Bangladesh Institute of Labour Studies- BILS. Dhaka, Bangladesh.
2. Al Masud, S. M. M., & Hamzah, R. B. (2018). International Migration and Development: A Bangladesh Perspective. *European Journal of Social Sciences Studies*.
3. Ammendola, C. F., Pittau, F., & Ricci, A. (2006). Italian National Contact Point (IDOS) *Return migration: the Italian case. Return migration in the EU member states*. Accessed from http://www.emnitaly.it/down/pb-03-01.pdf.Approach-to-Reintegration.pdf (accessed 15 July 2018).
4. Ara A (2018) Women returnees from KSA now face stigma. The Financial Express, 20 June. Available at: https://thefinancialexpress.com.bd/national/women-returnees-from-ksa-nowface-stigma-1529469099 (accessed 20 August 2020)
5. Arowolo, O. O. (2000). Return migration and the problem of reintegration. *International migration*, *38*(5), 59-82.
6. Bachmann, Carine, Janine Dahinden, Martina Kamm, Anna Neubauer, and Aurélie Perrin. (2004). Photo Stories of Armenian Migrants. Emigration and Return. Geneva: Cimera Publications.
7. Barkat A and Ahsan M (2014) Gender and Migration from Bangladesh. Geneva: ILO.
8. Battistella, G. (2018). Return migration: A conceptual and policy framework. *2018 International Migration Policy Report Perspectives on the Content and Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration*, *2018*, 3-14.
9. Bilgili, Ö., Kuschminder, K., & Siegel, M. (2018). Return migrants' perceptions of living conditions in Ethiopia: A gendered analysis. *Migration studies*, *6*(3), 345-366.
10. BILS. (2019). Official website. Retrieved from http://bilsbd.org/
11. BMET (Bureau of Manpower Employment and Training) (2021b) Statistical report on overseas employment of female workers (1991–2020). Available at: www.old.bmet.gov.bd/BMET/ viewStatReport.action?reportnumber=25 (accessed 1 May 2021).

12. BMET. (2018). Overseas Employment and Remittances From 1976-2017 of Bangladesh. Dhaka: BMET Retrieved from http://www.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction.

13. Buchenau, J. (2008). Migration, remittances and poverty alleviation in Bangladesh‟. *United Nations Development Program, Preparatory Assistance for Promoting Pro-Poor Trade (PA-PPT), Dhaka, Bangladesh*.

14. Cassarino, J. P. (2004). Theorizing return migration: The conceptual approach to return migrants revisited. *International Journal on Multicultural Societies (IJMS)*, *6*(2), 253-279.

15. Cassarino, J. P. (2008). Conditions of modern return migrants–Editorial introduction. *International Journal on Multicultural Societies*, *10*(2), 95-105.

16. Constant, A., & Massey, D. S. (2002). Return migration by German guest workers: Neoclassical versus new economic theories. *International migration*, *40*(4), 5-38.

17. Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In *Handbook of educational policy* (pp. 455-472). Academic press.

18. Gardner, K., & Ahmed, Z. (2006). Place, social protection and migration in Bangladesh: a Londoni village in Biswanath.

19. ILO. (2011). 'Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers', <http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_116048/lang–en/index.htm> accessed June 2012

20. International Organization for Migration (IOM) (2012a). *Return migration*. Accessed from http://www.iom.int/jahia/Jahia/managing-migration-return-migration.

21. IOM. (2013). *Gender Coordination Report 2013*. 103rd Session of Council, Geneva.

22. IOM. (2018). Enhancing migrant well-being upon return through an integrated approach to reintegration. Global Compact Thematic Paper, Reintegration. IOM, Geneva. Available fromwww.iom.int/sites/default/_les/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf%20http:// (accessed 15 July 2018).

23. Islam NM (2011) Women migrant situation: Profile of women migrants, causes, problems and prospects of migration. Available at: www.old.bmet.gov.bd/BMET/resources/Static%20 PDF%20and%20DOC/publication/Survey%20on%20Female%20migrant.pdf (accessed 10 December 2020).

24. Islam, M. N. (2010). *Strategy Paper for re-integration of Returnee Migrants*. Prepared for International Labour Office, Dhaka, accessed February, *10*, 2014.

25. Islam, M. N. (2013). Gender Analysis Migration from Bangladesh, Viewed on 2015 April.

26. J.W. Creswell, V.L.P. Clark, (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, third ed., Sage publication, London.

27. Jureidini, J. (2005). Submission to Senate Legal and Constitutional References Committee Inquiry into the Administration and Operation of the Migration Act 1958.

28. Ketema, N. (2014). Female Ethiopian migrant domestic workers: An analysis of migration, return-migration and reintegration experiences.

29. Kibria, N. (2004). *Returning international labor migrants from Bangladesh: the experience and effects of deportation*. Inter-University Committee on International Migration. Rosemarie Rogers Working Paper Series; 28.
30. King, 'Return migration', op. cit.; R. King and A. Christou, (2010). 'Cultural geographies of counter-diasporic migration: perspectives from the study of second-generation "returnees" to Greece', Population, Space and Place 16(2), pp. 103–119.
31. King, Russell (2000) 'Generalizations from the History of Return Migration.' In Bimel Ghosh (ed.) *Return Migration: Journey of Hope or Despair?* Geneva: IOM.
32. Klagge, B. and Klein Hitpaß, K. (2007): High skilled return migration and Knowledge based economic development in regional perspective. Conceptual considerations and the example of Poland. Centre of Migration Research No. 19/77.
33. Kleist, N., & Bob-Milliar, G. (2013). *Life after deportation and migration crisis: the challenges of involuntary return*. Danish Institute for International Studies.
34. Koser, K. (2013). "Migrants and Refugees." In Introducing Human Geographies, edited by P. Crang, M. Crang, and M. Goodwin, 3rd edition, 556–71. London: Routledge.
35. Koser, K., Kuschminder, K. (2015), *Comparative Research on the Assisted Voluntary Return and Reintegration of Migrants, International Organization for Migration, IOM Publications:* Maastricht Graduate School of Governance, Geneva, *Switzerland*.
36. Kuschminder, K. (2013). "Knowledge Transfer and Capacity Building Through the Temporary Return of Qualified Nationals to Afghanistan" *International Migration.* Early View.
37. Kuschminder, K. (2014). Female return migration and reintegration strategies in Ethiopia. PhD dissertation. Maastricht: Maastricht Graduate School of Governance.
38. Kuyper, M. (2008). Return Migration to Vietnam: Monitoring the Embeddedness of Returnees. *Radboud University Nijmegen. University of Amsterdam*.
39. Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, *3*(1), 47-57.
40. Mahdavi P. (2013) 'Gender, Labour and the Law: The Nexus of Domestic Work, Human Trafficking and the Informal Economy in the United Arab Emirates', *Global Networks*, 13/4: 425–40
41. Martin, P. (2003). Managing labor migration: Temporary worker programs for the 21st century. *Ilo, Geneva*, 117-31.
42. Mengesha, M. (2016). *ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC REINTEGRATION OF RETUR NEES FROM SAUDI ARABIA TO ETHIOPIA, A CASE OF RETURNEES IN ADDIS ABABA, ADDIS KETEMA SUB-CITY* (Doctoral dissertation, St. Mary's University).
43. Nawaz, F., & Tonny, T. A. (2019). Reintegration Challenges of Migrants in Bangladesh: A Study on Forced Returnee Women Migrants from Saudi Arabia. *Horizon*, *1*(1), 49-58.
44. Olwig, K. F. (2001). New York as a Locality in a Global Family Network: West Indian migration to New York. In *Islands in the City* (pp. 142-160). University of California Press.
45. Piper, N. (2003). Feminization of labor migration as violence against women: International, regional, and local nongovernmental organization responses in Asia. *Violence Against Women*, *9*(6), 723-745.

46. Piper, N. (2005). Gender and migration. *policy analysis and research programme of the Global Commission on International Migration*.

47. Priesner, Bindhya P. 2012. "HIV and Bangladeshi Women Migrant Workers: An Assessment of Vulnerabilities and Gaps in Services". International Organization for Migration (IOM), Switzerland: Geneva.

48. Prothom Alo. (2019). 8 Mashe Firlen 800 Nari Grihokormi. retrieved from Prothomalo.com (29thAugust, 2019), Dhaka Bangladesh.

49. Prothom Alo. (2018). *Nirjatoner Chinno niye Firchen Tara*. retrieved from Prothomalo.com (13th September 2018), Dhaka Bangladesh.

50. Prothom Alo. (2018). *Saudi theke Ferot asha Narir Songkha barche*. retrieved from Prothomalo.com (5th June 2018), Dhaka Bangladesh.

51. Prothom Alo. (2019). *Nirjatoner Shikar hoye Firlen 91 Nari.*retrieved from Prothomalo.com (23th January 2019), Dhaka Bangladesh.

52. REACH and Mercy Corps (2018). Tunisia, country of emigration and return: migration dynamics since 2011-December 2018, Swiss Agency for Development Cooperation and the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.

53. Setrana, M., B. & Tonah, S. (2014). *Return Migrants and the Challenge of Reintegration: The case of Returnees to Kumasi, Ghana*.

54. Siddiqui et.al. (2019). Labour Migration from Bangladesh 2018: Achievements and Challenges, RMMRU.https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2019/05/Migration-Trend-Analysis-2018-RMMRU.

55. Siddiqui, T. (2008, September). Migration and gender in Asia. In *United Nations Expert Group Meeting on International Migration and Development in Asia and the Pacific, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Population Division, Bangkok* (pp. 20-21).

56. Siddiqui, T., & Abrar, C. R. (2002). *Contribution of Returnees: An Analytical Survey of Post-Return Experience.IOM*, Dhaka. See at: http://www.un-bd.org/pub/unpubs/IOM--Contribution%2Oof%2OReturnees-An %2 accessed on 10 June 2012

57. Siddiqui, T., & Abrar, C. R. (2003). Migrant Worker Remittances and Micro-Finance in Bangladesh. Refugee and Migratory Movements Research Unit. Working Paper No. 38.

58. Siddiqui, T., & Bhuiyan, R. A. (2013). Emergency return of Bangladeshi migrants from Libya. *S. Rajaratnam School of International Studies, NTS Working Paper Series*, (9).

59. Singh, N. J., Börger, L., Dettki, H., Bunnefeld, N., & Ericsson, G. (2012). From migration to nomadism: movement variability in a northern ungulate across its latitudinal range. *Ecological Applications*, *22*(7), 2007-2020.

60. Smoliner, S., Förschner, M., Hochgerner, J., & Nová, J. (2012). Comparative report on re-migration trends in Central Europe. *Re-Turn, Centre for Social Innovation, Vienna, 81*. social protection. In *Migration and Social Protection* (pp. 262-282). Palgrave Macmillan.

61. The Daily Star. (2018). '*No one by their side*'. retrieved from The Daily Star.com (12th June 2018), Dhaka Bangladesh.

62. Thomas, K. J. (2008). Return migration in Africa and the relationship between educational attainment and labor market success: Evidence from Uganda. *International Migration Review*, *42*(3), 652-674.

63. Tithila KK (2020) Never-ending woes of female migrant workers. Dhaka Tribune, 9 November. Available at: www.dhakatribune.com/bangladesh/migration/2020/11/09/never-ending-woesof-female-migrant-workers (accessed 1 May 2021).

64. Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. *The American economic review*, *59*(1), 138-148.

65. Tonny TA (2016) Role of NGO's in ensuring safe migration for Bangladeshi women migrant workers: A case study. Society and Change X(1): 62–72.

Willoughby, John and Heath Henderson (2009). *Preparing Contract Workers for Return and Reintegration—Relevant for Development?* Paper presented at *Global Forum on Migration and Development* Athens, Greece [online] <http://www.gfmd.org/preparing-contract-workers-return-and-reintegration-%E2%80%93-relevant-development-henderson-willoughby> [13 May 2014].

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 15.11.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

A Study on the Genocidal Torture of Bangladesh Genocide 1971

Chowdhury Shahid Kader*

Abstract

The Pakistani military launched one of the cruelest genocidal campaigns in 1971 against the Bangali nation to suppress the national liberation struggle. It is impossible to understand the dynamics of Bangladesh's liberation war by ignoring the nature of the genocide. However, the Bangladesh genocide has received attention from academics and activists but hardly sheds light on the issue of torture. The torture carried out as a means of genocide is referred to as genocidal torture in this article. The article suggests that the Pakistani army and its allies committed forms of torture on a horrific scale during the war. It also argues that the forms of torture fall within the elements of genocide or constitute the crime of genocide. Besides, it discusses forms of torture elaborately.

Keywords: Genocide, Torture, Genocidal, Liberation War 1971, Genocidal Rape, Crime Against Humanity

1. Introduction

Genocide, a term coined by Raphael Lemkin in the mid-twentieth century, is one of the significant political phenomena of the contemporary world. Although there are many examples of genocidal events prior to the twentieth century, colonialism and the emergence of the modern nation-state sharpen genocidal events. Following the horror of the Holocaust, the importance of naming the 'crime without a name'[1] became very evident, which eventually came into being officially by the United Nations Genocide Convention in 1948. Lemkin not only coined the term combining 'geno' (a Greek word meaning 'race or people') and 'caedo' (a Latin suffix meaning 'act of killing), he also attempted to provide a large-scale definition of this crime.[2] The attempt laid the foundation of the official definition of *genocide*, provided by the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, which defines as "acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group."[3]

Although many critiques of the definition are available,[4] this definition is widely regarded for any recognition or studies related to genocide. This definition has some core features, such as identifying 'targeted groups,' 'genocidal intention', and 'genocidal acts.' The *act* of genocide *(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group* has the implication of considering *torture* as the constituent

*Associate Professor, Department of History, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

elements of the crime of genocide. The Statue of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1993 (ICTY), The Statue of the International Criminal Tribunal for the Rwanda, 1994(ICTR), and The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (ICTBD) considered the crime of torture as 'Crime against Humanity'.[5] The tribunals more or less adopted the definition of torture provided by the 'Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment': "any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions."[6]

It involves severe pain, physical pain, physical suffering, mental pain, mental suffering, cruel treatment, inhuman treatment as the element of torture. The Rome Statute of the International Criminal Court identified 'torture' as a crime against humanity in article 7(1)(f). It also defines torture as "means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions".[7] Thomas W. Simon distinguishes between genocide and torture by making distinctions between the core acts that lie at the heart of these crimes. To him, for genocide, the core act is mass killing, while for torture, the core act is the infliction of pain.[8] However, some suggest that in certain circumstances, torture and other ill-treatment might constitute genocide.[9]

In this article, the torture that occurred during genocidal events and that form genocidal *action* is considered 'genocidal torture.' Almost every genocidal campaign had some concentration camp, torture cells, or detention center. Hundreds of people were detained on suspicion of being foreigners and western-educated during the Cambodian genocide. The history of the concentration camp during the Holocaust is well known. This article aims to shed light on the forms of the 'torture' of the genocidal campaign perpetrated in Bangladesh (the then East Pakistan) in 1971 by the Pakistani army.

The genocide that was carried out by the Pakistani military on 25th March 1971 through 'Operation Searchlight' to suppress Bengali nationalism and self-determination rights is one of the major genocidal events of the twentieth century. The genocidal violence of the Pakistani army, with the active support of pro-Pakistani political groups, killed almost 3 million people, displaced 10 million, and internally displaced almost 30 million. Almost 4-5 lakhs women were the victim of genocidal rape. Genocidal actions and intentions are evident from the activities of the Pakistani military during the Liberation War of 1971 in Bangladesh (then East Pakistan).[10] Although many researchers shed their light on the genocidal massacre[11],

the instances of torture, which we call *genocidal torture* in the article, did not come up much in the discussion. The Pakistani military regime set up different torture cells in 1971 and used these cells as the hub of torture and persecution. Generally, established institutions and buildings, such as schools, police stations, radio stations, abandoned houses, etc., were used as torture cells or camps. The survey conducted by the Genocide Museum has revealed that there were almost 1,071 torture centers in 32 districts, which explicitly illustrates the horrors of 1971.[12] Our aim is not to give details of the torture cells, instead shed light on a topic that remained unexplored.

2. Historical Background

The genocide perpetrated by the Pakistani military in 1971 had its root in the political formation of then Pakistan. Pakistan came into being after the partition of 1947 with its stark differences between the provinces, East and West Pakistan. The elite of West Pakistan accumulated political and economic power, which eventually created a massive disparity between the two fractions. The feelings of being oppressed politically, socially, and economically provided the conditions for the emergence of Bangali Nationalism.[13] The state oppression pushed the masses of East Pakistan the call for the right to self-determination, freedom, and emancipation. After the fall of the dictator Ayub Khan through a large-scale mass uprising in 1969, another military official Yahya Khan came into office. After the election of 1970, when the Awami League, a party from East Pakistan, won the majority in parliament, the elite and military officials refused to transfer the power. In response to this, Sheikh Mujibur Rahman, the most popular leader and chief of the Awami League, started a non-cooperation movement in March 1971. Military officials planned a genocidal campaign called ‘Operation Searchlight’, which categorically identified the measures and target groups during the movement.[14] At the outset of the operation on 25th March, they arrested Sheikh Mujib. Gradually they attacked different major cities, burned down houses, and, most importantly, launched an operation at Dhaka University and killed many students, including nine teachers.[15] A report by Simon Dring, published in *Daily Telegraph* (London) on 30th March 1971, stated in its inception: “In the name of ‘God and a united Pakistan’, Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by Pakistan Army, as many as 7,000 people are dead, large areas have been levelled, and East Pakistan’s fight for independence has been brutally put to an end.”[16] Facing the horror, almost 10 million people left the country and took shelter in the border neighboring country of India. Pakistani military, and their local collaborators, such as *Razakar, Peace Committee, Al-Badr, and Al-Shams,* killed almost 3 million people and raped 4-5 lakh women within the next nine months. Masses of East Pakistan resisted from the very beginning, but the initial resistance was crushed brutally. Then, with direct help from the Indian government, and after a short training, *Mukti Bahini* (regular armed forces and insurgents) started an armed struggle under the authority of the government of exile. In December 1971, India officially intervened. After a war of two weeks (6 December to 16 December), the Pakistani military ultimately called for a unilateral ceasefire and surrendered to the *Joint Forces* (Indian and Bangladeshi Forces), which ultimately ended the war and genocidal campaign of 1971.[17]

3. Methodology

This article analyzes the data of 100 genocidal events during the Liberation War of 1971. The events are selected from the '1971: Genocide-Torture Archive and Museum', a Genocide Museum situated in Khulna. Basically, the Genocide Museum has taken the initiative to publish extensively researched books on each genocidal event of 1971 under the editorship of Professor Muntassir Mamoon, a renowned historian of Bangladesh. The books are published under the title *Genocide Index Series*. The main aim of this *Index Series* is to highlight the history of genocide, mass killing fields, mass graves and to preserve the memories and the history. *Index Series* includes a detailed background of the genocidal event, geography, situation of the place, details of the genocidal event, the identity of the victims and the collaborators, statements of victims and eyewitnesses, attempts to preserve the sites, current situation, and an overall assessment. The research is exclusively based on primary sources.

The researchers received data and information from face-to-face interviews with the victims, eyewitnesses, and family members of the victims. The information is to be re-examined. The contesting memory and narratives of an event that occurred almost 50 years ago must be analyzed carefully to conclude. In other words, the *Index Series* is very carefully and extensively composed. One hundred books on genocidal events have been published as part of the Index. Among the 100, I have researched 6 of the events. Due to having a personal association with the Museum and the Centre, I was involved with the publication of the rest of them. Largely, it is an attempt to reconstruct the history of genocide based on oral history. By analyzing the description of these 100 events, this article will focus on genocidal torture, which the military and their allies commonly use.

4. Description of torture and methods of massacre

War and genocide are not mutually exclusive; instead, history suggests that genocidal events generally occur in a war, war-like situation, or civil war. The massacre is also generally used as a tactic or strategy for inflicting fear in the war. Similarly, torture is used to inflict pain, bodily or mental suffering upon the targeted groups and methods of massacre during war-like situations or in genocidal situations. Although no systematic study was carried out on the torture, there are many testimonies or memories regarding the torture, pain, and suffering. The study exhibits a number of ways of torturing and methods of killing. The list is not mutually exclusive, more than one method was used in the genocidal violence. The table shows that, among 100 case studies, there are 87 incidents where shooting was used as a way of massacre and torture, which makes it largest group. It follows then stabbing with a bayonet (44), rape and gang rape (37), beating with rifle (28), killing by spear or ax (22), hitting by boot (18), burning alive (14), Slaughtering (13), killing by drowning (8), mutilation (10), buried alive (5), inserting a thick needle into the nails (5), and using electric shock (4)

5. Mass shooting

Killing by mass shooting was the most common tactic of massacre. Most of the time, able-bodied males have been gathered around and shot dead. Sometimes they were shot in the abdominal region, which eventually exposed internal organs. For instance, the genocidal event in Mohammadpur Gandhi Ashram in Noakhali is such event. 13 people were massacred by mass shooting.[18] One of the cruelest genocidal violence happened in the Chuknagar where it is estimated that thousands were killed by mass shooting within 5-6 hours.[19] Similarly, Madhu Majhi, an eyewitness of the Ramanathpur Genocidal event and lost his relatives in the genocidal attacks, said, 'My father was killed in our house. He was shot twice, one of which hit the left side of his chest and came out through the upper part of the back shoulder, and the other came out through the back and out of the abdomen. The entrails all come out of the stomach'.[20] Another eyewitness, Kahinur Begum, remembered the event: 'My father-in-law and uncle-in-law were aged people, so they thought the Pakistani army might not harm them. While the army attacked, they were sitting at home reciting the Qur'an. However, the Pakistani army entered our house and shot my father-in-law….'[21] Although mass shooting was the most used tactics of massacre, other methods such as beating with bayonet or rifle was used at the same time. Similarly, in the genocidal event of Bajua, Dakop Upazila, Khulna, the Pakistani army captured all the fugitives and tortured them on the school grounds.[22] The victims were killed by mass shooting after being looted. Nurul Islam has worked on the Chakrakhali genocide. After entering the village, he writes, the perpetrator burn down all the houses and temples. They beat, stabbed, stabbed, or shot anyone they found in front of them.[23]

6. Stabbing with a bayonet

Stabbing with a bayonet was a regular phenomenon for the perpetrators. Although they used to stab with a bayonet before killing as a method of massacre and torture, they also used stabbing with a bayonet to ensure that the victims were dead. This tactic is evident in the 44 genocidal events. For example, in the Zilla Parishad Dakbanglow genocidal event, victim was stabbed with a bayonet, and then hanged inside the police station.[24] After being shot, to confirm his death, the perpetrator slaughters him with a knife. The genociders used the dakbanglow as a torture center. The genocidal event in Mohammadpur Gandhi Ashram in Noakhali is one of the cruelest events. Some were killed in the direct brush fire, while others were killed after torturing with the bayonets.[25]

7. Beating with rile and hitting by boot

Beating with the rifle butt was the most common tactic of torturing. The military and the perpetrators used this tactic during interrogation or any operation. Similarly, hitting with the boot was a prevalent culture in the military. They used to hit people, irrespective of sex and age, even pregnant women. They used to hit men or women while asking questions. Military used these two forms in almost every military operation. Researcher Abdullah Al Mamun Chowdhury gives the details of the torture during the genocidal event of Sakoya in Mohanpur Upazila of Rajshahi:

'…all of them *[victims of the event]* were brutally beaten with the offshoots of the tree and rifle-butt. The common punishments were to cut off the genitals of men, crush the testicles, cut off the breasts of women, and pierce the vagina with a bayonet.'[26] While protecting the women from the harassment and torture of the Pakistani army, in the genocidal violence of the Harinagopal-Bagbati, three family members were killed.[27] The army abducted two young people from the Rangpur village of Dhumuria in Khulna and then severely tortured them by beating them with rifle butts and kicking them with boots.[28] Their bodies were never found. The army here lined up 60-70 years old, although they were physically weak to join the war and charged with bayonets. An incident of beating was evident in the genocidal event of Gopalpur, Noakhali. Pakistani army beat people in a market after getting the flag of then Bangladesh from a tailor shop.[29] The perpetrators used rifle butts as a tool of torture in the Yogisho and Palsha genocide in Durgapur, Rajshahi. Only Hindus were abducted from their home and taken behind the mud house on the north side of the school grounds; there, the aggressors beat them with their butts.[30] The prisoners were beaten upside down till they bled. Abdul Khaleq Khalifa, an eyewitness of the Sirajganj Kazipur Baraitala genocide, was narrating the memory of the genocidal torture of 1971: "When they killed my father, they also hit my mother's arm with a rifle. My older brother was 13-14 years old. Mother hid her brother under the ashes and covered him with a sack. Then when the Pakistani army came inside the house, they addressed uncle Magbar Ali, 'You are one of the Muktis.' Uncle replays, 'no sir, I am not,' and he runs away. His elder brother Afzal Hossain, another uncle of mine, was killed with the butt of a rifle. He had a daughter named Kadbanu. While holding her father's body, the military grabbed her and threw her away. The girl became frightened and fell ill, then died days after the torture."[31]

8. Killing by spear or Axe

The local collaborators mainly used the method of torturing and killing. Both tools and similar types were ubiquitous in rural areas because they were used in regular household uses. Perpetrators used these tools to torture and persecute the people. In the genocidal event of Kalyanpur, Biharis of that region attacked Bengali by giving slogans related to the religion and jihad, such as 'Naraye Takbir Allahu Akbar,' 'Ya Ali' etc. Bengalis of that region tried their best to save their lives by secretly taking shelter in different houses, but the defense was unsuccessful. Besides burning the houses, Biharis killed the sheltered people on the streets. One of the eyewitnesses reports that Biharis used *Borsa* (long spears) to pierce the victim's chest.[32] Rajab Ali was the leader of Razakar, a para-military force and collaborator of the Pakistani military in the Bagerhat area. He led many genocidal actions in these regions. During the event of *Sridham Lakhikhali,* he used an ax to kill people. He once stabbed a person 22 times; he even cut off someone's hand, ears, or leg if he regarded someone as an enemy.[33]

9. Burning/buried alive

We have found 14 cases of burning alive and 4 cases of buried alive. Generally, perpetrators forced victims to dig their graves and then shot dead or buried alive. Sometimes they buried victims while they were injured, not dead. Burning alive is also an inhumane tactic. Sometimes, people were buried or burned, mainly to ensure death after the mass shooting. Researcher Abdullah Al Mamun Chowdhury has given the details of the torture during the genocide by the Pakistani forces in the Sakoya genocide in Mohanpur Upazila of Rajshahi. Many people were buried in the mass killing fields near the Sakoya Razakar camp in Mohanpur.[34] Researcher Mamun Tarafdar gave details of the torture in the Chabbisha genocide in Tangail. According to him, the Pakistani military tortured the women in the Hindu Para of Bamanhata village. No one, pregnant women, innocent children, new brides, or loving mothers, was spared from their wrath.[35] Sanowar Hossain, an eyewitness, who lost seven family members to that genocide, describes the brutality of the Pakistani forces perpetrated on that area. He said that, “The invading forces came to the village and started killing people. My uncle Ismail Sarkar (Kotu) was killed, and my father Omar Ali was shot in his right arm. The bullet pierced the uncle’s body and hit father. The second ensured the father’s death. Our house was set on fire, and my father was burnt to ashes. My mother, younger sister, and cousin Khaleda were also shot dead. With my baby sister Rabia in her arms, the mother begged mercy from the Military force. She was pushed into the burning flame. She ran out of the fire and jumped into the water. Her whole body was severely burnt. Five days later, mother died. Even we could not bury the seven martyrs of family ritually.”[36] During the genocidal event in Kathira, the older men were burnt alive in house.[37] Houses were burnt indiscriminately in a genocidal event of Hatia;[38] villagers irrespective of age and gender were burnt inside the houses. The incidence of burning alive occurred in Goran and Sachiyachora villages. People were also killed with bayonets. Some of the villagers took shelter in a house set on fire by the military.[39] In the event of Haripur, Feni, a member of Mukti Bahini named Khurshid was brutally tortured and buried alive.[40]

10. Slaughtering

Generally, Biharis and Razakars, military collaborators, used to slaughter victims with axes, knives, bayonets, and other domestic sharp tools. Sometimes after slaughtering, bodies were mutilated brutally. Pahartali Genocide in Chittagong is one of the brutal examples of torture and genocide, where Bihari, a non-Bengali Urdu-speaking community, were involved in genocidal actions with the military. Biharis used to slaughter the victims with a knife. Slaughtering was one of the widely used ways of killing in this event. Sometimes army and Bihari tore apart the chest of the victims.[41] On 10th November 1971, the train’s passengers were dropped off and killed similarly.[42] The first genocide in Chittagong was perpetrated at Nathpara by the Pakistani forces and their allies. The Pakistani forces and the local Biharis used sharp local weapons- swords, daggers, blades, etc.- to slaughter the victims. After

killing Dinesh Kanti Nath, a political activist, they cut him into six pieces. He was cut into six pieces as a staunch supporter of the 6-Point Demand Movement.[43] The Pakistani army perpetrated genocide about ten kilometers north of Pirganj; they killed numerous people at the Vhatarmari sugarcane farm on the east side of Pirganj-Thakurgaon road. Their bodies were detached to pieces. Their rips, head, and chest were all breaking into pieces. Dr. Deenbandhu Roy was abducted from his home, slaughtered with a sharp knife, and his body was cut into pieces. He and another 15 people were also killed with the same brutality.[44] Dogachhi genocide testifies to the viciousness of the Pakistani military upon innocent villagers. The Biharis (collaborators of the Pakistani army) of that locality hang the imam (one who leads Muslim worshippers in prayer) and the muezzin (who proclaims the call to prayer) of the mosque from a tree. Those who survived the earlier genocide were victimized again and slaughtered.[45]

11. Mutilation

The perpetrators used to cut off limbs and mutilate the victims' organs. Sometimes, the penis was cut off, the breast was cut off, and the testicles were crushed off. Collaborators used to do these types of activities mostly. Shanta Patranbish did extensive research on the Binodbari Mankon genocidal event. She details the killing, torture, looting, and arson of the military and their allies in the region of Muktagaccha, Mymensing. More than 300 people were killed in the event.[46] An eyewitness Mohammad Rafiqul Islam, who also lost his relatives in the event, gave a witness account to Shanta. He said, "I can still visualize the way my mother was killed. My younger sister was in her lap; the army shot them dead; they cut off the breast of my aunt; killed my sister-in-law and niece... they were killed so brutally that their internal organs were exposed. Army and local Razakars showed the ultimate example of cruelty. Babies, pregnant mothers, the perpetrators exempted none."[47] In the genocidal event of Kalyanpur, an eyewitness whose family members were killed brutally said that when Biharis left his house, his father was still alive, and the body was full of blood. His mother tried to provide some water and pour water on the head. However, after realizing that he might not be dead yet, Bihari returned and attacked his injured body with a knife again. His mother begged for his life, but no one gave a damn about it! He said Biharis hit the head of older people with a shovel/hammer, killing him instantly. They even cut off the penis of a young boy that day.[48] On 20th June, 1971, the Pakistani forces launched a raid on a village named Beshainkhan in the Jhalkhati district. Munira Sumi did her research on the specific event. She writes, 'corpses were mutilated, head or chest ribs were broken. Military set the villages on fire and looted the villages.'[49] The victims were beaten with the butt of rifles and boots in the Danga genocide, Palash Upazilla in Narsingdi. Describing the killing of Martyr Paru in the genocide, researcher Suraiya Akhter writes that Puru was killed by twisting his arms and legs. There was no place on his body where there were no marks of torture. Puru and his other companion shared the same fate.[50] Pakistani military and the collaborators used to mutilate the body after

rape if the victim were women. In the case of Rajshahi, there was a torture center where victims were killed after brutal torture and abuse. Cutting off genitals, crushing testicles, cutting off women's breasts, and piercing the vagina with a bayonet were the expected punishment. They freed some of the women. The Pakistani military set up their camp at Zoha Hall of Rajshahi University. When Bangladesh became independent, hundreds of tortured women prisoners were found in Zoha Hall, Rajshahi University.[51]

12. Rape and Gang rape

In almost every case, the military used to rape or gang rape female, irrespective of their religion and age. Sometimes women were abducted and taken into concentration camps/torture cell, where they were raped for an extended period of time. Sometimes they were killed after rape, sometimes they were killed by raping and torturing sexually. There are many works on the incidence of rape and sexual violence that occurred in 1971.[52] Besides using as a weapon and tactics of war, it was also used to create fear in the community. Although some researchers, such as Sarmila Bose, denied the rape committed by the military[53], the study confirms that incidence of rape and gang rape occurred in large number. Sexual violence was not only limited to instrument or strategy of war or spreading fear rather an ideological position of creating 'pure Pakistani' through impregnating was evident. Bihari and local collaborators were also involved in raping. Researchers shed some light on the effects of rape on the survival victim: a) many women have committed suicide out of the horrible torture and sexual violence of military; b) a large proportion of raped women were suffered from infertility and recurrent diseases such as syphilis and gonorrhea or both; c) most of the raped women experienced feticide; d) Lot of girls lost their mental balance; e) those who survived the sexual violence have been abandoned by their families.[54] The pattern of torture in the tea gardens was the most savage. The butt of the rifle boots was used to hit the people. Rebati Malahi, her younger brother, grandfather, and three uncles were killed at the Tarapur Tea Garden genocide. Rebati was brutally killed after being raped. Her body was left naked, and her eyes were pierced with the butt of two rifles.[55] In the case of Ataikul Genocide the women in the village were the worse sufferer. A resident of the village, Maya Bala, was 9-month pregnant. She became the victim of the ruthlessness of the Pakistanis. Maya Bala says, 'they kicked in my belly, they chased me from room to room and assaulted me.'[56] One of the witnesses of the genocidal event of Majhadanga in Dinajpur Sadar Upazila said that "my brother was screaming for a drop of water.. military made him drink his urine! They insert sticks in his anus. They came with daggers, knives, spears, and sticks. They captured all the men of the houses, blindfolded them, and charged them with sticks in the sensitive parts of their bodies…."[57] The brutality was the means of interrogation to know about the Mukti (members of freedom fighters). The village women became the prey of the military; They were tortured and raped by the oppressors.[58] Genocidal violence in Charahat village of Dinajpur was also an instance of brutality. Besides killing almost 100 people by shooting, the Pakistani military also raped women. They also beat men and women by rifle.[59]

13. Inserting a thick needle into the nails and using electric shock

Inserting a thick needle into the nails and electric shock were the most used tactic in during interrogation. Moshiur Rahman, a popular leader of the Awami League and a member of Pakistan's National Assembly, was brutally tortured to death by the Pakistani military. *Daily Bangla* reported in 1972: "The Pakistani aggressors killed him with great pain. They first used various forms of torture to derail him: burning parts of the body, beating, applying salt to the affected region, and giving an electric shock. The inhuman torture gradually weakened his body; nevertheless, his mental strength was intact. He always said, 'I could not say or write anything against my people.' He really could not. When they ordered to cut off his right arm, he just shuddered in agony."[60] This form of torture was applied in every torture center. Such as, in the event of Lalbridge and Boro Railway station, this form of torture was evident.[61] Those who survived from the torture centre, almost all of them shared similar experience about this form of torture. There are many testimonies or memories regarding the torture, pain, and suffering. As such, Zahir Uddin Jalal (known as Bicchu Jalal), a famous freedom fighter and tortured war hero, provides a vivid picture of torture:

"They [Pakistani military and their allies Al-Badr] cut off the fingers of Badi, broke his right arm, and struck him in the spinal cord with a rifle butt. The situation of Azad was identical. Rumi's face seems devastated and impossible to recognize; his fingers were also cut off, and his legs were broken. The fingers of Altaf Mahmud were cut off; his lips were swollen. His face was also blood clotted and swollen. A rifle butt injured his spinal cord. Jewel Bhai's fingers were also cut off; his left ear was bleeding. Same things happened with his spinal cord."

It is to be noted that Badi, Azad, Jewel, Rumi were all members of Crack Platoon. Platoon was a special commando team of the Mukti Bahini formed in 1971 by the young members. Altaf Mahmud, another member of the Platoon, was one of the most famous musicians and cultural activists of then East Pakistan.

Collecting information about the freedom fighters was one of the common causes of persecution and torture of the people during the genocidal events. These were evident in the Jhanjhira genocide.[62] It is also seen from an event that about 25-30 people were abducted and then taken to the Dak-bunglow of Rupganj in Narail Water Development Board, which was then used as a torture camp. After interrogation, some of the prisoners were freed. The abducted freedom fighters were inhumanly tortured.[63]

14. Killing by drowning

Sometimes perpetrators killed the victims by drowning them in the rivers. The used to tied them at first, and then throw then in the rivers, eventually killing them. For example, in the Gabkhan massacre in Jhalokati Sadar, the Pakistani army showed atrocities like shooting and killing by drowning. Eyewitness of the genocide Abdus Shukur Hawladar's statement is a description of that atrocity, "Instead of being shot,

most people would be tied up with ropes and thrown to the launch terminal next to the camp. When the people were tied up and thrown into the water in this way, when they died, they would tie them up in groups of three or four and throw them in the river… In this terminal on the west side of the market, innocent people were tortured and drowned almost every day, and those caught on the east side of the market were shot dead."[64]

15. Discussion

The article exhibits the nature of torture carried out by the Pakistani military and their allies in the war of 1971 in Bangladesh (then East Pakistan). The torture was not only a means of inflicting pain, rather a method of killing and massacre. The perpetrators used a variety of means, from mass shooting to buried alive, to massacre and inflict pain upon the body of victims. Before mass-shooting, stabbing and beating the victims with bayonet, boot and rifle-butt were regular phenomenon. However, Bihari, as allies of Pakistani military, used slaughtering as means of killing. They used local weapons for slaughtering. On the other hand, the testimonies confirm that, they used to kill most brutally. Women were raped in several incidents. Incidence of rape in Bangladesh genocide is already much-discussed topic. This article also exhibits that the perpetrators mutilated the body of raped women.

The results of the article are consistent with earlier researches done on the issue. Shahriar Kabir, researcher, and renowned journalist, provided 15 methods of torture carried out by the Pakistani military and their collaborators: 1) Using vulgar language; beating till bleeding; 2) Hanging legs by rope, charging bayonet, and beating with a rifle; 3) Keep standing naked for hours; 4) Burning all over the body with cigarette; 5) Inserting a thick needle into the nails; 6) Inserting cigarette and ice bars into the anus; 6) Pulling out nails with tweezers; 6) Dipping head repeatedly in hot water; 9) Leaving under the hot sun tying hands and feet; 10) Sprinkle salt and pepper powder on wounds; 11) Leaving the bare and wounded body directly on the ice slab; 12) Giving electric shock to the anus; 13) Urinating on the thirsty prisoner; 14) keeping in the darkroom with a bulb directly over the eyes; 15) Giving electric shock to the sensitive parts of the body.[65]

M. A. Hasan also mentioned similar methods of torturing: 1) Using abusive words, spitting on the mouth and body, feeding urine, forcefully holding the face on human feces; 2) Scorching by cigarette; 3) Inserting ice and hot iron into the anus; 4) Burning eyes by flashing lights; 5) Giving electric shock to anus and body; 6) Kicking and punching hard; 7) Inserting needles on nails; 8) Pulling out the nails; 9) Pulling out the eyes;10) Spraying salt and pepper in wounded place;11) Beat the guts with a blunt weapon; 12) Hurting hard testicles and penis; 13) Inserting sticks, rifle barrels, sharp bottles into vaginas; 14) Beating with bamboo; 15) Beating on ice bars;16. Beating after soaking water; 17) Beating with a bottle filled with hot water.[66] He also mentioned some of the methods of killing and persecution: 1) Shooting the suspected instant; 2) Strong and young men after being abducted,

interrogated, and then killed; 3) Captives were killed by shooting; 4) Sometimes, the prisoners were slaughtered one by one in front of their families, and their bodies were dismembered; 5) Mutilation; 6) Pulling out eyes; 7) People were hanging naked from upside down; they were unskinned; 8) Smashing head with a blunt weapon; 9) Putting in a sack, tied and beat it to death, or thrown in the river in the sack; 10) Kicking and punching till bleeding; 11) Different parts of the body were crushed by bamboo and roller.12) The abdomen was pierced; bayonets and sharp weapons exposed the internal organs. 13) Tying with rope and burnt alive to death; 14) Throwing in the water, fire or boiler.[67]

16. Concluding Remarks

The case study of 100 genocidal events carried out by the Pakistani military in 91 Upazilas of 40 districts confirms that religious minorities, in that case, Hindus, were the easiest and most persecuted target group. However, the genocidal campaign was not limited to this group only rather the whole range of the population living in the then geography called East Pakistan were in a vulnerable situation. The events show that the military used to torture more if the victims were suspected as Hindu or Mukti Bahini. If they suspected any family was having any member of Mukti Bahini, then they were brutally tortured. The intensity of torture increased if anyone tried to escape but could not, or if anyone tried to defend against raping or looting.

The explanations of torturing brutally can be found in the works of Herbert Kelman and V. Lee Hamilton. They explained the involvement of the US Army in Vietnam as a ‘crime of obedience’ in their renowned book ‘*Crime of Obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility.’* They mentioned three different but interrelated processes involved in this whole phenomenon: Authorization, Routinization and Dehumanization.[68] A person loses or is forced to lose his own conscious and only obeys the orders of the higher authority. Authorization process started by the order of the military authority. They carefully planned the campaign and then operated it. The army and their local collaborators had shown their highest efficiency in maintaining the order and killing people, which can be labelled as ‘routinization’. The target group was presented based on a national-religious ideology, which makes ‘Bangali Hindu’, ‘Bangali’, even ‘Bangali Muslim’ an anti-state element, ‘Hindu influenced Muslim’, or impure Muslim. This constituted the process of dehumanization, that is, the process of not recognizing these people worthy of human being. These processes made it possible to carry out these extreme forms of torture and persecution.

Works Cited

1. Adam Jones, *Genocide: A Comprehensive Introduction,* Routledge, New York, 2006, P. 8
2. Raphael Lemkin, “Genocide - A Modern Crime”, *Prevent genocide*, 1945, accessed 5 June 2022, *http://www.preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm*

3. United Nations, *General Assembly Resolution 260, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, December 9, 1948 (UN Doc. A/RES/260(III))

4. For detailed analysis of the definition and contested meaning see : Scott Straus, "Contested meanings and conflicting imperatives: A conceptual analysis of genocide", *Journal of Genocide Research*, 3:3, 2001, P. 349-375

5. Association for the Prevention of Torture (APT) and the Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in International Law, a guide to jurisprudence,* 2008 , P. 141-177

6. United Nations, *General Assembly resolution 39/46, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, December 10, 1984. accessed June 5 2022, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

7. International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court,* 17 July 1998, accessed on 5 June 2022, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf

8. Thomas W. Simon, *Genocide, Torture, and Terrorism Ranking International Crimes and Justifying Humanitarian Intervention*, Palgrave Macmillan, New York, 2016, P. 5

9. Association for the Prevention of Torture (APT), *Torture in International Law,* p. 167

10. Rounaq Jahan, "Genocide in Bangladesh," in Samuel Totten et al (ed.) *Century of Genocide Critical Essays and Eyewitness Accounts*, Routledge, New York, 2009, P. 245-266.

11. For details: Muntassir Mamoon, *Bangladesh 1971: The Politics of Genocide-Torture*, Subarna, Dhaka, 2019; Ahmmed Shorif, *Muktijuddhe Gonohottar Prokriti O Swarup: 1971* [Nature of Genocide in Liberation War 1971], Genocide Museum, Khulna 2020; Robert Payne, *Massacre: The Tragedy at Bangla Desh and the Phenomenon of Mass Slaughter Throughout History*, Macmillan Company, New York, 1973; Anthony Mascarenhas, *The rape of Bangladesh*, Vikas Publications, Delhi, 1971.

12. Genocide Museum, (1971: Genocide-Torture Archive and Museum), the first genocide museum of the Bangladesh, situated in Khulna, started its journey in 2014. The Museum, as a part of its activities, conducted lot of in-depth researches on Bangladesh genocide 1971. The museum conducted a survey around the country based on districts. The results are mainly based on the already published reports on 38 districts. The museum is conducted its activities under a Trustee Board of 11 member. The main building of the museum is currently under construction as a project of the Ministry of Cultural Affairs. The museum is conducting its activities in a temporary building.

13. Rehman Sobhan, *Bangladesher Ovvuddhoi* [Emergence of Bangladesh], Prothoma, Dhaka, 2017

14. Golam Murshid, *Muktijuddho O Tarpor: Ekti Nirrdolio Itihas* [Liberation War and Aftermath: A Non-Partisan Accounts], Prothoma, Dhaka, 2018

15. *Ibid*

16. Simon John Dring , "Tanks Crush Revolt in Pakistan," *Daily Telegraph*, 30 March 1971

17. Golam Murshid, *Muktijuddho,* 2018

18. Tasnim Alam, *Mohammadpur-Gandhi Ashrom Gonohotta,*[Mohammadpur-Gandhi Ashrom Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 50
19. Muntassir Mamoon, *Chuknagar Gonohotta* [Chuknagar Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P. 20-21
20. Munira Jahan Sumi, *Ramnathpur Gonohotta* [Ramnathpur Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P.13
21. Munira Jahan Sumi, *Ramnathpur,* 48
22. Satyajit Roy, *Bajua Gonohotta* [Bajua Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017, P.14-15
23. Nurul Islam, *Chakrakhali Gonohotta* [Chakrakhali Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P.13-15
24. Md. Nurul Huda, *Panchagarh Zilla Parishad Dakbanglow Gonohotta* [*Panchagarh Zilla Parishad Dakbanglow* Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 15-19
25. Tasnim Alam, *Muhammadpur,* P. 50
26. Abdullah Al Mamun Chowdhury, *Sakoya Gonohotta* [Sakoya Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P. 13
27. Susmita Das, *Horinagopal-bagbathi Gonohotta*[Horinagopal-bagbathi Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017, P. 14-15
28. Dibyaduti Sarkar, *Rangpur Gonohotta*, [Rangpur Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017), P. 11-12
29. Nur Nabi, *Gopalpur Gonohotta*, [Gopalpur Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017), P.19
30. A K M Kaisaruzzaman, *Yogisho-Palsha Gonohotta*, [Yogisho-Palsha Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018), P. 14-15
31. Susmita Das, *Boroitola Gonohotta*, [Boroitola Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017, P. 22
32. Ali Akbar Tabi, *Kalyanpur Gonohotta*, [Kalyanpur Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015), P.13
33. Satyajit Roy, *Sridham Lakhikhali Gonohotta*, [Sridham Lakhikhali Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P. 21-26
34. Abdullah Al Mamun Chowdhury, *Sakoya Gonohotta* [Sakoya Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P. 13-15
35. Mamun Tarafdar, *Chabbisha Gonohotta* [Chabbisha Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P.75-77
36. Mamun Tarafdar, *Chabbisha,* P.101
37. Himu Adhikar, *Kathira Gonohotta* [Kathira Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2014, P.15
38. Mithun Saha, *Hatia Gonohotta* [Hatia Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P.18

39. Mamun Tarafdar, *Goran Sachiyachora Gonohotta* [Goran Sachiyachora Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P. 15
40. Ariful Haque, *Haripur Gonohotta* [Haripur Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, p. 16
41. Chowdhury Shahid Kader, *Pahartali Gonohotta* [Pahartali Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2014, p. 12-19
42. Chowdhury Shahid Kader, *Pahartali,* P.16
43. Chowdhury Shahid Kader, *Nathpara and Abdur Para Gonohotta* [Nathpur and Abdur Para Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017, P. 11
44. Mizanur Rahman, *Choupukuria Gonohotta* [Choupukiria Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 11
45. Mousami Rahman, *Dogachi Gonohotta* [Dogachi Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 52
46. Santa Patranabish, *Binodbari Mankon Gonohotta* [Binodhbari Mankon Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2014, P. 11-15
47. Santa Patranabish, *Binodbari,* P. 33-34
48. Ali Akbar Tabi, *Kalyanpur,* P. 31-32
49. Munira Jahan Sumi, *Beshainkhan Gonohotta* [Beshainkhan Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P. 9
50. Suriya Akther, *Danga Gonohotta* [Danga Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 58
51. Abdullah Al Mamun Chowdhury, *Sakoya,* P.13-15
52. Muntassir Mamoon, *Birangona 1971: Saga of the Violated Women,* Journeyman, Dhaka, 2017; Nayanika Mookherjee, *The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories, and the Bangladesh War of 1971,* Duke University Press, 2015
53. Sarmila Bose, "Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971." *Economic and Political Weekly*. 40: 41, 2005, p. 4463–71; Sarmila Bose, "Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War." *Economic and Political Weekly*. 42: 38, 2007, P. 3864–71,
54. M A Hasan, *Juddho O Nari* [War and Women], Tamrolipi, Dhaka, 2008, P. 50-51
55. Nazmun Nahar Laizu, *Khadimnagar Cha Bagan Gonohotta* [Khadimnagar Tea Garden Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 18-23
56. Mausumi Rahman, *Ataikula Gonohotta* [Ataikula Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P. 15
57. Shamima Wadud, *Majhdanga Gonohotta* [Majdanga Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 74
58. *Ibid*
59. Shahin Alam, *Charar Hat Gonohotta* [Charar Hat Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2015, P. 12

60. *Dainik Bangla*, February 16, 1972

61. Imran Mahfuz, *Lalbridge Gonohotta* [Lal Bridge Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2017, P. 36

62. Azharul Azad Jewel, *Zanzira Gonohotta* [Zanzira Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P. 69

63. Afroza Parvin, *Tularampur Gonohotta* [Tularampur Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2019, P. 20-21

64. Munira Zahan Sumi, *Gabkhan Gonohotta* [Gabkhan Genocide], Genocide Museum, Khulna, 2018, P. 25

65. Shahriar Kabir, *Ekattorer Gonohotta, Nirjaton O Juddhaporadher Bichar*,[Genocide, Torture and Justice of War Crime : 1971], Somoy, Dhaka, 2018, P. 14

66. M A Hasan, *71'er Gonohott O Juddhaporadh,*[Genocide and War Crime of 1971], Tamrolipi, Dhaka, 2016, P. 36

67. M A Hasan, *71'er Gonohott,* P. 35

68. For Details: Herbert C. Kelman and V. Lee Hamilton, *Crimes of Obedience: Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility,* Yale University Press, New Haven, 1989

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 15.10.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

Tolerance and Pluralism in Islam: A Contemporary Thought

Gazi Omar Faruque*

Maksuda Akhter**

Abstract

World peace, solidity, semblance and progression depends upon proper practice of morality and rituals. Tolerance is the most important attribute beneath this aspect which insofar as relates to pluralism. Nonetheless, the present world remains in a great confrontational situation. Faith and ideological difference specially among the people of Islamic faith with those of the rest of the world become the top most crisis at the root of this situation. Now media is being used as very powerful tools for influencing and imaging each and every latitude. At present, Islam is being used to blame for the confliction by taking privilege of prevailing control over media and is apparently made a victim. However, Islam means peace and is considered as complete code of life. By the evidence of Holy Quran and Hadis with logical supports it is shown in this article that Islam is religion of peace which preaches and practice tolerance and pluralism.

Keywords: Religion, Islam, Tolerance, Pluralism, Peace.

The global situation is heading towards various confrontations. At the root of the present confrontational situations, one of the top most crises is faith and ideological difference which exists between the billions of people of Islamic faith and those of the rest of the world. Is this confrontation inevitable? No, we are magnifying the crisis and the confrontational issues much more than those of peace and cooperation. A sound knowledge –based discourse is essential for a resolution to the situation.

We are living at a time when media has reached a peak. News presentation is used psychologically to take confrontation to another dimension. On the other hand, our economic liberalism and relations are not free from political hegemony. All these features go in favour to the power and civilization other than Islam and create a confrontational tendency among the followers of Islam. That is why these features must be taken into consideration in our discourse. Another important matter is that this ideological conflict or difference has had an effect on each and every country and each and every person. A suppressed agitation has been created within people's minds. In order to ventilate this feeling, a deep study is required to examine if any political conspiracy is working at tarnishing the image of Islam as a religion of peace.

Islam is being used in the present world to create a situation of conflict. Religion in the past has often been used as an issue for occupation, war and struggle. But at a time in the 21 century when civilization has come so far, it is totally unwarranted

* Professor, Department of Law, Islamic University, Kushtia, Bangladesh
** Associate Professor, Department of Law, Islamic University, Kushtia, Bangladesh

that religions hold be used to create such conflict. Islam is apparently being made a victim or target. This can bode well for no one. Instigating almost 1.7 billion Muslims can certainly not usher in peace, stability or development of civilization. But the question is why there is instigation in the first place? Is Islam actually religion of violence and terrorism? Of course, not rather Islam is simply a continuation of the course that has been preached in the world down the ages. It has been started from the first man Adam completed unto Prophet Muhammad (Peace be upon him). Islam is the only religion that recognizes all the prophets and great men of religion.

Under the present circumstances, in order to overcome the prevailing situation of conflict, it is imperative for Muslims to present Islam in its true light, to explain it with clarity. At the same time, it is essential that those who misunderstand Islam and misinterpret, take stock of the religion, evaluate it properly and understand it. This is necessary for both Muslims and for the rest of the world. World peace, stability, harmony, and progress depend upon proper practice of religious norms and rituals which are the underlying spirit of Islam as well as all other religions.

This topic is extremely sensitive but it is not merely a matter of emotion, it is a matter of logic, knowledge and practice. A solution to the problems must be reached through logical analysis on the basis of the Holy Quran and Practice of Prophet Muhammad (Peace be upon him). Accordingly, some important flash points have been highlighted here.

The idea of creation presupposes the theme of equality of all men before the heavens and before every religious canon and law. It remains the one essential component of human life, indeed of human nature, that we have always and through the centuries regarded as sacrosanct. When therefore the question of tolerance insofar as it relates to pluralism, to multidimensional democracy as it were, makes its way to us today, we are but reminded once more of those original laws set for mankind by the Creator of the Worlds. You can be follower of any faith, you can be an activist for any sect, and indeed you may not entertain any faith in the issue of faith itself. But the cardinal principle that people all over the world and across the ages have followed has remained unalterable and therefore universally accepted. It is that all matters of belief a deity or in a number of deities come through the knowledge that those who do not believe or do not entertain any beliefs but their own yet recognize the plurality which defines people's approach to God, to the mystery Creation.

It is this fundamental principle religion we are being asked to consider today, in times when the danger to the peace and security of the world has never been greater, never been more pronounced. It is our job, at this point in time when the rear many men and women out there to tell us of an imminent or an already begun clash of civilizations that the idea of civilization itself precludes the idea of conflict. Civilization is generic; it comes to various men in various cultural climes in its various manifestations. And a common thread which these discrete aspects of the civilization, seeing that civilization is also a matter of continents and regions, is the thread which acknowledges the diversity of ideas. To that extent, the very idea of

faith as it is practiced in this many ways across the world is largely a matter of natural diversity. The Muslim, the Christian, and the Jew pray to the God they call their own. The Hindu thrives in the company of his multifarious deities; and the Buddhist constantly reflects on the theme of moksha or *nirvana*[1], of release from the pain of birth. There lies the beauty of faith. The sense of beauty, however, acquires a different, more enlightened character all together when it is recognized that a single underpinning links all these modes of belief in a long, rhythmic chain punctuated by a cosmic pattern. The underpinning is tolerance. It is pluralism the core point of which remains a willingness on the part of the believer to remember his God without in any way infringing on the right of his neighbours to send up his prayer to his own God up there in the heavens. One of the most eloquent to bring these threads together was the great American Thomas Jefferson, who wrote in the Declaration of Independence: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, and that they are endowed by their Creator with certain alienable rights."

As Muslim, we firmly believe in Allah's emphatic declaration in the Holy Quran:

"This day have I perfected your religion for you, completed my favours upon you,

And have Chosen for you Islam as your religion."[2]

By the Grace of Allah, every Muslim must have an unshakable faith in this perfect and only chosen Deen of Allah. It is a religion chosen for no particular age or time, for no particular race or clime. It is a religion for all ages, for all time to come. It is a religion of complete Submission to the Will of God. It is a religion which believes in peace and harmony. It is a religion which preaches and practices tolerance and pluralism. It is a religion which radiates liberty, establishes equality and breathes fraternity. A religion which upholds and promotes children's rights, and champions the cause of women's dignity and freedom. A religion which abolishes class distinction and apartheid. A religion which enjoins justice and righteousness in every walk of life and in every domain of thought. A religion which abhors tyranny and terrorism, hatred and hostility. A faith which preaches in unambiguous terms that there in no compulsion in religion "*La ikraha fid Deen."*[3]

Islam, the last of the celestial religions, which preaches and practices something unique in the annals of civilization. It not only declares unhesitatingly, "To every people was sent a Messenger of Allah."[4], but also ordains its followers to say: "We make no distinction between one and another of His Apostles."[5] As a sincere Muslim it is my duty to say: "We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in the Books given to Moses, Jesus, and the Prophets from their Lord. We make no distinction between one and another among them."[6] Yes, Islam ordains us to bear in mind that Muslims must respect all Messengers of God equally, though Allah in His Wisdom sent them with degrees of rank. The Holy Quran even goes to the extent warning us: (Those who say): "We believe in some (of the Prophet …but reject others...they are in truth (equally) Unbelievers."[7]

That is why a Muslim must invoke the Blessings of God and utter “peace be upon him,” whenever and wherever he mentions the name of a Prophet, be it Adam or Abraham, David or Solomon, Moses or Jesus (Peace be upon them), No other religion shows such respect or reverence to the overall sacredness and pristine purity of Prophet hood. What is more, no Muslim can dare to commit blasphemy or vilify the character of other religious leaders. None, if he truly believes in Islam, can criticise Sri Krishna,[8] Gautama Buddha and Mahavir.[9] If we are true Muslims, we can never criticise or blaspheme noble characters of other faiths. The Holy Quran ordains very clearly: “Revile not ye those whom they call upon besides Allah, lest they out of spite revile Allah in their ignorance”[10] A Muslim indeed has no right to blaspheme. No wonder, in Bangladesh, which basks today in the radiant glory and greatness of Islam, Hindus, Christians and Buddhists live peacefully side by side with their Muslim brethren and enjoys equal rights and privileges in every sphere of activity and in every domain of thought. And that testifies so eloquently to that concept of peace, harmony, tolerance, and pluralism that Islam firmly believed in. Islam indeed is a religion which propagates its own sublime excellence and unsurpassable greatness at all costs, and yet ordains its followers neither to force adherents of other religions to embrace Islam nor create any hindrance when they preach and practice their own faith.

Faith is a matter of personal conviction. The Holy Quran defines the right attitude to those who reject Faith: in matters of Truth we make no compromise, but there is no need to persecute or abuse anyone for his faith or belief, however different or unacceptable it may be. A Muslim will never force or compel anyone to accept Islam. While propagating the sublime Message of Islam, the method which a Muslim follows is plain and simple. “I am a worshipper of the One True God, the Lord of all, of you as of myself. I have shown you the Truth. It is up to you whether you accept it or not. For your Ways the responsibility is yours, for my Ways the responsibility is mine. In the words of the Holy Quran: “Lakum Deenukum Walia Deen” -To you be your Way, to me mine.[11] It is really unfortunate that Islam is often reproached with having propagated its faith by the sword. “What is overlooked is that”, says Schuon Frithj of in Understanding Islam, “Persuasion played a much greater part than war in the expansion of Islam as a whole.”

“The picture of the Muslim soldier *advancing with a sword in one hand and the Koran in the other is false” ,*testifies A.S. Tritton in his renowned work Islam.[12] “We must acknowledge that the humanitarian spirit of Islam at its best”, says Samuel C. Chew in the *Crescent and the* Boss, “has also been a guiding force in treating these other Peoples of the Book with more forbearance than Jews enjoyed in Christian Europe or than protestants in Catholic or Catholics in Protestant countries.”[13] John Davenport’s comment in this regard in his *Message of the* Quran is brief but eloquent: “Islam has never interfered with the dogmas of any faith- never established an inquisition. It offered its religion, but never enforced it”. Mahatma Gandhi, the world renowned exponent of non-violence, nails the canard more effectively, “I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-

effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission - these and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle" (Young India, 1924).

The Shorter Encyclopedia of Islam, edited by H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, also corroborates it: "Even down to the time of the Crusades there prevailed in Islam a tolerance towards the unbelievers, especially the Ahle-Kitab,[14] such as is impossible to imagine in contemporary Christendom."[15] Comte de Gobineau sums it up through a precise statement: "No religion is more tolerant than Islam to the followers of other Creeds."[16]

Even if we go back to history, we find the same harmony, the same co-existence, the same pluralism, the same tolerance in Muslim countries. Above all, of course, shines with majestic brilliance the historic Medinah Charter of the holy Prophet Muhammad (Peach be upon him). No document in history can be a more eloquent testimony to co-existence, tolerance, pluralism and harmony between different faiths. No wonder, the holy Prophet of Islam (Peach be upon him) permitted the Christian delegation from Najran to say their evening prayers in his own mosque. When the Christian delegation met Prophet Muhammad (Peach be upon him) in Medinah, the evening had already set in. The Christians sought permission to go outside the mosque and offer their prayers. The holy Prophet (Peach be upon him) requested them to say their prayers right inside the Holy Masjid-un- Nabi. The Apostle of Allah (Peach be upon him) led the Maghrib prayers facing the Holy Ka'ba while the Christians said their prayers facing the opposite direction- two faiths offering their prayers under the same roof and at the same time right inside a mosque. That is true Islam! No wonder, when a funeral procession passed by, the holy Prophet Muhammad (Peach be upon him) stood up. His companions informed him that it was a Jewish funeral. The Prophet of Islam (Peach be upon him) replied: "Death is a fearful event. So when you see a funeral stand up and show respect." (Bukhari and Muslim). It is this doctrine of tolerance, co- existence and pluralism which prompted the holy Prophet (Peach be upon him) to permit a Jew named Mukhairiq and Nadri to participate in the Battle of Uhud, the second Muslim Holy War against the infidels. No wonder, the Holy Quran also declares very clearly, "Those who believe (in the Quran), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,[17] ... any who believe in God and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord: On them shall be no fear, nor shall they grieve."[18]

The erudite scholar Abdullah Yusuf Ali, in his world-renowned Translation and Commentary on the Holy Quran, even goes to the extent of claiming: 'But I think in this matter (though many authorities would dissent) the term Sabiyin can be extended by analogy to cover earnest followers of Zoroaster,[19] Buddha,[20] Confucius,[21] and other teachers of the Moral Law."[22]

If we once again traverse through the pages of history, it will help all of us simply because, in the words of Winston Churchill, "the longer you can look back, the farther you can look ahead." When the pages are turned over what one finds in the annals of Islam is tolerance at its best, pluralism at its zenith. The most pious Muslim emperor in Indian history is undoubtedly the Moghul emperor Aurangzeb who was, in the words of Stanley Lane-Poole, 'first and last a sterm puritan. Nothing in life- neither throne, nor love, nor ease- weighed for an instant in his mind against his fealty to the Principles of Islam."But even this 'sterm Puritan, 'revered throughout the length and breadth of the sub-continent as Zinda Pir,[23] "wedded to the Muslim orthodoxy of the day", and sanctioned the largest amount of grants in India history for the preservation and restoration of Hindu temples.[24]

As regards terrorism, Islam is the scapegoat today. Due to age-old hatred and malice, ignorance and misconception, Islam has unfortunately been made synonymous with fundamentalism, militancy and terrorism. Nothing can be farther from the truth. Islam, which has been hailed by Rev. Bosworth-Smith as "the most complete, the most sudden and the most extraordinary revolution that has ever come over any nation of earth"[25] has never in its cheered history incited or patronized terrorism in any form. Its Holy Book emphatically declares: "Whoever kills a soul, except for murder or for spreading mischief in the land, kills all humanity, whoever saves a soul, except for murder or for spreading mischief in the land, kills all humanity, whoever saves a soul, Saves all humanity."[26] What is more, it ordains all its followers to try their level best to establish justice and righteousness in every sphere of activity and in every domain of thought. In the words of the Holy Quran, "And fight them on until there is no more tumult or oppression and there prevail justice and faith in God altogether and everywhere."[27] Not a single word in the Holy Quran or the Holy Hadith encourages or promotes terrorism or militancy. On the contrary, numerous Quranic verses and sayings of the holy prophet of Islam (Peach be upon him) are there which unhesitatingly denounce terrorism and hostility, militancy and fundamentalism. It can safely be claimed that the false aspersion of terrorism and militancy is the result of not only ignorance and misconception but also of the sinister design of some quarters who are bent upon maligning Islam in every possible way, but a man who banks on history, who is well-acquainted with the tenets of Islam, who believes in the unparalleled success of the Hilful Fuzul[28] organized by the holy prophet (Peach be upon him) will never hesitate to distance Islam from terrorism and fundamentalism. The evil and inauspicious designs of the conspirators who try to equate Islam with terrorism or militancy are nothing but "the works of dungeon cleaners". In the words Mahatma Gandhi, "Those who attend to the dungeon smell only the foul odour of it. The delight and fragrance of Islam foliage do not reach their sensibilities." It won't be any tall claim or exaggeration if I say that to fight terrorism in every nook and corner of the world, Islam, the religion of peace and harmony, tolerance and co-existence, deserves to be given a chance to play in the resplendence of its full plumage. Naturally, therefore, ladies and gentlemen, it

remains our task, in these extremely fraught times, to consider anew the alleys and lanes where we have pushed faith into a straitjacket, to rethink the entire question of giving religion a push that will take it back to an elevated plain of thought, free from narrowness and bigotry and sectarianism. What we are concerned with today is a reclaiming of our souls for ourselves, a search for the Creator, for the Omnipresent, that, in the words of Ibn Rushed (Averroes),[29] "sleeps in the stone, dreams in the animal, wakes in the man."

May it be mentioned in this connection that there are a huge number of issues which are strikingly similar in all the major scriptures of different faiths. It is a pity, however, that very few are aware of what the other religions preach. For example, not a good many Christians know that there is a full chapter devoted to Virgin Mary (Peace be upon her) in the holy Quran, and the holy Book of the Muslims declares in unequivocal terms "O Mary! God hath chosen thee and purified thee chosen thee above the women of all nations."[30] Very few know that the supernatural powers of Jesus (Peace be upon him) and Moses (Peace be upon him) have been explicitly described in the Holy Quran. Buddhists also do not know that a good number of Exegetists and Commentators opine that the Ficus Indica,[31] the Bo-tree under which Gautama Buddha obtained his Nirvana, has been referred to in sura Tin in the Holy Quran. There renowned Exegetists Abdullah Yusuf Ali even goes to the extent of claiming: "If accepted it (the suggestion that Tin refers to the Ficus Indica) would cover pristine Buddhism and the ancient Vedic religions from which it was an offshoot. In this way all the religions would be indicated."[32]

None present here will disagree when I claim that no faith on earth promotes or supports terrorism. Every faith discourages hatred and hostility and aggression. Every faith denounces adultery and lechery and moral degradation. Every faith loves peace and tranquility. Every faith loves the children and the women. But although there are so many issues in common, it is a cruel irony of fate that the followers of different faiths keep themselves confined to the walls of their own religions. Shrouded by the ignorance or misconception about other faiths, they prefer to nourish hatred and malice and hostility towards one another. Now that the vicious terrorism has spread its hood menacingly against humanity and co-existence, we must make concerted efforts at this crucial hour to silence the hissing of the devil - incarnates and the howls of the werewolves in human shape.

The need of the day indeed is pluralism imbued with the serene and sublime hue of tolerance and harmony as is very effectively practiced in Islam. Let all of us reject and forget the so-called inevitability of the clash of Civilizations. Let the representatives from different faiths sit together with a view to weeding out the man-made differences and antagonism that have unfortunately cropped up among various religions due to sheer ignorance, misconception and distortion of the sublime ideals conveyed by the Messages emanating from the Great Unknown. The task is challenging and arduous. We have miles to go before we sleep. Let us rise to the

occasion and accept the challenge in right earnest and turn the small step taken today into a great leap for mankind.

Conclusion: At the end, it may be said that Islam believes in co-existence with all other dogmas and ideologies irrespective of all political, social and philosophical thoughts. It tolerates different opinions and it provides different religious sects and communities to have their own ideas among them regarding their own ideology. The scope of tolerance and pluralism does not mean to compromise with ideologies and sectarianism and merge into them. For example, Jews interpreted the Prophet's liberalism as foolishness and once the Jews offered in this way, O! Muhammad we will pray with you six months and you will worship with us six months, then we will decide what to do. This is one kind of agreement of compromise. The prophet refused. There Allah the Almighty revealed the verse, "Lakum Deenu kum wa- lia Deen"(To you be your way, to me mine). Allah sent the prophet to preach oneness of God, not to preach many gods and faith. On the other hand, Islam opposes fanaticism, radicalism, terrorism, superstition, and innovation to worship and all kinds of tyrannical mechanism. A faith which preaches in unambiguous terms that there is no compulsion in religion.

References

1. Moksha is a term in Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism which refers to various forms of emancipation, enlightenment, liberation, and release. In its stereological and eschatological senses, it refers to freedom from *saṃsāra*, the cycle of death and rebirth. In its epistemological and psychological senses, *moksha* refers to freedom from ignorance: self-realization, self-actualization and self-knowledge.

   In Hindu traditions, *moksha* is a central concept and the utmost aim to be attained through three paths during human life; these three paths are *dharma* (virtuous, proper, moral life), *artha* (material prosperity, income security, means of life), and *kama* (pleasure, sensuality, emotional fulfillment). Together, these four concepts are called Puruṣārtha in Hinduism.

   In some schools of Indian religions, *moksha* is considered equivalent to and used interchangeably with other terms such as *vimoksha*, *vimukti*, *kaivalya*, *apavarga*, *mukti*, *nihsreyasa* and *nirvana*. However, terms such as *moksha* and *nirvana* differ and mean different states between various schools of Hinduism, Buddhism and Jainism.The term nirvana is more common in Buddhism, while *moksha* is more prevalent in Hinduism (https://en.wikipedia.org/wiki/Moksha).
2. Al- Quran, Sura Al- Maida, verse, 4
3. Al- Quran, sura Al Baqarah,verse, 256.
4. SuraYunus, verse, 47
5. Sura Al Baqarah, verse , 285
6. Sura Al- Imran, verse, 84

7. Sura Al-Nisaa, verses, 150-151

8. ***Krishna*** is a major deity in Hinduism. He is worshipped as the eighth avatar of the god Vishnu and also by some as the supreme God in his own right. He is the god of compassion, tenderness, and love in Hinduism, and is one of the most popular and widely revered among Indian divinities.[10] Krishna's birthday is celebrated every year by Hindus on Janmashtami according to the lunisolar Hindu calendar, which falls in late August or early September of the Gregorian calendar (https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna).

9. **Mahavira**, also known as **Vardhamāna**, was the twenty-fourth *tirthankara* (ford-maker) who revived Jainism. In the Jain tradition, it is believed that Mahavira was born in the early part of the 6th century BC into a royal kshatriya family in present-day Bihar, India. He abandoned all worldly possessions at the age of 30 and left home in pursuit of spiritual awakening, becoming an ascetic. Mahavira practiced intense meditation and severe austerities for 12 years, after which he is believed to have attained *Kevala Jnana* (omniscience). He preached for 30 years and is believed by Jains to have died in the 6th century BC, although the year varies by sect. Scholars such as Karl Potter consider his biography uncertain; some suggest that he lived in the 5th century BC, contemporaneously with the Buddha. Mahavira attained nirvana at the age of 72, and his body was cremated (https://en.wikipedia.org/wiki/Mahavira).

10. Surah An’am, verse, 108

11. Al –Quran, sura Al- Kafirun, verse, 6

12. London, 1951, p.21

13. New York, 1937, p. 374.

14. Refers to the Christians, the Jews and the Sabians. Or they are called as People of the Book.

15. Royal Netherlands Academy, Leiden, 1981, p. 206.

16. Les Religions et la Philosophies dansL’Asie Centrale, Paris,1865.

17. The Sabians of Middle Eastern tradition were a religious group mentioned three times in the Quran as a People of the Book, along with the Jews and the Christians. In the hadith, they were described simply as converts to Islam. Interest in the identity and history of the group increased over time. Discussions and investigations of the Sabians began to appear in later Islamic literature. The Sabians were identified by early writers with the ancient Jewish Christian group the Elcesaites, and with gnostic groups such as the Hermeticists and the Mandaeans. Today, the Mandaeans are still widely identified as Sabians.(https://en.wikipedia.org/wiki/Sabians)

18. Al Quran, Sura Baqarah, verse, 62

19. **Zoroastrianism**,or **Mazdayasna**, is one of the world's oldest religions that remains active. It is a monotheistic faith (i.e. a single creator god), centered in a dualistic cosmology of good and evil and an eschatology predicting the ultimate destruction of evil Ascribed to the teachings of the Iranian-speaking prophet Zoroaster (also known as Zarathustra), it exalts a deity of wisdom, Ahura Mazda (*Wise Lord*), as its Supreme Being. Major features of Zoroastrianism, such as messianism, judgment after death, heaven and hell, and free will have influenced other religious systems, including Second Temple Judaism, Gnosticism, Christianity, and Buddhism. The most

important texts of the religion are those of the *Avesta*, which includes the writings of Zoroaster known as the Gathas, enigmatic poems that define the religion's precepts, and the Yasna, the scripture. The full name by which Zoroaster addressed the deity is: Ahura, The Lord Creator, and Mazda, Supremely Wise. The religious philosophy of Zoroaster divided the early Iranian gods of Proto-Indo-Iranian tradition, but focused on responsibility, and did not create a devil per se. Zoroaster proclaimed that there is only one God, the singularly creative and sustaining force of the Universe, and that human beings are given a right of choice. Because of cause and effect, they are responsible for the consequences of their choices (https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism).

20. GautamaBuddha (c.563/480–c.483/400BCE),knownas Siddhārtha.Gutama Buddha, or simply the Buddha, after the title of Buddha, was a monk, mendicant, sage, and teacher on whose teachings Buddhism was founded.[7] He is believed to have lived and taught mostly in the northeastern part of ancient India sometime between the 6th and 4th centuries BCE.Gautama taught a Middle Way between sensual indulgence and the severe asceticism found in the śramaṇa movement common in his region. He later taught throughout other regions of eastern India such as Magadha and Kosala.

    Gautama is the primary figure in Buddhism. He is believed by Buddhists to be an enlightened teacher who attained full Buddhahood and shared his insights to help sentient beings end rebirth and suffering. Accounts of his life, discourses and monastic rules are believed by Buddhists to have been summarised after his death and memorized by his followers. Various collections of teachings attributed to him were passed down by oral tradition and first committed to writing about 400 years later (https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha).

21. **Confucius** (551–479 BC) was a Chinese teacher, editor, politician, and philosopher of the Spring and Autumn period of Chinese history.

    The philosophy of Confucius, also known as Confucianism, emphasized personal and governmental morality, correctness of social relationships, justice and sincerity. His followers competed successfully with many other schools during the Hundred Schools of Thought era only to be suppressed in favor of the Legalists during the Qin dynasty. Following the victory of Han over Chu after the collapse of Qin, Confucius's thoughts received official sanction and were further developed into a system known in the West as Neo-Confucianism, and later New Confucianism (Modern Neo-Confucianism).

    Confucius is traditionally credited with having authored or edited many of the Chinese classic texts including all of the Five Classics, but modern scholars are cautious of attributing specific assertions to Confucius himself. Aphorisms concerning his teachings were compiled in the *Analects*, but only many years after his death.

    Confucius's principles have commonality with Chinese tradition and belief. He championed strong family loyalty, ancestor veneration, and respect of elders by their children and of husbands by their wives, recommending family as a basis for ideal government. He espoused the well-known principle "Do not do unto others what you do not want done to yourself", the Golden Rule. He is also a traditional deity in Daoism.

    Confucius is widely considered as one of the most important and influential individuals in shaping human history. His teaching and philosophy greatly impacted people around the world and remains influential today.(https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius).

22. Abdullah Yusuf Ali, The holy Quran (Translation and Commentary)

23. Aurangzeb was called “ZindaPir”or “Living Saint” in Mughal India. In 1659 AD, Aurangzeb captured the throne from his father Emperor Shahjahan and ruled till his death in 1707 AD by his imperial title Alamgir (Conqueror of the world). Due to the simple living and high thinking of the Mughal emperor Aurangzeb, he is known as Darvesh or ZindaPir (See https://www.gktoday.in/question/which-mughal-emperor-was-called-as-zinda-pir).

24. Encyclopedia Britannica

25. Muhammad *and Mohainmedanism (1874),* London, p.105.

26. Sura Al-Maida, verse, 32

27. Sura Al Anfal, verse, 39.

28. In the years preceding the pact, the Quraysh were involved in intermittent conflict. The war, as usual, was a result of an unsettled murder. The effect was growing discontent with the form of justice that required sacrilegious war. Many Quraysh leaders had travelled to Syria, where they found relative justice prevailed. Similar conditions also existed in Abyssinia (now Ethiopia). No such system, however, existed in Arabia.Following the Fijar War, the Quraysh realized that the deterioration of their state and the loss of Mecca's prestige in Arabia were the result of their inability to solve disagreements, creating internal division.Ithas been founded by inspiration and physical help of Prophet Muhammad (Peace be upon him), special when he was young age (https://en.wikipedia.org/wiki/Hilf_al-Fudul). In the years preceding the pact, the Quraysh were involved in intermittent conflict. The war, as usual, was a result of an unsettled murder. The effect was growing discontent with the form of justice that required sacrilegious war. Many Quraysh leaders had travelled to Syria, where they found relative justice prevailed. Similar conditions also existed in Abyssinia (now Ethiopia). No such system, however, existed in Arabia.Following the Fijar War, the Quraysh realized that the deterioration of their state and the loss of Mecca's prestige in Arabia were the result of their inability to solve disagreements, creating internal division.Ithas been founded by inspiration and physical help of Prophet Muhammad (Peace be upon him), special when he was young age (https://en.wikipedia.org/wiki/Hilf_al-Fudul). The Red Cross Society is the replica of Hilf al Fuzul.

29. AbūlWalid Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rušd was born in 11 December, 1126 often Latinized as **Averroes** was a Muslim Andalusian (Spanish) philosopher and thinker who wrote about many subjects, including philosophy, theology, medicine, astronomy, physics, Islamic jurisprudence and law, and linguistics. His philosophical works include numerous commentaries on Aristotle, for which he was known in the West as *The Commentator*. He also served as a judge and a court physician for the Almohad caliphate.

    He was born in Cordoba in 1126 to a family of prominent judges—his grandfather was the chief judge of the city. In 1169 he was introduced to the caliph Abu Yaqub Yusuf, who was impressed with his knowledge, became his patron and commissioned many of Averroes' commentaries. Averroes later served multiple terms as a judge in Seville and Cordoba. In 1182, he was appointed as court physician and the chief judge of Córdoba. After Abu Yusuf's death in 1184, he remained in royal favor until he fell into disgrace in

1195. He was targeted on various charges—likely for political reasons—and was exiled to nearby Lucena. He returned to royal favor shortly before his death on 11 December 1198.

Averroes was a strong proponent of Aristotelianism; he attempted to restore what he considered the original teachings of Aristotle and opposed the Neoplatonisttendencies of earlier Muslim thinkers, such as Al-Farabi and Avicenna. He also defended the pursuit of philosophy against criticism by Ashari theologians such as Al-Ghazali. Averroes argued that philosophy was permissible in Islam and even compulsory among certain elites. He also argued scriptural text should be interpreted allegorically if it appeared to contradict conclusions reached by reason and philosophy. His legacy in the Islamic world was modest for geographical and intellectual reasons (https://en.wikipedia.org/wiki/Averroes).

30. Sura Al-lmran, verse, 42.

31. ***Opuntiaficus-indica*** is a species of cactus that has long been a domesticated crop plant grown in agricultural economies throughout arid and semiarid parts of the world.*F*icus-indica is the most widespread and most commercially important cactus. Common English names for the plant and its fruit are **Indian fig opuntia**, **Barbary fig**, **cactus pear etc.(**https://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia_ficus-indica) .

32. Abdullah Yusuf Ali, The holy Quran (Translation and Commentary).

Date of Submission : 24.08.2022
Date of Acceptance : 19.11.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July–December 2022

The Effects of Perceived Discrimination on the Level of Confidence among Immigrants in Canada

Md. Aminul Islam*

Abstract

Immigrants in many cases do not receive equal treatment for materializing different kinds of rights or valid privileges from native Canadian or Canadian Whites and hence they perceive discrimination. The study clearly demonstrates that immigrants who perceive or experience discrimination in different aspects, they tend to have less confidence in Canadian institutions. The objective of present study is to examine whether immigrants' perceived/experience of discrimination does have any impact on confidence level in different institutions. Drawing data from Canadian General Social Survey (GSS) 2013, a cross-sectional survey was carried out. Although the total sample size is 27,695, this study was restricted to immigrants only (N=9,689). The data were collected with the help of both computer-assisted telephone interviewing and electronic questionnaire. The results depict that 14 percent immigrants perceive/experience high level of discrimination while 18 percent immigrants' experience of discrimination is medium level. Bivariate result indicates that there is a negative weak (r=-19, p<0.01) correlation which means if perceived/experience of discrimination increases; the confidence of immigrants in different institutions tends to decrease. Multivariate analysis also confirms a negative effect (Unstandardized B is -0.595, p<0.001) i.e. immigrants who experience discrimination, they possess less confidence in Canadian institutions. These findings would facilitate the researchers and the policy makers to have better understanding on the effect of experience of discrimination on immigrants' confidence in various institutions.

Keywords: perceived discrimination, confidence, institutions, immigrants

Introduction

Globally, migration has been a very important issue which is characterized by different kinds of diversities among immigrant groups. Although immigrants land in Canada with a great hope, but many of them go through various kinds of odds situations and hence perceive discrimination. Therefore, it is necessary to know if immigrants' perceived discrimination has any impact on the level of confidence in Canadian institutions. Some immigration literatures also reveal that immigrants who perceive discrimination tend to have less confidence in Canadian institutions.

A significant portion of Canada's population is made up of immigrants from different ethnic identities of various countries. An important question occupies a central position in the immigration literature that whether Canada has been succeeded in integrating immigrants into the mainstream society. Variation always plays a vital role in characterizing the population and society of Canada (Lower, 1964). Canada also held the traits of being culturally distinguished area before settling European people here. There were around 50 different Aboriginal cultures as well as many diverse language groups in the Aboriginal population (Burnet,

* Associate Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka–1100, Bangladesh

1981).The 2016 data reveals that immigrants occupied 21.9 percent share of Canada's entire population (Statistics Canada, 2017). These people having 94 diversified mother tongues have made their destination to Canada (Statistics Canada, 2011). Of late, more than 65 percent immigrants have been coming from East and Southeast Asia (Berry, 2010). Besides cultural distinctiveness, immigrants' geographic, historical, social as well as linguistic variation pose a great challenge to integrate them into the mainstream Canadian society. For example, some earlier study findings regarding political integration depict that migrants' 'divided loyalties' obstruct their smooth integration (Black, 1987; Huntington, 2004). Some other literatures focus on the facts that immigrants are having less political expertise, democratic norms as well as trust in public institutions hinder nice integration to destination country (White et al., 2008).However, being integrated economically is considered as one the important problems of an immigrant's life. Because of language related complications, poor human and social capital as well as less adaptability to Canadian culture, immigrants face significant problems in getting into the destination country's job market. Moreover, many government or autonomous or private organizations do not ensure unbiased employee selection procedures. In this regard, immigrants are, in many cases, deprived of appropriate jobs or deserved services due to their race, age, religion, and sex in Canada. Many institutions do not follow 'just procedure' in providing immigrants with desired jobs or basic services. As a result, the immigrants who experience discrimination are more likely to hold less confidence in different institutions.

Related Literature Review

To get a glimpse of the level of confidence in Canadian institutions, Dilmaghani's (2019) work can play an important role where she shows that Muslims and Jews unlike other religious groups are more vulnerable to perceive discrimination. Dilmaghani (2019), furthermore, concludes that Muslims who perceived discrimination had less confidence in various institutions, but this result was not same for discriminated Jews.

With a view to have an idea on immigrants confidence in institutions in Europe, Roder & Muhlau (2011) examine whether because of being socially excluded and discriminated in many aspects, immigrants perceive institutions in a different way than that of mainstream people of European countries. The findings of Roder & Muhlau (2011) reveal that immigrants are more prone to think that they are in a particular group that is discriminated against. Hence, they perceive discrimination which eventually plays a significant role in lowering immigrants' confidence level in public institutions.

Wilkes & Wu (2019) studied whether discrimination impacts on immigrants' trust in Canada. Their findings depict that member of racialized minority group experience higher rates of discrimination than majority group members in Canada. As a result of more frequent experience of discrimination, racialized immigrants tend to possess lower level of trust than majority group of people (Wilkes & Wu, 2019).

The findings of some researches show that Americans other than Whites tend to possess less trust not only in political institutions (Abramson, 1983; Howell and Fagan, 1988), but also in police personnel (Frank et al., 2006)as well as the hospital operating procedure (Koenig et al., 2003). Abramson (1983) opines that this sort of vacuum in trust mirrors the existing political biasness. It means immigrants' scope in participating political activities is narrow and they face racial discrimination frequently. Moreover, they go through various disadvantageous situation as well as they become socially excluded in many aspects.

Actually, discussions on discrimination against immigrants are also centered on the concept of racism. Research suggests that overt racism is becoming increasingly unacceptable in Canadian society, and a few people will tolerate the open expression of racism (Kendall et al., 2014). But polite racism may be operating when visible minority groups are ignored or turned down for jobs or promotion on a regular basis (Kendall et al., 2014).

There are few studies that have directly focused on the effects of perceived discrimination on the level of confidence in different institutions. The dearth of studies on this aspect proves the necessity to embark a research on it. By examining General Social Survey (GSS) data, the study tests the hypothesis and adds knowledge to immigration literature.

Objective of the study

To fill up the existing gap in the literature of immigrants' level of confidence based on perceived/experience of discrimination, the present study sets the following objective.

- To know whether immigrants' perceived/experience of discrimination does have any impact on confidence level in different institutions.

Hypothesis

- Higher the level of perceived discrimination among immigrants, lower the level of confidence will be in different institutions.

Methods

The present paper uses the pooled data from the General Social Survey (GSS) 2013 in Canada, the data were officially released in December 2014, to scrutinize whether the experience/perceived discrimination among immigrants can account for immigrants' confidence in various institutions. Since the GSS (2013) is a well-designed cross-sectional survey, the data were collected through both computer-assisted telephone interviewing (CATI) and electronic questionnaire (EQ) from June 2013 to March 2014. The total sample size was 27,695 and among them 9,689 were immigrant people. GSS 2013 included a good number of items on confidence in different institutions and experience of discrimination faced by both the Canadian and the immigrants. For the purpose of this paper, only the samples of immigrant people (a total of 9689) were taken into account for analysis.

The present study's dependent and main independent variables fulfill the condition for continuous variable since the range of these variables is equal to or more than seven and skewness of both dependent and independent variable is -0.380 and 1.32 and kurtosis is 0.008 and 0.55 respectively. Although some of other independent variables that were used as controlled variables had many categorical attributes, some had been recoded as binary. Moreover, the immigration sample is fairly large that fulfill the assumption for normal distribution. Besides, there is a linear correlation between dependent and independent variables. And there is a low level of correlation among almost all independent variables. It is observed that only two independent variables i. e. age and visible minority are correlated (-0.346) each other. With a view to dealing with the interaction effects between age and visible minority, separate regression equation has also been computed. The researcher calculated differences between unstandardized slopes (for specific predictor variables) of two models and then evaluated for statistical significance.

The study has used Statistical Package for Social Sciences (SPSS version 20) software to run Pearson's r in order to measure the association and test of significance between experience/perception of discrimination among immigrants and confidence in different institutions.

Moreover, the analysis of the impact of experience of discrimination on immigrants' confidence in institutions uses ordinary least-squares (OLS) regression techniques, while controlling for other variables (for example, sex, age, marital condition, education, visible minority, news watching on television, contact with friends by telephone, pride with Canadian democracy and perception on returning lost wallet by police) that might have effects on confidence.

Measurement of Key Variables

Dependent Variable

Confidence in different institutions has been measured in GSS 2013 with a bunch of variables that examine on a one to five Likert scale ranging from no confidence at all (1) to a great deal of confidence (5) to examine how much confidence immigrant people have in different institutions in Canada. Eight items of the questions were asked to assess how much confidence the people have on Canada's police Department, judicial procedure and courts, educational arrangement, parliament, banks, major corporations, local merchants and business personnel as well as mass media. For the dependent variable, an index of confidence was created using the abovementioned eight items of questions regarding confidence in different institutions. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measures of sampling adequacy score is 0.887 as well as the reliability of these items was confirmed with Cronbach's Alpha for 0.872 and a sum of score was calculated from the eight items, with higher the scores indicating the more confidence. The confidence variable has a mean of 29.64, standard deviation 5.78, skewness 0.380, kurtosis 0.008 and a range of 32.

Independent Variable

Experience of discrimination faced by the immigrants is the main independent variable. A bunch of questions were asked whether the immigrants had any experience of discrimination regarding their sex, ethnicity, culture, race or skin color, physical appearance, language, and religion and became a victim of discrimination in the past five years preceding the interview. To measure the experience of discrimination, an index was created using seven items to assess one's experience or perception of discrimination in regard to any of the above mentioned aspects. All seven items' answer categories were binary (0 = no, 1 = yes). The KMO measures of sampling adequacy score is 0.846 and the reliability of these items was also confirmed with Cronbach's Alpha for 0.832. The experience of discrimination variable has a mean of 1.15, standard deviation 1.77, skewness 1.32, kurtosis 0.55 and a range of 7.

Measurement of Other Independent Variables

Nine other independent variables were included as control variables in the multiple regression analyses. Demographic characteristics include gender (0 = female, 1 = male), marital status (0 = single/never married, 1 = married), age (categorical in years). Age has been divided into 7 categories with an interval of 10 within categories. Education has been categorized in terms of different levels of education. Visible minority status has been classified into two groups (0 = not visible minority, 1 = visible minority). Other independent (control) variables measured whether the immigrant people had the habit of following news and current affairs on television (0 = no, 1 = yes), and whether they were habituated to maintain contact with friends by telephone (0 = contact in a week, 1 = contact in a month & no contact). Moreover, whether they were proud of Canadian democracy (0 = not proud & less proud, 1 = proud & highly proud), and what was their perceived likelihood with regard to returning their lost wallet by police officer (0 = not at all & somewhat likely, 1 = very likely).

Results

Table 1 presents frequency distributions of both dependent and independent variables. Over half (52.7 percent) of the respondents expressed high confidence in various institutions whereas only 3.7 percent expressed low level of confidence. The number of respondents who expressed high level of confidence was 14.2 times higher than the number of those who expressed low confidence. On the other hand, 43.6 percent respondents had medium level of confidence. More than half of the respondents (67.7 percent) experienced low level of discrimination while only 14.2 percent respondents experienced high level of discrimination. It appears that 4.8 times higher number of people experienced low level of discrimination than those who experienced high level of discrimination. Only 18.1 percent respondents had medium level of experience of discrimination.

Table 1: Frequency distribution of dependent and independent variables

Variable	Categories	Frequency (N = 9689)	Percentage (%)
Confidence	Low	318	3.7
	Medium	3706	43.6
	High	4482	52.7
Experience of discrimination	Low	6276	67.7
	Medium	1680	18.1
	High	1312	14.2
Sex	Female	5048	52.1
	Male	4641	47.9
Age	15 – 24	1642	16.9
	25 – 34	1321	13.6
	35 - 44	1991	20.5
	45 – 54	1714	17.7
	55 - 64	1428	14.7
	65 – 74	1011	10.4
	75 & over	582	6
Education	Less than high school diploma or equivalent	1078	11.2
	High school diploma or high school equivalency certificate	2234	23.3
	Trade certificate or diploma	542	5.6
	College/CEGEP/other non-university certificate/diploma	1712	17.8
	University certificate or diploma below bachelor's degree	392	4.1
	Bachelor's degree	2217	23.1
	University certificate, diploma, degree above BA level	1419	14.8
Marital status	Not in a marital status	3880	40.1
	In a marital status	5794	59.9
Visible minority	Not visible minority	3889	40.8
	Visible minority	5635	59.2
News watching on Television	No	2810	30.1
	Yes	6516	69.9

Contact with friends by Telephone	Contact in a week	5620	60.7
	Contact in a month & no contact	3645	39.3
Pride with Canadian Democracy	Not proud & less proud	2160	23.8
	Proud & Highly proud	6920	76.2
Perception on returning lost wallet by police	Not at all & somewhat likely	2089	22.3
	Very likely	7288	77.7

Source: GSS, 2013. Calculation is done by author.

There were more female respondents in this sample than that of their counterpart (52.1 percent and 47.9 percent respectively). Moreover, the data revealed that except 75 years and older (6.0 percent), all other age groups shared the similar proportion (around 20 percent respondents in each group) of the respondents.

Around one quarter(23.3 percent and 23.1 percent respectively completed high school diploma or a high school equivalency certificate and Bachelor's degree. On the other hand, 17.8 percent completed college/CEGEP/other non-university certificate or diploma while 14.8 percent achieved university certificate, diploma and degree above BA level. Only 11.2 percent had less than high school diploma or its equivalent certificate.

Among total respondents, 59.9 percent respondents were in a marital or common-law partner relationship whereas 40.1 percent respondents were separated, widowed or single. It is also evident that the majority of the respondents (59.2 percent) had visible minority status whereas 40.8 percent respondents did not have any visible minority traits. Among the respondents, 69.9 percent respondents followed news and current affairs on television. On the other hand, 30.1 percent did not watch news on various issues.

The data show that 60.7 percent maintained contact with their friends by telephone in a week while 39.3 percent did this in a month or did not contact in some months. A large number of respondents (76.2 percent) were either proud or highly proud of the democratic system of Canada whereas only 23.8 percent respondents were not proud in this regard. More than half of the respondents (77.7 percent) believed that police would return back the lost wallet to the right person while 22.3 percent answered negatively in this respect.

Results of measures of association

In order to measure the association and test the significance of the association between the experience or perception of discrimination and confidence in different institutions, Pearson's r was calculated (see Table 2).

Table 2: Correlations between experience of discrimination and confidence in institutions

Correlations between dependent and independent variable		**Experience of discrimination**	**Confidence**
Experience of discrimination	Pearson Correlation	1	-.194**
	N	9268	8276
Confidence	Pearson Correlation	-.194**	1
	N	8276	8506

** Correlation is significant at 0.01 level.

Source: GSS, 2013. Calculation is done by author.

The result of Pearson's *r* indicates that there is a negative weak association (r = -0.19) between experience of discrimination and confidence in institutions among immigrants. The result depicts that if experience or perception of discrimination increases, the confidence in different institutions tends to decrease. The result is statistically significant at the level of 0.001.

Results of multivariate analyses

To explain the variance in confidence in different institutions, a multiple regression model has been built up. This model includes ten independent variables. Among them, experience of discrimination is the main independent variable and the rest of variables, for example, sex, age, education, marital status, visible minority, and contact with friends by telephone, follow news and current affairs on television, pride with Canadian democracy and perception on returning lost wallet by police, work as control variables. A correlation matrix of independent variables has been created to examine the relationship among the independent variables. It shows reasonably low relationship among them (r = <0.30), although there is a moderate significant correlation (-0.346) between age and visible minority. This moderate and significant relationship between age and visible minority leads to the assumption that these two independent variables share variance in confidence to some extent. To examine this combined effect, the present paper has created a cross product of age and visible minority to see that whether it has a significant impact on predicting confidence or not. After inserting the cross product into the multiple regression models, it is seen that it is not significant (0.155) in case of predicting confidence. But existing literature suggests that there might be some influence of age and visible minority on confidence. Therefore, the study runs partial correlation between confidence and age while controlling visible minority and it is seen that they are still not related (r = 0.057). But when it is done for visible minority controlling age, it is found that confidence and visible minority is significantly positively related (r = 0.167).

Table 3: Net effects of experience of discrimination and other predictor variables on the level of confidence in institutions

Independent Variables	**Beta**
Experience of discrimination	-0.188***
Sex	-0.041***
Age	0.034
Educational status	-0.039**
Marital status	0.053***
Visible minority	0.221***
Follow news on television	0.050***
Contact with friends by telephone	-0.027**
Proud with Canadian democracy	0.229***
Perception on returning lost wallet by police	0.257***
Cross product of age & visible minority	-0.034

n= 9689,R Square = 0.225, Adjusted R Square = 0.224

*Significant at p<0.05; **significant at p<0.01; ***significant at p<0.001

Source: GSS, 2013. Calculation is done by author.

Multivariate regression equation has been drawn with the help of dependent (confidence) and main independent variable (experience of discrimination) along with other nine independent variables to examine the influence of independent variables in determining the variance on confidence. The equation confirms that since the R square is 0.225, it clearly indicates that the ten independent variables, altogether, account for 22.5 percent of the variance in confidence (Adjusted R Square = 0.224).Here, it is found that if one unit increases in experience or perception of discrimination, it will decrease the confidence in institutions by -0.595 and it is statistically significant at the level of 0.001. The model indicates that there is no problem regarding collinearity because tolerance score is less than 1 while variance inflation factor (VIF) score is less than 2.

The equation suggests a negative effect (Beta = -0.188) of experience or perception of discrimination on confidence in institutions among immigrants and the result is statistically significant at the level of 0.001. This negative effect translates that immigrants who experience/perceive discrimination they tend to have less confidence (Beta = -0.188) in different institutions than their immigrant counterparts who do not experience/perceive discrimination. It is also seen from the model that the study's main independent variable i.e. experience of discrimination has the third

highest Beta = -0.188. It indicates that this variable has third highest influence among the independent variables on determining confidence. The equation also shows that males have less confidence (Beta = -0.041) in institutions than females. However, age is not significantly related to confidence. On the other hand, more educated people also tend to have less confidence (Beta = -0.039) in institutions than less educated immigrant people. The equation also suggests that marital status has a positive relationship. It means that confidence is (Beta = 0.053) greater among married people than single, separated or widowed. Moreover, the visible minority respondents tend to show more confidence (Beta = 0.221) in institutions than non-visible minority.

Besides, the equation shows that those who follow news and current affairs have more confidence (Beta = 0.050) in institutions than those who are not habituated to watch news and views on television. On the other hand, those who maintain more communication with friends by telephone hold less confidence (Beta = -0.027) in institutions than their counterparts.

Furthermore, it is seen from the equation that there is a significant positive relationship between practicing fair democratic norms and confidence. The study finds that if good democratic system prevails, it helps increasing (Beta = 0.229) confidence in institutions. It is also found that if police returns lost wallet, confidence is found to be positively related with moderate degree (Beta = 0.257). It indicates if police follow just procedure, it increases confidence towards police. However, the cross product of age and visible minority status do not have significant impact (significant at 0.155) on confidence.

Discussion

The result of Pearson's r confirms that experience of discrimination faced by immigrants and confidence in different institutions are negatively related. If immigrants experience/perceive more discrimination, they possess less confidence in different institutions. Therefore, the study findings support the present paper's hypothesis. The results of multiple regression equation also suggest significant inverse relationship between experience of discrimination and confidence in institutions. Almost similar result was found in a study conducted by Van Craen (2012) which indicates that practical experiences of discrimination have a great influence on the level of trust among racialized group members than that of the people of majority cluster.

The study findings of Roder & Muhlau (2011) reveal that immigrants are more prone to think that they are in a particular group that is discriminated against. Hence, they perceive discrimination which eventually plays a significant role in lowering immigrants' confidence level in public institutions.

The study findings of Wilkes & Wu (2019) also reveal that racialized minority groups experience higher rates of discrimination than majority group members in Canada. As a result of more frequent experience of discrimination, racialized

immigrants tend to possess lower level of trust than majority group of people (Wilkes & Wu, 2019).

The findings of Dilmaghani (2019) also have some similarity with the present study findings. Dilmaghani's (2019) work shows that Muslims and Jews unlike other religious groups are more vulnerable to perceive discrimination. She, furthermore, concludes that Muslims who perceived discrimination had less confidence in various institutions, but this result was not same for discriminated Jews (Dilmaghani, 2019).

Similarly, the findings of some researches show that Americans other than Whites tend to possess less trust not only in political institutions (Abramson, 1983; Howell and Fagan, 1988), but also in police personnel (Frank et al., 2006) as well as the hospital operating procedure (Koenig et al., 2003). Likewise, Abramson (1983) opines that this sort of vacuum in trust mirrors the existing political biasness. It means immigrants' scope in participating political activities is narrow and they face racial discrimination frequently. Therefore, the findings of this study and the abovementioned studies' findings clearly demonstrate that immigrants who experience/perceive more discrimination, they tend to have less confidence in different institutions.

Along with the main independent variable, some other independent variables do also have significant relationship with the level of confidence in different institutions. The paper finds that men among immigrant population have less confidence in institutions than their female counterparts. Besides, more educated people among immigrant people possess less confidence while married people have more confidence in institutions than unmarried people. Furthermore, it is also seen that watching news and current affairs on television play positive role in increasing confidence in this regard.

The results of multivariate regression also show a positive relation between visible minority and confidence in different institutions in Canada. Moreover, it is seen that there is a significant positive relationship between practicing fair democratic norms and confidence. The study finds that if good democratic system prevails, it helps increasing confidence level by 3.036. It is also found that if the people belief that police are not corrupt, this positive perception regarding police increases confidence among immigrants.

The paper does not find any significant relationship between the cross product of age and visible minority on confidence although there is a significant relation between visible minority and confidence while age has been controlled.

This study involves a number of limitations. First, since the study was carried out relying on the methods of computer-assisted telephone interview and electronic question, some immigrant people might not have telephone or mobile phone and less well-off immigrants might not be covered adequately. Moreover, less literate immigrants have not been able to fill out electronic questionnaire or participate in the telephone interview.

Second, the study controls for only some mediating factors in examining the association between experience of discrimination and confidence in institutions, and the equation explains only one-fourth of the variance in confidence while three-fourth variances remain unexplained. In this respect, how and to what extent some more other mediating factors affect confidence in institutions remain unknown.

Finally, the patterns of the relationship between experience of discrimination and confidence in institutions may vary depending on the cultural background (such as African, Asian, European, and South-American) of the immigrant people. The present study does not examine confidence level based on these different cultural backgrounds. Therefore, the study suggests that further study is needed to find the impact of cultural diversity along with other possible mediating factors to explore the true relationship between experience of discrimination and the level of confidence in Canadian institutions.

Conclusion

The findings of the present study provide us with a clear answer to the main research question of whether experience of discrimination and confidence in different institutions are related. The study finds a significant negative weak relationship between experience of discrimination and confidence. That means if the experience of discrimination or perceived discrimination among immigrants increases, the confidence in institutions tends to decrease.

Moreover, the present study finds a positive relationship between visible minority and confidence although it is also required to explore further regarding this result. However, we, still, cannot be sure about the true relationship between experience of discrimination and confidence in institutions because many other possible mediating factors are yet to be explored. Besides, the relationship between these variables may vary depending on the cultural differentiation of immigrants. For example, Roder and Muhlau (2011) opine that perceived group discrimination varies from one group of immigrants to another group. Therefore, the present study suggests further research to examine if there is any difference between the varying degree of experience of discrimination or perceived discrimination among diverse visible minority groups of immigrants such as South Asian, African and Caribbeans, Korean, Middle- Eastern, Chinese, Filipino/a, Latin American, Koreans, Southeast Asian, West Asian, Japanese, and countries within Africa on the level of confidence in different institutions.

Conflict of Interest: The author declares no conflict of interest as the author himself has accomplished this study.

References

1. Abramson, P. R. (1983). *Political attitudes in America: Formation and change.*WH Freeman. https://doi.org/10.2307/2149731

2. Berry, J. W. (2010). Immigrant acculturation: Psychological and social adaptations. *Identity and Participation in Culturally Diverse Societies: A Multidisciplinary Perspective,* 279-295. https://onlinelibrary.wiley.com

3. Black, J. H. (1987). The practice of politics in two settings: Political transferability among recent immigrants to Canada. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 20*(4), 731-753.https://www.jstor.org/stable/3228109

4. Burnet, J. (1981). The social and historical context of ethnic relations.*A Canadian Social Psychology of Ethnic Relations, Toronto: Methuen.*

5. Dilmaghani, M. (2019).Perceived religious discrimination and confidence in Canadian institutions.*Ethnic and Racial Studies, 42*(15), 2603-2622. https://doi-org.umi.idm.oclc.org/10.1080/01419870.2018.1539505

6. Howell, S. E. & Fagan, D. (1988). Race and trust in government: Testing the political reality model. *Public Opinion Quarterly, 52*(3), 343-350. https://www.jstor.org/stable/2749076

7. Huntington, S. P. (2004). The Hispanic challenge.https://www.jstor.org/stable/25647660

8. Kendall, D. E. (2014). *Sociology in our times: The essentials*. Wadsworth, Cengage Learning.https://www.amazon.com/Sociology-Our-Times-Diana-Kendall/dp/1337109657

9. Koenig, H. G.,Boulware, L. E., Cooper, L. A., Ratner, L. E., LaVeist, T. A., &Powe, N. R. (2003). Race and trust in the health care system. *Public Health Reports, 118,* 358-365. Doi: 10.1016/S0033-3549(04)50262-5

10. Lower, A. R. M. (1964). *A History of Canada: Colony to Nation*. Longmans.https://www.jstor.org/stable/2144315

11. Roder, A., &Muhlau, P. (2011).Discrimination, Exclusion and Immigrants' Confidence in Public Institutions in Europe.*European Societies, 13*(4), 535-557. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616696.2011.597869

12. Statistics Canada. (2017). Permanent Residents – Monthly IRCC Updates, Statistics Canada, Ottawa: Canada. https://open.canada.ca/data/en/dataset/f7e5498e-0ad8-4417-85c9-9b8aff9b9eda

13. Statistics Canada.(2011). Canadian Census of Population. Canada. https://www.google.com/search?q=Canadian+Census+of+Population

14. Van Craen, M. (2012). Explaining Majority and Minority Trust in the Police. Justice Quarterly, 30:6, 1042-1067, DOI: 10.1080/07418825.2011.649295

15. White, S., Nevitte, N., Blais, A., Gidengil, E., & Fournier, P. (2008). The political resocialization of immigrants: Resistance or lifelong learning? *Political Research Quarterly*, *61*(2), 268-281. DOI:10.1177/1065912908314713

16. Wilkes, R., & Wu, C. (2019). Immigration, discrimination, and trust: A simply complex relationship. Frontiers in Sociology, 4, 32. https://doi.org/10.3389/fsoc.2019.00032

Date of Submission : 03.03.2022
Date of Acceptance : 20.06.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July-December 2022

Policies and Challenges to Prevent Deforestation in Bangladesh

Md. Azam Khan*

Abstract

Deforestation in Bangladesh has its various driving factors, like role of power, economic beneficiaries' of corrupted people and cultural motivation in illegal activities. This study mainly initiated to answer how the actors play their role and to prevent deforestation how government is taking measures by formulating and implementing the forest polices regarding deforestation. This article mainly based on descriptive and explanatory research method to find out the political and economic factors which influenced deforestation. The finding indicates timber merchants and immoral political bigwigs supported by corrupted government forest officials of the department of forest are closely involved in their illicit work. The existing weak forest governance and policies which are not so effective to prevent deforestation and some important recommendations is addressed here relevantly.

Keywords: Deforestation, Forest Policy, Political Economy.

1. Introduction

Bangladesh is an over populated developing countries in the world. Renewable forestry is the very vibrant sector in the economy of Bangladesh, its contribution to GDP is 4.98% and about 2.5% employees of the labor force engaged in this sector directly (Rahman, 2006). The rate of depletion of forest is increasing day by day and due to this reason this sector is getting vulnerable. Now, deforestation has become great challenge to Bangladesh. The main challenges of the economy of Bangladesh are disturbance of biodiversity, local people livelihoods greenhouse effect, increase of soil erosion, flood and wildlife damage. The environmentalists show that 25% forest area is needed for a balanced ecological system where Bangladesh has only 11.1 % of the forest land. It is identified that rural poverty, population pressure, privatization, urbanization, natural calamities, industrialization are the main reasons for deforestation in Bangladesh. Globally, illegal logging is responsible for losing around USD 30–100 billion per year in many South Asian countries. In Bangladesh illegal logging and forest land grabbing increasing day by day. Though Bangladesh formulated a number of forest polices in different times. During the past two centuries political changes influenced the forest policy in Bangladesh due to colonial heritage. Despite the different forest policy's deforestation is not stopped fully. This paper aims to review and assess the forest polices and the challenges of deforestation of Bangladesh.

* Professor, Department of Economics, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

2. **Objectives of the Study**

The specific objectives of this research is as follows:

1) To explore the challenges and problems of deforestation in Bangladesh.
2) To examine the weakness and effectiveness of forest polices in Bangladesh.

3. **Theoretical Framework of the Study:**

Bangladesh is a liberal democratic capitalist country. There is great influence of bureaucrats, elected public representatives, different political parties, different interest groups and printed and electronics media over the public policy and to implement the policy process. Large business firms, industrialists and other interest groups conflicts with the member of policy maker. The bureaucrats play more powerful role to implement decisions in any democratic government. When the forest policy is constructed the bureaucrats play and perform a very crucial role in the policy process. So, it should be given more priority to discuss the deforestation problem of driven by different actors and interest groups along with the support of government officers. The role of mass media and the political parties should be explained for their direct and indirect influence on this outcome. Though there are some positive roles played by mass media, this is not effective enough. Here, attempts the find out the main factors behind the offense of deforestation and what is their vested interest and how they facing the challenges of deforestation. Apart from, how much effectively working the forest policies to prevent the deforestation will be examined carefully.

4. Review of literature:

A large number of studies have been conducted on the deforestation issue in Bangladesh where the researchers' explain different socioeconomic aspects of deforestation. The existing literature basically emphasizes illegal logging and various commercial activates among diverse socioeconomic grounds of deforestation. Md. Millat-e-Mustafa in his article "A Review of Forest Policy trends in Bangladesh" has explained various policies and its implementation indifferent period in time. He has shown that the policy of before independent of Bangladesh largely ignored the crucial issue of community participation. The forest polices which were formulated after independent in 1994 for the first time recognized the importance of people's participation in forestry. According to How let et al., (2009), the political economy context includes two meta-institutions, namely democracy and capitalism, which have great influence on the policy-makers and shape the public policy-making process. In the liberal-democratic capitalist country like Bangladesh, some actors such as elected politicians, bureaucracy, political parties, interest groups and mass media exercise most influence over public policy form making to implementation of the policy process. Very little existing research has found to utilize its policies and problem or challenges in explaining the driving factors of deforestation which restrain the implementation of reserved policies in Bangladesh. By unveiling the role

of power, culture and economic incentives of actors such as political elites, state officials and businessmen associated to forest clearance, this study has tried to contribute to the existing literature and scholarly debates along with filling the current research gap.

5. Methods of Study:

This study adapted both the explanatory as well as descriptive research method to analyze the political economy of deforestation of Bangladesh. Secondary data is chosen for this study. The secondary data was collected from various published and unpublished documents like peer review journal articles, books, government policies, newspaper, government reports and websites etc. Besides this, selected important documents were systematically and critically addressed based on the research.

6. Forest Policies of Bangladesh:

The forest policy of Bangladesh is influenced by the changing of political parties in different times. The first policy was declared in British India in 1894. The government of Pakistan published forest policy in 1955. After the liberation, Bangladesh government declared its first forest policy in 1979 and current forest policy in 1994. The short salient features of these forest policies are discussed below.

Forest Policy of 1894

The core objectives of the forest policy of 1894 were to collect revenue for the state and to ensure the rights and privileges of the users of forest. To expand the agricultural land many forest land converted into agricultural land and to satisfy the local peoples' demand they allowed collecting small timber, fuel wood and fodder for the greater interest of the people.

Forest Policy of 1955

The forest policy of 1955 was formulated in Pakistani period. This policy was better addressing the needs of contemporary situation. In this policy national development plans regarding forest is given more priority and all forest area come under the national working plans. Railway tracks, roadsides, canal banks and waste land brought under the plantation program. To reduce the waste timber harvesting techniques were improved and necessary powers were given to the authority to avoid the threatened of social erosion due to forest harvesting.

Forest policy of 1962

Giving priority on five main objectives the forest policy was announced in 1962. These were watershed management, forestry, farm forestry, range management and social conservation. Moreover, the main focus of that forest policy were forest should be used intensively; to develop plantation in government-owned waste land ; to conduct research on fast growing commercial species for each ecological zone and to introduce pilot projects for the cultivation of trees in saline land.

Forest policy of 1979

After the independence of Bangladesh first forest policy was announced in 1979 with the aims of the scientific management and preservation of forest resources. This policy was given emphases on employment on the basis of modern technology to extract of forest. Training, and scientific education also introduced in this policy. But the weak point were not a clear indication of scientific classification of forest land and also no indication about sustainable productivity and community participation of the forest resources.

Forest policy of 1994

Addressing the forest policy of 1979 some amendment was brought in the current forest policy 1994. Keeping the vision of twenty years the forest policy of 1994 was formulated with the help of ADB and UNDP. Some important issues like efficiency, sustainability and people's participation were considered while preparing the forest policy of 1994. The main features of 1994 National Forest Policy were as follows- (i) Aiming to afforest 20% of total land of Bangladesh initiative should be extended by taking program for afforestation in fallow lands, unused agricultural land, hinter lands and any other possible lands so that the future generation can be benefited by this forest resources. (ii) To ensure the biodiversity for birds and wildlife afforestation program should be arranged according to the needs. (iii) To introduce the agricultural friendly forest policy for the country. (iv) Aiming to desertification, global temperature and world trade of birds and animals forest policy should be formulated. (v) By ensuring the participation of local people to present the illegal logging, felling of trees and hunting of wild animals. (vi) To ensure the effective forest policy public and private lands should be taken under the afforestation.

7. The Problem and Challenges of Deforestation in Bangladesh

The deforestation is highly correlated with the socio-economic condition of a country. **Siker and To** (2011) pointed out about local middleman, customary lenders, local government, logging companies, timber traders, forest protection officers, forest enterprises, wholesalers and buyers in overseas markets as the main player behind the point of extraction of logging. To protect the deforestation, the government has enacted the logging ban acts in the 1970s and 1980s. But the deforestation activities are being going on throughout the country. To stop deforestation first have to identify the main actors, groups and institutions that are getting illegal benefits from it.

The owner of paper mills, furniture, newsprint, pulp and match factories depend on forest trees and timbers. Recently to meet increasing demand of forest products and timbers in Bangladesh deforestation is happening regularly. For the decoration of household and furniture, the demand *Segun*, *Sal* and *Sundori* are gradually increasing. The local or national furniture traders always ready to pay in advance to the illegal loggers for good of quality timbers. Sometimes the smuggler snatches thousands of cubic feet valuable teak from reserved forests to their customer within

very short time. Sawmills and Brickfields are also responsible for deforestation in Bangladesh. These business firms are run after their illegal operation due to the irresponsibility of the district administration of the Department of Forest and Department of Environment. Penalty for illegal logging work is very low. So the timber trader gains high profits to the illegal logging in Bangladesh. Ecological imbalance and natural calamities are being disturbed seriously for deforestation. But the local business groups and elite class are powerful enough to protect the law enforcement agencies and hamper to implement the forest policy.

"Globally, a football field size of forest area is cutting down by illegal loggers in every two seconds (The World Bank, 2012)". The central reasons of extraction and deforestation for reserve forest are faulty governance of the forest department and tolerance of corruption. In many developing countries like Bangladesh, corruption normally occurs by direct monetary payments and by political influence over decisions. Many authors pointed out that main corruption occur within the department of forest department in Bangladesh. Many offices like public representatives other law enforcing agencies and land administration along with Department of Forest are involve with this illegal logging activities. (UN-REDD Bangladesh National Program, 2016). By taking illegal benefits from the owners of sawmills and brickfield, timber traders, many forest officers provide support for illegal activities to these business firms. Corruption of public servants in the Forest Department of Bangladesh raises serious impacts on afforestation. Some forest officials engage native poor and dishonest personnel in the snatching work of wood. Sometimes they hire outsider's people as day worker to fell down the trees (Chakma, 2009). The government agents often allows monoculture of acacias; agar rubber tree and eucalyptus in reserved forest for more economic benefits, and these plantations do not provide fruit for wild animal and have a inverse effect on forest and soil ecosystems.

Rural people and native woodcutters directly connect in the extraction of trees in those areas. Local communities and the woodcutter jointly cut the trees keeping illegal relation in different forest areas. Sometimes, the labor of forest cuts alive trees and technically qualify them as dead wood (Salam & Noguchi, 1998). Weak forest administration, bribe-taking habit of forest officials, less penalty for offense are active as inspiring factors for native wood labor to take part for deforestation (Bidhan, 2013). For hunting the wildlife, indigenous people use fires in the forest area and force the wild animal to bring out them from the brushes and sometimes local people intentionally do that for illegal logging. Some people intentionally cut down the reserved forest to construct their living house.

Politics also play a vital role to forest depletion both directly and indirectly. Public representative like MPs and political elites of Bangladesh have been illegally grabbed almost 2, 50,000 acres of forest areas with the help of forest officials (Haque, 2009). Due to the weakness of property right and government transparency the political elites uses the forest resources for their own interest. Sometimes the

politically powerful elites insult the people those who file cases against them. Illegal sawmills and brickfields near the protected forest area are also liable for excessive cutting of trees. The owner of sawmills and brickfields are locally powerful and during the election they extension their financial support to the political leader. Using the local influence the political leader hampers the normal activities of forest personnel and the forest policy implementation become almost impossible. Kishor & Rosenbaum pointed out five principles for good governance of forest these are accountability, transparency, coordination, participation, and capacity. In Bangladesh, the Forest Department is almost failed to protect and maintain the forests resources from the above principles. But the forest department is suffering from huge shortage qualified and skilled personnel, shortage of budgets, transportation and communication, outdated equipment, shortage to protect and manage the forest resources (Iftekhar & Hoque, 2005). Almost 1430 ha forest areas are administrated and monitored by a single forest guard patrol team which is not enough to cover this huge area (Syed, 2017). So it is not possible to monitor this big forest area. With these minimum workers and old and outdated weapons the forest department is fighting with the illegal woodcutter around the forest area of the country. The forest department is still fighting with old and out dated arms the criminals are using equipped with AK-47, the light machine gun. Effective monitoring system and, irresponsibility of forest officials seriously hampered the implementation process of forest policy of Bangladesh. In many cases the dishonest officials keep a good relation with powerful political elites to help the land grabbers of the forest area (Mirza, 2009). Due to the inefficient governance and illegal logging activities a loss of revenue happing that could be invested in economic development of the country. To improve the forest administration capacity World Bank recommended that the government should follow three important mechanisms "**first**, to improve the information and analysis system to inform policy maker and policy designer; **second**, to develop the responsive and effective institutions in the domestic institutional setting; and, **third**, to invite local honest persons in monitoring and enforcement, policymaking" (World Bank 1992).

8. Findings of the Study

It is shown in the article in Bangladesh control of restricted of forests has been highly concentrated in the hands of few interest groups. They are exploiting the forest and mishandling the forest policy for their own interest. It also shown immoral political persons and dishonest timber merchants in support of some dishonest officials of the Department of Forest are involved in commercial logging and forest land grabbing in reserved forest areas. Weak forest government structure, bureaucratic culture with hierarchical and top down working practices and poor capacity of forest department made it easier for illegal logging.

9. Recommendations

Deforestation is a burning issue in the world. In Bangladesh the impact of deforestation is focused in many sector even the human life becoming in threat. So considering all the matter of deforestation should be properly addressed and these suggestions are as follows:

(1) The government should engage the professional skill and forest worker and they should have perfect academic and proper training regarding forest.

(2) Sufficient monetary sanction is needed to strengthen the forest department so that they can strongly handle the illegal works for the reserved forest development.

(3) To reduce the deforestation, stakeholder participation should be ensured and efficient monitoring of forest department should be introduced with the help of forest laws.

(4) NGOs and private organization is needed to be empowered to reduce the deforestation.

(5) Policies, laws and parliamentary committee must be communicated so that forest management and conservation can work properly.

(6) Measures should be taken to remove sawmills and brickfields the factories and furniture industries which are located within 10 to 15 km of the forest area.

(7) Awareness activities like involvement of the native people, forest guard and arrange training for the forest related people.

(8) Apart from, different media can play a vital role by publishing news on deforestation, corruption, forest resources and killing of wildlife in forest areas.

(9) The above advices should be followed otherwise our forest resources will be decreased gradually and the main sufferer will be the nation for a long time.

10. Conclusion

This article explains to examine the policies and its challenges of deforestation that hamper to implement the forest policy in Bangladesh. It is also shown the control of forest resources is confined in few interest groups in Bangladesh and this vested interest groups misuse the forest resources. Weak forest government structure is controlled by bureaucratic way with hierarchical working practices. It is true that Bangladesh government introduced a lot of laws and policies to stop the deforestation and criminal activities of illegal logging but these are merely effective to prevent this work. Now strong initiatives need to be taken effectively and enforce them properly. Government of Bangladesh and international organization has taken long run policies such as REDD+ to reduce deforestation. But these policies are working as barriers to implement the forest policies, because of the existing political and economic causes.

References

1. Alam, M. (2009). Evolution of forest policies in Bangladesh: a critical analysis. *International Journal of Social Forestry*, 2(2), 149-166.
2. Bidhan, P. (2013, March 23). Deforestation denuding us of life. *The Daily Star*,
3. Biswas, S. R. & Choudhury, J. K. (2007). Forests and forest management practices in Bangladesh: the question of sustainability. *International Forestry Review*, 9(2), 627-640.
4. Chakma, S. (2009, September 1). Reserve forests turn barren. *The Daily Star*. Retrieved from http://www.thedailystar.net/news-detail-104058
5. Department of International Development. (2009). *Political Economic Analysis How to note: DFID practices paper*.
6. Department of Environment. (2017). National Strategy for sustainable brick production in Bangladesh. *Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh*.
7. Haque, A. (2017, July 18): Degrading our forests - Why we need to act quickly. *The daily star*. Retrieved from http://www.thedailystar.net/opinion/ society/degrading-our-forests-why-we-need-act-quickly-1382653
8. Haque, N. (2009, September 23). Wiping out the forests. *The Daily Star*. Retrieved from http://www.thedailystar.net/news-detail-106621
9. Howlett, M et al., (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.* (3rd Ed), Oxford: Oxford University Press.
10. Iftekhar, M. S., & Hoque, A. K. (2005). Causes of Forest Encroachment: An Analysis of Bangladesh, *GeoJournal*. 62, 95-106.
11. Kishor, N. & Rosenbaum, K. (2012). Assessing and Monitoring Forest Governance: A User's Guide to a Diagnostic tool USA. Program on Forests (PROFOR), Retrieved from http://documents.worldbank. org/curated/en/ 196281468337- 192253/pdf/ 714360PUB00PU B0rest Governance0guide.pdf
12. Millat-E-Mustafa, M. (2002). A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh-Bangladesh Forest Policy Trends. *Policy Trend Report 2002*, 114-121.
13. Mirza, S. (2009, June 5). Madhupur forests disappearing fast. *The Daily Star*. Retrieved from http://www.thedailystar.net/news-detail-91318
14. Rahman, L. (2016). Bangladesh National Conservation Strategy: Forest Resources. International Union for Conservation of Nature, Retrieved from http://gobeshona.net/publication/bangladesh-national-conservation-strategyforest-resources/#sthash.TTGdIsKg.dpbs
15. Salam, A., Noguchi, T., & Koike, M. (1999). The causes of forest cover loss in the hill forests in Bangladesh. *GeoJournal,* 47, 539-549.
16. Salam, M. A., & Noguchi, T. (1998). Factors Influencing the Loss of Forest Cover in Bangladesh: An Analysis from Socio-economic and Demographic Perspectives. Journal of Forestry Research, 3, 145-150.
17. Syed, D. A. (2017, February 26). Sustainable Forest Resource Management. The Daily Star. Retrieved from http://www.thedailystar.net/environment-and-climateaction/sustainable-forest-resource-management-1367131

18. The World Bank. (2012, March 20). Dirty Money in Illegal Logging can be Tracked and Confiscated, says World Bank Report. Retrieved from http:// www.worldbank.org/en/news/press- release/2012/03/20/dirty- money illegal- logging-can-tracked-confiscated-world-bank- reports.
19. The Terra Daily. (2008, August 18). Corruption killing Bangladesh forests: watchdog. Retrieved from http://www.terradaily.com/reports/ Corruption_ killing_Bangladesh_forests_watchdo g_999.html
20. Uddin, M. (2015, January 13). Logs used illegally. *The Daily star*. Retrieved from http://www.thedailystar.net/logs- used- illegally-59671.
21. UN-REDD Bangladesh National Programme. (2016). Drivers of Deforestation and Forest Degradation in Bangladesh: hill forest zone, Sylhet. UN-REDD Bangladesh National Programme, Bangladesh Forest Department.
22. World Bank. (1992). *Development and the Environment*. New York: Oxford University Press

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 23.12.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

The Role of MPs in Strengthening Local Government in Bangladesh: The Case of Two Upazila

Md. Naim Akter Siddique*

Abstract

Local government bodies in Bangladesh, including Upazila Parishad (UpP) and Union Parishad (UP), are the two lowest levels of local government. Members of Parliament (MPs) wield immense power and authority over UpPs. The reintroduced Upazila Parishad Amendment Act of 2009 restores MPs to the Upazila parishad council as "advisers." According to the Act, the MP in Bangladesh plays an important role in bolstering the local development process and other plans at the Upazila level. Thus, the primary goal of this research is to determine the extent to which MPs play a role in strengthening local government in Bangladesh. This study employed both qualitative and quantitative data analysis techniques. According to the study, the MP's role as advisors in strengthening local government is critical and significant because they act as a bridge between the Upazila Parishad and local people in the process of initiating local development projects. People believe they are aware of the MPs' initiatives in the local development process. They observe that the MP generally advises the Upazila Parishad to allocate funds for the development of local communication, educational institutes, healthcare service delivery, and the expansion of electricity networks for localities in Bangladesh's rural areas. These development initiatives encourage people to confide in and trust local officials, resulting in the strengthening of local government in Bangladesh. Finally, the study suggests that financial, human, infrastructure, and technological resources be allocated to the Upazila Parishad, as well as effective accountability and transparency mechanisms be established for the development of the Bangladeshi people.

Keywords: Member of Parliament, Local Government Institution, Strengthening Activities, Bangladesh

Introduction

Local government bodies, including Upazila Parishad (UpP) and Union Parishad (UP), are the two lowest levels of local government in Bangladesh. They exist in a variety of institutional settings. Members of Parliament (MPs) wield immense power and authority over UpPs and UPs. MPs serve as "advisers" to the UpPs, and all UP chairmen are UpP members. As a result, the role of MPs reflects on the strengthening of local government in Bangladesh. According to the Bangladesh Constitution, elected representatives at all administrative levels have the authority to prepare budgets, manage funds, levy taxes, and carry out plans for public services and socio-economic development.

Now-a-days, the issue of local level governance has received much attention from policymakers, scholars, development practitioners, and researchers, and simultaneously the issue has occupied a substantial place in the discourses of

* Associate Professor, Department of Political Science, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

development that strengthens local government (Siddiqul, 2002, p. 23). Upazila Parishad (UpP), an intermediate tier of a local government body, is reintroduced under the UpP Act in 2009 that ensuring strengthening development and other works at the local level (Selim & Ahmed, 2003, pp. 108-109). Bangladesh has a long history of local government which has eventually given rise to Zila, Upazila, and Union Parishad. Despite the present three-tier local government system, there is much to be desired in the relationship between the national government, local Member of Parliament (MP), and the local government. The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganization) Ordinance 1982 gave birth to the concept of the Upazila Parishad (UpP). It collapsed, however, in 1991. Upazila parishad was reintroduced into the system of local government in 1998 through the UpP Act 1998 where MPs were given an advisory role. A local lawmaker always plays a role in the development process all over the world. For instance, the role of an MP is to review legislation and represent local interests in Parliament in the United Kingdom. In the constituency, British MPs support local community groups, publicize local issues and endeavor to help constituents resolve any issues that they have by making representations on their behalf and ensuring that their cases are clearly presented (Rahman, 2012, p. 75). Considering Western practice, the government of Bangladesh passed new legislation for UpP in 2009 that chairs local MP as an “advisor” for UpP, viewing that the relation between the people and lawmakers cannot be undermined. Article 25 of the Upazila Parishad Act, 2009 advises that the UpP “will have to take the advice” or “shall accept the advice” of the MP concerned. Again article 42(3) of the Act empowers local MPs too, as it requires the UpP to accept the advice of the MP in all development planning and execution. It is stipulated viewing that such an initiative may increase mass participation in the locality in order to solve various problems, as they must organize people-centered activities. The main focus of the study is to investigate the roles of MPs in strengthening local government at the Upazila parishad and UP levels in Bangladesh. The study aims to collect and analyze the public's opinions and perceptions of the roles MPs play in the process of strengthening the country's local level of development.

Objectives of the Study

The main objective of this study is to explore what extent of the role an MP plays in strengthening local government in Bangladesh. However, the following objectives are also addressed for this research:

1. To present the existing structure of local government in Bangladesh;
2. To assess the role of MP in strengthening local government at the UpP and UP level in Bangladesh; and
3. To identify the views, and perceptions of the local people about the role of MPs in the process of strengthening local level development in Bangladesh.

Review of the Secondary Documents

Nizam Ahmed's article "The Constituency Role of the Member of Parliament in Bangladesh" 2015 mentions four types of roles played by MPs in Bangladesh. These are policy advocates, ministerial aspirants, and parliament men and constituency members. He mentions that MP plays two important roles in his/her constituency: Case-work and projects. Casework, as he means, involves responding to requests for help with individual problems and projects, as he describes, as the means of welfare and development activities in local government bodies in Bangladesh.

Mohammad Mohabbat Khan, *Local Government in Bangladesh: Some Contemporary Issues and Practices*, 2011 highlighted the legal and practical constraints preventing local government bodies from realizing their potential and performing their constitutionally defined roles. The author presented and highlighted the stipulations of the law of various tiers of local government, as well as their limitations, in this book.

Philip Norton's "The Growth of the Constituency Role of MP", 1984 identified seven roles of MPs in their constituency of UK as Local Dignity, Advocate, Promoter of Constituency interest, and Benefactor and safety value. The author has not discussed the local development issues in his article.

A book chapter written by Kamal Siddiqui entitled *Local Governance in Bangladesh, Leading Issues and Major Challenges*, 2005 mentioned the role of MPs as the Thana Development and Coordinating and advisory role for the development at local levels.

Another book named, *Local Governance and Decentralization Bangladesh: Political and Economics*, edited by Abul Barakat was published in 2015 highlights the role of MPs in the development of Upazila Parishad as only an advisor to implement the local development program as described in chapter 12.

Mohammad Tarikul Islam's article, "Cooperation or Interference: MP's role in Local Government" focused on the Upazila Parishad Act 2009 keeps provision for MPs' role in the Upazila Parishad as advisors and monitors in the different activities of the local government bodies from a distance, just to ensure that they follow parliament adopted policies in Bangladesh. According to the Upazila Parishad Act 2009, an MP's role as Adviser to local government bodies is not inherently contradictory as long as the MP is concerned with the well-being of the people in his/her constituency. However, in practice, MPs' "advice" frequently becomes an "executive order," overriding and controlling development plans and actions by elected representatives at the Upazila Parishad.

Bishawjit Mallick in his book entitled *Local Government: Local Peoples Institution*, 2017 focused on Bangladesh's local government under a different regime. The book also highlighted the importance of local government in Bangladesh, particularly the Upazila Parishad, and how its changing patterns. The book also demonstrates the flaws of local government and recommends reorganizing government structures. The

author convincingly argued in this book that Bangladesh’s local government bodies lack of proper structure and are unable to provide required services to their citizens.

An article was underwritten by Muhammad Sayadur Rahman, “Role of the Members of Parliament in the Local Government of Bangladesh: Views and Perceptions of Grassroots in the Case of Upazila Administration” which was published in 2013 intends to present the overall condition of the local government, particularly on the case of UpP in Bangladesh. He addresses a delicate issue of a scholarly contention about whether the MPs should have the role in strengthening local government. This study carried out fieldwork in eight Upazilas in Bangladesh and found that MPs have roles in local government bodies and these local government institutions should be strengthened as organizations. According to the findings of this study, the Bangladesh Parliament should place a high priority on strengthening local government bodies in order for them to be truly effective and efficient institutions at the local level while adhering to the provisions of the Constitution.

A Research Gap

The books and articles that the researcher reviews are mostly based on secondary sources of information. Only a few studies on primary sources of information have been conducted, and these have focused on the role of the nexus between bureaucracy and political leaders in Bangladesh's local government bodies. There have been no comprehensive studies based on primary sources of information because the study focuses on the stipulations of the role of MPs in strengthening local government bodies in Bangladesh. This study primarily investigates and explores what role MPs should play in strengthening local government in Bangladesh, as well as what rural people think about the role of elected representatives such as MPs on this issue. The study undoubtedly fills research gaps, and it is rationale to conduct the research to investigate how to strengthen local government in Bangladesh by undertaking various activities and development projects.

Theoretical Framework: The Existing Structure of Local Government Bodies and the Role of Members of Parliament (MPs) in Strengthening Local Government Institutions in Bangladesh

The structure of the local government bodies is the ultimate result of changes during the successive regimes in Bangladesh. The country, after gaining its independence in 1971, has been ruled by six successive regimes. It is a remarkable matter that, every successive regime focused to involve MPs in the local government. First regime (1972-1975), the Awami League government in the starting period of its rule made several efforts to replace the traditional local leadership with the local rank of their party. In 1972, the government of Bangladesh abolished the Pakistani Union Council system and formed Union Panchayats in which numbers were nominated by the government. The government also formed the ‘Union Relief Committees’. Lawmakers along with local party wings selected the members of two local bodies called ‘Union Panchayats’ and ‘Union Relief Committee” that played a crucial role in distributing relief materials, construction, and rehabilitation work (Rahman, 2012,

p. 79). Later in 1975, the Awami League government also introduced a system facilitating local government headed by the 'district governor' as the chief officials of district-level local government administration in Bangladesh.

In the second regime (1975-1981) four tiers of local government were introduced after the military occupied state power. By the end of 1980, Zia impregnated a new structure of the rural institution, named Swanirvor Gram Sarkar at all villages in Bangladesh, marginalizing the Union Parishads. To ensure control over the rural area, MP took the chairmanship of District and Thana level Gram Sarkar coordination committees (Haque, 2007, pp. 88-89).

In the later regime (1982-1990), General Earshad abolished the unpopular Gram Sarkar system inseminated by the Zia government and he introduced the Upazila system following the decentralization policy, which was established over local affairs in absence of MPs. By the introduction of the local government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganization) ordinance in 1982 a remarkable change was initiated in the local government system. Therefore, the Erashad-led government introduced Zilla Parishad Act in 1988 which elect MPs as the chairmen of the District Parishads to coordinate all development activities under the districts (Rahman, 2012, pp. 71-78).

Very soon after, in 1991, the BNP-led government abolished the Upazila system and introduced Thana Unnayon Samannay Committee at the Upazila level to work as a coordination and development body. Under the respective constituencies, MPs were made advisers to the bodies in the Upazilas. But, coming in the power a 2nd time, Awami League constituted a local government Commission in May 1997 that changed the existing system. The Commission has recommended a four-tier local government structure as well as Gram (Village) Parishad, Union Parishad, Thana/ Upazila Parishad, and Zilla Parishad. At present, there are two distinct types of local government institutions in Bangladesh: one represents rural areas and the other in urban areas. The local government in rural areas represents a hierarchical based consisting of three tiers. For example, UP at the village level, Upazila Parishad at the Upazila level, and Zila Parishad (ZP) at the district level, where urban local government concentrates into two categories: category I named City Corporation which works for large cities and the Paurashava or municipality for small towns (Panday, 2011, pp. 51-52). Actually, UpazilaParishad (UpP) is considered as the most significant tier in terms of strengthening local government in Bangladesh. In 1998, the Awami-League-led government revived the Upazila Parishads by enacting a law that made MPs advisers to the UpazilaParishads under the respective constituencies. The present Awami-League government re-introduced the repealed Upazila Parishad act of 1998 with provisions for making MPs to be an advisor. And still, now the Upazila Parishads are being run on the advice of MPs. Thus MPs are being empowered at the existing local government bodies in Bangladesh.

Local governments have been vital in reducing the central government's burden on development activities and service delivery. Local government is regarded as "a fertile ground for democracy" (Islam, 2018, p. 58). Indeed, democracy works when all citizens, including the most marginalized, participate in the governance process

and can ask questions and seek accountability. In Bangladesh, local government has always been an integral part of the central government, though the latter frequently takes advantage of the former's strength to further its political agenda. Making full use of local and respective committees is an important way of strengthening local government institutions without weakening the executive. Strengthening local government is thus an essential component of democracy and a prerequisite for good governance (Barakat, 2015, p. 43.) The UpP is an important tier in the political-administrative nexus, situated halfway between local and central governments. More importantly, the UpP serves as a link between the local and national governments to carry out government programs. As we approach a general election later this month that will result in the formation of a new central government the following year, we must discuss local government and its role in the national service delivery mechanism.

In reality, Members of Parliament (MPs) in Bangladesh are only permitted to serve as advisors to the local government under the terms of the Constitution. However, this hasn't stopped central leaders and politicians from becoming involved in local development projects and exploiting them for their own gain. Local government institutions have the potential to emerge as powerful development agents capable of reaching out to local communities and assisting them in identifying and addressing their own needs. Unfortunately, political leaders serving as advisors at the local government level make paternalistic decisions that alienate the general public, preventing them from fully participating in the various activities of local government, Public officials, MPs, chairmen, and other elected officials, as well as chairmen from UP, work collaboratively to strengthen local government bodies through development initiatives and projects at the local level. Attempts have been made to address the sensitive issue of whether MPs should have a role in local government or not as public representatives, whether a democratic UpP in Bangladesh enhances its responsive role to the people who elected themselves, and the general public's awareness of elected representatives. (Rahman, 2012, pp-87-88). Local governments suffer as a result of the conflict between MPs, public officials, and elected representatives.

Significance of the Study

This paper has the potential to hold MPs accountable in order for them to formulate appropriate decisions in strengthening the development of local government, which can help to reach out to the locals in order to identify their problems and work on their own needs. This will assist MPs in establishing local infrastructures such as educational institutions, hospitals, bridges, roads, and culverts, as well as healthcare and agricultural facilities for local communities. The findings of this study will also assist local MPs in promoting local development for rural residents. It entails bringing together vibrant local community management and local administration. Such measures will undoubtedly benefit rural people and contribute to Bangladesh's long-term national development.

Local elites, politicians, policymakers, bureaucrats, academicians, and researchers will be able to easily find relevant documents on the role of MPs in strengthening

local government institutions in Bangladesh once this study is published in a peer-reviewed journal. The findings of the study will also be useful reading materials for Bangladeshi policymakers as they develop policy proposals to strengthen local government bodies in order to local-level development.

Methodology of the Study

Data Sources

The study has gathered both secondary documents and primary data. Secondary documents on local government and development activities in Bangladesh have been gathered from various books, journals, editorials, commentaries, newspapers, magazines, and policy documents. The study also gathered primary data and information from MPs in order to determine their role in strengthening local government in Bangladesh. At the same time, this study gathered views and opinions from UNOs, chairmen of Upazila and Union Parishads, as well as members of the general public, to get a true picture of MPs' coordinating activities and roles in strengthening local level government bodies in the country. Both qualitative and quantitative data were gathered for this study.

Methods of Data Collection

The primary data was collected from stakeholders by using a semi-structured questionnaire. For the first stage, I prepared a semi-structured question set. I used the interview technique for the collection of the primary data and information for the study. I used the interview technique because it gives me a collection of rich information from the participants. By using the interview method, I finally collected opinions and views from MPs. Chairmen both from Upazila and Union Parishads and mass people about the role of MPs in strengthening the local government in Bangladesh. I selected these participants for interviews purposively as I primarily intended to collect rich information about the activities and role that an MP plays in straitening local government bodies in Bangladesh.

Research Area

For this study, two research areas were selected. These areas were selected purposively. I chose these areas on purpose because I wanted to collect information from participants that would be useful for comparing the activities and roles of MPs in strengthening local government institutions in Bangladesh. The first is in a semi-urban area, and the second is in a rural area. The study's field was chosen from two Upazilas (Savar Upazila in Dhaka district and Kaharole Upazila in Dinajpur district). Three unions were also purposefully chosen from each Upazila to represent both urban (or at least semi-urban) and rural areas.

Sample Size and Units

Participants in the study include MPs, UNOs, Upazila, and Union Parishad Chairmen, and members of the general public. I interviewed and gathered views and opinions from two MPs from two Upazilas (e.g. constituencies), two UNOs and two Chairmen from two Upazilas, and three Chairmen from each Upazila Parishad. I also

interviewed 100 people from these two Upazilas to know and understand their perspectives on the role of MPs and local leaders in strengthening local government bodies in Bangladesh.

Data Analysis

This research employs both qualitative and quantitative methodsof data analysis approach. This type of data analysis method is a research method that combines quantitative and qualitative data analysis elements. The data were primarily collected in Bengali (Bangladeshis' native language) and transcribed into English for analysis. The quantitative data were presented in tables or figures. The Statistical Package on Social Sciences (SPSS) statistics version 26 was used for the analysis of quantitative data and information. The qualitative interviews were analyzed using a thematic analysis technique. The fieldwork began in early January 2020 and was completed over a two-month period.

Study Findings

1. Qualitative Findings

1.1 Role of MPs in Strengthening Local Government

Local government is the authority constitutionally empowered to spend money for local purposes which have responsibility for government at the local level. Basically, therole of MP plays in the development process of the local government bodies, especially the perspective of the Upazila Parishad and Union Parishad in Bangladesh. Therefore, the research will bring out MPs' contribution in terms of the development of the local community. Development means the positive change of something, which is mainly used for under developed or developing countries. Bangladesh is a country in the third world, and for the betterment of the socio-economic status of this country, a development initiative is necessary. Developing or constructing roads, bridges, culverts, educational institutions, medical centers, agriculture, etc. are some highlighting factors of development. Development in rural areas of Bangladesh is under the Local Government's authority but MPs as the representative of the respective constituency initiate different development projects in their area. So, what kind of development projects do MPs initiate in their area undertaking the needs of the people in their areas is the main focus of this research?

In this study, development activities that strengthen local government bodies include projects undertaken by MPs for development initiatives for roads, bridges, educational institutes, medical institutes, utility support, and socio-economic structures. These projects are evaluated based on the response toactivities undertaken by MPs from their constituencies, UP chairmen, UNOs, and mass people. MPs are making every effort to improve communication, education, health, and various social infrastructures. While they also admitted to putting in less effort or time to develop the agricultural sector, which is the third largest source of our GDP. An MP in Dinajpur's Kaharole Upazila stated that "application for development or repairmen of bridges, culverts, metal and non-metal roads, schools, colleges, and other social

sectors as well as a masjid, mondir, club, etc." As a result, it is clear that MPs focus primarily on the development of infrastructure in their constituencies.

Both constituency's Upazila chairmen have confirmed that their MPs have undertaken significant development projects in their respective areas. MPs, in their opinion, have worked to improve communication by building or repairing roads, bridges, culverts, and so on. They have worked to ensure that everyone has access to electricity and education. They have also contributed to the construction of the Union Health Complex and community clinics for the villagers. MPs have created social structures such as masjids, mondirs, and markets on their own time. After reviewing the opinions of Upazila chairmen, it can be stated that MPs' maximum effort on development is reserved for roads and communication, followed by education, utility support (electricity, gas), and social structural development such as mosjids, mondirs, clubs, and so on. They also acknowledged that MPs do not initiate enough agricultural development opportunities.

UP chairmen from the Savar area stated that MPs from this constituency primarily focus on structural developments in the area, such as communication and educational institutes, mosques, madrashas, markets, and so on, which are more visible to the public eye. Whereas in Kaharole Upazila, UP chairmen praised their MPs' transportation and utility service initiatives. MPs also worked to build social structures such as masjids, mandirs, and markets. However, the chairmen expressed dissatisfaction with the lack of initiative for agricultural and health services from MPs in their district. Some chairmen stated that while MPs emphasized infrastructure development, this was due to the demands of their party and party members. Chairmen of other political parties are also treated as outcasts by the MP. "MPs do not consider my request or need for me being from the opposition and thus frequently deprive my people of government development schemes." The chairman of the UP has mixed feelings about the role of MPs in rural development. UP chairmen in their opinion, communication, such as bridges and metal and nonmetal roads, receives 91% of the effort that it should, followed by education at 78% and socio-structural development at 75%. Public health and utility assistance receive only mediocre support from MPs. In agriculture, the UP chairman stated that MPs put in only 11 percent of their efforts (Field Survey, 2020).

UNOs from Savar and Kaharole Upazilas stated almost identically to the chairman that MPs from these constituencies developed primarily in the transportation and educational sectors. MPs, in their opinion, also worked for the constituency's socioeconomic development. Despite having Annual Development Project, Test relief, and food for work secretaries to create proper development planning, MPs often dictate their decisions about initiatives. The UNOs regret that MPs prioritize their party's needs over government officials' proposals. "MPs frequently play a significant role in the development of their constituency, but most of the time this is unplanned and based on the demands of their party members." Which makes these developments less impactful for the general public?" According to the data I gathered on the ground, communication receives the most attention from MPs, followed by education (90.3 percent). Utility and social structural support are both at

85 percent, while medical support is at 65 percent. The United Nations also believes that agricultural development is not at a satisfactory level. They believe it is due to party pressure and disregard for government officials' advice.

A public said that “as the MP for the entire constituency, the MP's role should be to support all people in achieving a better socioeconomic structure. I believe that MPs have more authority and allocation power for resources than the chairmen of the UpP and UP. MPs thus have more public trust.” The preceding statement clarifies that the majority of people believe and rely on MPs rather than chairmen for the development of their area. Furthermore, the people I interviewed stated that their legislators have taken steps to improve communication and educational development. Savar Upazila residents claim that their MP has initiated numerous development projects, primarily in the transportation and educational sectors. They have constructed buildings for schools, colleges, and Madrasha, as well as paved roads, bridges, and culverts, among other things, but they have also stated that the majority of these developments have been done in response to the demands of his party members, which are completely unacceptable. MP also places a high value on agricultural development projects.

The people of Dinajpur-1 (Kaharole) stated simply that they are aware of the development in their area but have no idea about the procedure or planning of that project. They also claimed that MPs only think about road development, education, and medical services, but they rarely initiate any development or even survival projects for the constituency's agriculture. The data I collected also revealed that people are pleased with the role of the MP in the development of communication, education, and other socio-structural developments. They have a moderate level of satisfaction in health and 59 percent in utility support. The general public believes that MPs do nothing visible to advance the agricultural sector, as evidenced by their 11 percent reliability bar. After reviewing every aspect of a local development project, it is clear that MPs place the greatest emphasis on the construction of bridges, roads, culverts, and educational institutions. MPs primarily work on development issues, which they can brag about at the national level. They also help to shape the social structures of their respective Upazilas. However, the importance and budget allocation of projects is primarily determined by the demands of their party politics, government officials' advice, and public demands are frequently overlooked when initiating any project.

2. Quantitative Findings

2.1 The Role of MPs in the Strengthening Process in Local Level Institutions

The MPs in Bangladesh play an important role in the development process in their respective areas. MP generally advises local representatives on how to allocate resources and initiate development projects in their communities. The public is aware of their MPs' activities in their communities. The study interviewed 100 people from two Upazilas, and they were all aware of the role of MPs in the development process in their communities (see Figure-1). The vast majority of respondents indicate that education, communication, health, and electricity, and

utility sectors receive the most attention from MPs in terms of development, followed by other development activities such as building mosques, markets, clubs, and playing fields, among others (see Figure-2).

Figure -1: Public perception of MPs' initiatives on a development project

Indicator	Percentage	Respondent
Yes	100.00%	100
No	0.00%	0
No Answer	0.00%	0
Don't Know	0.00%	0
Total	100.00%	100

Source: Field Survey, 2020

Figure-2: Public perception on MPs role emphasizing the initiation of development activities

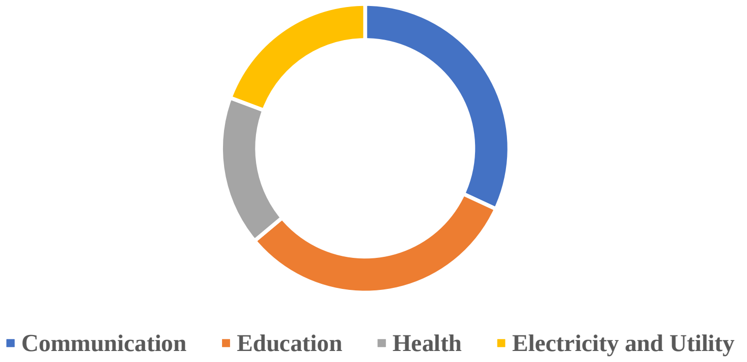

Source: Field Survey, 2020

2.2. Development Activities Initiated by MPs in the Communication, Education, Health, and Electrification Sectors

Figure 3 shows that 92.33 percent of people believe that MPs primarily work to improve communication and transportation in rural Bangladesh. A moderate number of people believe that MPs should take the lead in constructing bridges, culverts, and roads. Madrasha MPs focus on expanding primary and secondary schools because every Upazila or sub-district in Bangladesh has them. MPs have attempted to establish new institutions in some cases. Many people believe that MPs are making no visible effort to digitalize institutions (see Figure-4). On the other hand, work primarily on repairing the Union health complex and community clinics, and they frequently engage in other types of medical support activities for their constituents, such as bringing in experienced physicians for a limited time or organizing a medical

camp for residents (see Figure-5). The primary focus of MPs' roles is to install electric meters and connect electricity to homes and industrial buildings in rural areas.

Figure-3: Public perception on the development initiatives taken by MPs in communication cector

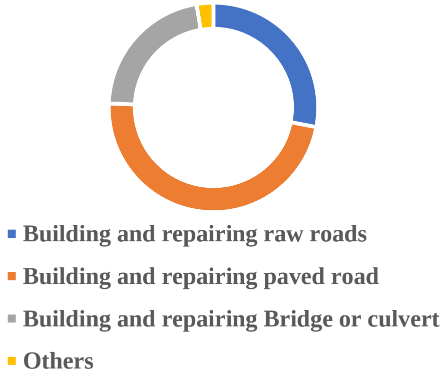

Figure-4: Public perception on the developemnt initiatives taken by MPs in educational sector

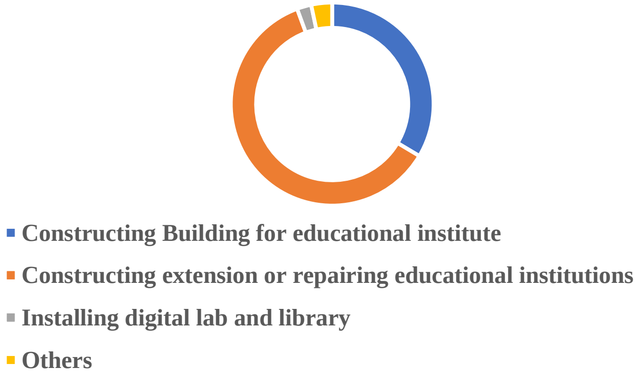

Figure-5: Public perception on the development initiatives taken by MPs in health sector

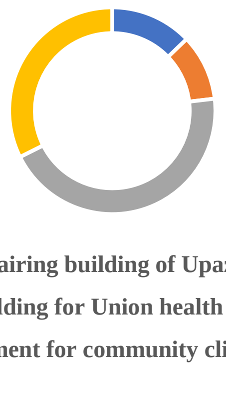

Figure-6: Public perception on the development initiatives taken by MPs for electrification

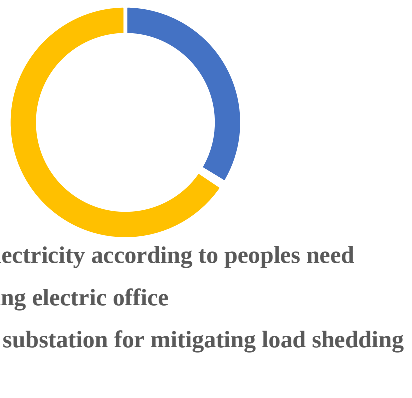

Source: Field Survey, 2020

2.3. Considering Public Demand while Undertaking Development Projects

MPs take public demands into account when undertaking projects for the development of their constituencies. Table-7 shows that 86 percent of people believe that MPs should consider public demand when starting any development project because it is a good practice to lead a transparent and democratic power practice.

Figure-7: Public perception about the role of MPs in consodering public demand while initiating projects

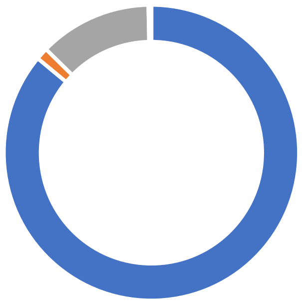

Source: Field Survey, 2020

2.4. Role of MPs for the Betterment of the Public in the Economic Development Activities

In general, MPs work to improve the lives of the people in their constituencies. Even though 37 percent of respondents have no idea about development projects underway in their area, 32 percent are aware of them, and 29 percent have no answer (see Figure-8). Figure-9 depicts how respondents perceived the testing relief and food for work projects to be the most popular in terms of economic development for individuals in communities.

Figure-8: Public perception about to MP's role for the betterment of the public in the economic development activities

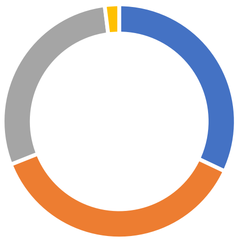

Figure-9: Public perception about initiating projects in localities

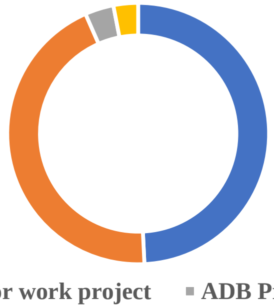

Source: Field Survey, 2020

Concluding Remarks

According to the findings of this study, the MP's role as advisors in strengthening local government is critical and significant because they act as a bridge between the UpP and local people in the process of initiating local development projects. Even though the MP's role as "adviser" in the UpP can sometimes create a conflicting situation when allocating resources with UpP elected representatives, such an advisory role frequently assists UpP representatives in making appropriate decisions in the initiation of development projects. According to the UpP Act of 2009, MPs generally advise the UpP to allocate resources for the development of local communication, educational institutions, healthcare services, and the expansion of electricity networks for rural Bangladeshi communities. These development initiatives foster trust and confidence in local government bodies, thereby ensuring the strengthening of local government in Bangladesh. Finally, this research suggests that more financial, human, infrastructure, and technological resources be allocated to the UpP, as well as effective accountability and transparency mechanisms be established for the development of Bangladesh's rural people.

References

Ahmed, N. "The Constituency Role of the Member of Parliament in Bangladesh,"

New Zealand Journal of Asian Asian Studies, 2015, Retrieved from www.nzasia.org.nz/journal/NZJASDee2015/jas_Ahmed.pdf.

Barakat, Abul (ed.), *Local Governance and Decentralization in Bangladesh: Politics and Economics,*University Press Limited,Dhaka, 2015, Pp. 67-68.

Hossain, Md. Anwar. "Ensuring Accountability and Transparency at LocalLevel Finance: A Study from SylhetSadar Upazila", *The Bangladesh Development,*Dhaka, 2015, P.38.

Islam, Mohammad Tarikul, "Cooperation or Interference: MPs Role in Local Government", *The Daily Star*, Dhaka, 11 December 2018.

Karu, Nanatna Carvin, *Administering Rural Development in Third World Countries,* University Press Limited, Dhaka, 1983, P.93.

NILG &Sarker, Parimal, "The role of the Upazila Nirbahi Officer (UNO) in coordination Process at Upazila administration in Bangladesh,"*Master in Public Policy and Governance Program, Department of General and Continuing Education, North South University, Bangladesh,* 2015, Pp. 27-28.

Norton. P, "The growth of the Constituency Role of the MP", *Parliamentary Affairs,* Uk, 1994, Retrieved fromhttp://www. Springer.com.

Panday, Pranab Kumar, "Local Government System in Bangladesh: How Far is it Decentralised?"*Journal of Local Self-Government*, Vol. 9, No. 3, 2011, pp. 205 – 230.

Rahman, M.S (2013),"Role of the Members of Parliament in the Local Government of Bangladesh: Views and Perceptions of Grassroots in the Case of Upazila Administration,"*Public Organization Review,* USA, *Vol:* 13**,** 2013,Pp. 71–88.

Rahman, M. Sayadur, "Upazila Parishad in Bangladesh: Roles and Functions of Elected Representatives and Bureaucrats," 2012.*Commonwealth Journal ofLocal Governance,* Uk, p. 101. Retrieve from: http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg.

Rahman, Nader, Cover Story, The Road to Local Government, however Unsatisfactory,2009, Retrieved from: thedailystar.net, http://www.thedailystar.net/magazine/2009/02/04/cover.htm

Siddiqul, Kamal, *Local Governance in Bangladesh, Leading Issues and Major Challenges*, Dhaka, The University Press Limited,Dhaka, 2002.

Selim, Mohammad & Ahmed, Saifuddin, "The Functioning of Upazila Parishad isBangladesh: A Casestudy,"*Journal of Politics & Administration, Department ofPolitics & Public Administration*,Volume-4, Islamic University, Kushtia, Bangladesh 2003, Pp. 108-115.

Sarker, Parimal, The role of the Upazila Nirbahi Officer (UNO) in coordination process at Upazila administration in Bangladesh, *Master in Public Policy and Governance Program, Department of General and Continuing Education, North SouthUniversity*, Bangladesh, 2011, pp. 52-53

Siddiqui, K.Local government in Bangladesh Leading issues and major challenges.In K. Siddiqui (Ed.), *Local government in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited, 2005.

stillborn J. *The roles of the members of parliament in Canada: Are they changing?* Canada: Political and Social Affairs Division. 2012.

Stoker, G, Introduction: Normative theories of local government and democracy. In King D., & Stoker, G. (Eds.), *Rethinking local democracy*, Macmillan University Press, Houdmills: 1996, p. 91.

Date of Submission : 20.02.2022
Date of Acceptance : 26.06.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

Determinants of Profitability of Insurance Business in Bangladesh: A Study on Bangladesh General Insurance Company (BGIC) Ltd.

Md. Omar Faruque*

Abstract

The objective of this study is to find out the Determinants of Profitability of Insurance Business in Bangladesh showing their impact on Banngladesh General Insurance Company (BGIC) Ltd. In the proposed study, secondary data has been used covering the period of 10 years (2010-2019) collected from Dhaka Stock Exchange (DSE) Library of BGIC LTD. In this investigation, Ordinary Least Square (OLS) Regression Model applied using SPSS 20.00 version to show the impact of determinants of insurance business profitability. In the study Underwriting Risk (UR), Premium Growth (PG), Leverage Ratio (LVR) ,Solvency Ratio (SLVR) and Company Size (CS) have been used as independent variables and Returns On Assets (ROA) Dependent variables. The study has revealed that Underwriting Risk, Solvency Ratio and Company Size negative impact on the Profitability (ROA) of BGIC Ltd. and Leverage Ratio (LR) and Premium Growth(PG) have positive impact on Profitability (ROA) of BGIC LtD .This result shows a strong signal for the managers to concentrate on the determinants for the company's sound health to maximize the market price. An insurance company like BGIC can evaluate its financial health through internal determinants that tend to profitability. Hence, it can undoubtedly be beneficial for insurance practitioners, academicians as well as other stakeholders of insurance companies.

Keywords: Profitability, Insurance companies, Multiple regression analysis, Leverage Ratio, Solvency Ratio, Bangladesh

JEL Classification: C23, G22 E66, F62, and M31

1. Introduction

Insurance is a technique of transferring the risk of loss from one to another in exchange for payment. The development of insurance business in Bangladesh is relatively extraordinary throughout the preceding two decades owing to operation of private assurance business. According to academic knowledge, it can be stated that risk refers to some future uncertainty about deviation from expected outcomes. Risks are of different types and origins from different situations. But people want safety in their risk majorly in economic risk. Most of the time, these safety measures can be implied as to the next basic needs for humans after food, cloth, shelter. Insurance market in Bangladesh is in an upward trend. Although there is low penetration rate. It has growth prospects &expansion as the comments passed by the insurance professional from home & aboard (Ullah, Faisal et al. 2016)**.**Insurance firms show a great role in economy of the service.

* Associate Professor, Department of Finance, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

The political volatility & economic worries as the inflation, rising interest rate, policy of tax, corporations deregulation, etc., hinders insurance progress in Bangladesh (Mamun and Chowdhury).However, Bangladesh’s, coverage market is not very bigas compared with the degree of risk. At present, , 32 life and 46 general totaling 78 insurance companies are operating in the country. BGIC is the first private insurance business in Bangladesh started its business as a public limited company on November 01,1984. In this way it obtained the certificate of commencement of business as on July 29, 1985. Under the Companies Act 1913 which was revised in 1994. BGIC went for public issue in 1989. The shares of the company are listed in both (DSE) Dhaka Stock Exchange Limited and (CSE) Chittagong Stock Exchange Limited. and plays a pioneering role in the established market. The major events of the insurance Companies are to offer general types insurance products. The Company operates through four segments: fire, marine, motor, and miscellaneous. The Insurance Companies offer products for the security of policyholder's assets& resources. They also provide indemnification of other parties suffered loss as a result of policyholder's mishap. Products offering by general insurance companies are Property Insurance, Marine Insurance, Motor Insurance, Health Insurance, Engineering Insurance, Overseas Mediclaim, and Miscellaneous Insurance various insurance products. Like other businesses, profitability is a strong factor for an insurance business and this profitability attracts the shareholders. Productivity is one of the most vital aims of financial management. As it is one of the objectives of financial management is to maximize shareholders’ firms value. The profitability is a very significant determinant of performance (Li 1999, Nguyen 2006). So there has an impact on profitability in Earning Per Share (EPS)in a company. The higher the profitability is, the higher the satisfaction of shareholders. This study is focused on the analysis to evaluate the profitability and identify its determinants of BGIC (Bangladesh General Insurance Company) Ltd. So, the study is designed to assess the affiliation between profitability performance & the determinants of the insurance profitability for Bangladesh.

2. Literature Review

Starting with Lang and Stulz (1994) and Berger and Ofek’s (1995) studies on the value of diversified insurance firms relative to specialized insurance firms, there has been increased academic interest in the relation between corporate diversification and firm performance.

Liebenberg and Sommer (2008) have examined the relative performance of P/L insurers that operate in one line of business (specialists) and those that operate in multiple lines (joint producers) for the years 1995 through 2004. They found that joint production is associated with a penalty of at least 1 percent of ROA, or 2 percent of ROE. They also find that the market applies a discount to diversified publicly traded insurers. Their finding of a more complex relationship between diversification and performance serves as a motivator for additional analysis on impact on financial market.

Ishtiaq, N., & Siddiqui, D. A. (2019) have investigated the Possible internal and external factors including liquidity, net premiums, premium growth, underwriting risk, debt to equity, insurance leverage, tangibility, equity capital, GDP, inflation, and market share used to assess their impact on ROA to show the financial performance of life insurance sector in Pakistan the data ranging from 2008-2017 from 9 life insurance companies including 1 public life insurance company and 8 private life insurance company including two on only tactful life and the rest are on conventional or both. They used OLS regression model and GMM method to estimate the results showing tangibility, market share, net premium, insurance leverage and GDP insignificantly or negatively related to the financial performance of Pakistani Life Insurance Company. There are also positive and significant relation of other independent variables such as liquidity, underwriting risk, debt to equity, equity capital, capital surplus and inflation on the financial performance of Pakistani Life Insurance Company.

A pragmatic study of regression results by Yuvaraj & Abate (2013) showing growth, leverage, volume of capital, size, and liquidity identified as determining factors of profitability whereas growth, size, and volume of capital have a positive relation with performance. In contrast, liquidity ratio and leverage ratio are negatively but significantly related with profitability. The company's profitability does not affect significantly by age & tangibility of assets.

Daniel & Tilahun (2013) showed insurance company's size, Loss ratio (risk), tangibility and Leverage as determinants impact the performance of insurers in Ethiopia whereas growth in premium, age and liquidity have no significant effect on ROA.

Meaza (2014) found out the size of company, leverage, liquidity, underwriting risk, asset's tangibility, growth and managerial efficiency, (GDP) & rate of inflation effects on ROA of insures significantly.

There are numerous proxies to evaluate the profitability. Some of which are return on invested capital (ROIC), return on assets (ROA) & return on equity (ROE) (Nguyen, 2006). Productivity is affected by many issues comprising with the scale of policy holder's dividend, capital gain /or losses & federal/state taxes for underwriter (Wright 1992).

Koller et al. (2011) have found that assurance businesses are playing the role of transferring risk. They do this by channeling funds from one unit to the other (financial intermediation). For example, they are non-life assurance firms & life and health insurance businesses correspondingly. This suggests that the insurance firms are serving the economy of a nation one way by relocating & sharing of risk. In this way they can generate confidence over the events of uncertainty . In another way insurance businesses like other commercial institutes plays the role of pecuniary intermediation. That is the way insurance companies passage financial assets from one unit to the other.

An aspect of determining economic performance of the insurance enterprises is the underwriting risk. This reveals the adequacy, or otherwise, of insurers' underwriting

acievement. Complete underwriting rules are fundamental to an insurer's economic performance. It rest on on the risk craving of the insurers. It is frequently evaluated as the ratio of claim incurred to net premium (Adams and Buckle 2000).

Investment productivity reveals the efficiency and proficiency of investment choices. As the investment performance develops acute to the economic solidity of an underwriter. (Kim, Anderson et al. 1995) & Kramer (1996) have found that the investment achievement is inversely correlated to insolvency rate. Another study by (Öner Kaya 2015) has investigated the factors of the Croatian non-life insurance companies' productivity throughout the period from (2003 - 2009). The outcomes of the study shows the ownership, expense ratio & inflation have a significant negative impact on the profitability. Nonetheless, previous productivity has a significant positive effect on Croatian non-life insurer's profitability (Vojinović, Milutinović et al. 2022). Solvency has also been used in study as an sign of the economic performance of insurers (Baourakis, Doumpos et al. 2002, Boyd, Pai et al. 2011). It also shows how it moves the productivity of agricultural associations. (Hailu, Jeffrey et al. 2005). It has assessed the impact of solvency in attaining cost reduction on a sample of Canadian agricultural cooperative. This study disclosed the firm & industry features must be accounted for in determining whether improved solvency makes statistically noteworthy agency costs. That could come in the form of means for managers to make expenditures. This will rise their personal welfares & disregard owner preferences. Founded on their investigation, only one of the associations in their sample hurted from improved agency costs due to increased solvency. (Schumacher and Boland 2005, Boland, Golden et al. 2008, Dorsey and Boland 2009) have shown solvency is a important variable in clarifying the economic performance of company in the four segments of the food economy (e.g., processing, wholesale grocery, retail supermarket, and restaurant). Thus, solvency is a rational variable elucidating productivity.

Observed results showed the fast progress of premium size is one of the fundamental elements in insurers' insolvency (Kim, Anderson et al. 1995). Being too infatuated with development can lead to self-destruction. This can cause the other vital objectives might be abandoned. This is particularly real through an economic downturn. For Example it may be the Asian Financial Crisis. Insurers s having more resources over the years have also better chance of being profitable for the reason that they do have internal capacity. Although it rest on on their capability to exploit outside opportunities. Empirical proof by(Ahmed, Ahmed et al. 2011) in Pakistan, (Li 1999) in UK and (Al-Shami 2008) of their inquiry have found a statistically significant positive connection between growth & profitability of insurers.

In most literatures, the outcome of size on banks productivity is characterized by total asset. (Flamini, McDonald et al. 2009) have showed that the size has used to detect the fact that bigger firms are better placed than smaller firms. It can connecting economies of scale in transactions. As a result they enjoy a greater level of profits. One of the greatest vital inquiries underlying bank policy is size. This optimizes bank productivity. According to (Athanasoglou, Brissimis et al. 2008) the consequence of a growing size of a bank on productivity has been proved to be

positive to a certain extent. Accordingly, a optimistic rapport is estimated amid size & productivity by many insurance study area. As supervisors are less likely to liquidate large insurers. It is predictable that the small underwriters are more helpless to insolvency (BarNiv and Hershbarger 1990, Cummins, Harrington et al. 1995). Though, for firms that become tremendously large, the outcome of size could be adverse due to administrative and other reasons (Li 1999). Hence, the size & productivity association may be anticipated to be non-linear. Consequently most readings use the real assets in logarithm and their square in order to capture the possible non-linear connection.(Athanasoglou, Brissimis et al. 2008) and (Li 1999) found positive connection amid size and productivity. From the above discussion as a successful pioneering Insurance Business Concern no study has been yet conducted on BGIC Insurance company In Bangladesh.

2.1 The following Hypothesis / Research question has been built up for the study to show the impact of independent variables on dependent variavle.

H_O: The independent variables Underwriting Risk, Premium Growth ,Leverage Ratio, Solvency Ratio and Company Size have significant impact on dependent variable Return On Assets (ROA)

H_A: The independent variables Underwriting Risk, Premium Growth , Leverage Ratio , Solvency Ratio and Company Size have no significant impact on dependent variable Return On Assets (ROA)

The following conceptual model has been developed from study:

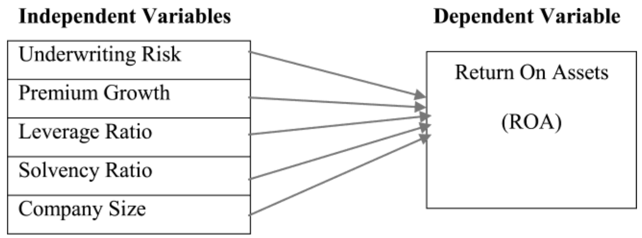

Source: Author own study

From the conceptual framework the following model has been framed:

$$\mathbf{Y = \alpha+\beta_1X_1 + \beta_2X_2 +\beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e;}$$

Profitability (ROA) = α + β_1*Underwriting Risk+ β_2*Premium Growth +β_3*Leverage ratio +β_4*Solvency ratio + β_5* Company Size+ e

1.0 Objectives of the study

I. The main objective of this study is to find the relationship between profitability performance of the BGIC Insurance Company in Bangladesh. The specific objectives are as follows:

II. To show the impact of The independent variables Underwriting Risk, Premium Growth , Leverage Ratio , Solvency Ratio and Company Size on dependent variable Return On Assets (ROA)

3.0 Methodology of the study

3.1 Data collection: Data has been collected from the Annual Reports of BGIC Limited Over the period of 10 years (2010-2019) which is Listed in Dhaka Stock Exchange Limited (DSE). This company chosen as sample from the DSE Listed 34 general insurance companies in Bangladesh as it is the oldest and pioneering in General insurance Business in Bangladesh Due to the COVID-2019 data for the period of 2020 and 2021 have been avoided for being unavailability.

3.2 Software , Tools & Techniques Used for Processing and Analyzing Data

After collecting data, data entry has been done by MS Excel. Then MS Excel database is exported to SPSS v 20. All statistical analyses have been performed in SPSS. Graphs and charts have been prepared using MS Excel. Ordinary Least Square (OLS) Regression method, Charts, Graph and Table used in the study to show the results.

3.3 Variables' Used in the study.

The analysis includes a Ratio analysis, CAGR for profitability measures. The Regression Model and Correlation Matrix are analyzed for identifying the strong determinants of profitability of the performance of BGIC. The ratio comprises the Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), (ROI) Return on Investment(ROI), Return on equity (ROE). These are common measures of productivity of a company. Compound Annual Growth Rate (CAGR) is calculated on Net Income(NI), EPS and Share Price (SP) for 10 years to estimate the internal growth of the company. As strong profitability indicators, underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size are considered to analyse the profitability determinants of the company. In the regression analysis (ROA) is considered as dependent variable. The underwriting risk, growth of premium, leverage ratio, solvency ratio and company size are considered as independent variables to evaluate the profitability determinants .

3.4 Variable specifications

Gross profit margin = (Total Profit / Net Sales) ×100

EBITDA Margin = EBITDA / Revenue

Operating Profit Margin = (Operating Profit /Sales) × 100

Net Profit Margin = (Net Profit / Sales) × 100

Return on Asset = (Net Profit Before Tax / Total Assets) ×100

Return on Invested Capital (ROIC) Return on Invested Capital = (Net Profit Before Tax / Net Worth)*100

Return on Equity (ROE) = (Net Profit / Shareholders' Equity)

Earning Per Share (EPS) = (Net Profit After Tax – Preferred Stock Dividends) ÷ No. of Shares Outstanding

ROA= Net Profit before Tax ÷ Total Assets

Underwriting Risk= Net Claims ÷ Underwriting Profit

Premium Growth= $(P_2-P_1) \div P_1$

Leverage Ratio = Total Liabilities ÷Total Equity

Solvency ratio= Net Assets ÷ Net Premium

Company Size= Ln of total Assets

4. 0 Data Analysis and Interpretation

4.1 Net Profit Margin (NPM): The net profit margin measures how much net profit is generated as a percentage of revenue. It is one of the most indicators of company's financial health. It is possible to compare the profitability of two or more period of time as it express in percentage.

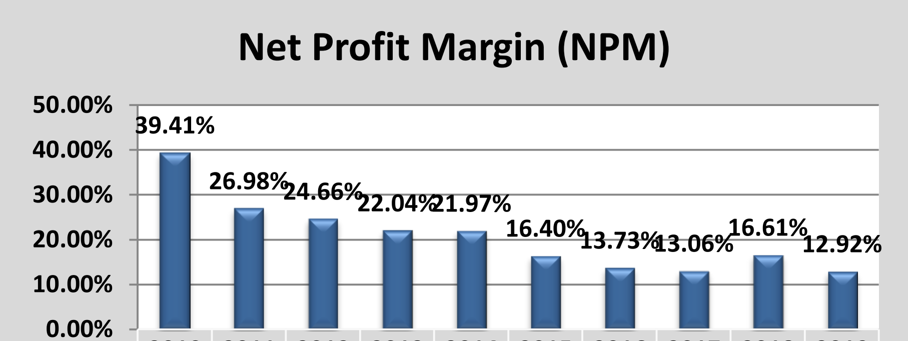

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NPM	39.41	26.98	24.66	22.04	21.97	16.40	13.73	13.06	16.61	12.92

FIG4URE-1

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

The FIGURE-1 presented to show the BGIC's net profit margin from fiscal year (2010 to 2019). The NPM for 2010 is 39.41% and 2019 is 12.92%. From the avove graph it can be said that the growth of NPM is downward from 2010 to 2019. The NPM for 2014 was 21.97% which has been lower to 16.40% in 2015. From the above graph, it can be said that BGIC decreased its profitability over the years that indicates bad impression on the mind of shareholders, policyholders as well as the investors. The management should take into account to improve this margin.

4.2 Return on Assets (ROA): The ROA shows investors idea of how effective the business is in transforming the invested money into net income. It is one of the strongest tools to measure the financial performance of a company. ROA is used

when need to compare similar company or by comparing a company to its own previous performance.

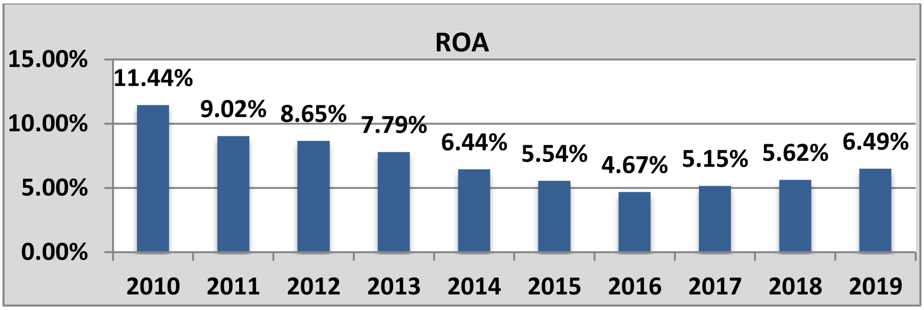

FIGURE - 2 :

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the reserchers by EXCEL and SPSS20. Vsrsion

From the above graph depicts the BGIC's ROA from fiscal year (2010 to 2019). The ROA for 2010 was 11.44% and 2016 was 4.67%. That indicates the ROA is decreasing from 2010 to 2016. After that the ROA is increasing from 2017 to 2019. So the management should handle and be more efficient to hold the target ROA.

4.3 Return on Investment (ROI): The ROI is a popular profitability metric used in evaluating how well an investment has performed. with higher ROI, this is the signal can help investors eliminate or select the best options.

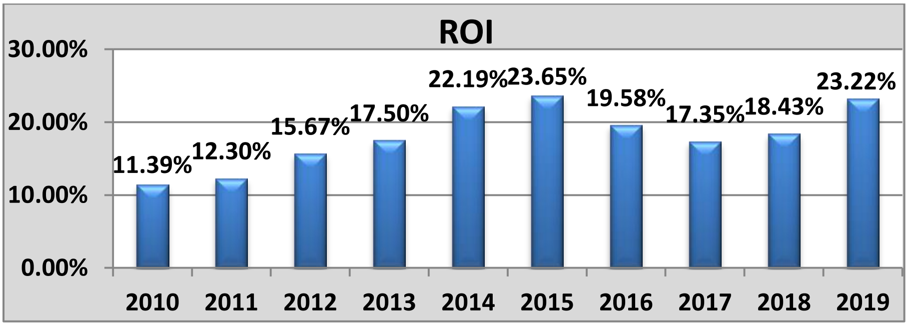

FIGURE-3:

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

The above graph shows the ROI of BGIC from the fiscal year 2010 to 2019. The ROI for 2010 was 11.39% and for 2015 was 25.01%. This can be said that the investment return was increasing in these years. In 2016, the ROI was decreased by 19.58%. The rate was fluctuated in 2017, 2018 and again increased by 23.22% in 2019.

4.4 Return on Equity (ROE): ROE is considered satisfactory will depends on what is normal for the industry or company peers. This measures a corporation's profitability in relation to stockholders' equity.

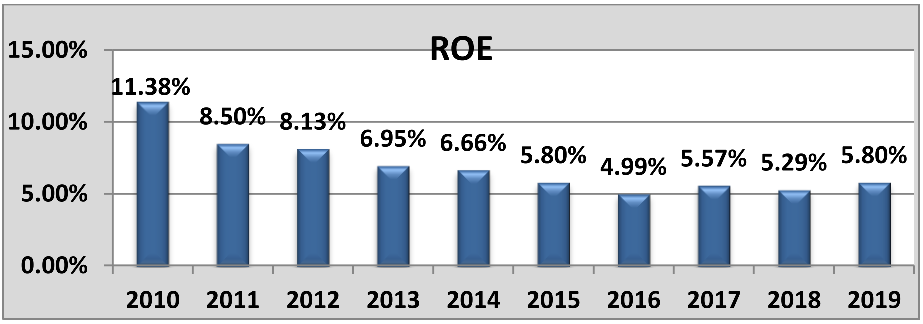

FIGURE-4,

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

The above graph presents the BGIC's ROE from the fiscal year 2010 to 2019. The ROE for 2010 was 11.38% and 2016 was 4.99%. It indicates the ROE is decreasing in these years. After 2016, the ROE has increased in 5.80% in 2019. The management should improve the condition for the profitability of the company.

4.5 Earning Per Share (EPS)

EPS shows how much money a company makes for each share of its stock and it is an analytical tool for estimating corporate value. The tool serves as an indicator of a firm' productivity.

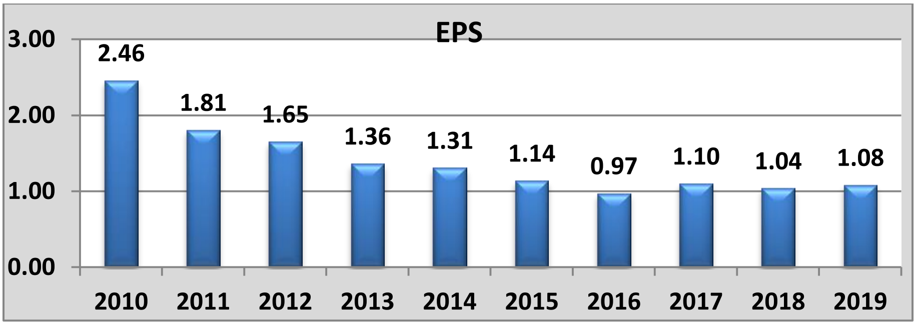

FIGURE-5:

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

The above graph provides the information regarding EPS of the BGIC from 2010 to 2019. EPS for 2010 was 2.46 and 2016 was 0.97. It indicates that the EPS was

decreasing in these years. After 2016, the EPS is increasing slightly. The movement does not show the profitability and management should take measures to improve the indicators.

4.6 Market Price/Share of last 10 Years

The common shares trades regularly in the stock market. The price of share which is trades in market is considered as market share price.

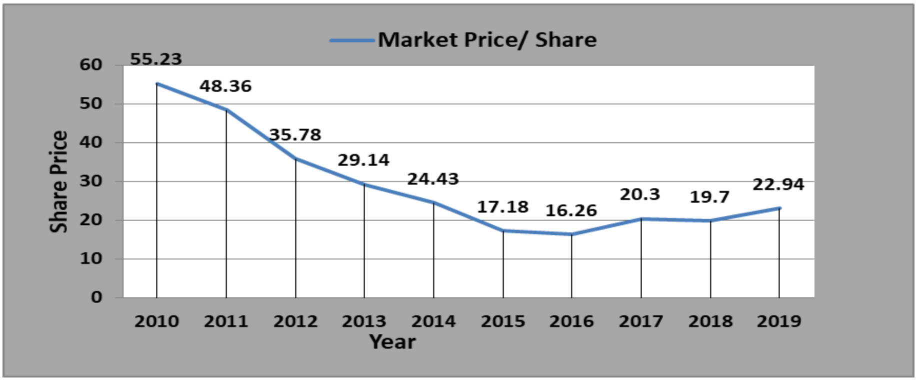

FIGURE-6:

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

The above graph shows the average market price of share of BGIC from 2010 to 2019. The share price in 2010 was 55.23 and 2016 was 16.26. This shows rapid downward change in market price. After 2016, the price fluctuated to 2019. The management should be efficient in their operation to earn more so that the value of stock increases.

4.7 Compound Annual Growth Rate (CAGR)

The CAGR analysis is done by the information on published annual report of BGIC for 2010-2019. This analysis is important for evaluating the internal growth of the company.

CAGR for last 10 years	
Net Income	-6.58%
EPS	-8.72%
Share Price	-9.30%

Table 1

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

The CAGR for Net Income, EPS, Share Price in 10 years from 2010 to 2019 is shown in the table. It indicates that the CAGR for net income decreases 6.58%, EPS decreases 8.72%, Share price decreases 9.30% over 10 years. It indicates that all three variables decline over the period. From the above analysis, it can be shown that the trend of net income, EPS, and Share price was downward. This indicates that the profitability of BGIC from its operational activities was decreasing and this affected to the shareholders' earnings called EPS. This lower EPS also affected to lower share price in the market. The following fall negatively impacted the investors, which decreased the investment income from 2010-2019. The trend of these three indicators is shown graphically as below-

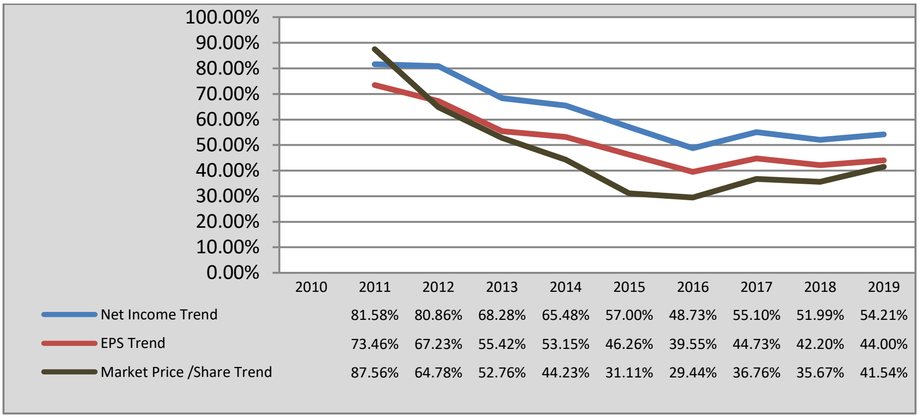

FIGURE: 7

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

5.1 Regression Analysis

Regression analysis is considered a reliable analytical tool to identify the variables which have an impact on a topic of interest. This analysis allows us to identify the variables which affect most, which can be ignored and how these variables influence each other. To run this analysis there need two variables; independent and dependent variables.

In this study, the analysis of profitability has been run by the 'Underwriting Risk, Premium Growth, Leverage Ratio, Solvency Ratio &Company Size' variables as independent (X) and ROA has considered as dependent (Y) variable. This analysis is done using multiple linear regression analysis for internal factors. This analysis is to know if there is any significant influence and how much influence the dependent variable with independent variables. Following is a regression model to this analysis-

$$\textbf{Profitability (ROA)} = \alpha + \beta_1\textbf{*Underwriting Risk} + \beta_2\textbf{*Premium Growth} + \beta_3\textbf{*Leverage ratio} + \beta_4\textbf{*Solvency ratio} + \beta_5\textbf{* Company Size} + e$$

The data is obtained by time-series data from the published annual report (2010-2019) of BGIC.

Multi linear Regression	X (Independent Variables)					Y(Dependent Variable)
Year	**Underwriting Rik (X1)**	**Premium Growth (X2)**	**Leverage Ratio (X3)**	**Solvency Ratio (X4)**	**Company Size (X5)**	**Profitability (ROA)**
2010	1.21	0.19	0.32	8.79	20.95	11.44%
2011	0.94	0.18	0.39	11.77	21.08	9.02%
2012	0.60	0.04	0.38	12.30	21.12	8.65%
2013	0.85	0.03	0.47	14.39	21.16	7.79%
2014	5.69	0.04	0.47	15.02	21.17	6.44%
2015	6.35	0.04	0.51	17.25	21.19	5.54%
2016	6.79	0.07	0.57	20.03	21.22	4.67%
2017	7.51	-0.14	0.61	17.96	21.26	5.15%
2018	3.99	0.12	0.57	18.91	21.23	5.62%
2019	2.13	-1.00	0.64	17.24	21.23	6.49%

Table 3

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

5.2 Result and Interpretation

To evaluate the determinants of profitability and identify the strong indicators, multi linear regression is a better analytical tool. With this model, it has been tried to analyze whether the ROA as a dependent variable is significant or not with the underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size as independent variables.

5.3 Testing the Overall Significance of the Regression Model

This section of the regression model shows the coefficient estimates, the standard error of the estimates, t- stat, p- values and confidence intervals for each variable-

Table 4: Coefficient Table

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	2.769404434	0.36023992	7.68766674	0.001539945
Underwriting Risk	-0.00208266	0.00030787	-6.7646299	0.002491218
Premium growth	0.008592117	0.00360301	2.38470314	0.075601647
Leverage ratio	0.100884406	0.02721201	3.70734886	0.020701941
Solvency Ratio	-0.00398132	0.00065332	-6.0940071	0.003667227
Company Size	-0.12660407	0.01738701	-7.2815303	0.00189032

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

In this analysis, the estimated regression equation is –

(Profitability) ROA = 2.77 – 0.0021 × (Underwriting Risk) + 0.0086 × (Premium Growth) + 0.1009 × (Leverage Ratio) - 0.0040 × (Solvency Ratio) – 0.1266 × (Company Size)

The intercept is described as the expected average of (Profitability) ROA is 2.77 for BGIC when the other independent variables – underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size is equal to zero. The coefficients of underwriting ratio, solvency ratio and company size are -0.0021, -0.0040, -0.1266 respectively that show negative relation with ROA. On the contrary, the coefficients of premium growth and leverage ratio are 0.0086 and 0.1009 respectively. These indicate a positive relationship with ROA. P-value tells a given response variable is significant or not. In the analysis, all the variables without premium growth have a significant effect on ROA or profitability. Because the p-values of all variables regression coefficients are less than 0.05 except premium growth.

5.4 Examining the Fit for the Model

The table is the regression statistics that shows several numbers that measure the fit of the regression model.

Table 5: Regression Statistics

Regression Statistics	
Multiple R	0.998845733
R Square	0.997692798
Adjusted R Square	0.994808795
Standard Error	0.001528853
Observations	10

R- Square is known as the coefficient of determination. It is the proportion of the variance in the response variable that can be explained by the predictor variables. The range is from 0 to 1. The R^2 for this analysis is 0.9977 which indicates around 99.77% of the variation can be explained by the predictors.

5.5 Testing Significance of the Regression Model

Table : 6 shows the significance of the regression model.

ANOVA					
	Df	SS	MS	F	Significance F
Regression	5	0.00404299	0.0008086	345.940294	0.0000232352
Residual	4	9.3496E-06	2.3374E-06		
Total	9	0.00405234			

Source: Annual Reports (2010-2019)

Notes: Data has been compiled by the researchers by EXCEL and SPSS20. Version

Significance F is the p-value associated with the F statistics to a significance level of 0.01, 0.05 or 0.10. In the analysis, the significance F is 0.000023 which is less than the common significance level of 0.05 or 5%. This indicates that the regression model as a whole is statistically significant.

5.6 Interpretation of the Determinants of Profitability

Impact of determinants on Dependent Variable (Profitability): Accept the research hypothesis.

There has a significant relationship among the independent variables- underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size with the significance F of 0.000023 which is less than the significance level at 0.05 or 5% confidence level. Where the underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size are equal to zero/constant, the profitability coefficient will be on an average of 2.77.

Independent Variables:

Underwriting Risk: **Accept the research hypothesis.**

The coefficient of underwriting which is measured by the total claim to underwriting profit ratio was negative and statistically significant at a 0.2% significance level (p-value < 5%). This indicates that low underwriting risk produces a positive effect on profitability. This finding is consistent with the previous research by **(Lee 2014)**that underwriting risk has a negative influence on the insurer's profitability.

Premium Growth: Accept the null hypothesis.

The regression results of this analysis imply that the relation between premium growth and profitability is positive and statistically not significant at 7.5% significance level (p-value > 5%) but significant at 10% significance level.That implies that BGIC underwrites more premiums over the years but has no better chance of being profitable.

Leverage Ratio: Accept the research hypothesis.

The coefficient of the leverage ratio is measured by the total liabilities to total equity was positively and statistically significant at a 2% level of significance (p-value < 5%). That means it increases the liability or decreases the equity that will positively affect profitability.

Solvency Ratio: Accept the research hypothesis.

The coefficient of solvency ratio which is measured by net assets to net premium was negative and statistically significant at a 0.36% significance level (p-value < 5%). The more solvent means a company is (more equity or less underwriting premium),the less profitable it will have. It means increasing their underwriting profit without increasing their capital may result in an excess of liabilities over assets.

Company Size: Accept the research hypothesis.

The regression result of company size shows that is negatively related to profitability and statistically significant at a 0.19% level of significance (p-value <5%). BGIC is a medium-size company consisting of less than 500 employees. This may be the reason for not influencing the profitability positively. The increase of assets cannot increase the underwriting profit, so this affects negatively.

5.7 Correlation among the Variables

Correlation is a way to describe the degree to which two or more variables are related to each other. The most widely used Pearson's correlation is used in this analysis. According to Brooks (2008), it is stated that –if the variable X and Y are correlated, it means that variables Y and X are being treated in a completely symmetrical way. This matrix shows the movement for liner relationship between the two variables. Table 7: Correlation Matrix :The correlation matrix for the analysis is given below-

Matrix	Underwriting Risk (X1)	Premium Growth (X2)	Leverage Ratio (X3)	Solvency Ratio (X4)	Company Size (X5)	Profitability (ROA)
Underwriting Risk (X1)	1					
Premium Growth (X2)	0.028055818	1				
Leverage Ratio (X3)	0.60158464	-0.62454547	1			
Solvency Ratio (X4)	0.73310087	-0.30837801	0.91285836	1		
Company Size (X5)	0.631451446	-0.4119147	0.91902	0.934187971	1	
Profitability (ROA)	-0.80762937	0.25368574	-0.8706604	-0.97304643	-0.9497122	1

The above table shows that the correlation result between underwriting risk and ROA had negative with a coefficient -0.81. Besides, leverage ratio, solvency ratio, company size had negative relationship with a coefficient of -.087, -0.97 and -0.95 respectively. It can be said there had a strong negative correlation among them. On the other hand, there was a positive correlation between premium growth and ROA with a coefficient of 0.25. This was not a significant positive relationship between the variables.

6. 0 Findings and Recommendations

6.1 Findings of the study

The overall performance of BGIC is not satisfactory because of the decreasing scenario of profitability analysis. From the observation of Net profit margin for the year 2010-2019, this ratio is decreasing significantly from 39.41% (2010) and 16.40% (2015) to 12.92% (2019) over 10 years. That indicates the lower performance of the company. The ROA for the company was gradually decreasing from 11.44%(2010) to 4.67%(2016). It indicates the inefficiency of the operation manager. The result for ROI is increasing from 11.39% (2010) to 25.01% (2015) that encourages the investment portfolio. This ratio is fluctuating after the year 2015 and increased by 23.22% in 2019. The CAGR for net income (-6.58%), EPS (-8.72%) and share price (-9.30%) is negative that is an alarming signal on the company performance. In the regression model, the analysis shows that there has a significant positive relationship at a 5% significant level between the ROA (Dependent) and independent variables- underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size. The p-value for premium growth has a positively not significant effect that may be the limitation of the numbers of observations. Overall analysis the study remark the insufficient profitability performance over the 10 years for attracting the investors and the interested clients.

8.2 Recommendations of the study

The analysis shows the company’s overall Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. The operation managers and others should take into accounts those for increasing the performance. The Net Profit Margin is gradually decreasing from

(2010-2019), so the underwriting department, reinsurance department and finance & accounting department, as well as marketing department, should be efficient to manage their fund and portfolios. The ROA is the indicator of an insurance company's financial performance but the company cannot hold the margin at an adequate level. So, the top-level manager should analyze the portfolios and utilize the asset prudently. The trend of ROI is not satisfactory. So, the fund managers should take into deep consideration of liquidity management and select profitable investment opportunities. The CAGR for Net Income, EPS, Share Price is indicating improper management or inefficiency of the officials. So, the company should handle the working operation strategically. The underwriting risk, leverage ratio, solvency ratio are the strong influencing determinants of profitability. So the underwriting manager, reinsurance & claim manager and finance & accounting manager should take proper decisions. Concluding the overall scenario of BGIC's financial ability, the board of directors, top-level management, middle-level management and the operation level management should take value-adding initiatives, apply moderate charges, improve the customer services and select the lucrative investment portfolios.

Conclusion

In this study, researchers tried to analyze the profitability by measuring the profitability ratio of the insurance company and analyzing the determinants of profitability (ROA) with the regression model on BGIC's published financial statement (2010-2019). The profitability of BGIC has been decreasing over the periods that should take into account to improve the alarming situation. There have some significant profitability determinants such as underwriting risk, leverage ratio, solvency ratio and company size. But some results have given abnormal decisions owing to the lower number of samples taken into analysis. All the analysis is on the financial annual report of BGIC from 2010-2019. The net profit margin has decreased from 39.41% to 12.92% which showed an alarming signal for the company. The ROA, ROE, are also decreasing from 11.44% to 6.49%, from 11.38% to 5.80% respectively around the 10 years of operation. But the ROI is satisfactory because it has increased from 11.39% to 23.22%. The profitability has also been analyzed by the CAGR which is negative such as -6.58%, -8.72%, -9.30% that is not satisfactory for any stakeholders. The financial performance of BGIC indicates the volatile situation around 10 years of activities. From the regression analysis, the key findings are –there have a significant effect on ROA and the profitability determinant such as underwriting risk, premium growth, leverage ratio, solvency ratio and company size. The relationship between profitability and its determinants has 0.000023(App.) significance F which is less than standared measure of .05 (.05> .00023),meaning that our multiple regression model is a "good fit" in clarifying the profitability of insurance firms of Bangladesh.

This result shows a strong signal for the managers to concentrate on the determinants for the good health of the company. The overall performance of BGIC is not satisfactory because of the decreasing scenario of profitability analysis. An insurance company like BGIC can evaluate its financial health through these kinds of internal

determinants that tends to profitability. At all, it can be said that BGIC as a leading insurance company in the country, should manage its assets and strategically utilize them so that the company can hold its reputation and can play an economic role in the country's GDP and growth. This sector is a wide area. So, it is quit tough to draw a strong decision from exploring the only one company's financial data. Future research can create. Further study may be focused comprising more pertinent variables. And a bigger sample which will show the issue of how productivity of insurance firms get affected. It will also be improved upon. But it is the authors' belief that this research can create scope to rethink measuring variables for calculation the profitability (ROA). Moreover, for future researchers this study indicated that it is high time to investigate the insurance companies' efficiency because of some other empirical study have proved that there is a significant positive relation with profitability (ROA) and profitability determinants.

References:

1. Adams, M. and M. Buckle (2000). The Determinands of Operational Performance in the Bermuda Insurance Market, Working Paper, European Business Management School, University of Wales.
2. Ahmed, N., et al. (2011). "Determinants of performance: A case of life insurance sector of Pakistan." International Research Journal of Finance and Economics 61(1): 123-128.
3. Al-Shami, H. A. A. (2008). Determinants of insurance companies' profitability in UAE, Universiti Utara Malaysia.
4. Athanasoglou, P. P., et al. (2008). "Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability." Journal of international financial Markets, Institutions and Money 18(2): 121-136.
5. Baourakis, G., et al. (2002). "Multicriteria analysis and assessment of financial viability of agribusinesses: The case of marketing co-operatives and juice-producing companies." Agribusiness: An International Journal 18(4): 543-558.
6. BarNiv, R. and R. A. Hershbarger (1990). "Classifying financial distress in the life insurance industry." Journal of Risk and Insurance: 110-136.
7. Berhe, T. A. and J. Kaur (2017). "Determinants of insurance companies' profitability Analysis of insurance sector in Ethiopia." International journal of research in finance and marketing (IJRFM) 7(4): 124-137.
8. Birhan, M. (2017). "Determinants of insurance company profitability in Ethiopia (case study on Nile Insurance, Dire Dawa Branch)." International Journal of Scientific and Research Publications 7(6): 761-767.
9. Boland, M. A., et al. (2008). "Agency theory issues in the food processing industry." Journal of Agricultural and Applied Economics 40(2): 623-634.
10. Boyd, J. H. and G. De Nicolo (2005). "The theory of bank risk taking and competition revisited." the Journal of Finance 60(3): 1329-1343.
11. Boyd, M., et al. (2011). "Factors affecting crop insurance purchases in China: the Inner Mongolia region." China Agricultural Economic Review 3(4): 441-450.

12. Cummins, J. D., et al. (1995). "Insolvency experience, risk-based capital, and prompt corrective action in property-liability insurance." Journal of Banking & Finance 19(3-4): 511-527.
13. Ćurak, M., et al. (2014). "Firm specific characteristics and reinsurance–evidence from Croatian insurance companies." Ekonomska misao i praksa(1): 29-42.
14. Demsetz, R. S. and P. E. Strahan (1997). "Diversification, size, and risk at bank holdingcompanies." Journal of money, credit, and banking: 300-313.
15. Dorsey, S. and M. Boland (2009). "The impact of integration strategies on food business firm value." Journal of Agricultural and Applied Economics 41(3): 585-598.
16. Flamini, V., et al. (2009). "The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa."
17. Greene, W. H. and D. Segal (2004). "Profitability and efficiency in the US life insurance industry." Journal of Productivity Analysis 21(3): 229-247.
18. Hailu, G., et al. (2005). "Regulatory environment, cooperative structure, and agency costs for cooperative agribusiness firms in Canada: comparative case studies." Journal of Food Distribution Research 36(856-2016-56482): 39-49.
19. Hoyt, R. E. and C. A. Lankau III (2006). "Insurance Coverage Disclosure Laws and Their Impact on Automobile Insurance Costs." Journal of Insurance Regulation 25(2).
20. Hoyt, R. E., et al. (2006). "The effectiveness of state legislation in mitigating moral hazard: evidence from automobile insurance." The Journal of Law and Economics 49(2): 427-450.
21. Khan, T. R., et al. (2014). "How earning per share (EPS) affects on share price and firm value."
22. Kim, Y.-D., et al. (1995). "The use of event history analysis to examine insurer insolvencies." Journal of Risk and Insurance: 94-110.
23. Koller, M., et al. (2011). "Further insights into perceived value and consumer loyalty: A "green" perspective." Psychology & Marketing 28(12): 1154-1176.
24. Kramer, B. (1996). "An ordered logit model for the evaluation of Dutch non-life insurance companies." De Economist 144(1): 79-91.
25. Lee, C.-Y. (2014). "The effects of firm specific factors and macroeconomics on profitability of property-liability insurance industry in Taiwan." Asian Economic and Financial Review 4(5): 681-691.
26. Li, Y. (1999). "Determinants of Banks 'Profitability and its Implication on Risk Management Practices: Panel Evidence from the UK in the Period."
27. Lire, A. and T. Tegegn (2016). "Determinants of profitability in private insurance companies in Ethiopia." Journal of poverty, investment and development 26(0): 85-92.
28. Malik, H. (2011). "Determinants of insurance companies profitability: an analysis of insurance sector of Pakistan." Academic research international 1(3): 315.
29. Mamun, M. Z. and F. Chowdhury "Financial Performance of General Insurance Companies in Bangladesh: A 2003-2020 Evaluation."

30. Nguyen, K. (2006). "Financial Management and Profitability of Small and Medium Enterprises. Southern Cross University Thesis Submitted to the Graduate College of Management in partial fulfillment of requirements for the degree of Doctor of business." Administration. Paper Provided by the German University in Cairo Working Paper Series.

31. Öner Kaya, E. (2015). "The effects of firm-specific factors on the profitability of non-life insurance companies in Turkey." International Journal of Financial Studies 3(4): 510-529.

32. Opeyemi, A. M., et al. (2020). "Firm Specific Attributes and Financial Performance f Listed Insurance Companies n Nigeria." Gusau Journal of Accounting and Finance 1(2): 16-16.

33. Reshid, S. (2015). "Determinants of Insurance Companies Profitability in Ethiopia." Addis Ababa University Addis Ababa, Ethiopia.

34. Rudlof, M. (2007). Kritische Reflexion und/oder Reproduktion von Macht?—Hegemoniale Männlichkeit und Heteronormativität im Doing Gender männlicher Sozialarbeiter. Heteronormativität, Springer: 171-186.

35. Saunders, A., et al. (1990). "Ownership structure, deregulation, and bank risk taking." the Journal of Finance 45(2): 643-654.

36. Schumacher, S. and M. Boland (2005). "Persistence in profitability in food and agribusiness firms." American Journal of Agricultural Economics 87(1): 103-115.

37. Shiu, Y. (2004). "Determinants of United Kingdom general insurance company performance." British Actuarial Journal 10(5): 1079-1110.

38. Ullah, G., et al. (2016). "Factors determining profitability of the insurance industry of Bangladesh." International Finance and Banking 3(2): 138-147.

39. Vojinović, Ž., et al. (2022). "Determinants of Sustainable Profitability of the Serbian Insurance Industry: Panel Data Investigation." Sustainability 14(9): 5190.

40. Wright, K. M. (1992). The life insurance industry in the United States: an analysis of economic and regulatory issues, World Bank Publications.

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 15.12.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July-December 2022

The Conceptualization of Policy Implementation Theory

Md Saidur Rashid Sumon*

Abstract

While the policy success/failure spectrum depends on how to implement the adopted policies, policy scholars have been paying attention to the study of policy implementation theory over the past decades. There is a scarcity of theoretical models concerning the policy implementation evident. Thus, the issue of policy implementation process has been debated for many years and the debate shows no signs of diminishing any time shortly. As a result, academics as well as policy actors need to comprehend on how to articulate policy implementation process before looking at reasons behind policy failure or success. Given the context, this paper intends to investigate the conceptual or theoretical perspectives regarding the issue of policy implementation by reviewing literature on this scholarship. For this purpose, I have explored three main eras of implementation studies which represent the main theoretical models of the policy implementation. Some critiques or limitations associated with theoretical standpoint of the policy implementation have been identified in this study. While existing scholarship of policy making process have extensively emphasized on some standard subfields, which are likely rooted in political science discipline, this paper, in contrast, illustrated that public policy are not based on these subfields only because the policy process focuses a variety of phenomena often neglected by political scientists. This examination of theoretical models will directly help scholars in order to understand the policy implementation process which is inalienable part of policymaking process.

Keywords: Policy Implementation, Policymaking Process, Theoretical Models, Limitations of Theoretical Perspectives.

1. Introduction

While there is an increasing concern that the success or failure of policies is dependent upon the implementation process (Hudson et al., 2019), implementation is a key feature of the policy process. Thus, design and implementation are intimately associated where the selections of policy options overwhelmingly influence the way a policy is implemented (Birkland, 2020).So, the notion of policy implementation has become the most significant area of knowledge in policymaking process. Moreover, while several studies focused on the implementation process, a few of them contributed to effective theoretical models of policy implementation (Birkland, 2020).

Policy is variable in nature because it changes over time. Considering the changing nature of policy issues, the debate continues over the most appropriate approach to the study of implementation. Thus, the concept of policy implementation has been contemplating a significant policy discourse among political or policy scientists over the past decades (Birkland, 2020; Light, 2002). To be clearer, as Birkland (2020) argues, “As long as policies fail or appear to fail, implementation studies will remain

* Associate professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

important to policy makers and to students of the policy process" (p.197). As a result, the study of policy implementation can supposedly be more a fertile avenue of research. Hence, although the continuation and interest of the issue of policy implementation failure have been debated for decades (Diori, 2021; Fowler, 2021; Mueller, 2020; Tormos-Aponte et al., 2021), the debate shows no signs of disappearing any time soon. In order to understand factors contributing to policy failure or success, first we need to dig deeper into the whole policy implementation process. Given the context, this paper intends to explore the conceptual or theoretical viewpoint regarding the issue of policy implementation by reviewing literature on this scholarship.

2. Methods Used in This Study

This paper is theoretical in nature based on the extensive literature review. Several scholarly works such as journal articles, books, project reports, policy documents were taken into accounts while developing arguments in this study. In this process, I have followed such strategies as – browsing relevant literatures by searching keywords like policy implementation, policymaking process, theoretical modelsetc.; prioritizing several academic websites including google scholar and Research Gate and databases such as Scopus, Sci-hub, PubMed; giving emphasis on relevant books, journal articles, policy documents, project reports, available in the university libraries and concerned ministries in Bangladesh. In this process, while latest materials (within last ten years) were given priority, numerous significant earlier scholarly contributions were also included.

3. Understanding Policy Implementation Theory

As mentioned earlier policy changes over time, therefore, it is critical to explore which particular factors are responsible for policy changes. Hence, it is evident that "many change attempts fail because 'no distinction is made between theories of change (what causes change) and theories of changing (how to influence those causes)" (Fullan, 2007, p.14). Therefore, it is significant to note that policy change is dependent upon how policy is implemented (Cerna, 2013). Before looking into policy implementation theory, first we need to cognize what the implementation is. Here, implementation can be defined as "the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions" (Mazmanian & Sabatier, 1983, p. 20). Policy implementation is thus a vital for the usefulness of policies as an inseparable part of policymaking process. At the implementation stage, public managers are highly empowered to play significant roles and they have insightful prescriptions of the impacts of the policy based on their treasured experiences.

Scholars note three main eras of policy implementation studies, which represent dimensions of few theoretical models of policy implementation (Smith & Larimer, 2013).The first era emerged between the late 1960s and the early 1970s focusing on the economic development administration models in order to understand why some specific policies or administrative efforts fail. For example, the gap between policy goals and policy implementations was evident while attempting to eradicate extreme

poverty by the Johnson administration's "New Towns in Town" efforts in Oakland (Birkland, 2020).These efforts were grounded in individual case studies and failed to generate generalized theory that could be pertained to other cases (Derthick, 1972; Pressman & Wildavsky, 1984). Perhaps, this era could not be able to offer a critical room for scholars to develop theoretical simulations of policy implementations. Consequently, this economic development administrative aspect was not well articulated and failed to establish the centerpiece of research project despite a plethora of policy implementation issues were discussed under this era (Birkland, 2020).

The second era materialized in the mid 1970s and intended to develop systematic theories of the policy process. Particularly, this era was more concerned about generalizable theory that could be employed to and tested with many other cases focusing on two approaches – a "top-down" perspective and "bottom-up" perspective on policy implementation. In short, this era was dominated by the paradox between these two implementation theories (top-down and bottom-up approaches), which depicts the dynamics between state government and local authorities or officials.

4. Top-down Implementation Theory

By empowering top levels of the authority in the state government, top-down theorists consider policymakers as the focal actors during the whole policy designing and implementation process. Moreover, these theorists pay their attention on factors that condition successful implementation (Cerna, 2013; Matland, 1995). This research tradition – study of factors – was pioneered by such scholars as Carl Van Horn (1979) and Carl Van Horn & Donald Van Meter (1976), as well as Daniel Mazmanian and Paul Sabatier (1989). More importantly, Sabatier and Mazmanian (1979) espoused an array of political and legal aspects which are composed of six conditions required for successful implementation ranging from clear and consistent objectives, causal theory, legal structure of the implementation process, committed officials, supportive interest groups, and to no undermining of changing socio-economic conditions that support causal theory (Cerna, 2013; Sabatier, 2005).

Furthermore, this theoretical approach is grounded in a set of significant assumptions illustrated by Birkland (2020) such as: it is dependent on clear and consistent goals and objectives (Ryan, 1995); policies are guided by well-developed policy tools for the attainment of goals; it begins by a policy decision and later assesses the actions vested in implementation (Sabatier, 1986); it is rooted in implementation chain that starts with a policy message at the top and sees implementation as occurring in a chain (Dyer, 1999); policy designers are capable of evaluating the efficiency and commitment of the implementers for the effective policy implementation.

It can be argued that the establishment of generalizable policy suggestions along with coherent noticeable behaviour pattern across various policy concerns is one of the major strengths of top-down theoretical approach (Cerna, 2013; Matland, 1995). Likewise, this perspective can trace the proper structure of implementation and can

overcome any challenges or compel compliance with the targets set at the top through the lowest-level implementers (Birkland, 2020).

However, the top-down approach has some substantial flaws. As such, experienced local level actors are not taken into account throughout the implementation process. for example, those who are working with grass-root level people have some important knowledge. This knowledge can add extra value in the policy design. Furthermore, overlooking the political dimensions and previous actions is one of the main weaknesses of this approach (Cerna, 2013). As such, political dimensions at local level can guide the policymaking process effectively. Moreover, this perspective has been criticized for the overemphasis on statutory language and clear aims or objectives. As a result, it is difficult to fix a standard target for program success when consensus on setting goals or objectives is not achieved (Birkland, 2020; Cerna, 2013).

5. Bottom-up Implementation Theory

The bottom-up approach emerges in a response to the limitations aligned with the top-down theoretical model. More specifically, in reaction to overwhelming criticisms of this theory and continuous dissatisfaction with top-down perspective's capabilities regarding the interpretation of unsuccessful outcomes or the failure of implementation encouraged researchers to analyze implementation from the perspective of "street-level bureaucrats" (Birkland, 2020; Lipsky, 1971).Moreover, this theory is popular by calling it as "backward mapping," where the implementation process and the related associations are diagrammed backward, from the fundamental implementer to the topmost policy actors (Elmore, 1979).

Some critics of the top-down approach like Hjernand Hull (1982), Hanf (1982), Barrett and Fudge (1981), and Elmore (1979) advance the study of policy implementation from the viewpoint of bottom-up theory by criticizing top-down scholars' too much emphasis on central decision makers and ignoring local actors (Cerna, 2013). Hence, Hanf et al. (1978) developed the bottom-up approach and ascertained the linkages between regional and national players who are engaged in service delivery in several local areas and are also efficient to provide input son setting goals, strategies, and activities. In sum, this theory offers a framework in which local actors can participate in decision making process for effective policy implementations (Sabatier, 2005) and these theorists argue that policy is made at the local level (Matland, 1995).

Like top-down approach, this theory is, according to Birkland (2020), also based on such important assumptions as: bottom-up perspective acknowledges that policy goals and objectives are not unequivocal, rather these are somewhat vague and may clash with not only other goals but also with norms and values of street level bureaucrats; while top-down approach focuses on compliance, bottom-up theory is the most concerned about conflict-management by negotiating and even though compromising with relevant actors with a view to attaining the policy goals; this approach recognizes that policy can be designed as a collection of laws, acts, rules

and regulations, norms, values, practices instead of a single defined policy in the form of a statue; implementation process is very realistic in nature where implementation can be approached as the continuation of challenges and bargains that happen throughout the policy process, not just at point of inception (Birkland, 2020).

One of the main strong points associated with bottom-up approach is its emphasis on circumstantial features within the implementing atmosphere (Cerna, 2013). Moreover, this approach is easily adaptable to local level challenges and environmental factors since goals, strategies, and activities of this perspective for the implementation are easily adaptable or flexible (Birkland, 2020).

Nevertheless, bottom-up theory is not beyond criticisms. As such, this approach concentrates on the local autonomy by empowering the street level bureaucrats who are not exclusively free agents, which often aggravate the aims and objectives of top policymakers or central authority (Birkland, 2020; Cerna, 2013; Matland, 1995; Sabatier, 2005).Again, this theoretical viewpoint ignores the power dynamics linked to implementation process, which is another shortcoming of this approach because policy control should be exerted by those actors who belong to legitimate power originated from their accountability (Birkland, 2020; Cerna, 2013; Sabatier, 2005). Finally, local actors are compelled to act in a specific way grounded in their professional norms, values, practices, and commitments, by the resources available to them, and by legal endorsements (Cerna, 2013).

6. Synthesis or Combined Theory: A Third Generation of Implementation Research

Finally, scholars have attempted to combine or reconcile the strengths of both top-down and bottom-up approaches into one theoretical model or synthesis that can address the third generation of policy implementation from the top as well as local considerations (Birkland, 2020; Elmore, 1985; O'Toole, 1986; Sabatier, 1986). It is evident that there is a growing demand in combining two approaches in order to get benefits from the strengths of both approaches (Cerna, 2013). Furthermore, the existing literature also articulates how this theory revolves around the combination of micro-level characteristics of bottom-up perspective and macro-level characteristics of top-down approach in implementation research (Birkland, 2020; Cerna, 2013; Elmore, 1985; Fullan, 2007; Goggin et al., 1990;Matland, 1995; O'Toole, 2000; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

This approach is built upon some basic assumptions such as: this theoretical model focuses on the mixture of the idea of "backward mapping" and "forward mapping element"(Elmore, 1985) in which central decision makers can make choices of policy instruments or tools to devise implementation while the needs and motivations of local level implementers are also realized; a conceptual framework should be designed that synthesize the best of the top-down and bottom-up approaches (Birkland, 2020; Sabatier, 1986); it begins by implementing the bottom-up perspective, which addresses public and private actors engaged in a policy problem (Sabatier, 1986); this theory of policy implementation depends on conveying messages between policy actors and implementers (Goggin et al., 1990);it is based

on the feature that implementation is as much a matter of negotiation and communication as it is a matter of command (Birkland, 2020).

Reducing limitations in policy implementation process is one of the strongest points of this theory. By the same token, policy implementation often deals with a wide variety of stakeholders at diversified levels where both top policy actors and local implementers on the ground are equally vital for successful implementation (Cerna, 2013). Additionally, this third-generation approach acknowledges the segregation of different policy areas, which is the beauty of this theoretical model (Cerna, 2013). Consequently, implementation changes over diverse matter and kind of policies. This theory has been criticized for its longer-term of implementation process (Birkland, 2020).

Besides, there are other theoretical dimensions marked in existing scholarship to understand implementation process that is given below.

7. Rational Choice Theories

In the later era, thinkers have sought for more refined modes of theorising about implementation by employing rational choice approaches (Cerna, 2013). Indeed, these theoretical approaches are constructed through some significant assumptions. First, while policymakers set a stable number of preferences, they act rationally with a view to escalating the accomplishment of these preferences. Second, because of inadequacy of formal provisions to inspire support and cooperation, politics is regarded as a series of collective act dilemmas (Cerna, 2013; Hall & Taylor, 1996). There are two dominant rational choice theories found in existing scholarship in order to analyze the implementation process.

Game theory

This approach focuses on building theories that pursue to illustrate how alliances enact legislation. Perhaps, game theory is "a mathematical treatment of how rational individuals will act in conflict situations to achieve their preferred objectives" (Firestone, 1989, p. 18).This theoretical approach is derived from ecology as a significant dimension in environment in different ways – through competition, cooperation, or interdependence (Firestone, 1989). By using this theoretical lens, scholars view implementation as the maintenance of a political game from the policy design stage (Bardach, 1977).

It is critically observed that political actors employ different types of games in the implementation process in order to satisfy their own interests. Nonetheless, "these games distort implementation from the legislative goals" (Winter, 2003, p.213). Inspite of its wider application in implementation research, particularly in inter-organizational management, game theory has some severe credible flaws which obstruct the natural flow of successful implementation process (O'Toole, 1995). While there are numerous limitations in game theory to implementation such as uncertainty across different areas and the lack of institutionalisation in the implementation setting, effective and expert multidimensional implementation executives can successfully arbitrate at a range of arguments in a complex

circumstance to lessen ambiguity and institutionalise cooperation (Cerna, 2013). Moreover, although this perspective has been criticized for some drawbacks, it can benefit implementation managers for unwrapping ideas of power and control aligned in the implementation process (O'Toole, 2000).

As a whole, delineating on game theory, researchers can utilize local variations and networking games through "signalling, commitment, and iteration; influencing preferences of actors and persuading them of the benefits to encourage cooperative outcomes; developing norms of trust and cooperation" (O'Toole 1995, p.47-51).

Agency theory: Agency theory is another application of rational choice theory, which emphasizes how key leaders in the policymaking process assign implementation to state agents and it is extensively used in political science, economics, and sociology (Kiser 1999). Various policy thinkers focus on supervising of agents that are guided by the focal policy actors in order to decrease drift in implementation (Bendor & Moe, 1985; Cerna, 2013; Kiewiet & McCubbins, 1991; Weingast & Moran, 1983; Wood, 1988). While the economics literature on agency theory addresses the monitoring issues in implementation process, political science concentrates on three concerns – third parties, administrative procedures and multiple principals. However, numerous difficulties remain unresolved. For example, this question is still unanswered who precisely the prime actor is that is supposed to oversee the activities of the agents, and how agents are chosen (Cerna, 2013; Kiser 1999).

In a nutshell, although "rational choice does not offer solutions for all cases and contexts" (John, 2003, p.485), this theoretical model offers a well-developed framework in which performers are rational for achieving their goals with preferences. Therefore, policy actors build and maintain network deliberately with other actors in the structure. Theorists argue that this approach acts healthier in elucidating results when choices are settled instead of specifying the source of choices and factors contribute to change (John, 2003). Despite these theories have few challenges including uncertainty and insufficiency of institutionalisation, this theoretical framework provides valuable insights on a "rigorous deductive theory and the potential to combine top-down and bottom-up approaches by treating all relevant actors as strategic players" (O'Toole, 1995, p.54). Finally, this model is conceivable to use rational choice theories, especially game theory in order to policy implementation, exclusively when there are testable hypotheses (Cerna, 2013).

8. Conclusions

It is evident that previous studies or existing scholarship of policy making process have largely focused on some standard subfields of policy process, which are likely rooted in political science discipline. Considering these subfields, political scientists have traditionally tended to emphasize on either a specific type of institution (legislatures, the presidency, courts, interest groups, administrative agencies, local governments, political parties) or on specific types of political behavior outside those institutions which are public opinion, voting, political socialization (Sabatier, 1991).

In contrast, policy scholars interested in public policy are not intended to restrict themselves within these subfields because the policy process spans all of them and they have highlighted a number of phenomena often neglected by political scientists (Sabatier, 1991). These neglected phenomena include: the importance of policy communities or networks involving a range of public and private institutions and multiple levels of government; the critical role of policy elite vis-à-vis the general public; and differences in political behaviour across policy types. These theoretical concepts are understood by the heuristic paradigm, as the dominant paradigm of the policy process. This dominant paradigm has outlived its usefulness and must be replaced, in large part because it is not a causal theory without a policy focus (Sabatier, 1991, p.147).

Throughout the paper, I have tried to address theoretical issues mentioned above and their conceptualizations. Furthermore, this paper has explored different theoretical models that are employed in policy implementation process based on literature review. I do strongly believe that this analysis of theoretical models will directly help scholars in order to understand the policy implementation process which is inalienable part of policymaking process.

References

1. Bardach, E. (1977). *The implementation game: What happens after a bill comes law*. Cambridge University Press.
2. Barrett, S. & Fudge, C. (Eds.) (1981). *Policy and action*. Methuen.
3. Bendor, J. & Moe, T. (1985). An adaptive model of bureaucratic politics. *American Political Science Review, 79*, 755-774.
4. Birkland, T. A. (2020). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (5th Eds.). Routledge.
5. Cerna, L. (2013). *The nature of policy change and implementation:*
6. *A review of different theoretical approaches*. OECD. Retrieved from: https://www.oecd.org/education/ceri/The%20Nature%20of%20Policy%20Change%20and%20Implementation.pdf
7. Diori, H. I. (2021). Deductive models of policy implementation and their impact on policy outcome: A critical assessment. *Advanced Journal of Social Science, 9*(1), 1-9.
8. Dyer, C. (1999). Researching the implementation of educational policy: A backward mapping approach. *Comparative Education, 35*(1), 45–62.
9. Elmore, R. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly,94*(4), 601– 616.
10. Elmore, R. (1985). Forward and backward mapping. In K. Hanf& T. Toonen (Eds.), *Policy implementation in federal and unitary systems* (pp. 33-70). MartinusNijhoff,
11. Firestone, W. (1989). Educational policy as an ecology of games. *Educational Researcher, 18*(7), 18-24.
12. Fowler, L. (2021). How to implement policy: Coping with ambiguity and uncertainty. *Public Administration, 99*(3), 581-597.

13. Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change*. Teacher's College Press.
14. Goggin, M., Bowman, A., Lester, J. & O'Toole, L. (1990). *Implementation theory and practice: towards a third generation*. Scott Foresman and Co.
15. Hall, P. & Taylor, R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies, XLIV*, 936-957.
16. Hanf, K. (1982), 'The implementation of regulatory policy: enforcement as bargaining', *European Journal of Political Research, 10*, 159-172.
17. Hanf, K., Hjern, B. & Porter, D. (1978). Local networks of manpower training in the Federal Republic of Germany and Sweden. In K. Hanf& F. Scharpf (Eds), *Interorganisational policy making: Limits to coordination and central control* (pp. 303-344). Sage.
18. Hjern, B. & Hull, C. (1982). Implementation research as empirical constitutionalism. *European Journal of Political Research, 10*, 105-116.
19. Hudson, B., Hunter, D. & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: Can policy support programs help?*Policy Design and Practice*, *2*(1),
20. 1-14. DOI: 10.1080/25741292.2018.1540378
21. Jenkins-Smith, H. (1988). Analytical debates and policy learning: analysis and change in the federal bureaucracy. *Policy Sciences, 21*(2), 169-211.
22. John, P. (2003). Is there a life after policy streams, advocacy coalitions and punctuations: Using evolutionary theory to explain policy change? *Policy Studies Journal, 31*(4), 481-498.
23. Kiewiet, D. &McCubbins, M. (1991).*The logic of delegation*. University of Chicago Press.
24. Kiser, E. (1999). Comparing varieties of agency theory in economics, political science and sociology: An illustration from state policy implementation. *Sociological Theory 17*(2), 146:170.
25. Light, P. C. (2002). *Government's greatest achievements: From civil rights to homeland security*. Brookings Institution.
26. Lipsky, M. (1971). Street level bureaucracy and the analysis of urban reform. *Urban Affairs Quarterly6*, 391–409.
27. Matland, R. (1995). Synthesising the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation.*Journal of Public Administration Research and Theory*, *5*(2), 145-174.
28. Mazmanian, D. & Sabatier, P. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
29. Mueller, B. (2020). Why public policies fail: Policymaking under complexity. *EconomiA*, *21*, 311-323.
30. O'Toole, L. (1986). Policy recommendations for multi-actor implementation: An assessment of the field. *Journal of Public Policy*, *6*(2), 181–210.
31. O'Toole, L. (1995). Rational choice and policy implementation: Implications for interorganisational network management. *American Review of Public Administration, 25*(43-57).
32. O'Toole, L. (2000). Research on policy implementation: Assessment and prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory, 10*, 263-288.

33. Pressman, J. L. &Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
34. Ryan, N. (1995). Unravelling conceptual developments in implementation analysis. *Australian Journal of Public Administration, 54*(1), 65–81.
35. Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches in implementation research: A critical analysis and suggested synthesis.*Journal of Public Policy,6*(1), 21–48.
36. Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, *21*(2), 129-168.
37. Sabatier,P. A. (1991). Toward better theories of the policy process. *PS: Political Science and Politics, 24*(2),147-156.
38. Sabatier, P. (2005). From policy implementation to policy change: a personal odyssey. In A. Gornitzka, M. Kogan & A. Amaral (Eds.), *Reform and change in higher education: Analyzing policy implementation* (pp. 17-34). Springer.
39. Sabatier, P. & Jenkins-Smith, H. (1999). The advocacy coalition framework: An assessment. In P. Sabatier (Eds.), *Theories of the policy process* (pp. 117-168). Westview Press
40. Sabatier, P and Mazmanian, D. (1979), 'The conditions of effective implementation: a guide to accomplishing policy objectives', Policy Analysis, *5*(4), 481-504.
41. Tormos-Aponte, F., Wright, J. E., Brown, H. (2021). Implementation has failed, implementation studies have failed even more: Racism and the future of systemic change. *Social Science Quarterly, 102*(7), 3087-3094.
42. *74*(4), 439–441.
43. Weingast, B. & Moran, M. (1983). Bureaucratic discretion or congressional control? Regulatory policy-making by the federal trade commission. *Journal of Political Economy, 91*, 765-800.
44. Winter, S. (2003). Implementation perspectives: Status and reconsideration. In G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of public administration* (pp. 212-222). Sage.
45. Wood, D. (1988). Principals, bureaucrats and responsiveness in clean air enforcements, *American Political Science Review, 82*(1), 213-234.

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 30.10.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July–December 2022

China's Role in the Infrastructure Development of a Muslim Country Bangladesh

Mobarak Hossain*

Abstract

Across the years, the People's Republic of China has emerged as an overall monetary superpower having achieved high money related advancement proceeded for a broad time interval and in the process transforming into the world's greatest item exporter. Its brisk assistant change and improvement progress to an upper-focus compensation country joined by a rapidly creating and massive metropolitan community and wealthy buyers have in like manner changed it into a huge overall market, addressing in excess of 10% of world imports. For suppliers across overall economies, China presents a momentous open entryway for convey expansion. Close by its creating financial and political importance, China has also started proactive responsibility with various countries through endeavor works out. Lately, pushing organization to support trade and advance monetary cooperation blueprints has become a need inspiration for Chinese policymakers. Through the Belt and Road Initiative (BRI), China's state had endeavors have endeavored trade related structure headway adventures at territory scales. All the while, China's private accounts are receiving an involved hypothesis methodology in many making countries to look for new trading chances made through infrastructural improvement and pulled in by monetary and monetary rousing powers offered to outside monetary subject matter experts. China is presently the greatest trading accessory of Bangladesh.

Key Words: China, Bangladesh, Infrastructure Development, Foreign Direct Investment (FDI), Bridges and roads, BRI, BCIM-EC, Muslim World.

1. Introduction

China's rearrangement of its socialist financial approaches with entrepreneur market economy during the 1980s has prompted outstanding advancements that draw in genuine scholarly interests. Initially, its fast financial development as of late has transformed it into the second biggest economy on the planet. As China blasts monetarily and its worldwide market-reach expands further, it has begun seeking after a forceful worldwide monetary discretion for the most part as asset looking for venture. In this drive, China gives expanding consideration on the oil-rich Muslim nations in Asia and Africa to meet its always developing energy needs. Furthermore, attendant to its financial development, China has been encountering a consistent improvement in science and innovation that is probably going to make China one of the most progressive nations soon. Lastly, a financially and deductively incredible China is progressively turning out to be more confident in its military may which is probably going to cause a change yet to be determined of force at the worldwide level. These elements of a rising China are probably going to impact its relations with territorial and global forces later on. This paper endeavors to survey plausible

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

ramifications of China's ascent for the Muslim world. It contends that two specific factors in particular, geological vicinity among China and a considerable lot of the oil-rich Muslim nations, and strain connection between the West and the Muslim world since the finish of the Cold War are probably going to make China and the Muslim world encouraged nearer monetary and vital relations making the later an immediate recipient of a rising China. The Muslim world is a typical term utilized in this paper to remember 47 Muslim greater part nations for the world. Those nations are partitioned in territorial bunches like South and Southeast Asia (Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Maldives, Malaysia, Indonesia, Pakistan); Central Asia (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan); the Middle East (Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, UAE, Yemen): north Africa (Algeria, Djibouti, Egypt, Eritrea, Libya, Morocco, Tunisia); west and Sub-Saharan Africa (Benin, Burkina Faso, Chad, Comoros, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, , Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leon, Somalia, Sudan).

Since China and Bangladesh officially settled strategic relations on October 4, 1975, the inviting reciprocal relations between the two nations have been creating in a sound and stable way over the previous years. This time of 2020, marks the 45th commemoration of the foundation of discretionary relations among China and Bangladesh, has become a fantastic chance to additionally extend the companionship and organization between our two nations. China and Bangladesh customarily have been appreciating well-disposed respective relations. Thinking back on the previous 45 years, the heads of the senior age in the two nations have made the benevolent relations, and with the arrangement of undeniable level visits, particularly President Xi Jinping's visit to Bangladesh in October 2016 and Prime Minister Sheikh Hasina's visit to China in July 2019, the respective relations among China and Bangladesh have been additionally fortified and raised to the essential association of collaboration. Against this foundation, we are totally pleased to see that China-Bangladesh monetary and exchange collaboration has accomplished substantial and productive outcomes in this brilliant improvement period.

Bangladesh has encountered the quickest development rate in the Asian Pacific region and is perhaps the most unique nations on the planet, keeping a GDP development pace of above 6% in 10 years and accomplishing exceptional improvement drawing in overall consideration. To understand the fantasy of "Amar Sonar Bangla" and the "Vision 2021" and "Vision 2041" of venturing into the classes of center pay nations and created nations, the public authority of Bangladesh has been executing enormous foundation developments to support monetary turn of events. During this cycle, China saves no endeavors and supports Bangladesh to help out framework developments constantly through different methods, including concessional credits, venture collaboration, project contracting and China-help projects. Since 2016, the measure of the concessional credits given by the Chinese Government to Bangladesh has added up to about $10 billion, which beat the sum among the improvement accomplices of Bangladesh. What's more, Bangladesh has been one of the nation's using the biggest measure of Chinese concessional advances in three continuous years.

2. The Rationale of the Study

In recent times, relations between Bangladesh and China, especially economic relations, have developed a lot. Due to the strengthening of economic cooperation, economic relations with a number of potential sectors have been explored through which the relations between the two countries can be better understood. China is also implementing infrastructure projects worth $ 10 billion in Bangladesh, according to the China Daily. This includes the China Economic and Industrial Zone, the 8th China-Bangladesh Friendship Bridge, and the International Exhibition Center. There are similar trends in trading. China is now Bangladesh’s largest trading partner, said Osama Taseer, president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Bangladesh exports vegetables, frozen and live fish, leather and leather goods, textile fibers, paper yarns as well as fabrics, knitting & dyeing and clothing and clothing. In fiscal year 2017-18, bilateral trade between countries amounted to USD 12.4 billion and is expected to reach USD 18 billion by 2021.

3. Research Methodology

This article conducts a qualitative study covering documentaries, library and Internet resources, and editorial opinion of the daily and different sources of information. Since the qualitative approach attempts to explore and uncover development, clarify and explain relationships, and construct results applicable beyond the immediate limits of research, this article emphasizes determining the outcome. From a historical, political and economic point of view. Further, based on literature and documents collected from Ministry of Finance, People's Republic of Bangladesh, Bureau of Statistics Management, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Investment Board and from Bangladesh Bank. All data and information collected from primary and secondary sources has been organized, examined, studied and interpreted, taking into account the fundamental interest of the study - Recent development of relations between Bangladesh and China and impact of the role of China in Bangladesh's infrastructure development

4. China's support in Bangladesh to infrastructure development

Bangladesh is right now at a phase where it should be a "factor-based economy" to be an item based economy. Framework advancement can build business proficiency and encourage the modern area.[1] China has given an enormous number of speculations to build up Bangladesh's framework and add to monetary turn of events. Financial participation among Bangladesh and China is relied upon to heighten in the following decade. That is the reason Bangladesh needs foundation improvement to accomplish its objective. Understanding the significance of framework improvement in the economy, Bangladesh and China have just taken various activities. Furthermore, the two sides additionally understood that the accomplishment of all current undertakings actualized by Bangladesh and China relies upon foundation improvement. It is hence expected that soon Bangladesh-China collaboration in this area will increment significantly more.

During its third visit in June 2014, China welcomed Prime Minister Sheik Hasina on the privileged pathway. The two heads pledged to augment cash related assistance and obligation to system reaches out in Bangladesh. The Chinese Prime Minister said that Bangladesh will be a "working accessory" in the "Asian age under China's organization." Prime Minister Sheik Hasina focused on her status to build up the key and monetary relationship of her country with China, stamping critical arrangements for the improvement of roads, railways and force plants during a three-day visit to the Chinese capital. Bangladesh is searching for Chinese help to gather a distant sea port. It would cost billions of dollars if the Chinese association got the arrangement, Sonadia would transform into the fourth port worked by the Chinese association in the Bay of Bengal. China has furthermore offered the advancement of nuclear force plants in Bangladesh to help meet the country's creating imperativeness needs while endeavoring to help the improvement of Bangladesh's petrol gas resources. Six platforms of partnership were worked in Bangladesh and the Seventh continues. Various other tremendous establishment adventures are being worked on with a Chinese store and concentrated assistance (June 2014). On the help side, spending from China is appealing. As of recently, China has permitted Bangladesh USD 1.5 billion, of which USD 978 million were hard credits, while Bangladesh was relying upon milder conditions (Chowdhury, 2010: 7). On October 14, 2016, the Chinese president visited Bangladesh. Chinese President Xi Jinping's visit to Bangladesh is likely going to be important in light of various parts. During this visit, 27 interest understandings were set apart in various divisions, 15 understandings and memoranda of perception (update of understanding) and 12 development and normal getting understandings. China will back USD 21.5 billion out of 28 headways and outside assistance adventures, USD 80.3 million for monetary and specific investment, USD 700 million for the pile contract for the Karnaphuli tunnel advancement and USD 280 million for the credit understanding for the Dashekandi sewage treatment adventure. In 2014, the Bangladeshi Government allowed China USD 1.55 billion arrangements for the advancement of the Padma Bridge. Work on this key endeavor is propelling incredible and is depended upon to be done in 2018. As a segment of additional creating attaches with Bangladesh in February 2015, the Chinese government has agreed to back 10 critical establishment adventures costing over 8.5 billion USD. China has in excess of 100 associations working in Bangladesh during the zones of articles of clothing, materials, jute, and general creation. In case this rate won, the total separate trade would amount to USD 18 billion out of 2021, when the country recognized its 50th remembrance (Kabir, 2016).[2]

During Prime Minister Sheik Hasina's five-day visit to China on July 2-6, Bangladesh and China consented to a few significant arrangements - five arrangements, including three MoUs and different arrangements that remembered ventures for the energy area ($ 1.7 billion).[3] The visit was essential to Dhaka since it focused on activities that are significant for Bangladesh's turn of events. "On account of the joint endeavors of the two governments and organizations from the two nations, a gathering of participation projects is being actualized, including the

Chinese Economic and Industrial Zone, Payra Power Station, 8. Companionship Bridge in Bangladesh in China and the International Exhibition Center, along with an all out speculation of more than 10 billion dollars, "said the Chinese diplomat.[4]

Bangladesh has just haggled with China to fabricate new tasks participation and arrangements inside the Belt and Road. A portion of those proposed and expected public network and transport projects in Bangladesh are the Padma Bridge (part II) railroad association, Chittagong ocean street, Akhaura-Sylhet, Dhaka-Sylhet fourth path roadway, a raised thruway in Dhaka, profound seaport of Pyra.

Table 01: Projects of Infrastructure in Bangladesh with Chinese Cooperation (US$ in Millions)

Project	Value/Cost
China-Bangladesh Friendship Bridge	50
Tunnel Under Karnaphuli River	70
Padma Bridge (part-I)	2000

Source: Ministry of Transport, Government of Bangladesh.

Table 02: Connectivity and transport projects Bangladesh expects from Belt and Road offer (US$ in billions)

Project	Value/Cost
Padma bridge(part-II) rail link	3.3
Marine driveway in Chittagong	2.9
Akhaura-Sylhet railway	1.8
Dhaka-Sylhet four-lane highway	1.6
Elevated highway in Dhaka	1.4
Payra deep seaport	3.1

Source: Author’s compilation (based on data from Bangladesh Government, the Daily Star of 17 October 2016; and country.eiu.com)

China and Bangladesh marked US$ 6 billion for interest in 2016 future rail framework projects. Padma Railway Bridge, Akhaura-Sylhet present day rail association, raised Dhaka - Ishwardi rail, rapid Dhaka-Chittagong rail the organization and other little tasks have been coordinated into the rail route foundation speculation bundle. Simultaneously, the Chinese consortium is building 70 US$ million passages under the Karnaphuli River in the Chittagong port territory of Bangladesh. China Major Bridge Engineering Company Limited is building the Padma Bridge 2000 million US$.

Bangladesh is now going through quick advancement in the foundation area. In this unique situation, China's participation in foundation advancement is critical. Streets in the country, expressway extensions and courses give unique consideration to the significance of street transport for financial turn of events. In the event that Bangladesh can give foundation improvement, it can pull in more homegrown and unfamiliar speculators. China has just added to its advancement by partaking in different tasks in the correspondence area in Bangladesh. Since the 1980s, seven Chinese scaffolds have been worked with the assistance of China. Right now, eight additional scaffolds are being fabricated. To build up the vehicle area, China has taken numerous activities added to the One Repertoire, One Road project.

Table 03: Chinese Investment in the Transportation Sector in Bangladesh

Name of Project	Sector	Investment (in million US$)	Stage
Dhaka Mass Transit Development Project	Transport	2200	Planning
Dhaka Elevated Expressway	Transport	1250	Financial Close
Dhaka-Ashulia Elevated Expressway	Transport	1150	Planning
Shantinagar-Dhaka/Mawa Expressway	Transport	338	Planning
Mongla Port	Transport	53	Awarded

Source: Rob Koepp, 2016

What's more, on account of the financing of China, a few scaffolds are being fabricated, for example, the Rupsha Bridge in Khulna, the Pakshi Bridge in the Padma, and another extension on the Meghna River in Bhairab. Activities are additionally in progress to build up the Bazar Dhaka-Chittagong-Cox expressway, the Cox Bazar-Teknaf seaside street, the Sylhet-Jaflong parkway, and the Bhola-Barisal-Lakshmipur interstate. China is likewise communicating revenue in putting resources into other framework projects in Bangladesh. China has just finished a few significant development projects in Bangladesh. The Padma Bridge in Bangladesh is right now under development. Numerous Chinese organizations are associated with development, transport, power, energy, and media communications. The Asian foundation venture bank made on the activity of China has financed a few advancement projects, including the power dissemination framework in Bangladesh. On the off chance that this venture is done effectively, more than one crore Bangladeshi individuals will profit.[5] What's more, a few different activities are likewise financed by AIIB.

Table 04: AIIB Funded Project in Bangladesh

Name of Projects	Sectors	Amount
Sylhet to Tamabil Road Upgradation	Transport	US$ 268 million
Power System Upgrade and Expansion	Energy	US$ 120 million
Mymensingh Kewathali Bridge	Transport	US$ 152.6 million
Municipal Water Supply and Sanitation	Water	US$ 100 million

Source: Collected from various newspapers

China has become a significant player not just in the energy area. As per China Daily, China is likewise actualizing $ 10 billion in framework projects in Bangladesh.[6] This incorporates the Chinese monetary and modern zone, the eighth Chinese companionship connect in Bangladesh and the global presentation community.

There are comparative patterns in exchange. China is right now Bangladesh's biggest exchanging accomplice, said Osama Taseer, leader of the Dhaka Chamber of Commerce and Industries.[7] Bangladesh trades vegetables, frozen and live fish, calfskin and cowhide items, material filaments, paper yarn, just as textures, dress and apparel articles.[8]

In the spending years 2017-2018, two-sided exchange between nations added up to USD 12.4 billion, and by 2021. It is relied upon to add up to USD 18 billion.[9]

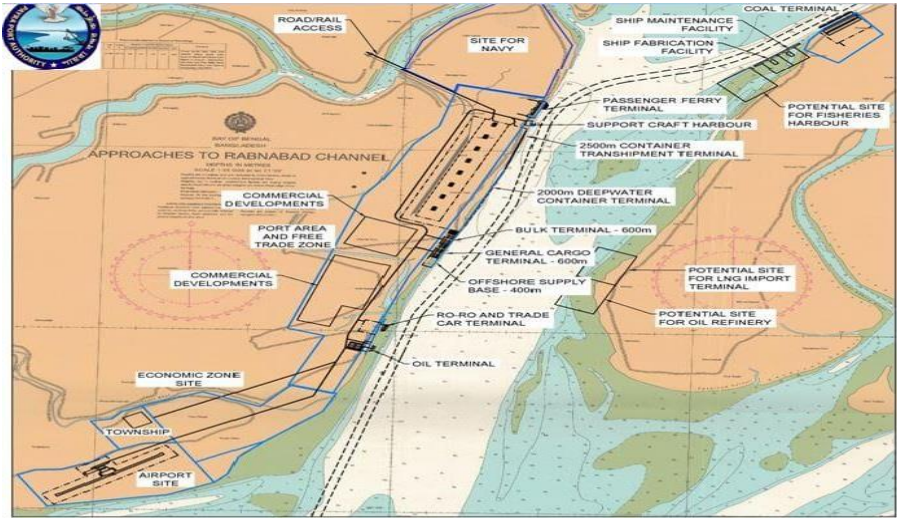

Figure 01: Layout for Payra seaport in Bangladesh

Source: Transport Ministry of Bangladesh

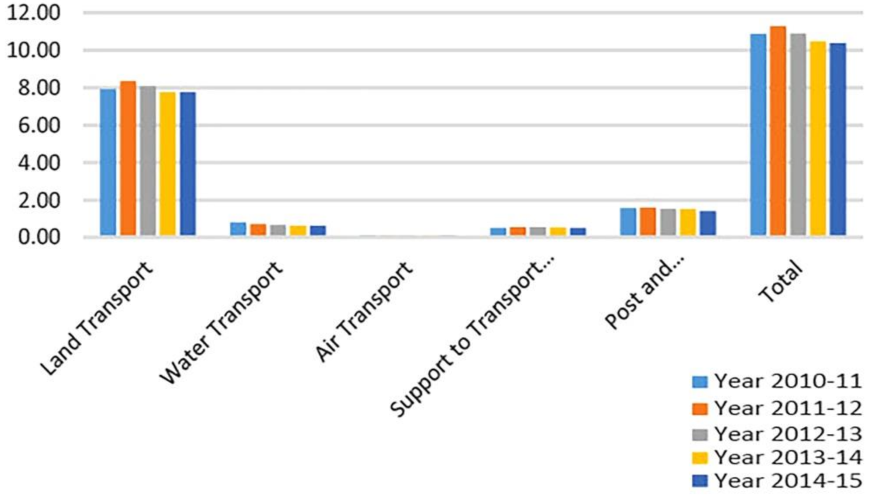

Figure 02: Infrastructure Sector as % of GDP in Bangladesh

Sources: BBS, 2014-15, http://ibtbd.net/from-bottomless-basket-to-basket-of-wonders/

5. Bangladesh-China Project-based Cooperation (BRI and Other Project)

As of now, China is the second-biggest financial force on the planet. It has a colossal money hold. It has made tremendous interests in the advancement of the framework of Sri Lanka, Myanmar, and Africa. It additionally plans to put USD 46 billion in the China-Pakistan monetary hallway. China is presently moving toward Bangladesh and is attempting to grow its exchange relations. The developing association of China with the nations of South Asia caused to notice Bangladesh. In 2016, he communicated the craving to fabricate enormous framework in Bangladesh and declared a speculation of USD 24 billion.[10] President Xi Jinping during a visit to Dhaka in 2016. He consented to 27 arrangements and a MoU, which is solid proof that the developing pattern of Bangladesh-China financial collaboration. While in the 2005-2006 monetary year absolute Bangladesh fares to China were worth USD 6.5 million, in the 2015 - 16 monetary year it was worth USD 81 million. In the most recent decade, all out fares to China expanded right around multiple times, and imports expanded by around multiple times. In 1977-2015, China put USD 37 million in different areas of Bangladesh. It gave help with the measure of USD 105 million as advances and awards from the autonomy time frame up to the 2014–15 financial year.[11] Volume The volume of two-sided exchange among China and Bangladesh has expanded from USD 450 million of every 2009 to USD 13 billion lately.[12] "It is accepted that new skylines have been found between these two nations and that it will get more extensive later on. Close and agreeable Bangladesh-China relations have now been elevated to vital relations. New territories of exchange and venture have been found, and specialists accept this will add another section in Bangladesh-China relations. In any case, it is additionally obvious that, despite the

fact that exchange among Bangladesh and China has still extended in different new territories, the import/export imbalance is developing and has expanded in excess of multiple times in 10 years. In the present circumstance, we trust that Bangladesh's fares have expanded multiple times over the previous decade, while Chinese fares have expanded multiple times.[13] But since the measure of Chinese fare items is colossal than Bangladesh's fares to China, it is very hard for Bangladesh to manage the circumstance. Nonetheless, regardless of the exchange unevenness, a developing pattern is noticeable in the regions of exchange, speculation, monetary ties, ventures and associations, which might be an extraordinary chance for Bangladesh to look after steady, steady and valuable financial turn of events.

Chinese plan helps are vital for Bangladesh since they are pivotal to the advancement cycle. A progression of Chinese plan helps rule the Bangladesh-China Friendship Bridge (BCFB) on different streams of Bangladesh. Until 2002, China was engaged with six BCFBs (table). In 1994, China consented to an arrangement with Bangladesh to create and separate coal from the Barakpuria mine. China to giving help to the foundation of a few DAP plants in Bangladesh.

Table 05: The Chinese Aids and Grants to Bangladesh 1996-2002.

Serial no.	Amount	Date of Agreement	Comment
1	Taka 344.40 million	August 1996	Project aid
2	30 million Yuan	September 1996	Grant
3	2 million Yuan	October 1997	Commodity grant
4	US$ 3.02 million	January 2002	Grant*
5	US$ 7.25 million	December 2002	Project grant

*Initially it was a Chinese loan for the construction of Bangabandhu International Convention Centre at Dhaka.

Source: Data collected from various issues of POT Bangladesh (New Delhi).

Serial no.	Name of Project	Date of Agreement
1	Development of Barakpuria coal mine and extraction of coal from it.	February 1994
2	Bangladesh-China Friendship Bridge on the Karotoa.	August 1996
3	Establishment of Di-Ammonium Phosphate Plant at Chittagong	May 1997
4	Bangladesh-China joint venture project on the Rashidpur-Ashuganj gas pipeline.	July 2000
5	The building of Bangabandhu International Convention Centre at Dhaka	End of 2000
6	Bangladesh-China Friendship Bridge on river Dhaleswari	December 2002
7	Bangladesh-China Conference Centre	Formally Inaugurated on 12 January 2002

Source: Data collected from various issues of POT Bangladesh (New Delhi).

According to the perspective of China-Bangladesh's progressing monetary participation, China has given Bangladesh a decent chance to reinforce collaboration in tasks and associations. Bangladesh from the earliest starting point affirmed its most noteworthy status to draw in with Chinese organizations in different ventures and furthermore relied on association. In 2014, Bangladesh looked to help China in five significant ventures. The five proposed projects incorporated the public ICT foundation for the Bangladeshi government (stage III), the development of Rajshahi was a surface water treatment plant, the development of a subsequent railroad connect over Karnaphuli at Kalurghat, the development of another twofold measure railroad from Ćittagong to Bazar Cox through Ramu and Ramu to Gumdhum close to the Bangladesh-Myanmar line and foundation of the Eastern Refinery Unit-2 and the Single Point securing project.[14] In 2015, China financed five tasks worth USD 820 million and seven different pipelines. Various undertakings were additionally covered by Chinese sponsorships. They resemble the advancement of the display project, the second cluster of crisis hardware and clinical gear, flood the executives project, Bangladesh-China eighth, ninth, and tenth proposed kinship connect, Hybrid Rice Institute, agrarian gear and so forth 2016 is a critical year in both Bangladesh,[15] just as China on the grounds that during the visit of President Xi Jinping, Bangladesh and China consented to various arrangements, a reminder of comprehension under which China consented to fund 21 activities.[16] Bangladeshi Prime Minister Sheik Hasina said: "China is our biggest colleague and we think about China as a confided in accomplice in accomplishing our fantasies. China is a significant part in the financing and specialized help of a considerable lot of our enormous tasks. "[17]

Table 06: Major Projects with Chinese Assistance in Bangladesh

Area	Name of Project	Amount
Industrial Park	China Special Economic Zone in Anwara. Garments Industrial Park	US$ 280 million
Railway	Padma Bridge rail link Double line (Joydevpur-Ishwardi) Double track ((Joydevpyur-Mymensingh) Conversion of the dual-gauge rail line (Akhaura-Sylhet) New ICD near Dhirasram Railway Station	US$ 3.3 bill US$867 million US$ 258 million US$ 1.76 million US$ 200 million
Roads	Marine Drive Expressway (Sitakunda-Cox's Bazar) Dhaka-Sylhet four-lane Highway Dhaka-Ashulia Elevated Expressway Karnapuli tunnel	US$ 2.86 billion US$ 1.6 billion US$ 1.39 billion US$ 703 million
Power and Energy	Installation of single point mooring with double pipeline Expansion and strengthening of power system network under DPDC	US$ 550 million US$ 2.04 billion US$ 1.32 billion

	Power grid network strengthening project under PGCB Five million electrometers 350 MW Gazaria Coal-fired Thermal Power Plant Replacement of old transformers Prepayment metering Project	US$ 165 million US$ 433 million US$ 230 million US$ 521 million
Livelihood projects	Rajshahi Wasa Surface Water Treatment Plant Five full-fledged TV stations BMRE in public sector jute mills Water supply and sanitation in small municipalities Modernization of Mongla port facilities	US$ 500 million US$ 128 million US$ 280 million US$ 150 million US$ 249 million
Information Technology	Info-Sarkar-III Modernization of telecommunication network Establishing digital connectivity Modernization of rural and urban lives through ICT	US$ 150 million US$ 200 million US$ 1 billion

Source: The Daily Star, 14 October 2016.

What's more, in 2016 Bangladesh and China together introduced six undertakings, to be specific the Karnafuli multi-path burrow in Chittagong, Confucius Institute of Dhaka University, Tire National Data Center Kaliakoir of Gazipur, a 1320 MW nuclear energy station at Patia in Patuakhali, a nuclear energy station 1320 MW in Banshkhali in Chittagong, Shahjalal Fertilizer Company in Fenchuganj of Sylhet in 2016.[18] Bangladesh and China (July 4, 2019) Signed nine instruments in various areas going from help for the Rohingyas and financial and specialized participation, venture, force, culture, and the travel industry.[19]

1) China will give 2,500 metric huge loads of rice to the coercively dislodged Rohingyas from Myanmar.
2) Framework understanding "Development and fortifying of the force framework network in the DPDC zone"
3) Framework concurrence on the venture "Fortifying the power network under the PGCB project"
4) Agreement on financial and specialized participation between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the People's Republic of China.
5) Government concession advance arrangement with respect to "augmentation and reinforcing of the force framework network under the venture of the DPDC zone"

6) The particular credit arrangement for the purchaser "Extension and fortifying of the force framework network under the task of the DPDC zone"
7) Memorandum of Understanding (MoU) on the working gathering on building up venture collaboration
8) MoU and its usage plan for the trading of hydrological data on the Yalu Zhangbo/Brahmaputra River
9) MoU on the social trade and the travel industry program

It is normal that after the fulfillment of these undertakings will acquire a sensational change the economy since this is an incredible open door for Bangladesh to trade innovation and abilities, just as work.

6. Joint Venture Projects

As of now, China believes Bangladesh to be a significant accomplice in South Asia and needs to end great relations with Bangladesh. The quantity of participation projects has been developing since China has communicated status to put resources into joint endeavor projects with Bangladesh. Until now, China has marked many joint endeavor projects, of which coming up next were huge. In 2014, northwest Power Generation Company LTD a Bangladesh state organization, and the Chinese organization CMC together began development of the 1320 MG power plant in Patuakhali. China and Bangladesh together began development of a 1.2 km four-path viaduct on the Dhaka-Sylhet roadway. The agreement was endorsed between China Railway 24th Bureau Group Co. Ltd and the nearby Spectra En. Ltd.[20] The calfskin products industry in Mongla Export Processing Zone was made by the Bangladesh-China M/S joint endeavor. A rich endeavor whose Chinese side possesses 75 percent of the organization and Bangladesh the rest. The undertaking was worth USD 21.5 million, and its yearly creation limit is 5 million square feet of completed cowhide, 2,000 bits of sacks and 100,000 bits of shoes. Chinese organizations have set out work open doors for 3162 Bangladesh inhabitants. In 2016, numerous participation projects were endorsed among Bangladesh and China. At the marking service of these joint endeavor projects, Chinese President Xi Jinping said: "China-Bangladesh relations are currently at another authentic beginning stage and are going towards a promising future." Chinese organizations have consented to 13 joint endeavor arrangements with Bangladesh to fortify exchange relations worth USD 13.6 billion. The table beneath shows the 2016 joint endeavor projects.

Bangladesh and China additionally marked a few joint endeavor projects in 2017, including the development of 100 km of railroad lines and the essential framework in the Southeast Bazar area of Cox, lining Myanmar. It is required to be finished in three years. Another understanding was endorsed between the BRAC University and the Chinese Beijing Urban Construction Group (BUCG) and Bangladesh Associated Builders Corporation LTD (ABC) business collusion for steel and solid designs worth USD 87 million. Bangladesh and China have additionally together contributed BDT. 9.50 billion in the Southeastern Union of Ceramic Industries Limited

(SEUCIL) for the creation of hued and great tiles. As of now, the organization utilizes 1050 specialized staff and workers prepared by 50 Chinese to deliver 2.69 square meters of tiles a day. After the finish of the subsequent stage, this organization is required to have the option to deliver 4, 30,000 square feet for every day, just as set out new work open doors. The developing inclination of joint endeavor projects demonstrated that the Bangladesh-China relationship isn't simply restricted to help, sponsorships, and advances. It arrived at a more elevated level and Bangladesh turned into China's confided in exchanging accomplice.

7. Conclusion

The ascent of China is plainly apparent in the global political economy. It is turning into a financial goliath immense potential to outperform even the US economy. It has as of now outperformed the Japanese predominance, moving the overall influence in the locale. Its monetary commitment with Africa is causing a lot of bothering for specific nations in the West. China is turning into the biggest single energy devouring nation and a lot of its energy comes from the Muslim world. Not just gas and oil that are streaming to China from Muslim nations yet petrodollars from the oil-rich Muslim nations are additionally discovering China an alluring objective for venture. Most importantly, China is getting trust of the Muslim nations for being non-interventionist in their homegrown undertakings. Unmistakably, the Muslim world may progressively discover China as an elective superpower supporter to counter the impact of the West. On the off chance that the current pattern proceeds, the prescience of Huntington on Islamic-Confucian coalition working during the time spent Clash of Civilizations may not sound too whimsical later on.

The pace of Chinese investment in Bangladesh sidelines the country's previous major strategic and development partners. India was once its largest country, but it has only invested a tenth - just $ 65 million - of what China has invested in the same period. The two South Asian neighbors have enjoyed a strong historical relationship since India supported Bangladesh in its struggle for independence from Pakistan in 1971. But in recent years, ties have gradually loosened as Bangladesh s 'is closer to China.

As a result, in fiscal year 2017-2018, foreign direct investment from China reached USD 506 million, or about one-fifth of total foreign capital flows. There are now around 400 Chinese companies doing business in Bangladesh, including around 200 large companies and 200 other small and medium enterprises. Bangladesh's closer economic ties with China have disappointed India. Last year, the Dhaka Stock Exchange chose to sell a 25% stake to a Chinese consortium of the Shenzhen and Shanghai stock exchanges, rather than the Indian National Stock Exchange, which offered 56% less. It is not only in the energy sector that China has emerged as a major player. China is also implementing infrastructure projects worth $ 10 billion in Bangladesh, according to the China Daily. This includes the China Economic and Industrial Zone, the 8th China-Bangladesh Friendship Bridge, and the International Exhibition Center. There are similar trends in trading. China is now Bangladesh’s

largest trading partner, said Osama Taseer, chairman of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Bangladesh exports vegetables, frozen and live fish, leather and leather goods, textile fibers, paper yarns as well as fabrics, clothing and clothing. In fiscal year 2017-18, bilateral trade between countries amounted to USD 12.4 billion and is expected to reach USD 18 billion by 2021.

1. Khondaker Golam Moazzem, Bangladesh-China Economic Relations: Way Forward, Daily Sun, 15 Oct. 2016.
2. Abu Sufian Shamrat, China’s Strategic Partnership with Bangladesh in 21st Century, South Asia Journal. http://southasiajournal.net/chinas-strategic-partnership-with-bangladesh-in-21st-century/
3. Xinhua, Saturday, September 28, 2019.
4. Ibid.
5. Prothom Alo, 14 October 2016.
6. China Daily, 22 March 2018.
7. http://www.dhakachamber.com/
8. Thethirdpole.net, May 13, 2019.
9. Ibid.
10. Bonik Barta (Dhaka: A Bengali Online Daily), 15 October 2016.
11. Prothom Alo, 14 October 2016.
12. Chang Sian E, Samparka Gabhira Theke Gabhiratara (Bengali), (Relationship deep to deeper), Jugantor (Dhaka: A Bengali Daily), 15 October 2016.
13. Prothom Alo, 15 October 2016
14. The Daily Star, 10 June 2014.
15. M. Jashim Uddin, Prospects and challenges for Bangladesh-China Comprehensive Economic Partnership: A Bangladesh Perspective, Journal of International Affairs, Vol. 19, Nos. 1&2, (2015), p. 49.
16. Jagaran Chakma, Chinese President Xi Jinping’s Dhaka Visit: $40b Deal on Cards, The Independent (Dhaka: An English Daily), 7 October 2016
17. Kaler Kantho, 14 October 2016.
18. Natun Itihashe Bangladesh-China (Bengali), (Bangladesh-China in the New History), Bangladesh Pratidin (Dhaka: A Bengali Daily), 15 October 2016.
19. The Daily Star July 4, 2019.
20. China-Led Joint Venture to Construct 1.2 km 4-Lane Flyover in Bangladesh, Pakistan Defence, 27 October 2015.

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 16.11.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

Smartphone usage and its impact on interpersonal relationships of the school going adolescents of Dhaka city

Sabina Sharmin*
Bushra Islam**

Abstract

The prevalence of uncontrolled usage of smartphone with internet connection by the school going adolescents has become a serious concern for Bangladesh. The overuse of smartphone may have negative impact on the interpersonal relationships of adolescents. Keep this issue in mind, the purpose of this article is to assess the usage pattern of smartphone among the school going adolescents and its impact on their interpersonal relationships. In this regard both quantitative and qualitative research approaches have been adopted. The sample size of the quantitative part is comprised of 120 school going adolescents of class six to ten from three selected schools in Dhaka city. In addition, in-depth interviews with six adolescents for case studies and three (Guardian, psychologist and Teacher) for KIIs have been conducted for collecting qualitative data. Adolescents use smartphone and spend most of their time on virtual world and have little direct communication with their parents. They become irritate if their parents try to deter them from over use of smartphone. This article suggests that it is necessary to educate adolescents as well as parents about the consequences of excessive use of smartphone.

Keyword: Smartphone, adolescent, interpersonal relationship

1. Introduction

Smartphone, the multifunctioning, handy and highly accessible device has become the most desired instrument for the people of all ages around the world. We cannot imagine our modern life without a smartphone with internet connection even a single day. Especially for the teenagers, who are more challenger to new technology, this device become an integrated part of their daily life. The development of smartphone has created a new form of communication style that changed many parts of daily living practice (Soni et al., 2017) and at the same time excessive use may lead to addictive behaviors (Lee & Lee, 2017). The most advantage of smartphone is that it has wireless access to virtual world and anyone stay connected with that world. Moreover, smartphones are not only the sources of uninterrupted communication, but also have features like, camera, games, numerous apps that inspired the youngster to be a proud owner of this ubiquitous device. This ease and user-friendliness nature of smartphone offer an unquestionable inspiration for constant and escalating usage, and this tendency shows no sign of slowing down. This is

* Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh
** Lecturer, Department of Applied Sociology, ASA University, Bangladesh

particularly, prevalent among the adolescents and they are the highest consumers of this digital device. Through using the internet, they continue to be connected with friends, do gaming, social networking activity, and click outside world. Though the benefits of smartphone are munificent and ostensible, the overuse of smartphone may have negative impact on the adolescents that may hamper their overall development and may have a chance of being addicted to smartphone.

The emergence and uncontrolled access of smartphone with internet connection has significantly influenced the lifestyles of teenagers as they are the most vulnerable users and the most interested group in enjoying smartphones. They spend most of the time and dedicate much of their thinking (Aljomaa et al., 2016) to this device. These cause severe social and familial problems as well. By the excessive and intensive use of smartphones, school-going teenagers face severe physical, emotional, familial and social complications in their familial life than adults (Bian & Leung, 2014; Lee & Lee, 2017). Most of the parents are worried about their children's overall wellbeing for the encompassing use of this instrument as it has a dark side (Lee et al., 2014) also. Not only the aggrieved parents, the inescapable nature of smartphone makes the academician to be concern about the over use and its diverse effects on adolescents' societal life. Thus, the seeming ubiquity of smartphone and its addiction eventually leads a growing body of literatures in this domain over recent years with different results. Lin et al., (2015) consider the increasing popularity, overuse and addictions of smartphones, as significantly global and social problem. Devitt & Roker, (2009) findings suggested that some young people either withdrawing into their own social worlds, or having a false feeling of security as a result of having a mobile. However, their findings showed that young people and parents see mobiles as a key way for families to keep in touch, and to monitor and ensure young people's safety(Devitt & Roker, 2009). By down siding this, Doh et al., (2016) argued that, nowadays, parents become worried about their children's smartphone overuse. Similarly, Casey, (2012) opined that smartphone addiction symptoms create adverse effects on interaction with family and friends. The study of Miralles et al., (2016) found that the problematic use of these ICT devices has been related to the consumption of drugs, poor academic performance and poor family relationships. Divan et al., (2012) suggested that children who used cell phone displayed more behavioral problems such as anxiety, temperament, mental distraction and idleness and these characteristics worsened if children began to use it at an early age. Literature support that the prevalence of problematic use of smartphone is a worldwide concern. In Turkey the prevalence rate of addictive use of smartphone was documented 39% (Aljomaa et al., 2016). In Saudi Arabia it was documented 48% (Dermirci et al., 2015). In Korea it was near about 40% (Cha & Seo, 2018). In Tamil Nadu, India the prevalence rate was 27.6% (Renuka et al., 2019). In Chennai, India, phone usage interrupted day-to-day activities including parent-children relationship (Krithika & Vasantha, 2013).

More than one-fifth of the total population of Bangladesh is adolescents between the ages of 10 and 19 years and this number is approximately 36 million (BBS, 2015).

These adolescents make up 23 percent of the population (BBS & UNICEF, 2016). Huq et al. (2021) through their 'REPORT FOR GAGE RREF' called this segment of population is the one of the first generations to have grown up with the revolutionary technology of smartphone with internet connection. According to a report of Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, in 2021 the total number of internet users were 101.18 million; in 2020 the it was 99 million; 76.22 million people used the internet and smartphone in 2018 (BTRC, 2020). Internet users in Bangladesh were 11.4 million in the year 2017 according to same report (BTRC, 2021). Indeed, mobile phone users are increasing rapidly in our country. More specially, school going adolescent are the prime users and at the same time they are the high-risk groups of smartphone addiction. Though it is very difficult to find the exact figure of prevalence of smartphone among adolescents in a study Power et al., (2020) reported that 90% of the adolescents in Bangladesh use smartphones. It indicated that smartphones touch a substantial portion of school-going adolescents in Bangladesh. Although the usages of smartphone make an opportunity to intensify some forms of interpersonal relationship, while in some cases it stands against interpersonal and face-to- face communication with family members, friends and dears one. Not only that, accessibility of smartphone with internet connection appear to be the most vulnerable to internet addiction (Bleakley et al., 2016). The study of Lee, (2009) suggested that excessive and uncontrolled smartphone use put an impact on interpersonal relationships which becomes matter of the parental concern.

Problematic use of smartphone has become a serious concern both familial and professional domains in our country also. In Bangladesh, various studies have claimed that internet use by the adolescents is increasing very rapidly and it turn into a matter of serious concern and some of them termed it as addictive use (Islam & Hossain, 2016; Afrin et al.,2017; Mamun & Griffiths, 2019; Mahmud et al., 2020). In their study, Rashid et al., (2021) reported that 67.11% of the secondary school students use mobile phones on a daily basis whereas Mamun et al.,(2019) reported that prevalence of problematic internet use was near about 33% among their sample respondents. Smartphone with internet connection enable the school going adolescents a constant connectivity with individual of viral world whereas it reduces the interpersonal communication, relation and bonding between their parents. Overuse of smartphone by the school going adolescents directly impacts on the interpersonal relationship with the parents, siblings and relatives which in terns hampers their proper development and wellbeing. Most notably, smartphone with internet connection are fueling school going adolescents to be connected more virtual activities and ownership of smartphone become nearly a pervasive element of their life.

Though various studies(Mamun et al., 2019; Mamun & Griffiths, 2019; Hassan et al., 2020; Chowdhury et al., 2018; Islam & Hossain, 2016; Karim & Nigar, 2014, Mondal et al., 2020) have been carried out to identify the addictive nature of internet use and its impact on physical or mental health, very limited studies have been conducted to reveal the effect of smartphone on interpersonal relationships in

Bangladesh. Actually, this is a least researched area in Bangladesh. By address this gap, the article adds to the body of knowledge regarding smartphone use and its implication on interpersonal relationship. With this issue in mind, the objectives of this article are to find out the usage pattern of smartphone by the school going adolescents and to assess the impact of smartphone usage on interpersonal relationship of school going adolescents with family members

2. Methodology

Both qualitative and quantitative data collection and presentation techniques are used for the current study. 120 school going adolescents (66 boys and 54 girls) from three renowned schools of Dhaka city are selected purposively and interviewed by using a semi-structured questionnaire. The inclusion criteria for the students were: I. Studying at 6-10 grade, II. Age range from 11 to 18 years; III. Being a smartphone user and IV. Living with parents. To supplement the quantitative data, six adolescents have been purposively selected for in-depth interview and three KIIs, (one teacher, one psychologist and one guardian) have been conducted for collecting qualitative data. Quantitative data are analyzed by using descriptive statistics and qualitative data are analyzed thematically.

3. Findings and Analysis

3.1 Socio-demographic Status of the Respondents

The respondents of the study come from the adolescents who are still attending schools in 2020 in Dhaka, Bangladesh. We survey 120 adolescents (66 males a 54 females). Table-1 demonstrates the demographic information of the adolescents. It is found that highest proportion of respondents (51.7 %) belong to the age group of (15-16) years. Regarding gender, 55% of them are males. Most of the respondents (33.3%) are in 10th grade. Analysis of the question related to monthly family income reveals that most of the respondents (33%) come from higher income level families (Monthly income 80000 and above). This is because our study has been carried out in the prominent school of Dhaka city where higher income level background students are studied. Adolescents' parenteral level of education are moderate as most of them completed higher secondary level education and most of them live in nuclear family (57.5%) with siblings (71.7%). This background characteristic is almost similar with the findings of Mondal et al., (2020) and Rashid et al., (2021).

Table 1: Socio-demographic Profile of the Adolescents (n=120)

Variables	Categories	Percentage
Age in years	10-12	10.8
	13-15	25
	16-16	51.7
	17-18	12.5
Sex	Male	55.0
	Female	45.0

Academic Level of the Adolescent	6^{th} Grade	9.2
	7th Grade	10.8
	8th Grade	16.7
	9th Grade	30.0
	10th Grade	33.3
Fathers' Level of Education	Primary	16.7
	Secondary	25.8
	Higher Secondary	25.8
	Graduate and above	31.7
Mothers' Level of Education	Primary	21.7
	Secondary	27.5
	Higher Secondary	30.0
	Graduate and above	20.8
Monthly Family Income	TK.50000-60000	19.2
	TK.60000-70000	22.5
	TK.70000-80000	25
	TK. 80000 and above	33.3
Types of Family	Nuclear	57.5
	Joint Family	42.5
Have Siblings	Yes	71.7
	No	28.3

Source: Field Survey, 2020

3.2 Ownership and Smartphone Usage Pattern

3.2.1 Ownership Patternof Smartphones

More than 73% school going adolescents own and use personal smartphone (Chart-1) which is almost similar to the findings of Rashid et al., (2021). Various studies suggest that parents give mobile phone to their children as they want to be connected when they either of them are outside home (Ling, 2004; Srivastava, 2005). This device provides a sense of security and control over their children as they can call them and able to know their whereabouts. Adolescents not only own mobile phone, all of them have internet connection in their device. Atique (15), one of the respondents narrated following way:

"Actually, my parents were adamant not to provide a smartphone. But they gave me a button phone to be connected with them.Nonetheless, without my parental knowledge, I asked my mama (maternal uncle), who live in Canadato present a smartphone and eventually I became an owner of my smartphone."

Chart: 1 **Ownership of Smartphone Used by the Adolescents (%)**

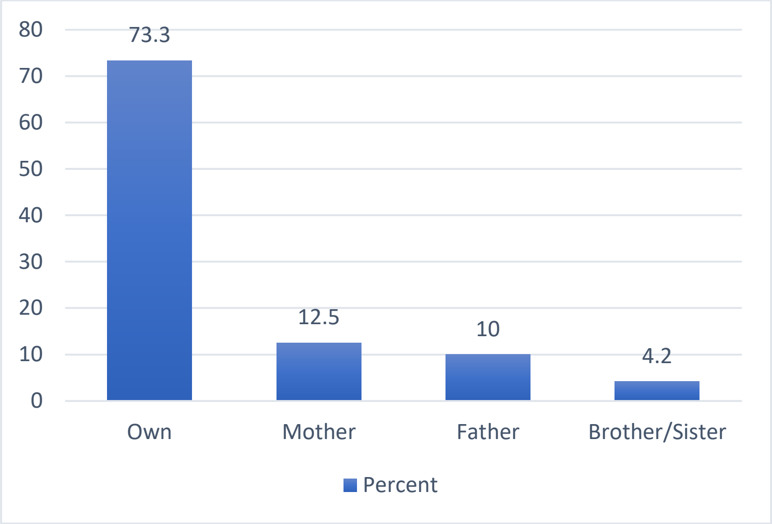

Source: Field Survey, 2020

Zaman (48), one of the KIIs and a psychologist by profession told:

"At initial stage, parents allow mobile phone to communicate and monitor their children's whereabouts while they are outside home. Moreover, after school or coaching hour parents can contact to their children to pick them up. Due to traffic jam in Dhaka city parents sometimes could not reach to them timely. In this regard they have no other option than to provide cell-phone. It reduces their anxiety and gives some sense of security."

3.2.2 Smartphone Usage Pattern by the Adolescents

Adolescents use smartphone needlessly to kill time and spend hours making virtual friends and to be connected to the virtual world. Highest 43.3% of the adolescents use smartphone more than five hours in a day. This is followed by 40 %of the adolescents use 3-5 hours and only 16.7% less than three hours(Table-2). Data in the table-2 also show that the purpose of smartphone use are: making virtual friends (60%), uploading picture and checking comments (56.7%), watching movies (52.5%), gaming (49.2%), sending text messages (46.7%). Besides these, they use smartphone to be connected with their parents also while either of them is outside home. You Tube (95.8%), Messenger (62.5%), Facebook (62.5%), Gaming (64.2%), Imo (52.5%), etc. are their favorable apps for which they spend most of their valuable time (Table-2). The prevalence of smartphone, its usage pattern and the platform of the usages are conforming with the global trend. In an earlier study Torrecillas, (2007) documented that 40% of adolescents and adults use smartphones for more than 4 hours per day to make calls and send messages. Chandrima et al., (2020) found that the frequent users of internet involved themselves in chatrooms,

played online videogames, engage in online shopping and viewed pornography and sexual content.

Table 2: Percentage Distribution of the Adolescence by the pattern of Smartphone Usages (n=120)

Pattern of Smartphone Usage	Categories	Percentage
Duration of Smartphone Time Consume	Less than 3 hour /day	16.7
	3-5 hours/day	40.0
	More than 5 hours/day	43.3
	Mean 5.65 S.D. 8.78	
Purpose of Smartphone Time Consumption*	To be connected with parents by calling	62.5
	Sending text massages	46.7
	Uploading picture and checking comments	56.7
	For making virtual friends	60.0
	Watching movies	52.5
	Gaming	49.2
	Study	50.0
Platforms that Consumes most of the Adolescents' Time*	YouTube	95.8
	Gaming apps	64.2
	Facebook	62.5
	Imo	52.5
	Candy Cam	30.8
	Messenger	62.5
	TikTok	39.2
	Share It	42.5
	Instagram	54.2
	Twitter	28.3
	WhatsApp	45.8

(*n=120, * Multiple Response)

Source: Field Survey, 2020.

Hossain (52) one of the KIIs and a school teacher by profession opined:

> *"Adolescents, particularly school going have little control over the smartphone usage period. They spend more time on smartphone than other activities. However, in Dhaka city there has little opportunities to enjoy physical activities as this city sternly lacks play grounds."*

Sadman Shahriar Rifat, (16) a user of TikTok shared his experience in the following way:

> *"I downloaded Tiktok for passing my leisure time and curiosity in November 2019 and very quickly became addicted to it. And honestly speaking this addiction grasp everything from my life. i.e. from study to family relations to friendships and even myself. (a TikTokstar) ".*

Another adolescent Taz (14) told:

> *'There is a sheer thrill in performing better than my friends while online gaming. In the time of gaming I do little care about my mother or brother"*

3.3 Smartphone Usage and Its Impact on Interpersonal Relationship

The easy accessibility, portability, easiness of operation, connection, user interface, design, music and video player, navigation etc. are the real motivation behind the use of smartphone (Oulasvitra et al., (2012). The excessive use of smartphone has some implications for interpersonal communications of school going adolescents. This paper reveals the pattern of smartphone usages as problematic. Due to over use of smartphone by the adolescents, a discomfort relationship is grown between parents and children. Data in Table-3 show that adolescents do not pay attention to their parents while they are using smartphone (41.7%), they use smartphone at the time of taking meals (37.5%), spend more time on smartphone than family members (42.5%). And for all the problematic usage of smartphone, most of the adolescents are scolded frequently by their parents. Eventually, leads and finally shapes the week interpersonal communication as well as relation between the two. The following table depicts the nature of parent- adolescent relationship while using smartphone:

Table-3 Nature of Smartphone Usages and Interpersonal Relation

Nature of problematic use of SP	Percentage
Do not give much attention to parents and other family members while using smartphone*	41.7
Use Smartphone while having meals with parents*	37.5
Use smartphone while conversant with family members*	42.5
Scolded by parents for heavy using of smartphone*	55.8
Spent more time on smartphone than family members while at home*	50.0
Total	100

(*n=120* Multiple Responses)

Source: Field Survey, 2020.

Our study findings are consistent with the findings of Doh &Lee, (2016) where they opined that children spend most of their time using their smartphones, usually in the

family environment at home. This situation reduces children's communication with family and guidance from family during the developmental period of gaining self-control as ability. In a similar manner, Ranjan et al., (2020) found the device affecting the relationship and bonding between the students and their family members, as they are more connected with the virtual world through their mobile rather than the real world.

In this study we analyze how the adolescents orate their relationships with their parents, siblings, and other real-life friends. Data in Table-4 show that adolescents are being detached from their parents (24.2%), siblings (38.3%), relatives (10.8%) and real-life friends (40.8%) as they spend the most of the time with their virtual friends or doing multi-player games.

Table-4 Percentage Distribution of the Adolescents by the Individuals from Whom they are Detached for Over Use of Smartphone

Categories	Percentage
Parents	24.2
Sibling	38.3
Relatives and Neighbors	10.8
Real life friends	40.8
Total	100

(*n=120*Multiple Responses)

Source: Field Survey, 2020.

The utterances of respondents demonstrate the fact more vividly Sagor Hossain (19), son of a single mother told

> *"I use a smartphone for around 6 to 7 hours per day; it's like my best friend and living without a smartphone is same to me as living without oxygen. My mother did scold me a lot. But I cannot live but the device."*

Another adolescent narrated his connection with smartphone in the following way:

> *"It is truly impossible for me to remain out of the smartphone for a second. In fact, this device rooted in our brains and our daily life whether my parents realize it or not. Through multi-player games, I able to connect global friends from all over the world. I enjoyed a lot from there."*

In fact, the over use of smartphone reduces conversation among family members. Our finding is consistent with the findings of Vaidya et. al., (2016), where they claimed that increasing mobile phone use among youth had reduced face-to-face communication. Not only that they often talked in person while sending messages on their phone to others at the same time. This is so, because they have access to the internet on their smartphone and have enormous chances to interact more with the people outside their immediate environment. The availability of internet has

decreased their desire for face-to-face communication with their family, relatives, and friends.

Analysis of the responses to the statements related to the feelings of the adolescents' smartphone usage and its impact on interpersonal relationship measured on a Likert Scale reveals that most of the adolescents agree that they enjoy smartphone than family members(42.5%), they become irritated while their parents suggested not to over use of smartphone(43.3%), their relation with siblings are gradually deteriorating due to dependent on smartphone (35%), they have to face negative comments from neighbors and relatives(20.8%), they like to communicate with virtual friends more than real friends(Table-5). Hence, they feel proud of having more comments or responses on their posts. All of these data indicate problematic use of smartphone and the resultant is the poor parent-adolescent relationships.

Table -5: Percentage Distribution of the Adolescents by the Opinion of the Feelings of Using Smartphone and Family Relationship

Questions	Strongly Agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly Disagree	Total *n=120
Enjoy spending more time on the smartphone than they do engaging in family.	6.7%	42.5%	12.%	19.2%	19.2%	100%
Feel angry when parents give suggestions about smartphone.	43.3%	33.3%	5.8%	17.5%	0%	100%
Using Smartphone is deteriorating relations with siblings.	0%	35%	9.2%	19.2%	36.7%	100%
As a result of using the smartphone I have been subjected to adverse comments from relatives and neighbors.	20.8%	9.2%	13.3%	20.8%	35.8%	100%
Using smartphone is more enjoyable	0	62%	27.5%	5.0%	5.0%	100%

than spending time with family and real-life friend.						
I feel proud when I get more response on my posts.	51.7%	22%	23.3%	2.5%	0	100%

Source: Field Survey, 2020.

One of the guardians expressed his concern in the following way

> *'The excessive and uncontrolled use of social media by my son creates a conflict between us. At present the smartphone is his all-time acquaintance. He does little care about his result, family or anything else. We are worried about his future."*

In relation to a question of the probable suggestion to control the problematic use of smartphone Zaman (48) opined:

> *"Parental digital literacy is a vital issue that should be ensured. In this regard a country wide awareness program should be incorporated in policy level. Continuous communication between parent and adolescent can overcome the stressful and unpleasant relation between them. Parents should monitor and supervise the usage of smartphone by their children by a positive and conveyancing way."*

Meanwhile, 35% of the adolescents feel that using smartphone deteriorated their relationship with siblings and parents. They also realize that they have to face adverse comments for overusing the device. However, they feel that smartphone provides them an outlet to spend enjoyable time, as Mamun (15), one of the respondents express:

> *"Smartphone has provided an outlet to express my opinion, feelings and emotion in my own way. Not only that, for this device I am being able to connect with people who share similar interest."*

4. Discussion

The availability, popularity, user-friendly and uninterrupted nature of smartphone has grown rapidly over the years especially in last three decades. Appropriate use of smartphone offers immense supports and services to the schooling going adolescents. They can use smartphone in positive purposes like, to be connected with parents, searching reading material, to be familiar with modern technology and knowledge sharing. But inappropriate use of smartphone may bring deleterious effects on their proper development. They are more vulnerable to be addicted to smartphone as they could not understand the negative effect of over use of smartphone and control themselves from the excessive usages of it. Even they

consider that possessing and using smartphone with internet connection is the part of their life. They cannot imagine their life even a single day without a smartphone. Moreover, the youth consider smartphone as a replication of their distinctiveness and stylishness.

In this article we have analyzed the usage pattern and to what extent does smartphone usage impact on adolescents' interpersonal relations. As mentioned before, we surveyed the adolescents who use smartphone and our findings revealed that 73.3% of the respondents owned smartphone while 16.7% use smartphone either their mothers or elder siblings (Chart-1). All of the adolescents who use smartphones have internet connection with or without their parental knowledge. This finding is in line with a study of Mondal et al., (2020) where the authors found that 81% students use smartphone with internet in Bangladesh. The use pattern of smartphone among the school going adolescents found to be risky as they use smartphone needlessly to kill time and spend hours on this device. In line with the findings of previous studies on application preference, (Huq et al., 2021; Al-Jubayer, 2013; Vaidya et al.,2016; Chandrima et al., 2020; Sayeed et al., 2021),we found that You Tube is the most popular and used app among the adolescents as it provides multiple opportunity from entertainment to skill development. Besides Gaming, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, TikTok are the mention worthy applications for which adolescents spend more of their valuable time.

The primary objective of possessing and using smartphone is to communicate with their parents but smartphones enable multiple functions within a second as well. We have found that adolescents use smartphones for exchanging text messages, entertainment(music/video), playing game, making and receiving calls, searching reading materials, making virtual friends and being connected with them, uploading various content etc. which are similar to other findings both national and globe (Bian& Leung, 2014; Jeong et al., 2016; Al-Jubayer, 2013; Ali, & Hossain, 2019; Chandrima et al.,2020; Afri et al., 2017; Hasan et al., 2020).

We investigated the smartphone use behavior and have found that adolescents spend an alarming time on smartphone (Table-2). In terms of spending hours on smartphone, Taiwan Communication Survey, (2021) reported that young adults spent more than 5 hours on mobile-phone in Taiwan. People worldwide spend an average of 3.25 hours on their phones every day whereas young adolescents (10-19 years) shows an upwards trend of 4.5 hours in a day (Mackay, 2019). As reported before in our finding, we documented 43% school going adolescents spent more than 5 hours per day which is consistent with the findings of Mamun et al.,(2019).

When adolescents spend many hours or days on smartphone by using the internet, they hardly find times for the family, friends or relatives. We found that school going adolescents are more connected to the virtual world rather than real world which impede them to be connected with their family members. They do not like to

communicate directly with people around them including their parents as they remain busy in connecting people virtually or doing game through their smartphone. They become exasperate if their parents try to dissuade them from overusing of smartphone. Hence, their face -to -face communications with near ones are being deteriorated. In line with our findings, Shiffle, (2013) opined that social media has crippled the students when it comes to interacting with one another in person. Similarly, Wang et al.,(2012) argued that problematic use of smartphone is connected to poor lifestyle habits in teenagers, such as prolonged online time, less sleeping time, and increased adolescent stress, affecting their interpersonal relations.In the same manner, Vaidya et al., (2016) found that increasing mobile use of the youth had reduced face-to-face communication and encourage destructive family relationship**.** Multiple studies i.e. Bian & Leung, (2014), Chatzitheochari & Mullan, (2019). indicated that who spent more time on smartphone are forced to reduce their face-to-face contact time and this use pattern is related to loneliness and shyness. Indeed, parent-child interaction and communication are influenced by the usage of smartphone in both ways, i.e. facilitates and impedes. Thoughsome studies indicated that use of smartphone increase uninterrupted connections and communication (Park & Lee, 2012; Cho, 2015; Liu et al., 2014; Pang, 2018),our study findings strongly supported that the overuse of this device deteriorate the interpersonal relation of the adolescents with their parents, siblings and kinship-relatives.Mahmud et al., (2020) found that 28% university students in Bangladesh are addicted to smartphone. They also noted that close-friendship and kinship relation in terms of mutual responsibility and direct interaction were found deteriorated due to smartphone addiction. Doh et al., (2016) orated that children are so busy these days with social media and their smartphones that they forget to spare time for the loved ones around them.

Because of multiple application and likewise functionaries such as music, video, photo, WhatsApp, messenger, Imo, You Tube, Instagram etc. consume heavy time of the school going adolescents. Our study reveals that smartphone in the hand of a school going adolescents create an opportunity to misuse as well as excessive use. It is evident from our study that school going adolescents find very little time to interact with their parents and close-ones directly. That means the use of smartphone, undoubtedly overuse has negative impact on interpersonal communications of school going adolescents in Bangladesh.

5. Conclusion

Though our study is not without its limitation as it included only three schools in Dhaka city and the sample size is very small, it has some inference in policy level and future research in this area. To recognize and acknowledge about the impact of smartphone on interpersonal relationship of school going adolescents, more research on this area is a necessity. In this digital era school going adolescents have to

maintain and adapt a new communication and relationship paradigm where the both virtual and real world seems to be important for their wellbeing and development. So, smartphones should be provided to adolescents with proper education about its negative effects.In this regard appropriate time management lessons need to be conveyed to the school going adolescents. To address this problem this paper suggests that more studies need to be carried out relating this issue and evidence-based intervention program should be incorporated in policy level.

References

Afrin, D., Islam, M. U., Rabbiand, F., & Hossain, A. (2017). The school-level factors associated with internet addiction among adolescents: A cross-sectional study in Bangladesh. *Journal of Addiction and Dependence.* 3(2), 170–174.

Al-Jubayer, S. M. (2013). Use of social networking sites among teenagers: A study of Facebook use in Dhaka City. *Journal of International Social Issues, 2*(1), 35-44.

Aljomaa SS, Al.Qudah M.F., Albursan I.S., Bakhiet S.F., Abduljabbar A.S. (2016). Smartphone addiction among university students in the light of some variables. *Computer Human Behavor,61*, 155-64. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.041

Ali, M. S., & Hossain, M. A. (2019) Physical and Psycho-social impact of mobile phone usage among the high school students of rural areas in Bangladesh. *Society &Change*. XIII *(1*), 27-44. Retrieved from https://societyandchange.com/uploads/1650424552.pdf

Bangladesh Bureau of Statistics and UNICEF Bangladesh. (2016). *Child well-being survey in urban areas of Bangladesh*. Retrieved from https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/childwell-being-survey-urban-areas-bangladesh-2016-0.

Bian, M. & Leung, L. (2014). Smartphone addiction: Linking loneliness, shyness, symptoms and patterns of use to social capital. *Media Asia, 41*(2), 159–176. DOI:10.1080/01296612.2014.11690012.

Bleakley, A., Ellithorpe, M., & Romer, D. (2016). The role of parents in problematic use among US adolescent. *Media and Communication*, 4(3): 24. DOI:10.17645/mac.v4i3.523

Casey, B. M. (2012). Linking Psychological Attributes to Smartphone Addiction, Face-to-Face Communication, Present Absence and Social Capital. (Doctoral dissertation, Faculty of Graduate School ofthe Chinese University of Hong Kong). Retrieved from https://pg.com.cuhk.edu.hk/pgp_nm/projects/2012/BIAN%20Mengwei%20Casey.pdf

Cha, S. S., &Seo, B. K. (2018). Smartphone use and smartphone addiction in middle school students in Korea: Prevalence, social networking service, and game use. *Journal of Health Psychology Open, 5* (1), 55-66. Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055102918755046

Chandrima, R. M., Kircaburun, K., Kabir, H., Riaz, B. K., Kuss, D. J., Griffiths, M. D., & Mamun, M. A. (2020). Adolescent problematic internet use and parental mediation: A Bangladeshi structured interview study. *Addictive Behaviors Reports, 12*, 100288. doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100288

Chatzitheochari, S. & Mullan, K. (2019). Alone together: how mobile devices have changed family time. *Journal of Early Adolescence, 32*(1), 104–125.

Cho, J. (2015). Roles of smartphone app use in improving social capital and reducing social isolation. *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 18*(6), 350–355.

Chowdhury, S., Basu, B. K., &Laskar, M. S. (2018). Impact of smartphone use on health among higher secondary level students in Khulna, Bangladesh. *Mediscope,6*(1), 1–5.doi.org/10.3329/mediscope.v6i1.38936

Demirci, K., Akgönül, M., Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. *Journal of Behavior Addiction, 4*(2), 85-92. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26132913/

Devitt, K. , Roker, D. (2009). The Role of mobile phones in family communication. *Children and Society,23*(3),89-202. DOI:10.1111/j.1099-0860.2008.00166.x

Doh, Y. Y., Rhim, J., & Lee, S. (2016). A conceptual framework of online-offline integrated intervention program for adolescents' healthy smartphone use. *Addicta: The Turkey Journal on Addiction, 3*(3), 319-338.DOI:10.15805/addicta.2016.3.0105

Hassan, T., Alam, M. M., Wahab, A., &Hawlader, M. D. (2020). Prevalence and associated factors of internet addiction among young adults in Bangladesh. *Journal of the Egyptian Public Health Association, 95*(3), 3. DOI:10.1186/s42506-019-0032-7

Huq, L., Khondoker, S., Mahpara, P., Sultan, M., Khondokar, A., & Syed, S., (2021). New forms of adolescent voice and agency in Bangladesh through the use of mobile phones and ICT. REPORT FOR GAGE RREF. Retrieved from https://bigd.bracu.ac.bd/wp-content/uploads/2021/06/GAGE-RREF2-Report_New-Forms-of-Adolescent-Voice-and-Agency-in-Bangladesh-Through-the-Use-of-Mobile-Phones-and-ICT.pdf

Islam, M. A., & Hossain, M. Z. (2016). Prevalence and risk factors of problematic internet use and the associated psychological distress among graduate students of Bangladesh. *Asian Journal of Gambling Issues and Public Health*, *6*(1), 11.

*Jeong, S., Kim, H., Yum, J., & Hwang, Y. (2016). What type of content are smartphone users addicted to? SNS vs. games.Computers in Human Behavior, 54(2), 10-17.*DOI:10.1016/j.chb.2015.07.035

Karim, A. R., &Nigar, N. (2014). The internet addiction test: Assessing its psychometric properties in Bangladeshi culture. *Asian Journal of Psychiatry, 10*, 75-83. DOI: 10.1016/j.ajp.2013.10.011

Krithika, M., &Vasantha, S. (2013). The mobile phone usage among teens and young adults: Impact of invading technology. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, *2*(12) ,12

Lee, S. J. (2009). Online communication and adolescent social ties: Who benefits more from Internet use? *Journal of Computer-Mediated Communication, 33*(4), 509–531. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10836101/homepage/productinformation.html

Lee H., Ahn H., Choi S., Choi W. (2014). The SAMS: Smartphone addiction management system and verification. *Journal of Medical Systems, 38*(1), 1.

Lee, C., & Lee, S. J. (2017). Prevalence and predictors of smartphone addiction proneness among Korean adolescents. *Children and Youth Services Review, 77*(C), 10–17. DOI: 10.1016/j.childyouth.2017.04.002

Lin Y. H., Lin Y. C., Lee Y. H., Lin P. H., Lin S. H., Chang L. R., Tseng H. W., Yen L. Y., Yang C. C., Kuo T. B. (2015). Time distortion associated with smartphone addiction: Identifying smartphone addiction via a mobile application (App). *Journal of Psychiatric Research,* 65, 139–145.DOI:10.1016/j.jpsychires.2015.04.003.

Liu, H, C., Sung, Pei, W. & ; Yao, W. (2014). *Computer, Intelligent Computing and Education Technology: Adolescent attachment and the mobile phone addiction.* (1st ed.). CRC Press. DOI:10.1201/b16698-10

Mackay, J. (2019, March 21). Screen time stats 2019: Here's how much you use your phone during the workday [Blog post]. Retrieved from https://blog.rescuetime.com/screen-time-stats-2018/

Mahmud, A., Adnan, H. M., & Islam, M. R. (2020). Smartphone addiction and bonding social capital among university students of youth community in Bangladesh. *Global Social Welfare, 7*(4), 315–326. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s40609-020-00177-1

Mamun, M. A., Hossain, M. S., Siddique, A. B., Sikder, M. T., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2019). Problematic internet use in Bangladeshi students: the role of sociodemographic factors, depression, anxiety, and stress. *Asian journal of psychiatry, 44,* 48-54. DOI: 10.1016/j.ajp.2019.07.005

Mamun, M. A., & Griffiths, M. D. (2019). The assessment of internet addiction in Bangladesh: Why are prevalence rates so different? *Asian journal of psychiatry, 40,* 46–47. DOI: 10.1016/j.ajp.2019.01.017

Mondal, K. S., Paul, K., G., and Islam A. M. (2020) Use and addiction of smartphone in adolescence students in Bangladesh. *Social Networking and Gaming ServiceInternational Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 50*(2), 65-74.

Miralles, Muñoz-R., Ortega-González, R., López-Morón, M. R., Batalla-Martínez, C., Manresa, J. M., Montellà-Jordana, N., Chamarro, A., Carbonell, X., &Torán-Monserrat, P. (2016). The problematic use of Information and Communication Technologies (ICT) in adolescents by the cross sectional JOITIC study. *BMC pediatrics, 16*(1), 140-157.

DOI: 10.1186/s12887-016-0674-y

Oulasvirta, A., Rattenbury, T., Ma, L. (2012). Habits make smartphone use more pervasive. *Personal and Ubiquitous Computing,161*(1), 105–114.

Pang, H. (2018). How does time spend on WeChat bolster subjective wellbeing through social integration and social capital? *Telematics and Informatics, 35*(8), 2147–2156

Park, N., & Lee, H. (2012). Social implications of smartphone use: Korean college students' smartphone use and psychological wellbeing. *Cyber psychology, Behavior and Social Networking, 15*(9), 491–497.

Power, R., Galea, C., Muhit, M. (2020). What predicts the proxy-reported health-related quality of life of adolescents with cerebral palsy in Bangladesh? *BMC Public Health ,20*(1), 1-10.

Ranjan, R., Sharma, S., & Ahmed, S. (2020). Impact of smart phones usage on interpersonal relationships of students in Meerut (U.P.).*Indian Journal of Public Health Research & Development,* 11(7), 683-689.Retrieved from https://medicopublication.com/index.php/ijphrd/article/view/10167/9512

Rashid, SMS., Mawah, J., Banik, E., Akter, Y., dee., J., Jahan, A., Khan, M., Rahman, M., Lipi, N., Akter, F., Paul, A., Mannan, A. (2021). Prevalence and impact of the use of electronic gadgets on the health of children in secondary schools in Bangladesh: A cross-sectional study.*Health Science Report.4*(4),388. DOI: 10.1002/hsr2.388

Renuka K., Gopalakrishnan S., Umadevi, R. (2019). Prevalence of smartphone addiction in an urban area of Kanchipuram district, Tamil Nadu: a cross sectional study. *International Journal of Community Medicine and Public Health, 6*(10), 4218-4223. DOI: 10.18203/2394-6040.ijcmph20194166

Sayeed, MA., Rasel, MSR., Habibullah, AA., Hossain, MM. (2021). Prevalence and underlying factors of mobile game addiction among university students in Bangladesh. *Global Mental Health, 8*(35), 1–10. DOI:10.1017/gmh.2021.34

Soni, R., Upadhyay, R., Jain, M. (2017). Prevalence of smart phone addiction, sleep quality and associated behavior problems in adolescents. *International Journal of Research in Medical Science, 5*(2), 515. Retrieved from https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20170142

Shiffle, D. (2013). Information technology and the net generation: The impact of technology on adolescent's communication and interaction. *American Journal of Social Science.16*(7), 26.

Taiwan Communication Survey. (2021). Use of Cell Phones. Available online: http://www.crctaiwan.nctu.edu.tw/epaper/%E7%AC%AC90%E6%9C%9F20190815.htm (accessed on 11 August 2021)

Torrecillas, L. (2007). Mobile phone addiction in teenagers may cause severe psychological disorder. *Medical studies, 14*(3), 11-13. Retrieved from ttps://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Medical+Studies&title=Mobile+phone+addiction+in+teenagers+may+cause+severe+psychological+disorder&author=L+Torrecillas&volume=14&publication_year=2007&pages=11-13&

The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission. (2012). Internet Subscribers in Bangladesh February, 2012. Retrieved from http://www.btrc.gov.bd/content/internetsubscribers-bangladesh-february-2012.

TheBangladesh Telecommunication Regulatory Commission. (2020). Internet Subscribers in Bangladesh October, 2020. Retrieved 10 January 2021. Retrieved from http://www.btrc.gov.bd/content/internet-subscribers-bangladesh-october-2020.

UNICEF (2017) Annual Report, Bangladesh.

Vaidya, A., Pathak, V., & Vaidya, A. (2016). Mobile phone usage among youth. *International Journal of Applied Research and Studies.* 5(3), 1-6.

Wang, L., Luo, J., Luo, J., Gao, W., & Kong, J. (2012). The effect of Internet use on adolescents' lifestyles: A national survey. *Computers in Human Behavior, 28*(6), Retrieved from 2007–2013. doi: 10.1016/j.chb.2012.04.007

Date of Submission : 07.04.2022
Date of Acceptance : 12.12.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

Impediments of Women Empowerment in Rural Bangladesh: An Empirical Study

Shahnaz Sarker*

Abstract

Women empowerment is a major issue in this globalized world. Women demand a secured environment where they can take their own decision to conduct hassle free life. But there are enormous barriers on the way to women empowerment. They have to fight in this capitalist battlefield. Bangladesh is a country of villages. Mostly the rural women are facing more obstacles than urban counterpart due to lack of education, early marriage, religious legislation etc. This study highlights the impediments of women empowerment in the northern part of Bangladesh. Both qualitative and quantitative methods are used in this research along with primary and secondary data. The findings of the study reveal the present status of the rural women with reference to economic status, their decision-Making power and the obstacles they are facing to empowered them.

Keywords: Women Empowerment, Obstacles, Violence, Gender equality, Development, Traditionality

1. Introduction

Generally, women are serving soundlessly as a good partner for the socio-economic development of the country as well as the family. The maximum women of Bangladesh are bound to work inside their house like a lockup due to the subservient attitudes of the men. Cultural and patriarchal sanctions, Purdah the cultural and patriarchal sanctions has limited their free movement and involvement in economic and social venture. Their prime duty are household work and family management like cooking, cleaning, rearing and bearing of children etc. (Sultana et al. 2009). According to house and population census 2022, total population of Bangladesh is 165 million with 81.71 million men and 83.35 million women. Among them 68.45% people live in the rural areas of the country. Around 56 million women are living in villages (BBS, 2011).

The people of Bangladesh are facing unemployment problem over many years where females' contribution is excluded from rural economy (IFAD, 2006). These situation demands women empowerment in the rural areas. Contribution of women in the domestic work is not treated as income earning activities. After realizing that half of the total population has been kept apart from economic conduct, from the few years women advancement has become a vital issue(World bank, 1994). Women's performance to family and especially for society has still not been fully evaluated (Bose et al. 2009).

* Assistant Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

Bangladesh, excepting her few urban centers, is a country of villages. Most of the people of the country depend on agriculture for their livelihood. The pre-British 'unchanging village' underwent through many changes and opened up to the greater political organization is called the state. Even after the changes that took place during the prolonged historical periods, the traditional structure of the villages and the role played by the women in particular was attached to the traditional role model until very recently. But in recent years there has been a massive change in the social structure of the villages in general and in participation of role of the women in particular. Different Go's and NGOs are taking the necessary steps to address the changing roles of women. That's why women are encouraged to engage themselves in income earning activities. In some cases, they are involved in non-conventional activities or are now involved in more than one income earning activity through-out the year. To ensure sustainable economic advancement there is no alternatives of women's empowerment. We should be careful about uplifting the fundamental rights well-preserved in the international conventions and our national constitution also (Hussain, 2018). Scholars presumed that modernization process and overall economic development of a country would be successful by ensuring equal benefits for both men and women (Rashid and Taibb, 2016).For the transformation of the country's economic position from the lower income to middle income Bangladesh figure outs participation of women in every aspect. Women empowerment is mandatory forany development of a country(Chaity, 2018). An individual's or group's retention to create effective choices that would be metamorphose those choices into expected deeds and results is called Empowerment (Malhotra and Schuler, 2002).

Empowerment of women is essentially the process of uplifting an economic, social and political position of women, the conventionally unheeded ones, in the society (Dutta, Bhakta and Bengal, 2017). Banu, Dilruba (2001) conceptualizes 'empowerment' as "the capacity of women to reduce their socioeconomic vulnerability and their dependency on their husbands or other male counterparts, in terms of their ability ….''For empowerment a person needs intellectual ability, decision making capacity, authoritative power and reduction of gender inequality. Since the 1990's women have been recognized as main delegate of sustainable development and women's equilibrium and empowerment are seen as centric to a more holistic approach towards establishing new shape and processes of development that are imperishable (Handy et al., 2004). Bangladesh is an emergent nation with the prevalent rural setting. It is a newly sovereign country with its' principal economy agriculture. All day long a woman hammers away at home and sometimes outside the home. In certain cases, when they even tackle allocated works of male in relation to the household division of labor their labor is generally not acknowledged by the male members of the family as well as the large society. Hence, customary etiquette carries out their whole social and cultural life. Along with other developing countries patriarchy prevails in Bangladeshi society (Islam, 1997). So, the condition of female in these societies, especially in the countryside areas, is dreadful in measuring to the affairs of male. Such inconsistency between male and female in Bangladesh and many other developing states research create the

attentiveness of intellectuals and policy planers to look into the underlying causes as well as comparative affairs analysis to micro and macro levels. Now, in Bangladesh and other developing countries the question of women empowerment is going to the combat zone. Conventional customary application restricts the chances of females in education, skill development, employment and participation in the overall development process. Women are also being required from ideal point of view in the decision-making process which is very foremost in the context of appraised development of the country (Islam, 2006). To ensure a healthy growth of our nation empowerment of countryside women is compulsory as the significant part of population belonging to this gender group. In my view, it is very urgent to know the current situation of Bangladeshi women. This research will explore how women's roles are altering in socio-economic activities and their empowerment due to these changes and the obstacles of women empowerment in the light of rural Bangladesh.

2. Objectives:

The main purpose of the study is to explore the impediments of women empowerment in rural

Bangladesh and the specific objectives are-

1. To know the demographic profile of the respondents.
2. To understand the social conditions of the rural women with reference to economic status.
3. To explore the women's decision-making power regarding different activities.
4. To identify the impediments of women empowerment in rural Bangladesh.

3. Research Methodology

The study has followed a mixed method approach. The term "mixed methods" refers to an emergent methodology of research that advances the systematic integration or "mixing" of quantitative and qualitative data within a single investigation or sustained program of inquiry (wisdom and Creswell, 2013).Hence the rationality of the using a mixed method approach in this study is to take the advantages of both methods and avoid the disadvantages. Rationality of using mixed method is twofold. Where quantitative research methods can be used to produce comparable

data with the enhanced generalizability of findings for policy-relevant implication (Choo, 2014), qualitative research methods helped to contextualize the understanding of the key constructs of quantitative data to be examined. Both primary and secondary sources are used for data collection. Initially the most theme of the study has been conceptualized from information of secondary sources. After reviewing different secondary sources preparation are taken totravel to the sector for primary data collection from three villages named 1) Shibpur, 2) Sadekpur and 3) Chokchoka of Gaibandha district. Social Survey method has been wonted to collect primary data. Primary data are collected through face-to-face interview employing a questionnaire containing both open-ended and closed-ended questions. Sampling is related with the selection of a subset of individuals from within a population to

estimate the characteristics of whole population. The two main advantages of sampling are the faster data collection and lower cost(Sing and Masuku, 2014). Purposive sampling technique will be used in this study. As it is known that this type of sampling method is applied when a researcher chooses specific people within the population to use for a particular study. By using purposive sampling method 80 respondents were selected for the study.

4. Literature review of the study

Some unusual situations that control one's free movement and keep him or her apart from progress is called impediment. In my research impediments refer to some unfamiliar beliefs and norms which are accountable for making problems in the way of women empowerment. Numerous studies are conducted to find out the factors affecting women empowerment in Bangladesh. Among those some related works with my study are discussed below-

Haque (2011) strived to measure and differentiate women empowerment and autonomy from each other by constructing indices in three specific dimensions namely 1) Economic decision making, 2) Household decision making, and 3) Physical movement in Bangladesh context. The level of women empowerment in economic decision making and household decision making is good enough but the empowerment in physical movement is very low and the autonomy level of women for all three dimensions in Bangladesh is the least. Although this country has been governed by two women leaders for almost two decades but traditionally there prevails negative social view about women autonomy in the household level, even women themselves think autonomy is bad and sometimes it is a shameful matter for male members if a family is driven by women. Rahman (1994) discussed the role of women in this study are from the poorest and the most stressed portion of Bangladesh's population. It seems that these women are fighting the hardest battle, but from most of the evidence it also appears that they are emerging as winners. To secure their household and children women are trying hard to break the chains of their society. They are also gaining economic resource bases and articulating new power relations in society, particularly in the households. The new procedure of empowerment is a significant aspect to understand the polarization in gender relations and social change.

Mizanuddin (2005) deals with the gender issues and the situation of women and development in Bangladesh. It has been highlighted in the paper that gender issues and discriminatory situation between men and women remain as the core areas relating to women and development in Bangladesh. It has also been identified that the deprivation of women in the fields of employment and economic opportunities, education, health and nutrition, age at marriage and in the decision-making processes in Bangladesh. It has been argued that women's emancipation is a prerequisite for our national development for which appropriate plans and programs are to be formulated. Hossain (2004)revealed the patterns and trends in women's work and examined the elements that work behind gender division of labour in rural Bangladesh. Economic involvement within the domestic affairs have been found to

have fragile effect on empowerment. This research appears two implications for policy: 1. To equip women we should boost up female education to participate in non-agricultural sphere where gender inequality in income is fewer. 2. Speculation in infrastructure that can accelerate women's versatility outside the house as well as can bring down the load of household affairs. Akmam (2017) strived to determine the effect of non-government organization's (NGO) venture on women. The result of the research reveals that microcredit in Kathalbari had been disbursed to only married women. Husband or sons who receive the credit take the decision to spend the money. Some mentionable changes had been identified out of participants such as- increase of daily meals, use of hygienic toilet, savings etc. due to microcredit. Although the main purpose of the microcredit was to involve women in income-generating activities.

In another study, Parveen (2007) examined that most of the rural women were not conscious about gender disparity due to conventional customs which accelerate them in the shadow of the male members of the family. Some progressive initiatives should be implemented to brush up this unfortunate condition, from GO and NGOs level along with community level. Strategies aimed at empowering women must address both their practical gender needs and their strategic gender needs. Efforts, therefore, need to be made to arouse people's concern and create awareness of gender differences, with particular emphasis on poorer farm households. We should impose much assistance on earnings, child marriage, endowment, education, expectation of son, nutrition, health and reproduction, legal rights and abuse of women. The study reveals that along with personal earnings and fairness rural women get more attention than the women who are physical and mentally disable. From this study I know the condition of women's awareness regarding empowerment in rural Bangladesh which is an important issue of my research.

5. Rationale of the study

Development can't be successful of any country without integrating women into the scheme of development. So, Bangladesh government has given emphasis on women empowerment. National and international scholars have conducted many research on women issues. Some scholars' research of Bangladesh, explained the subordinate position of females, women's contribution in the society, women on the way to development, women's contribution in agricultural, and women and penury. Some studies have also revealed women's subservient position in Bangladeshi society and the nature of their household affairs. For the foremost part, these studies emphasize that women's labour in rural Bangladesh is indistinguishable from domestic duties, which neither is taken into account productive; therefore, women remain obsessed with their male kin and powerless within the economic and social spheres. Several recently-published micro-studies have documented that persistent poverty in Bangladesh has driven some poor women to hunt employment outside the house. These women are defying and abandoning the ideological social norms of the society for the sake of the survival of their households; consequently, they're gaining

some control over the fabric resources within their households. This development suggests a brighter future for ladies in Bangladesh, and it's instructive within the understanding of the transformation and gradual change of the society (Hossain, 2011). Northern part of Bangladesh is very neglected (such as Gaibandha district) compare to the rest. So farther are no adequate and noteworthy studies regarding this area on women's enrollment in socio-economic activities and their empowerment. In these circumstances, this study is a front runner. As a consequence, the results of this study will initiate the planners and policy makers to take necessary steps to improve the women's condition in the northern part of Bangladesh along with G.O and NGOs initiatives. Ultimately the outcome of this study will help to include the women in development project with the main stream of population is not only in Bangladesh but also the other underdeveloped regions of the world.

6. Theoretical framework

Every household member spends their whole day in three ways- leisure, productive activity at home and outside home productive activity according to Backer's household labour allocation model. A person distributes time between home production of goods and services and market work to attain market goods where a fixed time is given for sleep and personal care. Because of unequal opportunities in the society, gender division of labour can occur. For example, male may be relatively more productive in market work and female in non-market work. Due to gender discrimination in the labour market, such differences may arise. In such a case, efficient distribution of labour occurs for the household if male and female specialize according to their comparative advantages. The model indicates that increased competition and reduced labor market discrimination can promote women's participation in market activities. Economic and technological advancements can lead to changes in labour allotment. As an example, market wage rate may go up due to increased productivity of labour. On the other side, improved infrastructure in household production (water supply, better stove) may reduce the time needed for homework. Both can induce more market work. Backer's model has provided powerful explanation behind changes in labour force participation of women in many countries especially, the industrialized ones (Hossain, 2004). However, the application of Becker´s model is, problematic in traditional societies of Asia such as Bangladesh where socio-economic factors affect tastes and preferences with respect to women´s work and the valuation of market versus non-market work. Culture and social values determine tastes and preferences not only at a given point of time, but also has dynamic consequences. Social norms about the roles of men and women can create productivity differences in market versus non-market work over time through feedback effects on human capital (Ferber, Blau and Winkler, 1998). Another complication arises because labour allocation decisions are related to three types work: market work for wages, subsistence production activities within the household where production generates income or saves income. These are defined as *economic activities*, and some activities which generate utility but not cash income are defined

as *domestic activities*. Although the distinction between the latter two types is not very clear-cut as domestic activities do have a market value, (for example, the price of a nurse, teacher, or prepared food), it has some important implications in rural Bangladesh. Labour allocation between income generating activities at home and domestic activities is affected by economic as well as socio-cultural factors, and this deserves more attention because women´s participation in outside economic activities is very low in Bangladesh (Hossain, 2004).

Liberal feminism traces its origin from the classical thinking regarding the male female inequality. Age old ideas regarding women, division of labour on the basis of sex, less emphasis on women's labour, inequal female participation in public and administrative spheres, unwanted pregnancy etc. are the focal concern of liberal feminism (Lorber 1998, p.19). In fact, liberal feminism is the first of its kind to bring into front the rights of the women from which they are being deprived of. According to this approach equality between men and women are to be universally accepted. At the same time, it gives emphasis on individual right, right to vote, freedom of speech, property right and empowerment of women. It also refers to co-existence of male and female in the labour market of the capitalist system of economy (Mizanuddin, 2005). Liberal feminism argues that women's oppression prevails in the society due to women's unequal access to legal, social, political and economic institutions. Women will be empowered if we can ensure women's equal legal rights and participation in the public spheres of education, politics, and employment.

7. Major Research Findings

Traditional dominant social norms tend to discourage women movement in Bangladesh. Household works and child rearing are the principal responsibilities of a woman imposed by the society. That's why they can't involve themselves in the labour market. Two other influential agents that affect women's participation in the labor market are location and proximity. These two factors constrain women's activity to market opportunities and help explain why location seem**s** to be much more foremost in explaining women's labor benefits than men. Women from outlying areas are usually the least responsive to price signals because they have the least access to bring goods and services to the market and information. Along with this, cultural and doctrinal restrictions do not permit female workers to engage in outside work on their farms, even if their families regularly suffer from food insecurity (Hossain, 2004). Important findings of the study are described below.

8. Demographic profile of the respondent

The data of the following table depicts the demographic information of the women of three villages of shahapara union of Gaibandha district named Shibpur, Sadekpur and Chokchoka.

Variable	Categories	Frequency	Percentage
Age	Up to 20	25	31.25
	21 to 30	40	50.00
	31 to 40	15	18.75
	Total	80	100.00
Education	Illiterate	45	56.25
	Class i to v	30	37.50
	Class vi to x	05	06.25
	Total	80	100.00
Marital status	Married	70	87.50
	Separated	06	07.50
	Widow	04	05.00
	Total	80	100.00
Family member	1-3 person	10	12.50
	4-7 person	55	68.75
	8& above	15	18.75
	Total	80	100.00
Religious Status	Islam	50	62.50
	Hinduism	30	37.50
	Other	0	0.00
	Total	80	100.00

Figure 1: Percentage distribution of demographic information of the respondents

Source: Field Survey, 2020

9. Economic status of the rural women

Economic activities are those that originate earning for the households or saves household expenditure for the acquisition of the products from the market. This includes employment within the agricultural and non-agricultural market, but also unpaid work for the household in crop cultivation, homestead gardening, livestock and poultry raising, fishing, transport operation, construction, business, and private services. There are many other activities done mostly by women that are quasi-economic in nature which aren't valued in nationwide income accounting such as food-processing and preparation of meals for the family members; care of the kid, old and sick members of the family; and tutoring of youngsters. If the household had hired workers for doing these jobs, it might involve some expenditure. We call these activities as domestic activities (BBS, 2004; Hossain, Bose and Ahmad, 2004). No development is possible without Economic development. It is purported to be considered that women conduct their life in economic tightness as they are not involved in earning activities. They are engaged in performing some household

works. To justify the economic status of the respondent some indicators like income from land, farm, pond, garden etc. are taken into consideration.

9.1 Income Earning Status

In the study area I found that 16.25% women are engaged in different types of low paid job but major portion of the respondent (83.75%) having no job. There is a Hindu community in this area. They are engaged in pottery business. Kumar (potter) also known in Bangla Kumbhakar, is a traditional occupational group engaged in clay modelling and making earthenware and various household items and toys from clay. The clay dug from the earth's surface is prepared by beating and kneading with the hands, feet or simple mallets of stone or wood (Banglapedia).The Hindu women play a vital role in this profession but they don't get any recognition as they are bound to do this like other domestic works.

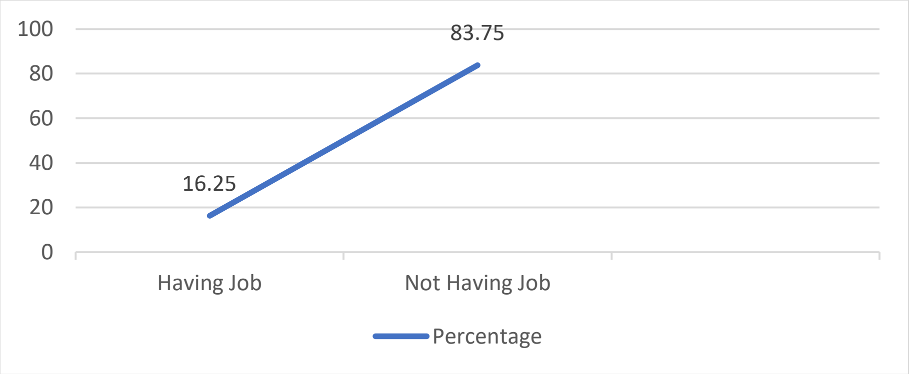

Figure 2: Income Earning Status

Source: Field Survey, 2020.

9.2 Land Property

The following table shows that no respondents are landless. 43.75% respondent possess at least less than 1 Bigha of land property while a few (6.25%) hold 6 and above

Amount of land (Bigha)	**Frequency**	**Percentage (%)**
Less than 1 Bigha	35	43.75
01-02	30	37.5
03-05	10	12.5
06- Above	05	6.25
Total	80	100

Figure 3: land property of the respondent

Source: Field Survey, 2020.

9.3. Surplus Income

Category	Frequency	Percentage
Having surplus	31	38.75
No surplus	49	61.25
Total	80	100

Figure 4: Surplus Income of the Respondents (monthly)
Source: Field survey, 2020.

In the study area, only 38.75% respondents have their surplus income but major portion of the respondent (61.25%) don't have any surplus income.

10. Women's involvement in decision making procedure over numerous activities

Categories of	Response	Frequency	percentage
Who adjudicates how to allocate money	Only informant Informant and spouse partner alone Other family member Total	10 15 50 05 80	12.50 18.75 62.50 06.25 100
Decision of obtaining valued household goods	Only informant Informant and spouse Partner alone Other family member Total	05 25 45 05 80	06.25 31.25 56.25 06.25 100
Who decides to obtain Daily necessities?	Only informant Informant and spouse Partner alone Other family member Total	10 20 50 00 80	12.50 25.00 62.50 00.00 100
Who decides on treatment?	Only informant Informant and spouse Partner alone Other family member Total	10 10 55 05 80	12.50 12.50 68.75 06.25 100
Decision regarding children's marriage	Only informant Informant and spouse Partner alone Other family member Total	10 15 50 05 80	12.50 18.75 62.50 06.25 100
Who determines regarding children's education?	Only informant Informant and spouse Partner alone Other family member Total	10 10 60 00 80	12.50 12.50 75.00 00.00 100

Figure 5: Decision making process over various activities of the respondent
Source: Field Survey, 2020.

Empowerment of women in economic decision making indicates to the women's capability to stake or to govern the decision procedure regarding household financial matter with partner or other members of the family. We can figure out that urban woman has more economic decision-making capability in comparison to a rural woman. In addition, aged women have more control in financial decision-making procedure than the female youngsters. To a greater extent, a woman who is educated have control on financial matter than the others. Currently working women, Muslim women and women whose family heads are females have more economic decision-making power than their corresponding counterparts. Over and above, for early age at marriage is negatively associated with economic decision power (Gowranga Kumar Paul, 2016). From the above table it is clear that, in our patriarchal society any type of decision of the family are taken by the male member. Females are habituated by this practice of the society. Those who are divorced or separated take their decision own.

11.Obstacles of women empowerment in rural Bangladesh

11.1.Family Restriction: Family barrier is the most important obstacle for women Empowerment. Muslim families are utmost in the study area. So, girls are not Permitted to achieve higher education. Work outside from home is totally prohibited. In the study area most of the families (87.50%) are restricted.

Categories	Frequency	Percentage
Restricted	70	87.5
Not Restricted	10	12.5
Total	80	100

Figure: 6 Family Restriction Status
Source: Field Survey,2020.

11.2.Religious Legislation

In the study area I found only Muslim (62.50%) and Hindu (37.50%) respondents. No other religion is found there. Women are supposed todo mainly genital duty and they experience from high workload and unrewarded endeavor in our traditional society. Women are trapped due tolack of decision-making at home and society with servitude, gender-biased social norms etc.(Mujeri,2021). Contribution of women to socio-economic development were not visible due to a set of social norms that enabled men to dominate women. Most Muslim women adhere to the conventional practice of *purdah* (dress covering the whole body), by which male subjugate women's mobility through seclusion, and thereby women are "invisible" to men

outside of their close family, and cannot participate in rural economic activities outside the home(Begum,1988). Religious legislation is predominant in the study area which is unbeatable. Still and all, women perform a consequential role in cost-saving activities by executing as “economic” exertion (Safilios- Rothschild and Mahmud, 1989).

11.3.Early Marriage

When a child is forced to marriage or unions in her/his early age is treated as a transgression of children’s human rights. In spite of international law, it is happening with millions of girls under 18 all over the world of their childhood. Due to child marriage girls can’t take any decision regarding their conjugal life and well-being. It forces them out of education and into a life of poor prospect, with an increased risk of violence, abuse, ill health or early death (Plan International). Gender inequality initiates child marriage and it is established in our traditional society that girls and women are substandard to boys and men. Due to poverty, lack of education, unfavorable social norms and practices and insecurity, the situation of early marriage is deteriorated. Child marriage is one of the major hurdles in the research area for women empowerment and education.

11.4.Family Structure

Nuclear Families consist of married couple and their children. Extended families comprised of at least three generations: grandparents, married children and grandchildren. Joint families are composed of sets of siblings, their spouses and their dependent children. By the influence of Modernization in this industrialist society the family structure has been changed. In the past the joint family system was more popular in our country but in the recent years elementary family system is carry out in a greater extent. In the study area 53.75% families are nuclear, 21.25% are extended and 25% are joint families. Nuclear families are more popular than joint and extended families. In a nuclear family female members get more freedom to be empowered than a joint family. In our traditional society elder persons of joint families don’t want to allow women family members as an important part of family. They think that women are for reproduction and household works. Women’s contributions for the family are not treated as economic activity. Women are not supposed to go outside from home for further work. Women have to face so many unwritten family restrictions

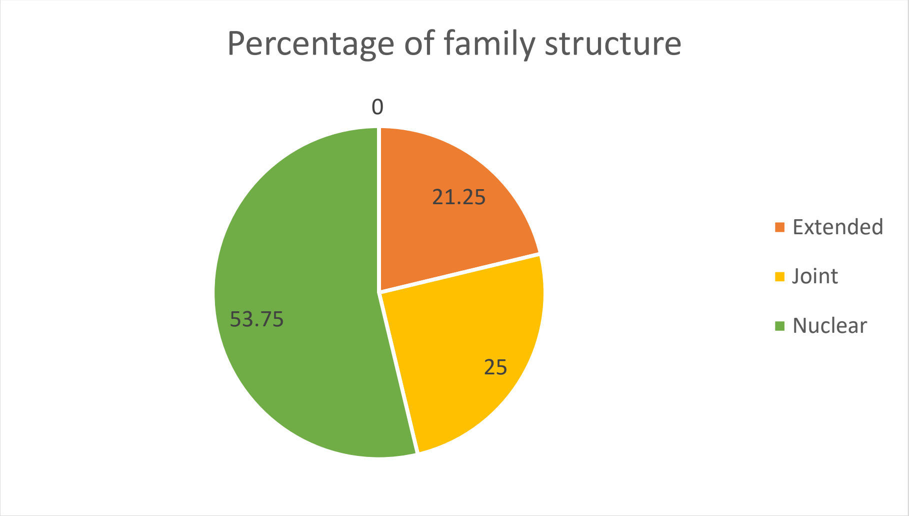

Figure: 7 Family Structure of the respondent

Source: Field Survey, 2020.

11.5. Lack of Education and awareness

Due to some social disgrace like child marriage, dowry and limited property inheritance rights etc. many women in Bangladesh conduct a miserable life, especially in rural areas. Due to child marriage the rate of female education is low in our country and they can't take active part in financial activities. Their physical movement become limited after marriage (Khatun, 2002). Musokotwane and Siwale (2001) define gender awareness as the recognition of different needs, expectations and life experiences of male and female that often create inconsistency among them but these are required to change. In this research gender awareness refers to the ability of women to identify problems arising from gender inequality and discrimination, which affect their ability to have access to and control over resources. Due to lack of education especially rural women are not informed about their rights. They always depend on their husband and son. This is one of the barriers of women empowerment as I found in my study.

11.6. Women are incapable to work late in the evening

Sanjida Hossain (2020) said that, women are not encouraged for after-hours work in Bangladesh, India and in many south Asian countries. This happen here because, the society is not safe for the female and the traditional mentality of the society. Along with this, the violence against women has damaged the minds and beliefs of family members that they think that, it is better for their girls to stay at home rather than staying out late.

Categories	Frequency	Percentage
Allowed	-	-
Not allowed	80	100
Total	**80**	**100**

Figure 8: permission of late-night work

Source: Field survey, 2020

In the study area where there is female are not supposed to work outside at home, late night job is a dream here. In the figure 8 it is shown that 100 percent women are not allowed to work outside after dark. If anyone have the opportunity to get a good job which is nocturnal, she will must have to give up the job.

11.7. Violence against women:

To understand violence against women we most commonly use the term gender-based violence. This is considered as hate crime. Any kind of acts or intimidation that planned to harm women hurt physically, sexually or mentally is called violence against women. Biologically women are not equal powerful as men. Along with this our patriarchal society created so many odd norms and values, rules and regulations to subordinate the women of our society. Violence is one of the brutal social instruments by which females are forced into a subservient position compared with men. It is very difficult to sketch a real picture of violence against women due to lack of authentic and ongoing data. Because of social restrictions, disgrace and the sensitive nature of the subject most of the women don't want to report these issues. The study reveals that most of the women are not aware of the significance of family courts for the sufferers due to lack of education. This is also an important impediment to women empowerment in rural Bangladesh.

12. Conclusion and suggestions

Pedantic attitudes, traditional norms and values, improper education and awareness, stereotype violence, child marriage, family structure, religious barriers etc. are the strong hindrance on the way to women empowerment. Being a male dominated society, gender inequality is apparent across all levels in Bangladesh. Women depend on men all over their lives, from their fathers through to husband, brothers or sons. In our rural areas people think that husband is the main identity of a woman. Religiously it is established that women are bound to obey their husband's command. By losing their husband women lose everything. The women who raise their voice to break down this social chain, treated as bad/ *nosta* women in the society. She has to suffer badly. The investigation results show that all the traditional rules and regulations, limited access to women education are the prime hindrance of women Empowerment. The development of our realm depends on both the male female contribution. So, we should change our conservative thinking and take pragmatic initiatives to empower rural women.

References:

1. Akmam, W., & Islam, M. F. (2017). Nongovernment Organizations' Contributions to Poverty Reduction and Empowerment of Women through Microcredit: Case of a Village in Gaibandha District, Bangladesh. In *Socioeconomic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science* (pp. 411-425). Springer, Singapore.
2. BBS. (2007) Statistical Yearbook of Bangladesh 2005. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Planning Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.
3. Bose, M. L., Ahmad, A., & Hossain, M. (2009). The role of gender in economic activities with special reference to women's participation and empowerment in rural Bangladesh. *Gender, Technology and Development*, *13*(1), 69-102.
4. Boserup, Ester (1970). Women's Role in Economic Development. St.Martin's Press: New York.
5. Barrett, W. G. (1950). Male and Female. A Study of the Sexes in a Changing World: By Margaret Mead. New York: William Morrow & Co., 1949. 477 pp. *Psychoanalytic Quarterly, 19*, 255-257.
6. Balu, F. D., Ferber, A. M. and Winkler, A. E. (1998) *The Economics of Women, Men and Work*, Prentice Hall.
7. Chaity, A. J. (2018). Women empowerment: Bangladesh sets example for the world. *The Dhaka Tribune*.
8. Chen, M. (1986). Poverty, gender, and work in Bangladesh. *Economic and Political Weekly*, 217-222.
9. Choo, H., & Pop, J. (2014).. . *Mixed Method Design in and for Asian Migration Research*, *31*(3), 193–195. doi:10.100712546-014-9131-7
10. Haque, M., Islam, T. M., Tareque, M. I., &Mostofa, M. (2011). Women empowerment or autonomy: A comparative view in Bangladesh context. *Bangladesh e-journal of Sociology, 8*(2), 17-30.
11. Hossain, M., Bose, M. L., & Ahmad, A. (2003). *Nature and impact of women's participation in economic activities in rural Bangladesh: insights from household surveys*. Centre for Policy Dialogue.
12. Hossain, M. A. (2011). Socio-Economic Obstacles of Women Empowerment in Rural Bangladesh: A Study on PuthiaUpazila of Rajshahi District. *Research on Humanities and Social Sciences*, *1*(4), 1-13.
13. Hossain, Shanjida. (2020, February 06). Challenges for women's empowerment. Financial Express.
14. Hossain, M., Bose, M. L., & Ahmad, A. (2004). *Nature and impact of women's participation in economic activities in rural Bangladesh: insights from household surveys* (No. 2004: 20). Working paper.
15. Hussain, A. (2018) 'Women and Empowerment', 4(7), p.171.
16. Islam, S. (1977). *Women's education in Bangladesh: Needs and issues* (Vol. 1). Foundation for Research on Educational Planning and Development.
17. Islam, S. (2006). Women's Education in Bangladesh. Analysis and Policy Imperatives. *Situation of Women in Bangladesh. Prepared by Women For Women Research and Study Group. Published by UNICEF, Dhaka*.

18. IFAD. (2006) People's Republic of Bangladesh: Country Strategic Opportunities Paper (Agenda Item 8 (a) EB 2006/87/R.9), International Fund for Agricultural Development, Rome.
19. Khatun, T. (2002) Gender-related development Index for 64 Districts of Bangladesh, CPD-UNFPA Programme on Population and Sustainable Development, Dhaka.
20. Mizanuddin, Muhammad. (2005) Women and Development in Bangladesh Issues And Problems. *Social science Journal, 10*, 147-158.
21. Musokotwane, R. &Siwale, R.M. (2001) *Gender Awareness and Sensitization in Basic Education*. Paris: UNESCO Basic Education Division.
22. Parveen, Shahnaj (2007). Gender Awareness of Rural Women in Bangladesh. *Journal of International Women's Studies,9*(1), 253-269. Available at: http://vc.bridgew.edu/jiws/vol9/iss1/14
23. Parveen, S. (2008). Access of rural women to productive resources in Bangladesh: a pillar for promoting their empowerment. *International Journal of Rural Studies, 15*(1).
24. Paul, G. K., Sarkar, D. C., &Naznin, S. (2016). Present situation of women empowerment in Bangladesh. *International Journal of Mathematics and Statistics Intervention*, *4*(8), 31-38.
25. POPIN (1995) Guidelines on Women's Empowerment for the UN Resident Coordinator System. United Nations Population Information Network. Available at http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html
26. Rahman, A. (1994). Women, Cultural Ideology and Change in Rural Bangladesh: Conflicting Patterns and Possibilities of Empowerment. *Peace Research*, 19-39.
27. Reza, M. H., & Yasmin, N. (2019) Empowering Women: Empowering Bangladesh. *Open Journal of Women's Studies,* 1(1), 15-23.
28. Sen, G.&Batliwala, S. (2000) Women's Empowerment and Demographic Process: Moving Beyond Cairo' pp. 95-118, in: H.B. Presser and G. Sen (eds) Women's Empowerment and Demographic processes. New York: Oxford University press.
29. Singh, A. S., & Masuku, M. B. (2014). Sampling techniques & determination of sample size in applied statistics research: An overview. *International Journal of economics, commerce and management*, *2*(11), 1-22.
30. Wisdom, J., & Creswell, J. W. (2013). Mixed Methods: Integrating Quantitative and Qualitative Data Collection and Analysis While Studying Patient-Centered Medical Home Models (pp. 1-5). PCMH Research Methods Series 13.

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 16.10.2022

Jagannath University Journal of Arts
Volume 12, No 02, July−December 2022

Why Islamic Finance is Panacea for Addressing Crisis in Financial Markets

Tareq Muhammad Shamsul Arefin[*]
Mohammad Nurullah[**]
Salieu Senghore[***]

Abstract:

When the 2008 domestic financial crisis in USA spilled over into the global financial crisis, only those financial institutions that followed Islamic *Shari'ah* principles were spared the collapse. In this context, the present paper investigates whether Islamic *Shari'ah*-compliant financial institutions are similarly resilient to other financial crises in the global economy. Moreover, can the financial system governed by Islamic *Shari'ah* principles emerge as an alternative system capable of preventing all financial disasters? The paper analyzes relevant policy and regulatory framework as well data and academic works from secondary sources to identify the core tenets of Islamic finance that distinguished it as different from the conventional finance practice. The analysis reveals that theses tenets can be theoretically and practically more applicable of counteract the causes related to the reoccurrences of the financial crisis in liberal economy.

Keywords: Financial Crisis, Islamic Finance, Financial Institutions, Financial Regulation, Muamalat.

1. Introduction

The world as a whole has been witnessing too many spells of disasters originated from the financial sector for the last two decades of this century. These spells have more or less devastating consequences for mankind. In lots of these cases, the malfunctioning originated in national boundaries spread quite rapidly to "globalized" financial markets and generated instability all over the world (Claessens and Kose 15). These phenomena expose the fragility and the related vulnerability of contemporary financial systems. The fragility is bound to happen because of the system design, as it is structured on fixed-price debt contracts(Askari and Mirakhor 16).Furthermore, the vulnerability of the system also propagated fast because both domestic and international systems are also designed and working of the same core—interest bearing debt contracts.

However, within contemporary financial architecture, Islamic Finance (IF) is emerged as unconventional. According to Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD), this unconventional financial sector worth a total asset of

[*] Associate Professor, Department of Economics, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh
[**] Associate Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh
[***] Ph.D. Student, INCEIF, Malaysia and United Arab Emirates University, UAE

USD 2.88 trillion during the 2019 financial year around the world (ICD-REFINITIV 11). Among the world, the Islamic Banking sector becomes a systematically important sector for 12 countries (ICD-REFINITIV 15). Most importantly, amidst the gloomy scenarios within the financial sector resulted from the financial crises, the performance of Islamic finance (IF) stands remarkable because of its resilience to tackle the severity of the downfall of the economy. For instance, at the eve of the 2008 global financial crisis, the majority of the Islamic financial institutions around the globe were able to sustain their pre-crisis period profit level; while comparing to their conventional part, in this period, most of the Ifs' able to register to double asset growth (Dridi and Hasan 21). This remarkable achievement was possible because IFs' are cohered to *Shari'ah* principles. This principle precluded IFs from financing or investing in the interest-bearing instruments, whereas the conventional were adversely affected because of their excessive ties to interest-bearing instruments. Eventually, the root cause of the 2008 financial crisis was the excessive dependence on interest bearing instruments within the financial system (Dridi and Hasan 15). The resilient features of IF which is evident through the stress test of the 2008 financial crisis prompted the proponents of Islamic finance to claim that it is a panacea for addressing the crisis in Financial Markets.

Above this backdrop, the present paper analyses why capital accumulation through the Islamic finance mode provides a more stable means comparing to conventional ones. The analysis will highlight that within the Islamic finance mode capital finance is more compliant to sharing risk rather than shifting it. Thus, Islamic finance requires a greater role of equity compared to conventional ones. The greater role of equity within the IF provides insurance against the instability that usually arises from excess leverage. This is the premise that we explore theoretically as well as practicability in the rest of the paper.

The next section put to the fore the case of reoccurrences of financial crisis within the world financial landscape. It also highlights the complex nature and identification problem related to multifaceted causes of the financial crisis. In the third section, we present the origin, evolution of core tenants of Islamic finance that distinguished it as different from the conventional finance practice. In the fourth section, we discuss the theoretical and practical applicability of Islamic finance principles to counteract the causes related to the reoccurrences of the financial crisis. The last section concludes briefly.

2. Financial Crisis is Embedded within the World Financial System:

The financial crisis has been in existence for centuries ago under various civilizations and it is not truly a new contemporary phenomenon. Ever since the dawn of history, there had been numerous reoccurrences of economic and financial crises. A recent study by Ascarya, A. (2017) mentioned about 421 financial crises since the failure of the Bretton Woods Agreements (BWA) in 1971 and up to 2011. These crises include 218 currency crises (10 episodes in 2008-2011), 147 banking crises, and 66 sovereign debt crises, including 68 twin crises and 8 triplet crises

(Ascarya142-144). He also highlighted that there have been 71 systematic banking crises before the 2008 financial crisis across 14 different countries (Ascarya142-144).

Typically, the financial crisis is a multidimensional phenomenon and may be difficult to describe using one dimension. That is why several explanations of financial crises are given. These explanations highlighted weak regulatory frameworks,[1]wrong policy formulation by the government,[2] misappropriation of funds, Ponzi schemes, fraud, animal spirits, a rapid rise in debt is the main cause for crisis occurrence (Askari and Mirakhor 16-17). Attributing so many causes for crisis indicates the diagnosis of crisis is a mere approximation because it is impossible often to differentiate among effects and causes (Askari and Mirakhor 142-144).This is quite normal as evident from the brief historical review that the form and manifestation of the reoccurrence of the financial crisis have evolved due to complex modern-day financial systems, technology, and globalization; but the root causes remain unchanged. From an analytical perspective, most of the causes can be categorized under three broad categories. They are Exogenous causes, Endogenous causes, and Moral Failure

2.1 Exogenous Causes:

Exogenous financial crisis referred to the causes which are derived from the outside of the country. So, the situation of a country contaminated by the crisis is through the transmission of crisis that derived somewhere else outside the jurisdiction of the country (Hall 27-30).The crisis is a contagion that happened due to the globalization process along with the world monetary sketch. The country is affected because it is part of the complex mechanisms— it is integrated as well as part of the characteristics of the affected system (Corsetti , Pesenti and Roubini 60). According to these criteria, one of the sources of the financial crisis could be a natural phenomenon or a man-made cause. While natural business cycles or natural disasters could because of natural financial crises, man-made financial crises, on the other hand, may happen when there is an interruption resulting in an imbalance in the real and financial sector and their stakeholders.

2.2 Endogenous Causes:

The proponents of this view believe that the main causes of the financial crisis are embedded within the sphere of the internal economy. It may have remained within the economy through financial or macroeconomic imbalances, that eventually emerge due to wrong policy design or implementation. The main causes falling under this category are over financialization, a sudden increase in the risk premium, asset price volatility, mismatch and misallocation of returns and credit, sudden

---

[1] Negligence in supervision and monitoring the system

[2] Zero-bound interest rate policy, incentivize excessive risk-taking by government bailouts of "too big to fail", Foreign capital flight.

alteration in risk profile, and sudden fluctuations in forecasts and expectations marked by high levels of pessimism relative to the true state of nature (Claessens and Kose29; Hall 7-8).

The literature has identified mostly erroneous monetary policy stance that can inflict the above-mentioned situation within the financial sector of the economy. Most of these financial imbalances are thought to have worked through policy rates that were kept low for too long—Zero bound rate (Merrouche and Nier 5; Adrian and Shin 9 ; Bernanke 3-4).

2.3 The Financial Crisis as "Moral Failure"

There is a third alternative explanation for the financial crisis, according to this view, the crisis is happening because of a massive "moral failure" plaguing contemporary society(Askari and Mirakhor 9). This view questions the premise of trust within the financial system. Within the conventional system, the core tenet is the transfer of risk. The risk transfer is directed by the predetermined interest rate. The predetermined interest rate assured the lender a fixed return even if the borrowers' venture would not perform. Similarly, the institutional lenders use the reserve banking principle to expose depositors' money to risky ventures (Askari and Mirakhor 4).Within this system the risk transfer is unilateral, so it requires strict and vigilant enforcement, supervision mechanism built-in regulatory framework. This is why there is a view that considers finance as "a profoundly moral issue, as it involves the creation of relationships of trust, often with very high stakes indeed" (Davies 5). Without the effective implementation of these measures, financial crises are sure to always follow.

After analyzing several financial crises, the proponent of these paradigms concluded that the underlying causes of the financial crisis are the stealthily of risk transfer or exposing parties to risk without the concurrence and switch over of risk shifting(Askari and Mirakhor 50-51). Under this paradigm, the conservative holds the view that the anomaly itself is actually within the financial system. The interest-based debt contract by design shifts risks stealthily. In this structure, lenders can transfer all inherent risks of any venture unilaterally to borrowers. In several cases, the borrowers may not in a position to handle it. Even in institutional form, several rescheduling of loans happened in a manner where the borrower is not aware or even gives consent to such arrangement (Askari and Mirakhor 50-51).The unilateral risk transfer incentivizes the financialization of the economy. Financialization decouples the real economy from the financial sector because within the system financial capital overrides real capital. Eventually, the system becomes unbalanced because it remains skewed for one party—the borrower. The predetermined fixed interest rate through compounding always adversely and disproportionately affects the less able member of the society. If the less able are designed to bear the major portion of risk then the reoccurrence of crisis is bound to happen. That is why the system is immoral and the reoccurrence is happening because of this inherent immorality of the system(Askari and Mirakhor 29-32).

Analysis of several financial crises revealed that crisis may occur due to any or combination of all of the above-mentioned causes. It's important to realize that no specific pattern of combination has been identified yet that happens each time. Economists still debate the origins and conditions for how and why crises arise. Although financial crises may have commonalities, they do differ and can appear in various forms and shapes depending on the source and nature of the crisis.

3. Islamic Finance

3.1. The Origins of Islamic Finance

Islamic finance emanates from the commands found in the *Quran* and directives derived from the *Sunnah* (sayings of the prophet Muhammad (PBUH)). These inspired central tenets in the religious law of Islam concerning commercial dealings are as much part of the religion as is the fundamental premise of the religion. The early Muslims engaged in transactions based on *Shari'ah*, and Islamic Economic principles are documented during the Middle Ages from the mid-7th century to the mid-13th century (Mohammed). This era is familiar with the Golden Age of Islamic Civilization. During this era, Islamic finance was the tradition for trade and commerce which spanned the great trade route of Gibraltar (*Jabal Tariq* in Arabic) to the Sea of China (Mohammed). Shaikh M Ghazanfar in his article Capitalist Traditions in Early Arab-Islamic Civilization states "financial innovations during this period led to the development of precursors of today's financial products which were developed by a need to safeguard the integrity of money transactions" (Ghazanfar). He describes "One such device was the bill of exchange or letter of credit (suftajeh), which became well established in state and private commerce" (Ghazanfar).A *Sakk* (the singular to the plural *Sukuk*) was used as an international cross border cheque, and Ghazanfar further states "One can find precursors of the modern stock-exchange/money market in Islam: there were not only the wholesale/retail commercial exchanges in the *funduqs* but also activities typical of the modern commodity exchange" (Ghazanfar).

This exchange relationship also stimulated financial development in other territories. For instance, Islamic trade was so important in Post-Roman Europe that their currency was demonetized and they started to use the Islamic coinage that they obtained from the Islamic traders while trading furs and lumber. This dominance of Muslim coinage eventually grows and spread through whole Europe, Middle East, as well as India (Mohammed). Herman Van Der Wee, an eminent Belgian economic historian, states that "the re-monetization of Europe post the Roman Empire and the rebirth of the European banking system owe much to the flow of Muslim coinage to Europe" (Mohammed).

It should not be surprising that these early practices and innovation of financial products within the Islamic culture have transformed the practice of modern finance because like science and agriculture similarly the knowledge was promulgated through trade as well as by the Crusaders. However, over time the European colonial empires possessed almost the entire Islamic world and suppressed the centuries-old

Islamic finance practices. This suppression results adoption of western-inspired banking systems and business models within most Islamic countries (Ghazanfar).

3.2 The Resurgence of Islamic Finance in the '70s

A majority of the Islamic countries get independence after the World War II, these newly independent Muslim countries led a drive to the surge of Islamic self-identity. This surge along with the repelled by the politics and culture of the West, and inspired by religious piety, a growing number of devout Muslims seek greater conformity between their lives in the modern world and the precepts of their faith (Mohammed). This has provided a positive push for adopting Islamic principles in business and finance in the realm of commerce. Meanwhile, during the 1970s, the middle east countries' oil economy reached its peak, which resulted from a surge in unprecedented oil revenues. The surge in surplus revenue brings in front the important question that how these Muslim nations should manage these funds (Ariff 48-49).

In response to this pressing need, the modern era Islamic financial institutions have started to emerge. Among such, the Mit Ghamr project was the earliest recorded Islamic financial institution established in Egypt in 1963, soon followed by the Nasser Social bank in 1971. As a continuation of this start, the organization of the Islamic Conference (OIC) founded a multinational Islamic development bank in 1973 (Ariff 48).The thrust continues within the 70s, as several countries took the initiative to form Islamic financial institutions within its jurisdiction—some public, some partly government-owned, and some private. These newly formed institutions in the form of Islamic Banking have sparked the revival of Islamic finance in this modern era.

3.3 Key Principles of Islamic Finance

The key principles of Islamic finance are *Shari'ah* legal code. This code is immutable because it is rooted in *Al Quran* and *Sunnah* of Muhammad(PBUH). This code is well explained by the teaching of Prophet Muhammad(PBUH) and the interpretations by his companions and followers from the primary source—the revelation in *Al Quran*. The main distinguishing factor or *Shari'ah* jurisprudence with a conventional one is that it is holistic, which means it does not distinguish between religious and other aspects of life so transaction aspects of human behavior are considered to be included within the sphere of socio-economic and socio-political culture—that referred as *Muamalat* (Ariff 53). Interestingly, this practice of *Muamalat* has been remaining a constant in its core form through the Islamic civilization for the last fourteen centuries. However, within the last three decades, through several innovations, it has emerged as one of the most significant and successful modern implementations of the Islamic legal system.

Islamic Finance is governed by three broader principles. First is the principle of equity. The objective of this principle is to ensure fair justice for the business participants. It ensures the balance between parties according to their abilities. This principle is the basis of the prohibition of '*riba*' (Ayub 43). The term '*riba*' is an

Arabic word means "hump" or "elevation". Scholars explain '*riba*' as an increase in wealth that is not related to engaging in productive activity(Ayub 43). That is why to protect the less able contracting party in a financial transaction on the ground of equity, '*riba*' is prohibited.

The principle of equity is also the basis for prohibiting '*gharar*'. Literal meaning of the Arabic word '*Gharar*' is excessive uncertainty. Within a financial transaction, '*gharar*' usually arise through contract ambiguity or elusiveness of payoff. Besides, in many cases, the information level varies significantly among the parties. For instance, working partners may have more insider information compare to silent partners. In such cases, to ensure equity, the party with insider information has a moral duty to disclose information before engaging in a contract. If not disclose, then the presence of *gharar* would nullify the contract (Ayub 44). Similarly, the equity principle governs the *zakat* distribution. Under the *zakat* obligation, every Muslim qualifies to pay *zakat* if he has a certain threshold level of wealth. The threshold level of wealth morally qualifies that the wealth of that person is sufficient for him to assist the less fortunate person of the society. Through such equity, principles foster social solidarity.

The second principle of *Muamalat* requires responsible participation in a transaction. The responsible participation derives from the legal maxim that states "reward (that is, profit) comes with risk-taking" (Agha and Sabirzyanov 47), This principle specifies how capital should be rewarded within a transaction despite the prohibition of '*riba*'.

Alternatively, it also nullified interest-earning in investment because the principle established that bearing risk is the pre-condition for justification of profit, so the value of money along the passage of time is not justified (Ayub 78). Thus, responsibility ensures a link between financing and entrepreneurship that makes the return on capital directly related to assets performance. This legitimizes the ex-post-based asset return or capital return through risk coupling (Ayub 78). This principle of participation is the key tenet that ensures growth taking place within the society through productive activities.

The third principle is the principle of ownership. This principle is derived from the rulings of "do not sell what you do not own" (for example, short-selling) and "you cannot be dispossessed of a property except based on the right" mandate asset ownership before transacting (Zakariyah 270; Agha and Sabirzyanov 49-50).Islamic finance has, thus, come to be known as asset-based financing, forging a robust link between finance and the real economy(Bacha, Mirakhor and Askari 207-209).Likewise, it requires regard and protection of property rights to underscore the holiness of contractual binding commitments (Maddah 92-93).

These standards infer that in an Islamic monetary framework, financing must be reached out to beneficial exercises, exchange, and genuine resources—in this manner, it is frequently viewed as a resource based monetary framework. If completely conformed to, these standards guarantee fitting influence and help limit hypothesis and good peril (Mirakhor and Zaidi 8-14).

By the above-mentioned principles, excluding fee-based services two modes of Islamic finance are common. The two modes can be categorized as financial intermediation provided on a profit-and-loss-sharing (PLS) basis and non-PLS contracts. Within Islamic finance, the spirit is that all activities should be linked to a real asset. That's why the risk-sharing modes of finance are preferred. Even debt-based finance is also linked to real assets. The link to real asset essentially limits the extent of total leverage within the system and enhance the productive activities by a human (Mirakhor and Zaidi 21). From the moral ground, every human wish is not endorsed by Islam, thus it prohibits activities related to tobacco and other drugs, alcohol, pork products, gambling involving money and non-money assets (*maysir*), speculation, pornography, and armaments and destructive weapons.

4. How Islamic Finance could have been the panacea for the financial crisis

In this section, we discuss the compatibility of the Islamic Finance principle to resolve the occurrence of the financial crisis: for all types and causes of the crisis that have already been identified in section three. In this aspect, rather than looking at the narrower lens of analyzing the "what happened" and the "why" of the financial crisis we set our query to a broader lens— criticize the credence of modern contemporary finance that initiated immediately after World War II. In this prospect, the basis of our argument is that financial crises within the contemporary system reoccur because the system is primarily working on interest-rate-based debt contracts or in more formally through fractional reserve banking, where leveraging bound to exacerbate debt burden—lending through interest compounding increases debt burden. This view is more aligned to the views of a prominent conventional economist like Kindle berger, Keynes, and Minsky(Askari and Mirakhor 17). This premise is backed by empirical findings, as several extensive researchers have identified that the instability of the contemporary financial system—cyclical behavior in terms of the boom and the bust—is inherent to interest-based debt financing (Mirakhor and Zaidi21).

Our argument follows two main premises, the first premise qualifies the stance if the principle of Islamic finance was in operation whether these financial crises would have been taken place; the second premise takes a look at a scenario where a financial crisis could have happened within the Islamic finance framework would the severity of finance felt that hard within the economy.

The synthesis of identified exogenous and endogenous causes related to financial crisis implied that under the current financial system, all financial crises are somehow linked to growth in debt (some focusing on public debt, others on private debt, and a few on total debt), thus they can be attributed as debt crises (Askari and Mirakhor29-33). In these scenarios, the economy reaches financialization—extensive growth of debt finance— because the real economy grows at a much slower pace compared to the financial sector, as a result, the system crumbles.

Theoretically, excessive leverage from debt would not possible under the principles of Islamic finance because the interest-bearing instrument which is the source of leverage is against the fundamentals of the Islamic financial system. According to *Shari'ah* one can't sell or lease any assets until one possesses (Ayub 46). Thus, it is

illegitimate in the Islamic financial system to sell a debt against a debt. The restriction of a debt sale by *shari'ah* also nullifies the scope of speculation and related risk-taking behavior. Thus, this *Shari'ah* principle establishes that any activities within the Islamic finance framework adhere to a fair notion of justice and transparency (Hassan and Kayed 13).

If the Islamic financial system were prevailed and practiced worldwide then disasters like the 2008 global financial crisis would not have happened. During the 2008 global financial crisis, assets worth trillions of dollars were traded without the backing of any sorts of assets. Islamic financial system would have restrained such growth of debt because equity capital is at its core. Most of the transactions within the IF are asset-backed. Even, loan transactions are designed to be supported by *rahn*(Collateral). By principle, the system is structured to transform transactions backed by real assets. This asset backing provides safeguards for the IF in case of default. Thus, if defaults happen still the consequences do not reach the level of enormity because the system by design does not compromise the health and proper functioning of the financial sector.

The equity-based structure of IF maintains the one-to-one mapping between the real sector and the financial sector. It reduces the scope of mismatch that usually prevails within the conventional system—the mismatch between household savings and investment demand within the economy as well as maturities of investment and saving deposits. As the scope of mismatch is minimal so expansion of credit in terms of leverage within the IF is always aligned to the capacity of real economic growth, whereas within the conventional the mismatch is always prevailed and increases the risk of over-financialization (Askari and Mirakhor 56-60; Askari, Iqbal and Krichene 65-66).

The workings and implications of such debtless systems have been already investigated in the theoretically modelled systems such as pure "stock market" economies and"cash-in-advance" systems (Askari and Mirakhor 48-51). This system is mainly developed by Metzler. The extended versions of Metzler's model which are designed as an equity-based model demonstrated that within such system assets nominal value is irrelevant for equilibrium position. The system's tie to the real asset by design embedded automatic stabilizer within the system. In response to systematic as well as non-systematic shocks, the stabilization occurs through the alteration of the total stock of the real asset within the economy. The alteration process is spontaneous and immediate so; the values of overall assets and liabilities within the system always remain equal. The result of this model is further extended in an open economy setting by Mohsin Khan (1986), Khan and Mirakhor (1990), Zaidi and Mirakhor (1988).These models hold the same fundamentals identified in the earlier ones as well as provide further empirical evidence that a fully equity-based system is more stable than a debt-based system, as it adjusts rapidly to shocks. In summary, these standard economic analyses have provided evidence that the Islamic financial system is more stable and resilient than the conventional system.

Another important underlying characteristic of Islamic finance is the risk-sharing mechanism. This is completely different than the conventional system where the depositors/savers do not bear any risk, meanwhile, in Islamic finance, every *shari'ah* legitimate transaction should be based on a profit and loss sharing (PLS) basis (Ayub 81). According to *Shari'ah*, parties involved in any financial transactions should have proportionately borne the risks and profits. Furthermore, the proportion should be known to both parties beforehand as it is a pre-decided ratio(Maddah 93). This risk-sharing approach is already examined extensively in conventional empirical settings, the related evidence showed that risk-sharing financing is more efficient than risk transferring conventional debt financing. Furthermore, information asymmetry which is inherent characteristics for debt contracts is also absent in the case of risk-sharing equity contracts (Hassan and Kayed 23).

Under the debt-based system, the charging of interest is designed to transfer risk from a transaction process (Askari and Mirakhor 29-30). In this system, the risk is never neutralized or eliminated in its total form, rather it shifts the burden from one participant to others within the involved parties in the transaction (Askari and Mirakhor 56). Meanwhile, unlike the capitalist system, principles of Islamic finance ensure risk share. According to *Shari'ah "*(Entitlement to) profit is accompanied by responsibility (for associated expenses and possible loss)*"* (Zakariyah 271-273; Agha and Sabirzyanov 49).According to this principle, under the Islamic financial system legitimacy of any contract requires bearing the part of risk derived from the whole transaction by the contracting parties. Thus, any transactions that guaranteed profits ex-ante as well as fixed, which are very common in conventional practice, are forbidden because in such case element of risk is essentially absent. This implies the Islamic finance mechanism is designed to reduce the risk burden over participants of transactions via sharing proportionately the risks.

The above principle defines risk as the probability of occurrence of an event that may incur a loss. Thus, the risk is not limited to default risk but extends to any type of risk—market risk, capital risk, economic risk, etc.—that would eventually cause losses(Agha and Sabirzyanov 50-51). According to *Shari'ah*, these multifaceted risks should be shared proportionately among the lenders and the borrowers within the transaction instead of being shifted to only one party. As the loss event is not certain thus risk transfer is one sort of speculation(Ayub 76).This is also the basis why risk aversion, as well as speculation (gambling), are not endorsed within the Islamic finance practice(Agha and Sabirzyanov 49-50). In opposite, any practice which adheres to obtaining higher returns in terms of higher risk is endorsed (Maddah 93). The high-risk high-return framework incentivizes entrepreneurs to give their best effort to maximize profits. This framework is the key stimulus of the Islamic economy(Askari and Mirakhor 48). Align to this line of thinking, analysts emphasize that for the success of the business rather than the availability of capital the entrepreneur attributes— the amount of effort a person puts to overcome the level of risk —are more important.

In this framework, the entities become partners, they are not only sharing risks but also profits. Nothing is fixed ex-ante. There remains a common ground for both parties to work along with. Furthermore, things are pre-decided within the contract thus clearly utters the rights and obligations of the parties—profit ratio as well as the extent of each party's liability (Ayub78;Agha and Sabirzyanov 49).Through this framework, information is symmetrical to the parties so they will have a common objective of creating higher values.

While in the conventional setup, returns to the lender are fixed and ex-ante. This fixation is usually a source of a conflict of interest between the borrower and the lender (Maddah 93). The conflict of interest arises because due to fixation the lender is always only concerned with receiving the principal amount lent and the interest accruing on that loan whereas the borrower's only concern is to anyway receive the funding. However, the flip side is the ultimate reality where there remains a lot of uncertainty while carrying the activities may affect the stake of the parties accordingly. For instance, the borrower cannot guarantee the success of the business which he funded by the lender money—more uncertain for relatively new projects or start-ups. The consequence would result in an uncertain return to the lender, which eventually may lead to default (Bacha, Mirakhor and Askari 193-196).

This conflict of interest keeps scope for asymmetric risk as often keeping information unrevealed perceived as an incentive for one party involved in the transaction (Bacha, Mirakhor and Askari 193-196). Furthermore, ex-ante fixed interest payment also keeps scope for free riding as well as moral hazard. The guaranteed payment is an opportunity for the lender to remain idle—no incentive for the lender to monitor the activities and performance of the borrower. This lack of monitoring on the other hand incentivizes the borrower to allocate the funds to risky or even speculative activities. This misallocation increases the risk within the project and may even lead to failure. The ultimate result defaults on the loan (Askari and Mirakhor37-40). While in the case of Islamic finance, the opposite is true, because of the risk-sharing principle adverse selection and moral hazards are absent within the contract framework. The absence minimizes the level of asymmetry among the parties that also enhance the level of cooperation among the parties. This enables both the lender and borrowers to work on more specific objectives—creating wealth and growing the business (Bacha, Mirakhor and Askari196-197). Thus, compared to the conventional system Islamic finance is more stable, realistic and resilient, and less prone to crisis.

The views that kept moral failure are the ultimate cause of financial crisis holds implicitly the problem of stealthy risk-sharing within the conventional system, lax regulatory framework incentivizes the excessive risk-taking and embedded human behavior of greed, fraud, and corruption as the root cause of the financial crisis. In a nutshell, all of these demonstrated the loophole of institutional frameworks of conventional finance. The base of most of these loopholes is mistrust derived from asymmetric information and related adverse selection, moral hazards problem (Bacha, Mirakhor and Askari 193-196). The synthesis is that these loopholes

impaired the key institutional frameworks to facilitates efficient operations of the financial system.

The principles of *Shari'ah* provide a better institutional framework for Islamic finance to work on. The risk-sharing principle, for instance, framed the parties in any business transaction as partners. Logically when the parties are in partnership then they have equal stakes in the transaction, thus it embeds monitoring of activities by both parties. The risk-sharing principle also erodes the default risk because under this principle it cannot be shifted or sold off. Besides, the ethical norm within Islamic morals requires fostering close relationships and trust between transacting parties. This is to uphold honesty along with greater transparency within the business transaction (Hassan and Kayed 20-23). This close relationship in form of fraternity also enhances allocative efficiency because this relationship is conducive for reducing the search cost—as the borrowers are compelled to open up to the lender, who in turn can identify borrowers based on genuine need(Hassan and Kayed 20-23). The significance of such positive relationships is also even felt within the conventional framework. Especially the need became more prominent in the aftermath of the 2008 financial crisis when the Vatican urged conventional banks to consider the ethical rules of Islamic finance "to restore confidence amongst their clients" (Ozsoy 174; Totaro).

This framework could have been successfully eliminated the situation that sustained and eventually led to the 2008 financial crisis, where a huge amount of credit extended to borrowers eventually became non-performing(Claessens and Kose 8). Even it would have not been possible for big players like Lehman Brothers to tweaking disclosure requirements, as it had for months before its collapse used an accounting technique known as "Repo 105" and 'reduced' its reported liabilities by $50 billion(Claessens and Kodres 32).These sorts of activities emphasize what types of socio-economic business model the conventional system promoted. Within this model only self-centeredness dominates. Where the practitioners are operating at an "emotional distance" from their victims and the "poisonous consequences" of their actions (Zuboff). Zuboff labelled that "In the crisis of 2009 the mounting evidence of fraud, conflict of interest, indifference to suffering, repudiation of responsibility and systemic absence of individual moral judgment produced an administrative massacre of such proportion that it constitutes an economic crime against humanity" (Zuboff). However, the same would not be possible under the Islamic finance framework, the system would have been functioning in a more humanized way not only at the crisis-hit moment but also at the crisis aftermath.

The 2008 global financial crisis has raised a serious question regarding the validity of existing ethical conduct and moral practice within the capitalist system. The occurrence of the 2008 crisis showed that there remains a gap under the capitalist contract system. Current contracts are lacking full disclosure thus also underrating the business risks. Besides the system is also adequately designed, especially it is lacking standard monitoring and effective regulation to ensure fairground for all relevant stakeholders.

In this regard, the landscape of Islamic Finance is already empowered through its fundamental principles. These principles require that the norm, culture, and practice of *Shari'ah-based* institutions should be in conformity with justice and fair play at any consideration first. Under this ideal framework, one of the key regulatory principles is that all the participants in any particular contract must be abreast of the potential opportunities and risks of that specific venture. Align to same, financial institutions are obliged to conform to comprehensive disclosure and transparency standards where risk must be explicitly communicated to its clients. Thus, this framework of full disclosure and transparency is by default designed to enhance the prospects for market discipline— the mechanism is built in to curb imprudent behaviour thus ensure the stability of the financial system.

It does not mean that fraud, corruption, and greed are eliminated from this system, as humans we all are created as weak and prone to indulge in unethical practice (Al Quran, *Oxford World's Classics Edition*, 4:28). However, the concept of ethics in Islam holds a holistic view so it permeates all spheres of Muslim life. Furthermore, divine commands of the creator authorize the extents of ethics in Muslim life with specific guidelines. Thus, by principle ethical practices are pre-conditional filters within the Islamic financial system and it embraces the whole activities. It means the layers and filters of moral ethics are thicker in the Islamic finance landscape. Thus, if anything bad or malpractice might happen, despite that the severity would not be disproportionately felt hard on anyone group because the regulatory and monitoring framework are more compassionate thus moderate to humanizer.

5. Concluding remarks and way forward

In this paper, our focus was to critically analyze the promise of Islamic finance to reshape the world financial landscape. We find in our analysis that Islamic finance is theoretically underpinned to provide a more stable financial landscape. The main basis of this system is equity participation—sharing profit and loss according to fair proportionate. The system's focus is on the real asset so even financial intermediation requires acquiring common stock through redeploying real savings into real investment. This design enables the system to avoid interest and interest-based assets, thus, it is inherently more stable than conventional finance. Importantly, the system does not compromise its functioning capacity to mobilize savings and efficient allocation of investment. The reason why the system imposes more stability is that its instruments are by design more directly linked to the productivity of the real sector. The link to the real sector through risk and rewards sharing promotes more social objectives because it is capable to provide a cocoon to the intermediation process against the business cycle—both in booms and slumps—embedded in the conventional system.

However, from the practice perspective, Islamic finance is still facing and working within the uneven field. Its parallel operation within the conventional practice always kept it contestant to achieve conventional performance. In this case, the stable, resilient real-valued nature of Islamic finance is occasionally under shadowed by the nominal growth of conventional finance. Furthermore, despite not having a favorable

political, regulatory framework it has to compete hard enough to create its own space within the long-runner conventional landscape. In this prospect, one of the key competitive attributes is its philosophical and ethical framework which should in practice provide a better institutional capacity to promote a more responsible and ethical landscape—the landscape which could solve lots of modern financial system anomalies as well as global drive for better future.

In reality, there require to uphold more coherence regarding the regulatory framework of Islamic finance to institute a *Shari'ah*-compliant financial safety net infrastructure. Still, a set of comprehensive prudential standards is needed, which can only achieve through a stronger supervisory and regulatory framework. It requires aligning of good practices through ensuring more capable and skilful human resources within the Islamic finance framework. If such can be achieved then the theoretical underpinning is bound to achieve broader practicability—evolve more inclined to *Maqasid*—that should be a panacea to tackle any form of crisis.

Works Cited

1 Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, 818-889. *Sunan Abi Dawud. Hums :Muhammad Ali al-Sayyid,*. 1969.

2 Adrian, Tobias and Hyun Song Shin. " Financial Intermediaries, Financial Stability and Monetary Policy." *Federal Reserve Bank of Kansas City, 2008 Symposium.* 2008.

3 Agha , Syed Ehsan Ullah and Ruslan Sabirzyanov,. "Risk Management in Islamic Finance: An Analysis from Objectives of *Shari'ah* Perspective,." *International Journal of Business, Economics and Law* 7.3 (2015): 46-52.

4 Ariff, Mohamed . "Islamic Banking." *Asian-Pacific Economic Literature* 2.2 (1988): 46-62.

5 Ascarya, A. "The Root Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.02 (2017): 136-149.

6 Askari, Hossein and Abbas Mirakhor. *The Next Financial Crisis and How to Save Capitalism*. Palgrave Macmillan, 2015.

7 Askari, Hossein, et al. *The Stability of Islamic Finance Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2010.

8 Ayub, Muhammad . *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons Ltd, 2012.

9 Bacha, Obiyathulla Ismath , Abbas Mirakhor and Hossein Askari. *PSL Quarterly Review* 68.274 (2015): 187-213.

10 Barth, James R., Michael D. Bradley and Paul C. Panayotacos. "Understanding International Debt Crisis." *Case Western Reserve Journal of International Law* 19.1 (1987): 31-52.

11 Bernanke, Ben S. . "Monetary Policy and the Housing Bubble",." *Remarks at the Annual Meeting of the American Economic Association, January 3, Atlanta, Georgia.* 2010.

12 Boughton, James M. . *Silent Revolution :The International Monetary Fund 1979–1989*. International Monetary Fund, 2001.

13 Chu, Ben. *Financial crisis 2008: How Lehman Brothers helped cause 'the worst financial crisis in history'*. 12 September 2018. <https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/financial-crisis-2008-why-lehman-brothers-what-happened-10-years-anniversary-a8531581.html>.

14 Claessens , Stijn and M. Ayhan Kose. "Financial Crises: Explanations, Types, and Implications." *IMF Working Paper, WP/13/28*. International Monetary Fund, 2013.

15 Claessens , Stijn and Laura Kodres . "The Regulatory Responses to the Global Financial Crisis: Some Uncomfortable Questions." *IMF Working Paper*. International Monetary Fund, 2014.

16 Corsetti , Giancarlo , Paolo Pesenti and Nouriel Roubini. "What Caused the Asian currency and financial crisis?" *Japan and the World Economy* 11.3 (1999): 305-373.

17 Davies, William. "The Emerging Neocommunitarianism." *The Political Quarterly* 83.4 (2012): 767-776.

18 Dridi, Jemma and Maher Hasan. "The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study." *IMF Working Paper*. International Monetary Fund, 2010.

19 Eichengreen, Barry and Richard Portes. "The Anatomy of Financial Crises." *NBER Working Paper N0. 2126 (Also Reprint No. r1262)*. the National Bureau of Economic Research, 1987. 30 March 2020. <https://www.nber.org/papers/w2126>.

20 Gay, E. F. . "The Great Depression." *Foreign Affairs* 1932: 529-540.

21 Ghazanfar, S M. *Capitalist Traditions in Early Arab-Islamic Civilization*. 2008. <https://muslimheritage.com/capitalist-early-arab-islamic-civil/>.

22 Hall, Robert E. . "Why Does the Economy Fall to Pieces after a Financial Crisis?" *Journal of Economic Perspectives* 24.4 (2010): 3-20.

23 Hassan, M.Kabir and Rasem Kayed. "The Global Financial Crisis and Islamic Finance." 2018.

24 History.com. *Great Depression History*. n.d. 20 March 2020. <https://www.history.com/topics/great-depression/great-depression-history>.

25 ICD-REFINITIV. "Progressing Through Adversity, Islamic Finance Development Report 2020." 2020.

26 Kettell, B. . *Introduction to Islamic Banking and Finance*. John Wiley & Sons Ltd. Print., 2011.

27 Khan, Mohsin S and Abbas Mirakhor. "Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and in Pakistan." *Economic Development and Cultural Change* 38.2 (1990): 353-375.

28 Khan, Mohsin S. "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis." *Staff Papers (International Monetary Fund)* 33.1 (1986): 1-27.

29 Maddah, Fatemah A.Al. "Islamic Finance and the Concept of Profit and Risk Sharing." *Middle East Journal of Entrepreneurship, Leadership and Sustainable Development* (2017): 89-95.

30 Merrouche , Ouarda and Erlend Nier. "What Caused the Global Financial Crisis?—Evidence on the Drivers of Financial Imbalances 1999–2007." *IMF Working Paper*. Inetrnational Monetary Fund, 2010.

31 Mirakhor, Abbas and Noureddine Krichene. *The Recent Crisis: Lessons for Islamic Finance*. 2009. 27 March 2020. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56022/1/MPRA_paper_56022.pdf>.

32 Mirakhor, Abbas and Iqbal Zaidi. "Stabilization and Growth in an Open Islamic Economy." 1988. 1-37.

33 Mohammed, Naveed. *A History of Islamic Finance*. 2015. <https://www.islamicfinance.com/2015/02/an-overview-of-the-history-of-islamic-finance/>.

34 Nur, Sinta. *Endogenous and Exogenous Explanations for the Financial Crises in Mexico, SE Asian and Russia*. Munich Personal RePEc Archive, MPRA, 2018. 31 March 2020. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92896/>.

35 Obstfeld , Maurice and Kenneth Rogof. "Global Imbalances and the Financial Crisis:." *Federal Reserve Bank of San Francisco Asia Economic Policy Conference, Santa*. 2009.

36 OECD. "OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis : CONTRIBUTIONS to the GLOBAL EFFORT." 2009.

37 Ozsoy, Ismail. "An Islamic Suggestion of Solution to the Financial Crises." *Procedia Economics and Finance* 38 (2016): 174-184.

38 Reinhart, Carmen M and Kenneth S Rogoff. "The Aftermath of Financial Crises." *American Economic Review: Papers & Proceedings* 99.2 (2009): 466-472. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.99.2.466>.

39 Romer, Christina D. . "Great Depression." Encyclopædia Britannica, 2003. 30 March 2020. <https://eml.berkeley.edu/~cromer/Reprints/great_depression.pdf>.

40 Roy , Saktinil and David M. Kemme. "The run-up to the global financial crisis: A longer historical view of financial liberalization, capital inflows, and asset bubbles." *International Review of Financial Analysis* (2019).

41 Straub, Ludwig and Robert Ulbricht. "Endogenous Uncertainty and Credit Crunches." *Working Paper*. 2017.

42 Totaro, L. *Vatican says Islamic finance may help Western banks in crisis*. 2009.

43 Wector, Dixon. *The age of the great depression, 1929-1941*. 1948.

44 Zakariyah, Luqman. "Legal Maxims and Islamic Financial Transactions:A Case Study of Mortgage Contracts and the Dilemma for Muslims in Britain." *Arab Law Quarterly* 26 (2012): 255-285.

45 Zanalda, Giovanni . *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier, 2015.

46 Zuboff, S. . "Wall Street's Economic Crimes against Humanity." *Businessweek* 2009.

Date of Submission : 31.08.2022
Date of Acceptance : 06.11.2022